আলো নেই

প্রথম খণ্ড

আলো নেই

প্রথম খণ্ড

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

স্বাধীনতাসম্ভব সেই সব দিন

অদূবেই স্বাধীনতা। দেশভাগ ঘনিয়ে এসেছে। কোথাও যেন আলো নেই। অখণ্ড বঙ্গে দমবন্ধ অবিশ্বাসেব আবহাওয়া। শতাব্দীব পবে শতাব্দী যাবা একে অন্যেব পড়শী তাদেব ভেতব বাজনীতিব বিষ ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বাস, ভালবাসা ছিন্নভিন্ন।

মহাত্মা গান্ধীব অনুবোধে বঙ্কিমচন্দ্রেব দেশভক্তিব গান বন্দেমাতবম ছেঁটে ছোট কবতে হচ্ছে ববীন্দ্রনাথকে অবিশ্বাসেব বাজনীতিব সাম্প্রদায়িক প্রচাবে দেশেব এক দল মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সবে যাচ্ছেন। জওহবলাল তাঁদেব ফিবিয়ে আনতে বথাই জনসংযোগেব ডাক দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র বলছেন, এখনই ইংবাজেব বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে। গান্ধীজি বললেন, না, এখনো সময় হয়নি। দীর্ঘদিনেব স্বাধীনতা আন্দোলন—সেই আন্দোলনকে ঘিবে আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন বুঝি খান খান কবে ভেঙে যায়

কাননদেবী ভাল গান পাওয়াব জন্যে ছুটলেন নজরুলেব কাছে নজরুল দু'হাতে লিখছেন তখন লিখছেন হাসছিবিব গল্প দেশপ্রেমেব গান কিন্তু সংসাব চলছে না। বিভূতিভূষণ মেসেব ঘবে বসে লিখছেন 'চাঁদেব পাহাড়'। সুদূব ইউবোপে কমলা নেহরুব অন্ত্যেষ্টিতে জওহবলালেব এক পাশে দাঁড়িয়ে মেয়ে ইন্দিবা—আবেক পাশে সহযোদ্ধা সুভাষচন্দ্র। সেই সুভাষ অভিমান ভবে জওহবকে লিখছেন - সাবা দেশে তুমিই সেই বিবল ব্যক্তি যিনি মহাত্মা গান্ধীব পবে সবচেয়ে জনপ্রিয়—কিন্তু আমাব বিরুদ্ধে কথা উঠলে সে সব কথা তুমি যতটা বড় কবে বল আমাব স্বপক্ষে বলাব থাকলে তা তোমাব মনোযোগই পায় না

মহম্মদ আলি জিন্না মেয়েকে বললেন, সাবা দেশে একজনও মুসলমান ছেলেকে পেলে না যাকে তুমি বিয়ে কবতে পাব ? শেষে বিয়ে কবলে একজন পাবসিকে। মেয়ে জবাবে বাবাকে বললেন আপনিও তো পাবসি বিয়ে কবেছিলেন নিজেব জীবনে দীর্ণ মহম্মদ আলি জিন্না মহাত্মা গান্ধীকে অনুবোধ কবে পাঠিয়েছিলেন, মাদ্রাজ, বোম্বাইয়েব মন্ত্রিসভায়, তখনকাব সংযুক্ত প্রদেশেব মন্ত্রিসভায় মুসলিম লিগেব একজন কবে মন্ত্রী নেওয়া হোক। জিন্না ফিবে তাকিয়ে ভাবছেন যদি ওঁবা কথাটা বাখতেন সেদিন তাহলে ? তাহলে হয়ত দেশভাগেব এই বাস্তায় নামতেই হত না তাঁকে

আবুল কাশেম ফজলুল হক ভোটে জিতে প্রথমেই কংগ্রেসেব সঙ্গে কোয়ালিশন সবকাব গড়াব প্রস্তাব দিলেন কংগ্রেস সাড়া না দেওয়ায় তিনি লিগেব সঙ্গে কোয়ালিশন সবকাব গড়তে বাধ্য হলেন। সেদিনই বাঙালিব ভাগ্য স্থিব হয়ে গেল পড়শিতে পড়শিতে ভিন্ন হয়ে যাওয়াব বাজনা ঝনঝন কবে বেজে উঠল।

ফেবদৌস অঞ্জলিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। কেন তা বুঝতে পাবে না অঞ্জলি।

স্বাধীনতাসম্ভব সেই সব দিন

অদূরেই স্বাধীনতা দেশভাগ ঘনিয়ে এসেছে। কোথাও যেন আলো নেই। অখণ্ড বঙ্গে দমবন্ধ অবিশ্বাসের আবহাওয়া। শতাব্দীর পরে শতাব্দী যারা একে অন্যের পড়শী তাদের ভেতর রাজনীতির বিষ ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বাস, ভালবাসা ছিন্নভিন্ন।

মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশভক্তির গান বন্দেমাতরম ছেঁটে ছোট করতে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে অবিশ্বাসের রাজনীতির সাম্প্রদায়িক প্রচারে দেশের এক দল মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সরে যাচ্ছেন। জওহরলাল তাঁদের ফিরিয়ে আনতে বৃথাই জনসংযোগের ডাক দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র বলছেন, এখনই ইংরাজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে গান্ধীজি বললেন, না, এখনো সময় হয়নি দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা আন্দোলন— সেই আন্দোলনকে ঘিরে আশা আকাঙ্খা, স্বপ্ন বুঝি খান খান করে ভেঙে যায়

কাননদেবী ভাল গান পাওয়ার জন্যে ছুটলেন নজরুলের কাছে নজরুল দু'হাতে লিখছেন তখন লিখছেন ছায়াছবির গল্প দেশপ্রেমের গান কিন্তু সংসার চলছে না। বিভূতিভূষণ মেসের ঘরে বসে লিখছেন 'চাঁদের পাহাড়'। সুদূর ইউরোপে কমলা নেহরুর অন্ত্যেষ্টিতে জওহরলালের এক পাশে দাঁড়িয়ে মেয়ে ইন্দিরা আরেক পাশে সহযোদ্ধা সুভাষচন্দ্র। সেই সুভাষ অভিমান ভরে জওহরকে লিখছেন - সারা দেশে তুমিই সেই বিরল প্রতিভা যিনি মহাত্মা গান্ধীর পরে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কথা উঠলে সে সব কথা তুমি যতটা বড় করে বল আমার স্বপক্ষে বলার থাকলে তা তোমার মনোযোগই পায় না

মহম্মদ আলি জিন্না মেয়েকে বললেন, সারা দেশে একজনও মুসলমান ছেলেকে পেলে না - যাকে তুমি বিয়ে করতে পার ? শেষে বিয়ে করলে একজন পারসিকে। মেয়ে জবাবে বাবাকে বললেন আপনিও তো পারসি বিয়ে করেছিলেন নিজের জীবনে দীর্ণ মহম্মদ আলি জিন্না মহাত্মা গান্ধীকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলেন, মাদ্রাজ, বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভায়, তখনকার সংযুক্ত প্রদেশের মন্ত্রিসভায় মুসলিম লিগের একজন করে মন্ত্রী নেওয়া হোক। জিন্না ফিরে তাকিয়ে ভাবছেন—যদি ওঁরা কথাটা রাখতেন সেদিন তাহলে ? তাহলে হয়ত.. .দেশভাগের এই রাস্তায় নামতেই হত না তাঁকে।

আবুল কাশেম ফজলুল হক ভোটে জিতে প্রথমেই কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়ার প্রস্তাব দিলেন। কংগ্রেস সাড়া না দেওয়ায় তিনি লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়তে বাধ্য হলেন। সেদিনই বাঙালির ভাগ্য স্থির হয়ে গেল পড়শিতে পড়শিতে ভিন্ন হয়ে যাওয়ার বাজনা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

ফেরদৌস অঞ্জলিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। কেন তা বুঝতে পারে না অঞ্জলি

চৈত্র মাসের বিকেল বেশ লম্বা হয়। সূর্যের আরও লম্বা সব আলোর কাঠি নতুন তৈরি কর্পোরেশনের বাজার—সাদার্ন মার্কেটের দোতলার ছাদ পেরিয়ে কবির রোডে এসে পড়েছে। এই আলোতে দুপুরের সেই তেজ নেই। রাস্তার মোড়ে একটি ডালপালা ছড়ানো বিরাট শিরীষ গাছের পাতার ভেতর দিয়ে যে আলো এসে বাস রাস্তা, ট্রাম লাইন, কবির রোডে পড়েছে—তাতে দেখা যায় নানা রকমের মানুষজনের চলাফেরা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র হওয়ার পর থেকেই কর্পোরেশনের নানা দিকে কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। দিকে দিকে কর্পোরেশনের স্কুল। টিনের চাল দেওয়া বাজার ভেঙে নতুন নতুন বাড়ি। সেখানে ওষুধের দোকান। বইঘর। ডাক্তারখানা। দোতলায় পাবলিক লাইব্রেরি।

সাদার্ন মার্কেটের নতুন দোতলা বাড়িটি অনেকটা লম্বা। তার মাথায় লেখা—সম্ভবত ১৯৩৬। এখন আলো কমে আসায় পড়া যাচ্ছে না।

কবির রোড, জনক রোড, সর্দার শঙ্কর রোড—এসব রাস্তায় যাঁরা নতুন নতুন বাড়ি করেছেন তাঁদের বয়স হয়েছে। কেউ জজ। কেউ বা চোখের ডাক্তার। দু-পাঁচজন অ্যাডভোকেট আছেন। এঁরা এই সময়টায় ছড়ি হাতে ইভনিং ওয়াকে বেরিয়ে পড়েছেন। একটা দুটো করে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠছে সাদার্ন মার্কেটে।

কালীঘাট ট্রাম ডিপো হয়ে রসা রোড সিধে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোয় চলে গেছে। মাঝে ভ্যারাইটি বলতে মাথার ওপর একটি রেল ব্রিজ। তার ওপর দিয়ে বজবজ যাতায়াত করে ট্রেন।

ইভিনিং ওযাকে যাঁরা বেরিয়েছেন—তাঁদের মনে খুব অশান্তি। জীবনের শেষে এ কোথায় এসে বাড়ি করলাম ? দক্ষিণে এগোলে বালিগঞ্জ অব্দি টানা মাইল তিনেকের জলা জায়গা। হোগলা বন। শেয়াল এখনও ডাকে। মাঝে মাঝে খুন করে ফেলে দেওয়া মড়া ভেসে ওঠে।

আশার কথা--শোনা যাচ্ছে—সি আই টি নাকি জায়গাটা নিয়েছে। পাঁচ বছর ধরে লেক কেটে চলেছে। সাজিয়ে গুজিয়ে ও দিকটা নাকি বেড়াবার মতো করে ফেলবে। কাগজে জমি জায়গার বিজ্ঞাপনে দেখা'যায়—ডেভেলপাররা গাড়িয়াহাটের বসতবাড়ির জমির দাম কাঠা পিছু ষাট সত্তর টাকা হাঁকছে। বজবজের রেললাইনের গা ঘেঁষে এই বিরাট জলাজায়গা। রেললাইন টপকালেই মুটেপাড়া। বলা ভাল—কাদাপাড়া। বাকি জায়গায় আবারও হোগলা বন। বর্ষাকালে হাঁটতে গেলে কাদায় পা ডেবে যায়। ওদিকটায় ইটখোলা করে রূপলাল কোম্পানি এদিককার সব মহল্লায় গো-গাড়িতে ইট সাপ্লাই দিচ্ছে নতুন নতুন বাড়ির জন্যে। লরি যাবার রাস্তাই হয়নি। এ সবের ভেতর ছবির চেহারা এক একখানা সাদা রঙের ট্রামের। রাজহাঁসের মতো দুলতে দুলতে রেলব্রিজের তলা দিয়ে টালিগঞ্জ চলে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে। ঘণ্টা দিতে দিতে। পাঞ্জাবিদের দুখানি বাস ট্রাম ডিপো অবধি গিয়ে শেষ। ডানদিকে টার্ফ ক্লাব। শনিবার রেস থাকলে ঘোড়া সার দিয়ে হেঁটে যায়। রেসুড়েরা ট্রাম বাস লাদাই হয়ে যায়। বাঁ হাতে গল্‌ফ ক্লাব। রবিবার ভোরে যে-যাবে গাড়ি চালিয়ে গলফ খেলতে যায়। তাদের বেশিরভাগই সাহেব।

এতকিছুর ভেতর কবির রোডে কোনও উনিশ-বিশ নেই। মুড়িওয়ালা মুড়ি ভাজছে। নতুন দোতলা বাড়ির যে-গ্যারাজে গাড়ি নেই, সেখানে ধোপাখানা। ইস্ত্রি চলছে। ফুটপাথের গায়ে ধোপানি তোলা উনুনে রুটি সেঁকতে ব্যস্ত। ঠিক এইসময় দেখা গেল একখানা খানিক তৈরি বাড়ির সামনে ফুটপাথ ঘেঁষে একটি মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে। তার পেছনের দরজাটি খোলা। সিটে বসে অল্পবয়সী একটি মেয়ে—এই বিশ বাইশ হতে পারে। ফুটপাথের দিকে পা ঝুলিয়ে দিয়েছে। শাড়ির আঁচল মাথায় তোলা। মুখের পাশে সে আঁচল এমন করেই টানা—যে মুখের কিছুই দেখা যায় না।

স্টিয়ারিংয়ে বসা ড্রাইভারের বয়স হয়েছে। ধুতির ওপর হাফশার্ট। চোখে চশমা। মাথা-গোঁফ জোড়া--দুইই সাদা। রাস্তা দিয়ে যাদের যাতায়াত, তারা গাড়ির ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে না। কলকাতা এখানে কচি—লোকজনও বেশি নয়। সবাই সবাইকে নিয়ে ব্যস্ত। তাদের আগ্রহও কম।

ড্রাইভার শান্ত গলায় বলল, মিস্ত্রিরা কেউ আজ আর আসবে না মনে হচ্ছে।

পেছনের সিটে বসা মেয়েটি বেশ শান্ত। গাড়ির পেছনের একটি দরজা খোলা থাকলেও আইঢাই করছেন গরমে। শান্ত গলায় বললেন, আরেকটু দেখি। এখন বুঝতে পারছি—বাড়ির কাজ এভাবেই এগোচ্ছে।

ড্রাইভার কোনও কথা বলল না। মোড়ের শিরীষ গাছটায় অনেক কাকের সঙ্গে অনেক পাখি থাকে। তারা সবাই নানা কথা বলতে বলতে যে যার বাসায় ফিরছে। ওরই ভেতর সামান্য ঘোমটাটানা মুখটি ঘুরিয়ে মেয়েটি ফুটপাথের উলটোদিকের একতলায় দেখলেন, এক গেরস্থ বাড়ি ফিরে হাতের ছাতাটি পাকিয়ে দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে দিলেন। জানলা দিয়ে সব দেখা যায়। অল্প পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠেছে ঘরে। একটি

বছর সাত-আটের ছেলে গেরস্থের কাছে বাবা বাবা বলে ছুটে গেল। ছেলেটির পেছনে তার মা। অল্প বয়স। এই ছবি দেখতে দেখতে মেয়েটি আর চোখ ফেরাতে পারছেন না। যেন নাম করা কোনও নাটকের প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য। শুরুতেই জমে উঠেছে। ঠিক এইসময় একটি মোটর এ গাড়িটি পার হয়েই স্পিড কমিয়ে থামল। তারপর ব্যাক করে এ গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। স্টিয়ারিং থেকে গলা বাড়িয়ে পুরুষালি—কিন্তু ভাজা ভাজা মিহি পরিষ্কার স্বর ভেসে এল।

এ গাড়ির ড্রাইভার কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাশের মোটরের দরজা খুলে একজন ছিপছিপে পুরুষ বেরিয়ে এলেন। তোমার গাড়ি দেখেই চিনতে পেরেছি—

মেয়েটি বেরিয়ে এলেন তাঁর গাড়ি থেকে। আপনি ?

এখানে কী করছ ?

মেয়েটি কোনও কথা বলতে পারলেন না। প্রায় স্কুলের ছোট মেয়ের মতোই মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

পুরুষমানুষটি চারদিকে তাকালেন। তাঁদের দেখে রাস্তার আশে পাশে লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই তো ! মুশকিল বাধিয়ে বসলে। শিগগিরি আমার গাড়িতে উঠে এসো। তোমার গাড়ি ছেড়ে দাও—

নিজের গাড়িতে বসে বেশ স্পিড তুলেই তিনি জানতে চাইলেন, এখানে গাড়ি থামিয়ে কী করছিলে ?

দেখুন না। আমার একটা বাড়ি উঠছে।—বলতে বলতে স্টিয়ারিংয়ের মানুষটিকে ভাল করে দেখলেন। ঘিয়ে রঙের হালকা সুট। গলায় রোজ যেমন থাকে না—আজও কোনও টাই নেই। কপালটি বড়। মাথার চুল কালো—কিন্তু পিছিয়ে পড়েছে। সবসময়ই একটা অন্যমনস্ক ভাব ছেয়ে আছে মুখখানি।

তাই বল। ওটা তা হলে তোমার বাড়ি কানন ? খানিকটা উঠেছে—

হুঁ। কাজে আসেনি কোনও মিস্ত্রি আজও। এই নিয়ে পর পর দুদিন। তাই তোমাকে স্টুডিওতে দেখিনি। চল—আজ আমরা কোথাও ঘুরে আসি।

কানন বুঝতে পারছেন না তাঁর পাশের মানুষটিকে কী বলে ডাকবেন। অন্যকে অমুকবাবু বলা যায়। কিন্তু ওঁকে তো প্রমথেশবাবু বলে কেউ ডাকে না। স্টুডিওতে বলা হয়—বড়ুয়াসাহেব। কাগজে বেরোয় গৌরীপুরের রাজকুমার প্রমথেশ বড়ুয়া। কিন্তু একেবারে সামনা সামনি—পাশাপাশি বসে কী বলা যায়। কিছুই মাথায় এল না কাননের।

গাড়ি বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে রসা রোড ধরল। বড়ুয়াসাহেব বললেন, দ্যাখো কানন—মাত্র চল্লিশ বছর আগেও ধর্মতলা থেকে সাউথে কলকাতা ছিল ভবানীপুর অব্দি। ওই অব্দি স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে মানুষ মিছিল করে এসেছিল—তিনি আমেরিকা থেকে ফেরার পর। এই চল্লিশ বছরে কলকাতা সাউথে এখনও টালিগঞ্জের রেলপোল ভাল করে পেরোয়নি।

বড়ুয়াসাহেব কারও মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না। গাড়ি যে চালাচ্ছেন—চোখ সামনের দিকে তাকিয়ে—কিন্তু সে চোখ যেন আসলে তাঁর নিজের ভেতরে তাকিয়ে আছে। কতই বা বয়স! তেত্রিশ চৌত্রিশ! দেখায় আরও কম।

খুব ভেবেচিন্তে কানন বললেন, কী বলছেন! আমরা যে শুটিং করি টালিগঞ্জে। সেটা কলকাতা নয়?

কলকাতা কানন। কিন্তু এখনও গ্রাম। আদিগঙ্গা পেরিয়ে ওপারে যাও—আমগাছে বউল এসেছে। পাখি ডাকছে। আদিগঙ্গায় হাঁড়িকুড়ি বোঝাই নৌকো। গঙ্গার ওপারেই সুশীলেশ্বরীর মন্দিরে কাঁসরঘন্টা বাজছে। বাড়িই যদি করবে তো কিছুটা এগিয়ে কলকাতায় করতে পারতে।

আমার কিছু তো আপনার অজানা নয়। আপনি রাধা ফিল্মকে চার হাজার টাকা কমপেনসেশন দেবার ব্যবস্থা করে নিউ থিয়েটার্সে আমাকে আনালেন—মাস মাইনে একশো ষাটে।

ওঃ! সেবারে দেবদাসে পার্বতীর জন্যে তোমায় ভেবেছিলাম। রাধা ফিল্মসের রাধাপ্রসাদ চামারিয়া ছাড়লেন না। তাই এ বার মুক্তির জন্যে আমি আর কোনও ঝুঁকি নিইনি কানন।

কানন খুবই কৃতজ্ঞ চোখে বড়ুয়াসাহেবের মুখে তাকালেন। বড়ুয়াসাহেব তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। বছর দুই আগে জহর গাঙ্গুলির সঙ্গে মানময়ী গার্লস স্কুল করেছিলেন কানন। রূপবাণীতে রিলিজ হয়ে টানা দশ সপ্তাহ চলেছিল। তারপরেই নিউ থিয়েটার্সের অফার। লেখক শরৎচন্দ্র। বইয়ের নাম দেবদাস। তায় পার্বতীর রোল। কিন্তু রাধা ফিল্মস্ ছাড়ল না কাননকে। চুক্তির দোহাই দিয়ে। জীবনে এতবড় একটা চান্স হারাতে হয়েছিল। তখন তিনি বড়ুযাসাহেবকে দুঃখ করে বলেছিলেন। রাজকুমার তাঁকে বলেছিলেন, ঠিক আছে, দুঃখ করার কিছু নেই। ভবিষ্যতে আশা করি এরকম যোগাযোগ আবার ঘটবে। সেই সুযোগ তিনি মুক্তিতে দিলেন।

টানা শুটিং করে বড়ুযাসাহেব মুক্তির কাজ শেষ করেছেন। এডিটিং চলছে। দু দুটো নাগরা মেশিনে সকাল থেকে কাজ চলছে। পূর্ণর সামনে পাহাড়ী সান্যাল তাঁর টু সিটার থামিয়ে গটগট করে হলঘরে ঢুকছেন। কানন দেখতে পেয়েছেন তাঁকে। ওঁর সঙ্গে বিদ্যাপতিতে কাজ করেছেন। পাহাড়ীবাবু বিদ্যাপতি, অনুরাধার রোলে আমি। আর ছিলেন দুর্গাদাস। ছাযাদেবী। আমি বলি শুধু ছাযা।

প্রমথেশ গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, তোমার বয়স কম। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করবে। শুনলাম কোন ছবির নাচের রোলে একটানা এত নেচেছো—শেষে পা ফুলে গিয়ে কদিন শুটিং বন্ধ রাখতে হয়েছে।

কাননের খুব গর্ব হল। তিনি কাজটা করেন খুব মন দিয়ে—যতক্ষণ না নিখুঁত হচ্ছে। একদিন ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে বেলা একটা থেকে পরদিন সকাল নটা অব্দি শুটিং করতে

হয়েছিল। কানন চুপ করে থাকলেন।

প্রমথেশ বললেন, খুবই অল্প বয়সে স্টুডিওতে এসেছিলে। শুনেছি সব জ্যোতিষবাবুর মুখে। বাসবদত্তার রোলে তোমায় মানায়নি। মানময়ী থেকে এখন তুমি স্টার। এই বিশ বাইশ বছর বয়স থেকে সমঝে চললে সবকিছু অনেকদিন ধরে রাখতে পারবে কানন।

কাননের একটা কথা মুখে এসে যাচ্ছিল। কিন্তু সামলে নিলেন। মনে মনে বললেন, আপনি এত গুণী। কিন্তু শুনি—খুব মদ খান। আপনার কি সামলে চলা উচিত নয় ?

এ কথা তাঁর বলা হল না। সাহসে কুলোল না। সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে বড়ুয়াসাহেব রূপকথার রাজকুমার ! এখনও কানন নিজে ডিরেক্টরের হাতের পুতুল। ওঁরা যেমন করান তেমনি করেন কানন। কিন্তু আরও একটা কথা তাঁর মনে আসছে। বড়ুয়াসাহেব। আপনি একজন বড় ডিরেক্টর। কিন্তু অভিনেতা ? আমি আর কী বলব। সবাই বলে আপনি ন্যাচারাল অ্যাকটিং এনেছেন সিনেমায। কিন্তু আপনি শুটিং জোনে থাকলে ক্যামেরা শুধু আপনাকে নিযে পড়ে থাকবে কেন ? এই তো মুক্তির পাশাপাশি সাথী করলাম সায়গল-সাহেবের সঙ্গে। ডিরেক্টর ফণী মজুমদার। শুটিংয়ের সময় সায়গলসাহেব কখনও ক্যামেরার সবটা নিজের দিকে কেড়ে রাখেননি। বরং আমাকে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। সে কথা বললে সায়গল বলেছেন, দেখার জিনিস পাবলিক দেখতে পেলেই হল। তারপর সেই স্টুডিও ফাটানো হাসি তাঁর।

এলগিন রোডের মোড় পেরিয়ে বাঁ ফুটে গাড়ি স্লো করলেন বড়ুয়াসাহেব। বাঁ হাতের বাড়ির দেওয়ালে বিরাট পোস্টার। তাতে পাশের সোনার দোকানের সবে জ্বালানো আলো এসে পড়েছে। বড় বড় করে লেখা—

চিত্রায় চলিতেছে
দেশের মাটি
অষ্টম সপ্তাহ

চিত্রা সিনেমা হলের নীচে ফোন নম্বর দেওয়া। ছোট করে। বড়বাজার ১১৩৩। ফোন করে জানা যাবে—টিকিট আর আছে কি না। সেদিকে তাকিয়ে প্রমথেশ বললেন, মুক্তি চলবে ?

কানন শান্ত গলায় বললেন, কেন চলবে না। আপনি তো চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেননি। পঙ্কজবাবুর গান। আপনার অভিনয়।

ডিরেকশন—

তোমার গানও খুব ভাল হয়েছে কানন।

কানন মাথা নোয়ালেন। তিনি দেখেছেন—পাবলিসিটির ঘরে ডিস্ট্রিবিউটরদের পোস্টারের কপি এসেছে। ছাপা হযে কলকাতা তো বটেই আসানসোল থেকে নিলফামারি—সব জায়গায় হলে যাবে। বড় বড় রাস্তার মোড়ে মোটা গাছের গায়ে সেঁটে দেওয়া হবে।

তাতে লেখা আছে—

নিউ সিনেমায় অচিরে
মুক্তিলাভ করিবে
সাথী
শ্রেষ্ঠাংশে...
তার নীচেই বড করে লেখা—
আগতপ্রায় মুক্তি
শ্রেষ্ঠাংশে...

দুই ছবিতেই হিরোর পরেই তাঁব নাম। কানন দেখেছেন।

ঠিক ফিরপো হোটেলেব সামনে গাড়ি এনে দাঁড় করালেন প্রমথেশ।

চল ভেতরে একবার ঘুরে আসি—

এখানে ?

কেন ? যেতে নেই ! মুক্তি রিলিজ হলে দেখো তোমাকে কত জাযগায যেতে হয়। চল। দোতলার ব্যালকনিতে বসব'

ঢুকতেই বেযাবারা সেলাম কবল। সিঁড়ি দিযে ওপবে উঠতে উঠতে দেওযাল আযনায নিজেকে সম্পূর্ণ দেখতে পেলেন কানন। নিজেকে দেখতে পেযে নিজেই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। কিছুদিন হল কাগজে কাগজে ছবির সমালোচনায় তাঁর নামের আগে লেখা হচ্ছে প্রতিভাময়ী, লাস্যময়ী। মানমযী গার্লস স্কুলে তাঁব গান জে এন ঘোষের মেগাফোন থেকে বেরোবাব পর ঘোষমশায নিজে এসেছিলেন। হাঁটুর ওপর ধুতি। গাযে ফতুযা। হাতে এক বাক্স সরপুরিযা—সঙ্গে গযনার বাক্সে নেকলেস আর একখানি মযূরকণ্ঠী রঙের বেনারসি। রেকর্ড হু হু কবে চলছে ! প্রতিভাময়ী লিখে কোনও কোনও কাগজ পাশেই লিখেছে কিন্নরকণ্ঠী কানন।

বড়ুয়াসাহেব কাননেব হাত ধরে ব্যালকনিতে ঢুকতেই লাগোযা ঘরের ঢাকা বারান্দায ব্যান্ডস্ট্যান্ডের বাজিযেরা সবাই দাঁড়িযে উঠল। সব যন্ত্র এক সঙ্গে বেজে উঠল। কাননেব মনে হল—বুঝিবা তিনি কোনও দেশেব রানী। তার সঙ্গে তো রূপকথার রাজকুমারেব মতো বড়ুযাসাহেব রযেছেনই।

ব্যালকনি এখনও ভবে ওঠেনি। এখানে সেখানে দু-চারজন এসে বসেছেন সবে। মযদান থেকে গঙ্গার হাওযা এসে গা জুড়িযে দিল। প্রমথেশ বসেই জানতে চাইলেন, গানের রেওযাজ করছ তো ?

হুঁ। লখনউযেব ওস্তাদ আল্লারাখার কাছে শিখছি। ইমন দিযেছেন। কথাটা বলেই কাননের মনটা আফসোসে ভরে গেল। ওস্তাদ আমাকে খুব ভালবাসেন। কত যত্ন করে নানারকম সরগম দিয়েছেন। রোজ ভোরে উঠে গলায় পাতলা চাদর জড়িয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে পনেরো মিনিট ধরে গলা সাধতে বলেছিলেন। বলেছেন পনেরো মিনিট থেকে বাড়িযে

আস্তে আস্তে দু ঘণ্টায় পৌঁছতে হবে। —বেটি আচ্ছাসে রেওয়াজ করো। দেখবে সারা হিন্দুস্থানে তোমার কত ইজ্জত হবে। নাম হবে। রাজা উজির তোমায় সেলাম করবে।

ওস্তাদ যেভাবে চান—সেভাবে রেওয়াজ হচ্ছে না। স্টুডিওতে কাজের চাপ। কদিন আগে ওস্তাদ বলেছেন, খোদাতালা তোমাকে বড় ভাল গলা দিয়েছেন। নামের লোভে—রুপেয়ার লোভে সেই গলাকে বে-খাতির করছ। একরোজ তুম পস্তাওগে কানন। তখন নিজের বলতে তোমার কিছুই থাকবে না। খুব আফসোস করবে।

প্রমথেশ বললেন, মুক্তি রিলিজ হতে হতে সেপ্টেম্বর হয়ে যাবে। আমি তখন কলকাতায় থাকব না।

কোথায় যাবেন ? কেন ?

ফ্রান্সে। রবীন্দ্রনাথ একখানা চিঠি লিখে দিয়েছেন কানন। ওখানকার স্টুডিওতে ক্যামেরার কাজ শিখব।

কানন লক্ষ করলেন, বড়ুয়াসাহেবের ডান হাতের পাতা কাঁপছে। আপনা-আপনি। খুব যেন অস্থির হয়ে পড়েছেন।

কাকে মুক্তির প্রিমায়ারে ডাকা যায় তা ভেবে পাচ্ছি না। আমি তখন থাকব না কলকাতায়।

রবীন্দ্রনাথ ?

তখন তিনিও কলকাতায় থাকছেন না।

বাঙলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে বলা যায় না ?

বলা তো যায়। কিন্তু তা হলে তাঁর কৃষকপ্রজা পার্টিকে মোটা চাঁদা দিতে বলতে পারেন।

কী মনে হল কাননের। বললেন, আরেকজনের নাম মনে আসছে। সুভাষচন্দ্র। সুভাষবাবু। কাগজে দেখলাম তাঁকে বিনা শর্তে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

হ্যাঁ। বিনা শর্তে। শরীর খুব খারাপ হয়েছে সুভাষবাবুর। কদিনের জন্য কলকাতায় বাড়িতে এসেছেন। শরীর সারাতে প্রথমে যাবেন ডালহৌসি পাহাড়ে—তারপর যাবেন ইউরোপে। ওঁকে তো সেপ্টেম্বরে পাওয়া যাবে না কানন। আর দেশে যদি তখন থাকেনও সুভাষচন্দ্র—কখন জেলে ঢুকে পড়বেন কেউ তা বলতে পারে না। কাননের মনে হল ব্যান্ডমাস্টার রাজকুমার প্রমথেশকে ভাল করেই চেনেন। যে গৎটা বাজাচ্ছিলেন—সেটা ফুরোতে বড়ুয়াসাহেবের সঙ্গে চোখে চোখে কী কথা হল। অমনি ভয়ঙ্কর খুশির একটা গৎ বেজে উঠল। জনাকয়েক বাজিয়ের নানারকম বাজনা একসঙ্গে ফুর্তিতে বেজে উঠল। যেন পাখি ডাকছে। ঝর্নার জল ঝরেই চলেছে। গাছের পাতা খসে পড়ল। পিয়ানো, বাঁশি ক্ল্যারিওনেট সব ফুটিয়ে তুলতে পারে।

আলো নেই

ময়দানে রেসকোর্স থেকে একটি রাস্তা আদিগঙ্গা পার হয়েছে। তার ডান হাতে চিড়িয়াখানা। এদিকটা বরাবরই নির্জন। রাস্তাটি বাঁ হাতে এগিয়ে জিরাট পোল ছাড়িয়ে লোকালয়ে ঢুকলে দেখা যায় ডান হাতে শিখদের গুরুদ্বার—আর বাঁ হাতে একটু এগোলে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল। রাস্তাটির দু ধারে গৃহস্থবাড়ি। কয়লার আড়ত। পান সিগারেটের দোকান। কালীঘাট থেকে আরেকটি রাস্তা এসে এই রাস্তার ওপর দিয়ে সিধে ময়দানে পড়েছে আবার। ওই দুই রাস্তার ক্রসিং থেকে মিনিট পাঁচেক হাঁটলে ভবানীপুর থেকে ধর্মতলা যাবার ট্রামলাইন। সে লাইন পেরোতেই আবার একটি হাসপাতাল। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নামে। সেই ফুট ধরে হাঁটলে ল্যান্সডাউন রোডের নাগাল পাওয়া যায়। জায়গাটি কলকাতা আন্দাজে বেশ চুপচাপ। বড় বড় গাছ। ভাল ভাল বাড়ি। গির্জা। আবার টিনের খাপরাওয়ালা বস্তিবাড়িও আছে।

ল্যান্সডাউন অবধি অতটা না এগিয়ে ডান ফুটপাথে অনেকটা জায়গা নিয়ে একটি বড় বাড়ি। তেতলা। এই শতাব্দীর শুরুতে বাঙালি বসতবাড়ি যেমন ছিল তেমন দেখতে। বাড়ির পাশে—পেছনে অনেকটা জায়গা। ঘাসে ঢাকা ছোটখাটো মাঠ। মাঠের শেষে একটি বড় কাঠবাদাম গাছে বড় বড় লালচে সবুজ পাতার ফাঁকে ছোটবড় পাখির কিচিরমিচির। তারা ফলে থাকা বাদামের শক্ত খোলে ঠুকরে ঠুকরেও কিছু করতে পারছে না, ব্যথা লেগে তাদের ঠোঁট ফিরে আসছে। এখন সকালবেলা। বোধহয় বেলা আটটা-নটা হবে। বড় রাস্তা দিয়ে যাবার সময় লোকের চোখে পড়বেই বাড়ির গেটে থামের ভেতর বসানো সাদা পাথরে ইংরেজিতে লেখা একটি নাম—জে এন বোস।

বাড়িটির ভেতরে ঢুকে দোতলা তেতলায় যাবার সিঁড়ি যেমন থাকে তেমন তো আছেই। এ ছাড়াও আরেকটি সিঁড়ি—কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে। সে সিঁড়ি বেয়ে বাড়িরই একটি বড় ঘরে যাওয়া যায়। বাড়ির ভেতরে না ঢুকে। এই ঘরখানিতে বড় বড় জানলা।

দক্ষিণের জানলা দিয়ে পণ্ডিতিয়ার দিককার খোলা মাঠ থেকে হু হু করে হাওয়া আসে। বাগানের কাঠবাদাম গাছটার ডালে ডালে নানা পাখির নড়াচড়া—তাদের বুক—এমনকি রঙিন ঠোঁটও স্পষ্ট দেখা যায়।

ঘরে আসবাব বলতে একখানি কাঠের সিঙ্গল খাট। একটি টেবিল। তাও কাঠের। তিন চারখানি চেয়ার। যদি কেউ আসেন তো বসবেন। জানলায় খড়খড়িওয়ালা পাল্লা। আলনায় দুটি পাঞ্জাবি ঝুলছে। খান তিনেক ধুতি ভাঁজ করা। দেওয়ালের ছবিতে আলমারিতে কয়েকটি শিশি কৌটো। একটি কৌটোয় লেখা চ্যবনপ্রাশ। আলনায় ঝোলানো একটি খদ্দরের ফতুয়া বাতাসে দুলে দুলে দেওয়াল আলমারির পাল্লায় এসে লাগছে। আলনার পাদানিতে একজোড়া কাবলি জুতো। আর কোনও জুতো নেই। অন্য জুতো বলতে কালো স্ট্র্যাপের স্যান্ডেলটি এখন ঘরের মালিকের পায়ে। তিনি ধুতির ওপর একটি গেরুয়া রঙের ফতুয়া গায়ে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাড়ির পেছন দিকটায় লনের ওপারেই ছোট ছোট ঘরের বস্তি। টিনের খাপরা। দোতলা থেকে সব দেখা যায়। সজনে গাছ। মেয়েরা ঘরকন্নায় ব্যস্ত। মাটির চিলতে রাস্তা ভেতরে ভেতরে। ওর ভেতর থেকে একজন মহিলা কাকে চেঁচিয়ে বলল, ওরে পুঁটি—যা মা—আধ পয়সার চিনি—আধ পয়সার সুজি নে আয়। তোর বাবার জলখাবারটা করে দি। যা মা, তাড়াতাড়ি যা। তোর বাবা বেরুবে। ও হ্যাঁ, চারটি তেজপাতা দোকানির কাছ থেকে মেগে আনিস মা। ভুলিসনে কিন্তু—

ঘর-গেরস্থালির আরও সব কথার টুকরো বাতাসের সঙ্গে এই দোতলায় উঠে আসছিল। জানলায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো কানে যেতেই মানুষটির মুখে একটা পাতলা হাসি ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। ব্রিটিশ সরকার এখনো আধ পয়সার কয়েন বের করে! কী চুলচেরা হিসেব! পুবের জানলার একেবারে মুখোমুখি—কিছুটা দূরে ডায়োসেসান গার্লস স্কুলের লন দেখা যায়। মেয়েরা তখনো আসেনি। হেড মিস্ট্রেস অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে ঝাড়ুদারকে দিয়ে ঝরাপাতা ঝেঁটিয়ে এক জায়গায় করাচ্ছেন। ল্যান্সডাউন রোডে চলন্ত সব গাড়ির ছাদ পরিষ্কার চোখে পড়ে।

মানুষটি এবার ঘরের মাঝখানে তাঁর চেয়ারে এসে বসলেন। টেবিল দেখেই বোঝা যায় তিনি কিছু লিখতে লিখতে উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়েছিলেন। কাগজের প্যাডের ওপর খোলা কলম। পেপারওয়েটের নীচে কাগজে গোটা গোটা হরফে কীসব লেখা। একটা ছোট টুলের ওপর ফোন।

ফের লিখতে বসে তিনি শূন্য চোখে উল্টোদিকের দেওয়ালে তাকালেন। মুখখানি ভরন্ত। ফর্সা। চোখে চশমা। সে চোখ মনের ভেতরের চিন্তাকে ভেতরে ভেতরে টের পাচ্ছে। গায়ের রঙটি রীতিমতো ফর্সা। মাথায় চুল কমে এসেছে। অনেকটাই লম্বা। তিনি কলম তুলে নিলেন—

কিছুদিন ধরে দেখছি আমার সম্পর্কে তোমার প্রচণ্ড বিরাগ জন্মেছে। এই কথা বলছি

কারণ দেখছি আমার বিরুদ্ধে যত কিছু কথা তা তুমি সাগ্রহে লুফে নাও ; আমার স্বপক্ষে যা কিছু যায় সে দিকে তাকাও না। রাজনৈতিক দিক থেকে যারা আমার বিরোধী তারা যা বলে তা তুমি মেনে নাও। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যা বলার আছে সে ব্যাপারে তুমি চোখ বুজে থাকো।

আমি তোমাকে রাজনৈতিক দিক থেকে বরাবরই বড় ভাইয়ের মতো দেখে এসেছি।

এই অব্দি লিখে থামলেন মানুষটি। হাতের কলমটি কাগজের ওপর বোলালেন। তাকালে দেখা যাবে ইনি লিখছেন ইংরাজিতে। লেখার ভেতরের ব্যাপারটি এভাবে তাঁর মনে বাংলায় ভেসে উঠছে। ফের তিনি কলম তুলে নিলেন হাতে—

আজকের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই কংগ্রেসকে প্রগতিশীল পথে নিয়ে যেতে পারো বলে আমরা ভরসা করতে পারি। তাছাড়া তুমি এমন একটা জায়গায় আছ যার সঙ্গে আর কারও তুলনা হয় না। আর আমার মনে হয় মহাত্মা গান্ধীও তোমার সঙ্গে যতটা মানিয়ে নেবেন অন্য কারও সঙ্গে তা তিনি নেবেন না। আমি সারা অন্তর দিয়ে আশা করি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তোমার রাজনৈতিক শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার তুমি করবে। তুমি অখুশি হতে পার এমন কোনও সিদ্ধান্তই গান্ধীজি কখনও নেবেন না—

মানুষটি লিখছেন ইংরাজিতে। চিঠির বয়ানে একদম ডুবে গিয়ে। আর চিঠির ভাবনাটি ঠিক এইভাবে তাঁর মনের ভেতর বাংলায় ভেসে উঠছে।

ঠিক এই সময় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ভারী সুশ্রী দেখতে একজন মানুষ হাট করে খোলা দরজার ফ্রেমের ভেতর ফুটে উঠলেন।

চিঠি লিখতে লিখতে এতই ডুবে ছিলেন তাতে যে চেয়ারে বসা মানুষটি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কারও ওপরে উঠে আসার পায়ের শব্দই টের পাননি।

দরজার চৌকাঠের ভেতর সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা—হাসিমুখ চেহারাটি আচমকা ভেসে উঠতেই তা দেখে খুবই খুশি হলেন যিনি এতক্ষণ চিঠি লিখছিলেন। দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। —আরে মন্টু যে—এসো এসো। কতদিন পরে—

মন্টু নামের মানুষটি দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে চিঠি লিখতে লিখতে দাঁড়িয়ে ওঠা লোকটিকে জড়িয়ে ধরলেন। দুর্জনই রীতিমতো সুপুরুষ। দুজনেরই মাথার চুল কমে এসেছে।

মন্টু বললেন, আসব কি ? কাগজে দেখলাম বিনা শর্তে তুমি ছাড়া পেয়েছো—তাই দেখতে এলাম। তুমি কখন যে কোথায় আছো কাগজে না বেরোলে তা তো জানার উপায় নেই। রীতিমতো রোগা হয়ে গেছ। কী হয়েছে তোমার সুভাষ ?

সে অনেককিছু। পরে বলা যাবে। বোসো। কী খাবে ?

এখন কিছু খাবো না।বলে মন্টু তাঁর বন্ধু সুভাষকে ভাল করে দেখলেন। মুখখানি আগের মতোই উজ্জ্বল। তবে চোখের নীচে কালির ছাপ।—শেষে তিনি বললেন, তোমার মুখে একটা স্পিরিচুয়াল ভাব এসেছে সুভাষ।

তাই ! ইংরেজ সরকার তোমার কথা শুনলে সুখী হবে। চাই কি আমাকে হরিদ্বার বা কনখলে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পাবে।

তারপরই ছাদ ফাটানো হাসি দুজনের। সুভাষেব হাসি গমগমে। আর মন্টুর হাসি বুঝি বা কিছুটা সুরেলা।

তারপর কোথায় উঠেছো ?

মন্টু বললেন, থিযেটার রোডে আমাব সেই পুরনো ডেরায়।

তোমার দাদামশায ডাক্তাব প্রতাপ মজুমদারের বাড়িতে তো !

হুঁ। দাদু-দিদিমা তো অনেককাল নেই। কলকাতায ও বাডিই আমার ডেরা। কাল সন্ধেবেলা একবারটি যেতে পারবে ওখানে ? একটু গানবাজনার আযোজন করেছি সুভাষ।

তোমার গান—সে তো মস্ত ব্যাপার মন্টু। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও আমি যেতে পাবছিনে। আগে থেকেই কথা দেওযায আটকে আছি যে ভাই।—বলতে বলতে সুভাষ বললেন, অঙ্ক নিযে মাথা ঘামাতে—আর শেষে গানে চলে গেলে ভাই !

সে তো তুমিও। হলে আই সি এস। করছ কংগ্রেস !

আবাব দুজনেব একসঙ্গে সেই হাসি। বাইরে কাঠবাদাম গাছে পাখি।

হঠাৎ টেবিলে নজর পড়ল। খোলা পেন। সামনেব প্যাডে ইংবাজি ভাষায লেখা। সুভাষেব হাতের লেখা মন্টুর চেনা। —কিছু লিখছিলে ?

হুঁ। চিঠি। জওহরকে।

এ কথাব পব দুজনের কেউই কোনও কথা বললেন না কিছুক্ষণ। মন্টু অল্পবযস থেকে সুভাষকে জানেন। চেনেন জওহরলালকেও। এই দুজনই সাবা ভারতের কাছে খুবই জনপ্রিয় মানুষ।

আমি ভেবেছি তোমার 'ইন্ডিযান স্ট্রাগল্' বইখানিব আরও খানিকটা বুঝি লিখছ। সব কথা তো বলতে পাবনি।

সুভাষ খোলা জানালা দিযে বাইবে তাকিযে। বললেন, ইংরেজ দেশছাড়া কবলো। ভিযেনায শবীর সাবাতে গিযে দশদিনে লিখেছিলাম মন্টু। লন্ডনেব পাবলিশার চাইছিলেন। সে তো তিন বছর আগের কথা। আর সে বই তো ইন্ডিযায ঢুকতেই দিল না সরকার।

আমি একখানা কপি জোগাড় করে পড়েছি। তুমি গান্ধীজির অসহযোগ থেকে মোটামুটি আজ থেকে তিন বছর আগে অবধি এসে থেমেছ। কিছু কিছু ভুল দেখলাম।

হ্যাঁ, সাল তাবিখের দু-একটা ভুল। সে সব বিরাট কোনও ভুল নয মন্টু। যেমন পণ্ডিত মতিলালেব মৃত্যুর দিনটা ভুল লিখেছি। হাতের কাছে কোনও বই নেই। মনে কবে লেখা। বিদেশে বসে।

জওহরলালও বইটা পড়েছে। ও এসব ভুল ধরে আমাকে একখানি চিঠি দিযেছে।

জওহরলালেরও সমালোচনা করেছ তুমি।

সুভাষ চুপ করে থাকলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, মাদ্রাজে জেলে থাকতে

বইটির খসড়া তৈরি করেছিলাম মন্টু। তা ইংরেজ তো আমায় জাহাজে তুলে দিয়ে দেশছাড়া করল। ভিয়েনায় ডাক্তার দেখাচ্ছি আর লিখে যাচ্ছি—এই করে কোনওমতে বইটি শেষ করেছি।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। শেষে সুভাষই মুখ খুললেন। দ্যাখো মন্টু, যে মানুষ জওহরলালের মতো খ্যাতিমান—তিনি খুব সাধারণ ধাতে গড়া মানুষ নন। এ ব্যাপারে কোনও ভুল নেই। এ ব্যাপারে কারোরই কোনও সন্দেহ নেই যে তাঁর মতো ধীশক্তি, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, লেখার ক্ষমতা বিরল। তবে মহাত্মার দিকে তাঁর এই অন্ধ আনুগত্যের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি না। আমাকে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা বোকা নই মন্টু। তবে একজন বোকাও বুঝতে পারে যে জওহরলাল তার বুদ্ধি দিয়ে পুজো করে মস্কোর—আর হৃদয় থেকে ভক্তি করে মহাত্মাকে। দেখ দিলীপ—

আবার দিলীপ কেন সুভাষ ! বাইরে আমি দিলীপকুমার রায়। গান গাই। তোমার কাছে মন্টু। শুধু মন্টু।

যদি তুমি স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের লোককে নেতৃত্ব দিতে চাও তাহলে একই সঙ্গে তুমি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করবে আর অহিংসার ভজনা করবে— তা তুমি করতে পারো না। একটা বিষয়ে আমি জোর দিতে চাই। জওহর যদি সত্যিই রাজনীতির ভেতর দিয়ে দেশের সেবা করতে চায় তবে তার নিজের ভিতটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। কারণ, যদি পায়ের তলার শক্ত মাটি খুঁজে না নেয় তা হলে ভবিষ্যতে সেটা পিছল হয়ে পড়বে। জওহর আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

আবার খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই। সারা বাড়িতে কোনও শব্দ নেই। এখনো বোধহয় অনেকে জানেই না— সুভাষ তার বাড়িতে ফিরে এসেছে। নয়তো এ ঘর তো এমন ফাঁকা ফাঁকা থাকার কথা নয় এখন।

কংগ্রেস সভাপতির টার্ম তো জওহরলালের ফুরিয়ে এল সুভাষ।

হ্যাঁ। ক্ষতি যা হবার তা অনেকটাই হয়ে গেছে জওহরের আমলে। শোনা যাচ্ছে—এবার অধিবেশন গুজরাটের হরিপুরায়।

শুনছি।

আরও একটা কথা শোনা যাচ্ছে বাতাসে।

সুভাষ দেখলেন একথা বলে মন্টু হাসছেন।

কী ?

হরিপুরায় তুমি নাকি কংগ্রেসের সভাপতি হবে ?

সুভাষ কোনও জবাব দিলেন না। নিজের ঘোরেই বললেন, ব্যক্তিগতভাবে আমার—আর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আর কেউই এতটা ক্ষতি করেনি, যতটা করেছে জওহর।

কাঠবাদাম গাছটি খুব তেজি। সিধে আকাশে উঠে গেছে। বড় বড় পাতা নিয়ে। কিন্তু বাতাসের ঝোঁকে সেও একটু নুয়ে গেল। তাতে ঘরের ভেতর খানিকটা ছায়া হল। মানে

আলো বাধা পেয়ে ঘরটা কিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

এবারও কেউ কোনও কথা বললেন না কিছুক্ষণ। শেষে মন্টু মুখ খুললেন, দ্যাখো সুভাষ। এজন্যে তুমি বা জওহরলাল—কেউই দায়ী নয়।

সুভাষ তাঁর বন্ধুর মুখে তাকিয়ে পড়লেন। মন্টু দেখলেন, বড় বড় চোখ। কিন্তু চোখের নীচে পাকাপাকি কালির ছোপ। সুভাষের মুখখানি কেমন সাধু সাধু হয়ে উঠেছে। শরীরটাও রোগা মতো। গেরুয়া ফতুয়ার গলার কাছে হাড় জেগে উঠেছে। সুভাষকে কোনও দিন তো এতটা কাহিল দেখিনি। বছরের পর বছর জেলে। সেওনি জেল, তারপর জব্বলপুর, সেখানে থেকে মাদ্রাজ জেল। দেশছাড়া করে ব্রিটিশ সরকার সুভাষকে জাহাজে তুলে দিল। বলল, নিজের খরচে যাও। বিদেশে হাসপাতালে। মাঝে বাবার অসুখের খবর পেয়ে বছর তিনেক আগে সুভাষ ভিয়েনা থেকে কলকাতায় ছুটে এল। তখন সব শেষ। বাবা নেই। সেই দশায় তিন নম্বর আইনে বাড়িতে নজরবন্দি। জওহরলাল নিজে তখন জেলে। জেল থেকে এই আদেশকে জওহরলাল বলেলেন, এই আদেশ তো এমনিতেই সব মানবিকতা সব বিবেচনার বাইরে। এই আদেশ এমন একজন মানুষের ওপর জারি করা হল দেশের অসংখ্য মানুষ যাঁকে ভালবাসে, যাঁকে শ্রদ্ধা করে, যিনি নিজে অসুস্থ—তবু ছুটে এসেছেন বাবার মৃত্যুশয্যায়।

তুমি কী বলতে চাইছো মন্টু?

জওহরের মনে কি তোমার জন্যে কোনও স্নেহ নেই?—শ্রদ্ধা নেই?

একথা বলছ কেন মন্টু? জওহর কলকাতায় এলে এ বাড়িতে যে-ঘরে এসে ওঠে—সে ঘরটিকে বাড়ির সবাই বলে—পণ্ডিতজির ঘর। দেশের রাজনৈতিক জীবনে সে একটা অসাধারণ জায়গা অধিকার করে আছে। একথা বলে তাকে আমি লিখেছি—এরকম বিচিত্র অবস্থায় আমাকে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব তুমি এড়িয়ে যেতে পার না জওহর। আমি আর কারও কথা ভাবতে পারি না যাকে জওহরের চেয়ে আরও বেশি বিশ্বাস করতে পারি। তোমরা সবাই জানো মন্টু--কমলা তখন জার্মানির এক স্যানেটোরিযামে। ব্ল্যাক ফরেস্টে। এই তো বছর দেড়েক আগের কথা। কমলার জীবন ফুরিয়ে এসেছে জওহর জেল। থেকে ছাড়া পেয়ে ছুটে আসছে। আমি তখন কার্লোভিভারিতে। সেখান থেকে ব্ল্যাক ফরেস্টে গেলাম। দুজনে একসঙ্গে কমলার কাছে গেছি। একই বোর্ডিং হাউসে রইলাম দুজনে। কমলার চিকিৎসা নিয়ে কথাবার্তা হল। পুরনো দিনের কত কথা হল দুজনে। কমলাকে বাঁচানো গেল না। গত বছর ফেব্রুয়ারির শেষদিকে সুইজারল্যান্ডের লোসানে এক স্যানেটোরিযামে কমলার জীবন শেষ হয়ে গেল।

লোসানের ক্রিমেটোরিযামে আমরা কমলাকে নিয়ে গেলাম। তাঁর শেষ কাজ হল। জওহরের সঙ্গে ইন্দু ছিল। ডক্টর অটল ছিলেন। আমি ছিলাম। জওহরের সঙ্গে অমিল হলেও সে আমায় লিখেছে, তুমি যা কর তা যে সব সময় আমি পছন্দ করি তা নয় -তবে বরাররই ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমাকে স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি।

দ্যাখো সুভাষ তোমরা দুজন আলাদা মানুষ। তোমাদের দুজনের মনের গড়নে ভেতরের দিকে কোনও মিল নেই। সেজন্যেই এই দশা—এই গোলমাল।

মন্টুর কথা শুনে সুভাষের মুখে যে-ভাবটা ফুটে উঠল—তাকে এক কথায় বলা যায়—বিভ্রান্ত—'কিছু বুঝলাম না।' সুভাষ বললেন, আমি জওহরকে শ্রদ্ধা করি। জওহরের অনেক জিনিসে আমি মুগ্ধ।

আমি ভালবাসি।

তবু বলব তোমাদের মনের গড়নই আলাদা। আর এটাই হল তোমাদের মতের অমিলের জন্যে দায়ী।

সুভাষ মনের ভেতরের কোন গভীর হতাশ এক গুহা থেকে আপন মনে বলে উঠলেন, তাঁর মতো জনপ্রিয়তা গান্ধীজি ছাড়া আর কারও নেই মন্টু। দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁর মর্যাদা অসীম। সবচেয়ে সেরা ধ্যানধারণার আধার তাঁর মাথাটি। আধুনিক পৃথিবীর নানা আন্দোলনের লেটেস্ট খবরটি তিনি রাখেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের কথা—নেতৃত্ব দেবার একটা জরুরি গুণই তাঁর নেই। সেটি হল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা—দরকার হলে জনপ্রিয়তা হারানোর সাহস রাখা।

মন্টু কোনও কথা বললেন না।

সুভাষ বলেই চলেছেন। বাইরে নীচে সবুজ মাঠে কড়কড়ে সাদা রোদ খেলা করছে।

সুভাষ বললেন, তুমি জানতে চাইলে জওহল আমায় স্নেহ করে কি না! শ্রদ্ধা করে কি না! শুনলে তো। এবার বলি আরেকটা কথা। আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে নাইন্টিন টোয়েন্টি সেভেন- মার্চ বেঙ্গুন জেল থেকে আমাকে বদলি করে নিয়ে যাবার জন্যে সরকারি ওপর মহলে কথা বলার জন্যে কাকে চিঠি লিখেছিলাম জানো মন্টু?

কাকে?

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে। তাঁর মৃত্যুর আগের বছর তিনি আমায় চিঠি লিখলেন—সুভাষ, কলকাতা যাচ্ছি। স্যার নীলরতন সরকার চিকিৎসা করবেন। সঙ্গে থাকবে ছোট মেয়ে কৃষ্ণা। একটা নিরিবিলি জায়গায় থাকতে চাই। সব ব্যবস্থা যেন করে রেখো।

এবারও মন্টু কোনও কথা বললেন না।

আলো নেই

বিরাট তেতলা বাড়ি। একেবারে মির্জাপুর স্ট্রিটের ওপর। লম্বাটে। একটু এগোলেই শিয়ালদা। বাড়িটার আশেপাশে কাটা কাগজ, বাঁধাইয়ের দোকান। বাড়িটার গায়ে দোকান। বাড়িটার গায়ে দোতলায় বড় একটা সাইনবোর্ড। টিনের। তার সাদা জমির ওপর বাংলা হরফে লেখা প্যারাডাইস লজ। তার নীচে লেখা ৪১নং মির্জাপুর স্ট্রিট।

ডেলি প্যাসেঞ্জার, ঝাঁকামুটে, ঠ্যালা, হাত রিকশার যাতায়াত। ওরই ভেতর দেখা গেল—এই বেলা ন'টা স'নটা হবে—ফর্সা ধুতির ওপর বেলেরঙের একটি পাঞ্জাবি গায়ে মোটামুটি স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক—মাথার চুলটি ব্যাকব্রাশ করা—রাস্তায় দাঁড়িয়েই ঘরের চারপাল্লার ভাঁজ ভাঁজ দরজাটি কোনও রকমে টেনেটুনে একটি টিপতালা লাগালেন। ছোট্ট। যে-কেউ ভেঙে ঘরে ঢুকতে পারে। তারপর তিনি রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে রওনা হলেন। পায়ে কেম্বিশের জুতো। তার গা ফুঁড়ে ডানপায়ের কেনে আঙুলটি বেরিয়ে পড়েছে। বাঁ হাতে একখানি বিলিতি ম্যাগাজিন। ওপারের ফুটপাথে উঠে তিনি আরেকটি বড় বাড়ির সামনে এলেন। বাড়িটির দোতলায় একটি সাইনবোর্ড। রিপন লজ। একতলায় পাইস হোটেল। খাবার তালিকা দাম সমেত টিনের সাইনবোর্ডে লেখা। সেটি ঢুকতেই দরজায় দাঁড় করানো। গরমকালের রোদ ঝকঝকে করে তুলেছে চারদিক। মানুষটি পাইস হোটেলে ঢুকে হাত ধুয়েই একটি সাদা পাথরের টেবিলে পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে বসে গেলেন। বাঁ হাতে বিলিতি ম্যাগাজিনটি টেবিলে রাখলেন। দেখা গেল ম্যাগাজিনটির নাম। ওয়াইড ওয়ার্ল্ড।

বড়সড় চেহারার মানুষটি বোঝাই যায় এখানে রোজকার খদ্দের। চওড়া কাঁধ। কব্জিতে কোনও হাতঘড়ি নেই। চান করে ভিজে চুলে মাথা আচঁড়ানো। বড় বড় চোখ। চোখের চশমাটি এখন ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের ওপর চাপা দিয়ে রেখেছেন তিনি।

আলো নেই

পাইস হোটেলে এখনো খদ্দেববা আসতে শুরু কবেননি। গবম ভাতেব একটা চেনা গন্ধ খুব ভাল লাগতে লাগল মানুষটিব। নিজেই তিনি ভেতবে ভেতবে নিজেকে বোঝালেন, ভাল। এই খিদে লাগাটা—খিদে পাওযাটা খুব ভাল জিনিস।

ধোঁযা ওডানো ভাতেব সঙ্গে দু'খানা ইলিশেব পেটি ভাজা সমেত থালাব ওপব কলাপাতায গুছিযে এনে দিল যে লোকটি তাব মুখে তাকিযে মানুষটি বললেন, এ কী কবেছ সুন্দবঠাকুব। দু' দুখানা ভাজা ? আমাব বেস্ত তো তুমি জান।

সুন্দবঠাকুব মাঝবযসি বাঁধিযে। ধুতিব ওপব স্যান্ডো গেঞ্জি গাযে। পানেব বসে বাঙানো ঠোঁটটি হাসিতে ভর্তি। —খান খান বাবু। খেযে নিন। গোযালন্দ থেকে আজ ইলিশেব বড চালান এসে পডেছে হঠাৎ। শেযালদায তো অত ববফ নেই। দাম নেমে দু' আনা সেবে ঠেকেছে।

তবু দু'খানা দিলে ?

খান না। কোনও চিন্তা নেই আপনাব। গতকালেব একখানাব দামে আজ সাবেক খদ্দেবদেব দু'খানা কবে দেওযা হবে। সুন্দবঠাকুব দুটি কাঁচালঙ্কা এগিযে দিল। ইলিশেব তেল গডিযে পডেছে কলাপাতায। সে বলল,ভাত ভাঙুন বিভূতিবাবু। আপনি তো আজ আমাব হাতেব বান্না খাচ্ছেন না। সেই যখন লুচি আলুবদমেব দোকান কবি—সেই তখনকাব খদ্দেব আপনি।

বিভূতিবাবু মানুষটিব ভাত ভাঙতে ভাঙতে মনে পডল—ঠিক আঠেবো বছব আগে সেই ১৯১৯ সালেব জানুযাবি মাস—আমাব জীবনে বড দুর্দিন—হাতে নেই পযসা, মনেও যথেষ্ট অবসাদ হতাশা। গৌবী সেবাব মাবা গিযেছে। সুন্দবঠাকুবেব দোকানে বাতে গিযে খেতুম -কোথা থেকে যে দাম দেব না-ভেবে খেযেই যাচ্ছি, খেযেই যাচ্ছি।

তখন—আবেকটু এগিযে হ্যাবিসন মির্জাপুব ক্রসিংযেব মুখোমুখি সুন্দবঠাকুব এক বড বাডিব ঘুপচিমতো ফালিতে দোকান কবেছিল। খেতে খেতে বিভূতিবাবু বললেন, আজ ডাল নিযে যাও। ঝোলেব মাছ একটাব বেশি দেবে না কিন্তু।

খানিক বাদে দেখা গেল বিভূতিবাবু নামে সেই লোকটি হাঁটতে হাঁটতে শশিভূষণ দে স্ট্রিটেব দিকে চলেছেন। পথে নেবুতলায বাস্তায ওপব এক মিষ্টান্ন ভাণ্ডাবেব পাশে একটি ছোট ছেলে পুজোব ফুল নিযে বেচতে বসেছে। তাব কাছে দাঁডাতেই ছেলেটি দুটি চাঁপা ফুল তুলে দিল বিভূতিবাবুব হাতে।

কোনও দাম নিল না। বোঝাই যায পাইস হোটেলটিব মতোই এই ফুলওযালা ছেলেটিব কাছেও বিভূতিবাবু পুবনো খদ্দেব। দুটি ফুলেব আব কীই বা দাম। হযতো সপ্তাহেব শেষে—কিংবা মাসকাবাবি ব্যবস্থা আছে।

ডান হাতেব দুই আঙুলে চাঁপা ফুল দুটি। বাঁ হাতে ওযাইড ওযার্ল্ড ম্যাগাজিন। ধুতি পাযেব অনেক ওপবে তোলা। বিভূতিবাবু শশিভূষণ দে স্ট্রিট ধবে এগিযে ধর্মতলায পডে ডান হাতে ঘুবলেন খানিক এগিযে ওযেলিংটন পার্কে পৌছবাব আগেই ট্রাম-বাস পেবিযে

উল্টো ফুটে চলে এলেন। মনে মনে বললেন, কতদিনই বা বিয়ে হয়েছিল গৌরীর সঙ্গে আমার! শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় গৌরীকে চাঁপা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে গিয়ে শুনেছিলাম।

একটু এগিয়ে এসে দুই থামওয়ালা একটি বাড়ির সামনে পড়লেন। ৬৪এ, ধর্মতলা স্ট্রিট। সাদা পাথরের ওপর কালো হরফে লেখা। তার ওপর বড় হরফে—খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশন। সবটাই ইংরেজিতে।

লোহার গেটে খাকি উর্দির নীচে নেপালি চুড়িদার পাজামা পরা টকটকে ফর্সা দারোয়ান। চাবি হাতে দাঁড়িয়ে। অল্প বয়স। বিভূতিবাবুকে দেখে হেসে বলল, সেলাম—

হাত তুলতে হবে না কৃষ্ণবাহাদুর। রোজ রোজ সেলাম কেন? গেটের ভেতর দিয়ে খোয়া ওঠা পাঁচ-সাত গজের রাস্তা। তারপর আবার দুটি থাম—দোতলার ঝুলবারান্দাকে মাথায় ধরে দাঁড়িয়ে। পুরনো দোতলা বাড়ি। সাদা পাথরেব পাঁচটি ধাপ উঠে ডাইনে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে বিভূতিবাবু টিচার্স রুমে এসে বসলেন। ছেলেরা এসে গেছে। এবার প্রেয়ার হবে একতলায়। হেডমাস্টার রামনাবাযণবাবু নীচে নেমে গেলেন। বেলা দশটা থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের মাথায় সাবা স্কুল বসে গেল। দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়। ওপরে গেলে আবেকখানি ঘর আছে। সামনে খোলা ছাদ।

বিভূতিবাবু ক্লাসঘরে ঢুকলেন। আশপাশেব তালতলা, ডক্টর্স লেন, লোযার সার্কুলাব রোড, দুর্গাচবণ ডাক্তার রোডের বাসিন্দাদেব ছেলেরা এখানে পড়তে আসে। গুটি তিরিশ ছেলে বেঞ্চে বসে।

ক্লাসে ঢুকতেই দেবব্রত বলে একটি নরমসবম ছেলে কেঁদে বলল, স্যাব মনিটব আমায় মেবেছে।

কেন মেরেছ সনৎ?

অন্য একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল।

বিভূতিবাবু বললেন, কী হয়েছিল আবিবলাল?

স্যার দেবু একখানা চক নিয়েছিল। মনিটব চকসুদ্ধ ওর হাত চেপে ধবে ছিল—তাই দেবুর খুব ব্যথা লেগেছিল।

আচ্ছা এই নাও আমার চকখানা। আজ কিছু লিখব না বোর্ডে।

ভূগোলেব ক্লাস। আবিরলাল কিছু বোগা। সে বেশ চটপটে। বলল, স্যার আপনাব হাতের ওই ম্যাগাজিনেব ছবি দেখাবেন?

দেখবে তোমরা? এবার লন্ডন শহরের টেমস নদী-পার্লামেন্টের ছবি দিযেছে।—বলতে বলতে বিভূতিবাবু সুন্দর কাগজে ছাপা লন্ডনের রঙিন ছবি উঁচু করে সাবা ক্লাসকে দেখাতে লাগলেন।

দেবু বলল, স্যার আগের ম্যাগাজিন থেকে আপনি শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ এইসবের ছবি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

সোলার সিস্টেম। মনে আছে তোমাদের---

খুব সুন্দর ছিল ছবিগুলো।

এ-ছবিগুলোও সুন্দর। ভাল করে দ্যাখো। এই উঁচু বাড়িটা ঘণ্টাঘর। দেখছ –এটাও হাউস অব কমন্স। ১০৯৭ সনে তৈরি। পুবদিকে বিখ্যাত বিগ বেন। ওজন তেরো টন। দেখতে পাচ্ছ ?—বলে বিভূতিবাবু ওয়াইড ওয়াল্ড ম্যাগাজিনটা উঁচু করে ধরলেন।

মাঝখানে সেন্ট্রাল গার্ডেন। নামকবা সব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মূর্তি রয়েছে এই বাগানে। উইলিয়াম দ্যা ফার্স্টের আমলে তৈরি। ১৫১২ সনে আগুন লেগে পুড়ে যায়। ফিরে ইংরেজরা আবার বানিয়েছে। আবার আগুন লাগে আজ থেকে একশো বছর আগে। ফের ওরা বানিয়েছে। হাউস অব কমন্স দ্যাখো। সাতানব্বই ফুট লম্বা ঘর। এখানে পার্লামেন্টের মেম্বাবরা বসেন। ওই যে ঘণ্টাঘর দেখছ– ওটা প্রায় তিনশো তিরিশ ফুট উঁচু।

এসবই সেন্ট্রাল লন্ডনে। লন্ডন শহরেব মাঝখানে। এই যে টেমস নদী বয়ে চলেছে। সবকারি অফিস সব। এই যে ওয়াটারলু স্টেশন। টেমসের ওপর ওয়েস্টমিনস্টাব ব্রিজ। এই ব্রিজ পেরিয়ে মন্ত্রীরা– পার্লামেন্টের মেম্বাবরা হাউস অব কমন্সে আসেন। –উত্তরে দ্যাখো সেন্ট টমাস হাসপাতাল।

হাউস অব কমন্স কী জিনিস স্যার ?

আমাদের এখানে গত শীতকালে ভোট হল মনে আছে ? উনিশশো ছত্রিশেব নভেম্ববে ? ওদের দেশে চার বছর অন্তত ভোট করে যাঁরা জিতে আসেন তাঁরা এই হাউস অব কমন্সেব সদস্য হন। যেমন কিনা আমাদেব ভোটের পর এখানে আইন সভায় অনেকে সদস্য হয়েছেন। আমাদের এই ভারতবর্ষেব জন্যে লন্ডনে থেকে সদস্যরা আইন পাশ করেন---তাঁকে বলা হয় সেকরেটাবি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া।

বিভূতিবাবুর ভাল লাগল। তিনি বুঝতে পাবছেন, এই ছোট ছোট ছেলের মাথায় ভেতব তিনি ছবিগুলো দেখিয়ে অনেক অনেক প্রশ্ন উসকে দিতে পেবেছেন। বন্ধু সজনীকান্ত দাস বঙ্গশ্রী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। সজনী বলেছে—ভাই ভূতো—প্রতিমাসে বঙ্গশ্রীর জন্যে বিচিত্র পৃথিবীর কথা তুমি আমায় দেবে। সেগুলো এখন বিচিত্র জগৎ নাম দিয়ে বঙ্গশ্রীতে বেরোয়। নীচে আমার নাম লেখা থাকে---বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবিরলাল বলল,স্যার, সেই যে অস্ট্রেলিয়ার একটা গাছের কথা বলেছিলেন। যে গাছ কাটা নিয়ে সারা পৃথিবীতে তোলপাড়।

মনে আছে তোমাদের ?গাছটার বয়সে হয়েছিল পনেরো হাজার বছর। সেই সব গাছের যারা এখনো শিশু—তাদেরও বয়স তিন হাজার-চার হাজার বছর।

সারা ক্লাস স্তব্ধ। সবাই মনে মনে হিসেব করছে—পনেরো হাজার বছর বয়স ? পনেরো হাজার বছর আসলে কত বছর ? সারা ক্লাসে কারও বারো তেরো বছরের বেশি বয়স নয়। স্যারের হাতের ওই ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিনে বিজ্ঞান, দেশবিদেশের ভূগোল, ইতিহাসের নানা কথা ছবি দিয়ে ছাপা হয়।

দেবব্রত বলল, স্যার মৌচাক নামে একটা বইতে আপনি একটা গল্প লিখছেন।

বই নয় দেবু। মৌচাক ছোটদের জন্যে একটি মাসিক পত্রিকা। গল্প নয়। ওখানে তোমাদের জন্যে আমি একটি উপন্যাস লিখছি। চাঁদের পাহাড়।

হ্যাঁ স্যার। দেখেছি। চাঁদের পাহাড়।

দেখেছ। পড়োনি। যা পারে তাই পড়বে শিশুসাথীতে রামায়ণের গল্প বেরুচ্ছে তোমরা কেউ পড়েছ ?

সারা ক্লাস চুপ।

দ্যাখো, খুব কম লোকই রামায়ণ পড়ে কিন্তু লোকমুখে শুনে শুনে রামায়ণের গল্পগুলো জানা হয়ে গেছে। লিখতে হলে এমনই লিখতে হয় যা যুগে যুগে মানুষের নিজের জিনিস হয়ে যায়। বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

এতক্ষণ ক্লাস মনিটর সনৎ কোনও কথা বলেনি সে বলল, সেজন্যেই স্যার আমরা রামায়ণ না পড়েই গল্পগুলো জানি।

বিভূতিভূষণ সনতের মুখে তাকালেন সনতের বাবার রঙের দোকান আছে চাঁদনিতে। স্বাস্থ্যটি ভাল। পড়াশুনোয় ভাল। তার মুখে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, না। একদম না পড়া ভাল নয়। তোমরা পড়বে আবার শুনবেও অন্যের মুখের কথা তাতেও অনেক কিছু শেখা যায়।

থার্ড বেঞ্চে আবিরলালের পাশেই বসে শ্রীপতি। শ্রীপতি চৌধুরী। সেই শ্রীপতি ফিস ফিস করে বলল, জানিস আবির—আমার জামাইবাবু সজনীকান্ত দাস বিখ্যাত সম্পাদক। বঙ্গশ্রী চালান। শনিবারের চিঠি চালান। প্রায়ই সন্ধেবেলায় বিভূতিস্যার জামাইবাবুর মোহনবাগান লেনের বাসায় আড্ডা দিতে যান

বিভূতিস্যার আবিরলাল আর শ্রীপতিকে ফিসফিস করে কথা বলতে দেখে বললেন আবিরচন্দ্র ?

আবিরলাল উঠে দাঁড়াল, ইয়েস স্যার—

ছুটির পর বাড়ি গিয়ে কী করিস ? খেয়ে নিয়ে খেলতে যাস ? কোথায়—ব্যায়াম সমিতিতে ? সেখানে কী হয় ? বাস্কেটবল, ব্রতচারী, লাঠিখেলা ? তা তুই আবার লাঠি খেলবি কী রে—তুই নিজেই একটা খ্যাংরাকাঠি।

সারা ক্লাস হো হো করে হেসে উঠল। আবিরলালও হাসল সত্যিই সে খুব রোগা বিভূতিস্যার কথা বলতে বলতে তাদের সঙ্গে একদম মিশে যান। এটা তাদের খুব ভাল লাগে

অন্ধ বুড়ো কালুয়া দারোয়ান তার ছেলের হাত ধরে রোল কলের খাতা নিয়ে হাজির হল। কালুয়া এরকমই দেরি করে। বিভূতিস্যার এ বার রোল কল করা শুরু করলেন।

রোল কলের শেষে কৃষ্ণবাহাদুর এসে একটা স্লিপ দিল। স্লিপটা পড়ে বিভূতিভূষণ উঠলেন। বললেন, আজ এই পর্যন্ত। হেডমাস্টারমশায় ডেকেছেন

স্যার ম্যাগাজিনটা আর ফুলটা ফেলে যাচ্ছেন।

বিভূতিভূষণ ফিরে দাঁড়ালেন। দে—

হেডমাস্টারমশাই রামনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর ছোটমতো ঘরখানিতে বসেছিলেন। খুব চিন্তিত মুখখানি।

ডেকেছেন ?

ওঃ। বিভূতিবাবু। বসুন। আজ খেলাত স্কুলে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে -যা আর কখনো ঘটেনি। এর জট আপনাকেই ছাড়াতে হবে।

কী হয়েছে ?

ক্লাস সিক্সের বিশ্বনাথ এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে বসে আছে।

কোন বিশ্বনাথ ? যার বাবার লোহার দোকান আছে ?

হ্যাঁ। সেই বিশ্বনাথ। অ্যানুয়ালে ফেল মারায় ওকে তো প্রোমোশন দেওয়া হয়নি। ও নিজেই নিজেকে প্রোমোশান দিয়ে বসে আছে। বিভূতিভূষণ এমন কথা কখনো শোনেননি। বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না।

বিশ্বনাথ ফেল করে তো মাস দুই স্কুলে আসেনি। বাবাকে বুঝিয়ে নতুন ক্লাসের সব বই কিনে নিয়ে আজ স্কুলে এসেছে। ক্লাস সেভেনে জায়গা দখল করে থিতু হয়ে বসে আছে। কিছুতেই উঠবে না। আমি ধমকালাম। নগেনবাবু খুব ধমকালেন বিশ্বনাথকে। বুঝিয়ে বলা হল তাকে। সেভেনের ছেলেরা নানারকম ঠাট্টা ইয়ার্কি করল বিশ্বনাথকে। সে কিন্তু বেঞ্চে বসে আছে। বিশ্বনাথ বলছে, আমি নতুন ক্লাসে পড়বই।

বিভূতিভূষণের মুখখানি গম্ভীর হয়ে গেল। উঠবার সময় তিনি বললেন, দেখি –

টিচার্স রুমে এসে বসলেন। দেখলেন বিশ্বনাথের ব্যাপারে মাস্টারমশাইরা সবাই উত্তেজিত। বিভূতিভূষণের মনে পড়ে গেল—তিরিশ বছর আগে তিনি নিজে পাঁচ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে ধানক্ষেত ভেঙে বনগাঁয় স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যদি হেডমাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে স্কুলে ভর্তি হতে পারেন। এ জন্যে তাঁকে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে বাবা মায়ের কাছ থেকে পড়তে যাওয়ার মত আদায় করতে হয়েছিল সত্যিই তো আমাকে পড়াবার উপায় ছিল না বাবার। অবিশ্যি বিশ্বনাথের বাবার ছেলেকে পড়াবার উপায় আছে যথেষ্ট

টিফিন পিরিয়ডে এই নিয়ে টিচার্স রুমে মাস্টারমশাইদের মিটিং বসল মাস্টারমশাইরা একে একে তাঁদের মতামত দিলেন। ঘরের বাইরে ছাত্ররা অনেকে দাঁড়িয়ে। বিভূতিভূষণ বললেন, আহা। বিশ্বনাথের এত আগ্রহ, বইটই কিনে ফেলেছে, দেওয়া হোক না কেন আরেকটা চান্স--দেখা যাক না ঘষে মেজে ওকে নতুন ক্লাসে মানানসই করে নেওয়া যায় কিনা--

নগেনবাবু বললেন, স্কুলের একটা নিয়ম আছে। এমন হলে অন্যরা আর পড়তে চাইবে না। ফেল করে বিশ্বনাথের মতো সবাই নিজেদের প্রোমোশন দিয়ে দেবে।

বিভূতিবাবু বললেন, বিশ্বনাথ যদি এবারটা সুযোগ পেয়ে ভাল ফল করে এইটে ওঠে—তাহলে তো অন্য যারা ফেল করছে—তারা আবার মন দিয়ে পড়বে। মেজে ঘষে নিজেদের ঠিক করে নেবে।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, আমাদের ছোট স্কুল। বিশ্বনাথকে নতুন ক্লাসে তুলে দিলে গার্জেনরা তাদের ছেলেদের ছাড়িয়ে নেবে।

বাকি মাস্টারমশাইরা বললেন, বিশ্বনাথকে ক্লাস সিক্সেই নামিয়ে দিতে হবে। ওর গার্জেনকে ডেকে পাঠানো হোক। কিংবা দারোয়ান কৃষ্ণবাহাদুরকে সঙ্গে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হোক বিশ্বনাথকে।

ছুটির পর বিভূতিস্যার হেঁটে ফিরছেন। সঙ্গে আবিরলাল, সনৎ, দেবু। দেবু টিফিনেব পযসা বাঁচিয়ে লজেন্স কিনেছে। সে একটি লজেন্স এগিয়ে দিল। খাবেন স্যার ?

দে—বলে হাতে নিয়ে লজেন্সটা মুখে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন বিভূতিভূষণ। অনেকদিন আবির ওরা স্যারের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে প্যারাডাইস লজ অবধি আসে। আজ বিভূতি স্যার কিছু গম্ভীর। অন্যদিন ওরা জোরে জোরে কথা বলে। আজ স্যারকে গম্ভীর দেখে ওরা ফিস ফিস কবে কথা বলছে। আবিরলাল বলল, আস্তে কথা বল সনৎ। স্যার কিছু ভাবছেন—

সনৎ বলল, স্যার চেয়েছিলেন—বিশ্বনাথ নতুন ক্লাসে উঠুক।

হঠাৎ বিভূতিভূষণ বললেন, লজেন্সের একটা গন্ধ পাচ্ছিস তো। এ গন্ধটা আর কোথায পাওযা যায বলতো ?

আবিবলাল, দেবু—কেউই বলতে পারল না।

এ গন্ধটা পাবি মোটব গাডি যেখানে বঙ কবা হয—সেখানে।

প্যারাডাইস লজ এসে গেল। বিভূতিস্যারের পেছন পেছন ওরা তাঁর ঘরে ঢুকল। সনৎ জানলা দুটো খুলে দিল। আবিরলাল দেখল, নড়বড়ে টেবিলটার ওপর তেলেভাজার শালপাতা আর চাযেব মাটিব খুরির ভেতর গাদা গুচ্ছের পোড়া বিড়ি। স্যার নিশ্চয ভোরে উঠে লেখাব সময এসব খেযেছেন। আবির সেগুলো নিযে বাড়ির সামনে বেরিযে কোণের ডাস্টবিনে ফেলে দিযে এল।

দেওযালেব গাযে বেঞ্চটার ওপর-নীচে-আশেপাশে-মাটিতে বই আর বই। কযেকটা ছেঁড়াখোড়া ম্যাগাজিন। ওসব গোছাতে গোছাতে—ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দেবুর মনে হল. বিভূতি স্যারেব এই ঘরখানা বড়জোর দশ ফুট বাই আট ফুট হবে। এ-ঘর ওরা মাঝে মাঝেই এসে গুছিয়ে দিয়ে যায। এই ঘরেব পেছনেব দিকে—একজন মানুষ ঢুকতে পারে এমন মাপের ফাঁক দিযে ঢুকলে এক ফালি জাযগা। সেখানে একটা চার পাইযের ওপর তোশক চাদর আর মাথার বালিশ। সেখানে স্যার ঘুমোন। আবির বালিশটা শব্দ করে ঝাড়ছে।

কী করছিস আবিরচন্দ্র ! আবার মাথার বালিশটা ছিঁড়ে ফেললি বুঝি।

না স্যার।

একটু পরে তিন বন্ধুতে মিলে বিভূতিস্যারের টেবিল গোছাতে গেল।

হাঁ হাঁ করে উঠলেন বিভূতিভূষণ। করিস কী ? করিস কী ? হাত দিবি না। ওখানে আমার চাঁদের পাহাড়ের ম্যানাসক্রিপ্ট—

আমরা হাত দিচ্ছি না। গুছিয়ে দিচ্ছি স্যার।

নড়বড়ে টেবিলের পাশে দু'টি চেয়ার। পুব দিকের দেওয়ালে একটা কাঠের ব্রাকেট। হুক লাগানো। তাতে স্যারের ধুতি। গেঞ্জি। একটি হাফ শার্ট। গামছা। এসব ঝুলছে।

আবিরলাল দেখল, স্যারের লেখা কাগজের ওপর মোটাসোটা একটা নীলচে কালো পার্কার পেন। খোলা পড়ে আছে। বন্ধ করতে ভুলে গেছেন স্যার। আবিরলাল বন্ধ করল।

বিভূতিস্যার বললেন, তোরা একটু বোস। আমি দোতলার বাথরুম থেকে আসছি। এসেই শালপাতার ঠোঙা ভর্তি এক পয়সার শোনপাপড়ি কুচি আনাবো। অনেকটা দেয়।

কাছাকাছি সব শোনপাপড়ির কারখানা। আবিরলাল ওরা জানে, এটা বিভূতিস্যারের প্রিয় খাবার।

প্যারাডাইস লজ বাড়িটি খুব পুরনো। বিভূতিভূষণ বুঝতে পারেন না—বাড়িটা কী করে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের সিঁড়ি। দু'জন মুখোমুখি হলে একজনকে বেঁকে দাঁড়িয়ে রাস্তা দিতে হয়। এত সরু। শেয়ালদায় নেমেই খুলনার লোকজন এই লজে ওঠে বলে প্যারাডাইসের একটা ডাক নাম আছে। যারা জানার তারা জানে। খুলনা নিবাস। বাথরুমটি একটি অন্ধকূপ। দোতলায় উঠে তবে যাওয়া যায়।

নীচে নেমে এসে বিভূতিভূষণ দেখলেন, আবিরলাল ওরা তটস্থ হয়ে বেঞ্চটার পাশে দাঁড়িয়ে। একখানি চেয়ারে ইয়া গোঁফ নিয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায় বসে।

কতক্ষণ এসেছেন হেমেনদা ?

এইতো। তা আমার সঙ্গে তো বেরোতে হচ্ছে তোমাকে—

কী ব্যাপার ?

আজ মন্টুর গান। অনেকদিন পরে কলকাতায় গাইছে—

দিলীপ রায় ? কোথায় ?

থিয়েটার রোডে ওর দাদামশাই প্রতাপ ডাক্তারের বাড়িতে—

আমরা আসি স্যার ?

পাগল। দাঁড়া।—এই, একপয়সার শোনপাপড়ি কুচি আনতো সনৎ। পাশেই বিশ্বজিৎ শোনপাপড়ি কারখানা। আজকের কুচি দিতে বলবি।

আপনার দেরি হয়ে যাবে স্যার।

মোটেই না। ইনি হেমেন্দ্রকুমার রায়। ওঁর যখের ধন পড়িসনি ? গান তো সন্ধের আগে শুরু হবে না। কী বলেন হেমেনদা—

হেমেন্দ্রকুমার চুপ করে ছিলেন। বললেন, দেরি কীসের ? আমার মোটর রয়েছে।

বিভূতিভূষণ বললেন, তাহলে তো ভালই হল। ওদের নামিয়ে দিয়ে যাব পথে।

বেরোবার সময় বিভূতিভূষণ কেম্বিশের বদলে ব্রাউন রঙের সবেধন নিউকাট পায়ে দিলেন। হেমেন্দ্রকুমার বললেন, পাঞ্জাবিটা কবে বের করেছ ভায়া ?

কেন ? দিন চারেক হল। শনিবার বের করলাম। বদলে হাফ শার্টটা গায়ে দিয়ে নেব ?

না না। তার দরকার নেই। এই ভাল আছে।

একটু পরে দেখা গেল—একটি টি-ফোর্ড মোটর গাড়ি গলা খাঁকারি দেবার মতো হর্ন দিতে দিতে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের সামনে দিয়ে দক্ষিণে জোড়া গির্জার দিকে ছুটছে। সামনের দিকে ড্রাইভারের পাশে গাদাগাদি করে বসে আবির আর সনৎ। পেছনে হেমেন্দ্রকুমার আর বিভূতিভূষণের মাঝে বসেছে দেবু। পাঁচজনই ঝুরিভাজার মতো শোনপাপড়ি কুচি খাচ্ছে। এই জিনিসে মুখের ভেতর ঝুরিভাজার মতো শব্দ হয় না।

ডাইনে ডক্টরস্ লেনের মুখে আবির ওরা গাড়ি থেকে নেমে বলল, আসি স্যার।

বিভূতিভূষণ হাসি হাসি মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওড়া তিনজন পেছন ফিরে যে যার বাড়ির দিকে চলেছে। তিনজনের ভেতর দেবব্রতই খুব নরম ছেলে। যে কোনও ব্যাপারে ধাক্কা খেলে তাঁর কাছে ছুটে এসে কেঁদে পড়ে। আজও সনতের হাতে ব্যথা পেয়ে কেঁদে ফেলেছিল। ওকে একদিন ঠিক বলে ফেলবো—এই দেবু। তুই আমাকে বাবা ডাকবি— ?

রাস্তায় দোকানে দোকানে আলো। মল্লিকবাজারের উল্টোদিকের কবরখানা থেকে কালো গাউন পরা একটি অল্পবয়সী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে বেরিয়ে আসছে। বিভূতিভূষণ মনে মনে বললেন, বিশ্বনাথকে নতুন ক্লাসে তুলে দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত ?

হঠাৎ হেমেন্দ্রকুমারের কথায় কান গেল বিভূতিভূষণের। কী বলছেন হেমেনদা ?

বলছিলাম, রবীন্দ্রনাথ যে দু'টি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন—দু'টোই তো দেখছি খেটে যাচ্ছে ভায়া—

বিভূতিভূষণ চুপ করে থাকলেন। কিসের হুঁশিয়ারি তা বুঝতে পারছেন না তিনি।

বত্রিশ সনে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব বিলেত থেকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করলেন। বাঙলায় যেখানে হিন্দু শতকরা চুয়াল্লিশ জন—সেখানে আইনসভায় তার স্বাভাবিক জনসংখ্যার চেয়েও কম করে শতকরা উনচল্লিশ জন জনসংখ্যার মতো প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—এটা হল গিয়ে ইনসাল্ট অব ইনসিগনিফিক্যান্স। হিন্দুকে জোর করে ছেঁটে দেওয়া হল। মুসলমানের যা স্বাভাবিক জনসংখ্যা—তার চেয়েও বেশি জনসংখ্যাটা ধরে তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার দেওয়া হল।

জানি। কিন্তু কংগ্রেস মেনে নিল কেন ? গান্ধীজি বলেছিলেন, কংগ্রেস গোল্লায় গেলেও তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নেবেন না। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর সে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি বিভূতি।

বিভূতিভূষণ কিছু বললেন না। কয়েক বছর ধরেই জনসভায়, অফিসকাছারিতে, ট্রেনে, রেস্তোরাঁয় বাজারে—এই এক কথা নিয়ে তর্কাতর্কি চলছে। তিনি শুধু অস্ফুটে বললেন, কেন ?

গত পাঁচ ছ' বছর কংগ্রেস লিগ সম্পর্কে বৈষ্ণবী মনোভাব নিয়েছে। স্বাধীনতার জন্যে সে হিন্দুর স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও লিগকে আপন করতে চেয়েছে বিভূতি। কিন্তু লিগ তাতে আরও বেড়ে গেল। দাবির পর দাবি করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বুঝে আরেকটা কথা বলেছিলেন। সারা ভারতের ব্যাকগ্রাউন্ডে জিন্নাসাহেব সংখ্যালঘুর হয়ে যখন দাবির পর দাবি করে চলেছেন—আর কংগ্রেস কনসেসন দিয়ে দিয়ে মিলনের আশা করছে—তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সংখ্যালঘুকে কনসেসন দিয়ে অন্যায় সুযোগ নেওয়া বন্ধ করা যায় না। তখন মাইনরিটি আরও—আরও চাইতে থাকে। একেবারে শেষে দেখা যাবে—আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। তখন অবস্থা আরও খারাপ হয়। আর সত্যিই তাই হয়েছে আজ।

তাহলে ম্যাকডোনাল্ডের অ্যাওয়ার্ড মেনে নিলাম কেন আমরা ?

না নিলে বিভূতি, কংগ্রেসের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা পাত্তা পাবেন না—তাঁরা ভোটেও জিততে পারবেন না।

গত নভেম্বরের ইলেকশনে তাঁরা তো হেরে গেছেন প্রায় সব জায়গায়। লিগের প্রচারে তাঁরা টিকতে পারেননি। অথচ এই বাঁটোয়ারা মেনে নেওয়ায় তার বিষফল ভোগ করছি আজ আমরা বাঙালিরা। আর পাঞ্জাব, সিন্ধু, আসাম এই বিষফল ভোগ করছে। অন্য সব প্রদেশে কংগ্রেস জিতেছে। বাঙলায় কংগ্রেস ফজলুল হকসাহেবের বন্ধুত্বের হাত ফিরিয়ে দেওয়ায় হকসাহেব বাধ্য হয়ে লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন করে এখন বাঙলার প্রধানমন্ত্রী। এখন প্রায় তিন হাজার মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু জেলে পচছে। কিরণশঙ্কর বললেন, রাজবন্দিদের মুক্তিতে রাজি হলে কংগ্রেস তাঁর সঙ্গে হাত মেলাবে। হকসাহেব বললেন, ওটা পরে—আগে কৃষকদের জন্যে সুদের হার কমাতে হবে—যাতে ঋণসালিশি বোর্ডে গিয়ে গরিব চাষি তার জমি কোনরকমে ফেরত পাওয়ার আশা করতে পারে।

তা করল না কেন কংগ্রেস ? যতসব খুচরো আন্দোলন নিয়ে মেতে রয়েছে কংগ্রেস। আমি দেখেছি হেমেনদা—আমাদের বনগাঁর ওদিকে গাঁয়ে গরিব চাষি—যাদের বেশির ভাগই মুসলমান—তারা সুদের চাপে—সুদ তস্য সুদের চাপে মাটিতে মিশে যাবার যোগাড়। একেবারে শুয়ে পড়েছে তারা—

স্পিকার আজিজুল হকসাহেব তো দুঃখ করে বলেছেন, আইনসভায় কংগ্রেসের বাঙালি হিন্দুরা ঋণ-সালিশি আইন সমর্থন করে মন্ত্রিসভায় যোগ দিলে হক মিনিস্ট্রি গোঁড়া মুসলিম লিগের খপ্পরে পড়ত না। এখন দ্যাখো—বিশ্ববিদ্যালয়ের সিল থেকে শ্রী তুলতে হবে। ওটা নাকি হিন্দু ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাস নিয়ে সিনেমা রিলিজ করেছিল—হলে গিয়ে গোলমাল করে মারধর করে তা তুলে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। অথচ

আমার নাচঘর কাগজে রাজসিংহ ছবির প্রিভিউ ছেপে বসে আছি। কী কেলেঙ্কারি !

জানি। এখন রটানো হচ্ছে গত ইলেকশনের পরে কংগ্রেস যে সাত প্রদেশে ক্ষমতায় এসেছে—সেখানে সংখ্যালঘুর ওপর অত্যাচার হচ্ছে।

আর এই মিথ্যা রটনায় বাঙলাদেশে কম্যুনাল টেনশন আজ চূড়ান্ত বিভূতি। সেই টেনশনে আমরা বাঙালি হিন্দু মুসলমান নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আমাদের দম আটকে আসছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কোথাও একটু আলো নেই। জিন্নার হুমকি: কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড নিয়ে প্রতিবাদ চলবে না। মেনে নিতে হবে। জেল থেকে বেরিয়ে গান্ধীজি আজ বলছেন, আমি এখন অস্পৃশ্যতা দূর করার কাজ নিয়ে থাকব।

হ্যাঁ। সুভাষবাবু জেল থেকে আনকনডিশনাল মুক্তি পেয়ে কলকাতায় এসে বলেছেন—গান্ধী ইজ এ স্পেন্ট আপ ফোর্স।

এ কী বিভূতি ? আমাদের গাড়ি কি চলছে না ?

বিভূতিভূষণ লক্ষ করলেন, সাইকেল চালাতে চালাতে সওদাগরি অফিসের একজন পিওন দিব্যি তাদের গাড়িতে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

ড্রাইভারের বয়স হয়েছে। সাদা গোঁফ। সাদা মাথা। চোখে চশমা। কী একটা নাম ধরে হেমেন্দ্রকুমার বললেন, জোরে চালাও—

গাড়িটা ঝনঝন শব্দ করে কেঁপে উঠে চলতে লাগল। একটু পরে আরও একজন লোক সাইকেল চালাতে চালাতে মোটগাড়িটিকে পেছন ফেলে এগিয়ে গেল।

সবাই আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে কী ব্যাপার ? বলে হেমেন্দ্রকুমার এই হুডখোলা টি ফোর্ডের সিটে প্রায় উঠে দাঁড়ালেন। গাড়িটা বড় শখের হেমেনদার। পাকানো গোঁফ। মাথায় বাবরি। গায়ে মেরজাই ধাঁচের জামা। ধুতিটি চুনোট করা। নাচঘর কাগজের সম্পাদক। সেই সুবাদে থিয়েটার, সিনেমা, গানবাজনার জগতে ঘোরাঘুরি। আবার ছোটদের জন্যে বইও লেখেন। তাতে আফ্রিকা আছে। গরিলা আছে। ডাকাত আছে। ডিটেকটিভ আছে। দারোগাও আছে।

ঠিক এইসময় ড্রাইভার এক ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থামাল। এসে গেছি—বিভূতিভূষণ বুঝলেন, এসব বাড়িতে হেমেন্দ্রকুমারকে আসতে হয়। ড্রাইভার তাই চেনে। ময়দানের দিক থেকে এলে ডানহাতে বাগানওয়ালা বাড়ি। দোতলা। সামনে ঢাকা রারান্দা। এর কয়েকটা বাড়ি পরেই বড় কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়িতে লিগের মন্ত্রী হাসান সোহারাওয়ার্দি থাকেন। গাড়িতে যেতে যেতে নীরদ চৌধুরী একদিন দেখিয়েছিল। নীরদ পলিটিকসের খবর রাখে। শরৎ বোসের কাছাকাছি থাকে। নীরদ বাড়িটা দেখিয়ে বলেছিল, হাসান হল গিয়ে লিগের রাইজিং স্টার।

হেমেন্দ্রকুমার বাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, মন্টুর দাদামশাইর বাড়ি। সেকালে ডক্টর প্রতাপ মজুমদারের ভালই পসার ছিল বোঝা যায়। কী বল বিভূতি !

হেঁটে বাড়ির হাতার লনের ভেতরে দুধারে ইটের কোনা তোলা রাস্তা দিয়ে এগোতে

এগোতে বিভূতিভূষণের মনে হল, মানুষ আয় করে। বাড়ি হাঁকায়। তারপর একদিন চলে যায়। কত লোক কত ব্যাঙ্কে চেক কাটে। সে সব ভাঙানোর পর চেকগুলো বাতিল হয়ে পুরনো কাগজ হিসেবে ধুলো খায়। রাস্তার দুধারে আসার সময় কাননবালা, সাধনা বসুর সিনেমার পোস্টার দেখেছেন। ওগুলোও ক'দিন পরে ধুলো, বৃষ্টির জলে মুছে যায়। কাননবালা, সাধনা বসু আবছামতো আমাদের স্মৃতিতে থেকে যায়। আমরা চলে গেলে ওঁরাও মুছে যাবেন।

গাড়িটা কততে কিনলেন হেমেনদা ?

এক ইহুদি সাহেব বিলেত ফিরে যাচ্ছিল। পাঁচশো টাকায় দিয়ে দিলে। আর সারাতে পড়ে গেল নব্বই টাকা। খারাপ গাড়ি ?

না না। দিব্যি চলে এলাম এতটা পথ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঢাকা বারান্দা। তার পরেই বড় হলঘর। আগাগোড়া সুন্দর ফরাস পাতা। কয়েকজন এসে বসেছেন। দিলীপ রায় মাঝখানে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। তাঁর পাশে একটি মেয়ে। খোল। করতাল।

দিলীপ উঠে এসে হেমেন্দ্রকুমারের হাত ধরলেন। আসুন। আসুন—বিভূতিভূষণের দিকে তাকিয়ে দিলীপ রায়। বিভূতিভূষণ সামান্য হাসলেন। দিলীপকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। মুখখানি সবসময় হাসি হাসি। ঘিয়ে গেরুয়া পাঞ্জাবির ওপর সামান্য গাঢ় হলুদ রঙের একখানি উড়নি। পরনে খাপি কাচিধুতি। সরু কালো পাড়। গায়ের রঙটি কাঁচা হলুদ। বড় বড় চোখ। ডান হাত এগিয়ে ধরলেন দিলীপ। আপনাকে—

আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই দেখুন। আমাদের সঙ্গে কখনো চাক্ষুষ আলাপ হয়নি। আপনিই বিভূতিভূষণ। কী আশ্চর্য ! আমাদের ভেতর আজ আট ন' বছর ধরে কত চিঠি লেখালিখি। কত কথা জমে আছে। অথচ কেউ কাউকে চোখে দেখিনি। আসুন—আসুন—বলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বিভূতিভূষণকে।

পরিচয়ে পথের পাঁচালীর সে কী আশ্চর্য সমালোচনা লিখেছিল দিলীপ। তারপরেই দুজনের ভেতর চিঠি লেখালিখি। হেমেন্দ্রকুমার বসলেন মাঝামাঝি। বিভূতিভূষণ এক পাশে বসলেন। তাঁর মনে হল, দিলীপের মনটা খুব উদার।

দিলীপ দুবার গলা তুলে বললেন, এখানে এসে বসুন। বিভূতিভূষণের কেমন লজ্জা হল। তিনি বললেন, এই ঠিক আছি। চোখ তুলে দেখা গেল—বন্দীর বন্দনার বুদ্ধদেব বসু এসে বসেছেন। একেবারে কলেজের ছেলেদের মতোই সুকুমার চেহারা। ধুতি পাঞ্জাবিতে বেশ লাগছে বুদ্ধদেবকে। তারই পাশে কুমার শচীনদেব বর্মন। রেকর্ডের কভারে ওঁর ছবি দেখেছেন বিভূতিভূষণ। শচীনদেবের বিখ্যাত গান—তুমি যে গিয়াছো বকুল বিছানো পথে—গানটি প্রায়ই মেসের ঘরে গুন গুন করে গেয়ে থাকেন বিভূতিভূষণ। ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার দেওয়ালের কাছে বসে। পাশেই জীবনময় রায়। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জায়গা বদলে হেমেন্দ্রকুমারের পাশে এসে বসলেন। উমা মৈত্র বসেছেন কোণে--জানলার নীচে। পরিচয় কাগজের দলের অনেকেই এসেছেন।

তাঁর পাশে বসা বেশ সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন দিলীপকুমার। ইনি আমাদের সমঝদার আব্বাস তায়েবজির মেয়ে। একটা নামও বলল দিলীপ। স্পষ্ট শুনতে পেলেন না বিভূতিভূষণ। দিলীপ বলল, ও কৃষ্ণ বিষয়ে গাইবে। আসল গানটা হিন্দিতে। আমি বাঙলা করে নিয়েছি।

মেয়েটির গায়ের সঙ্গে শাড়ির ফিকে হলুদ রঙ মিশে গেছে একদম। তানপুরা তুলে নিল বাঁ হাতে। কবজিতে লাল পলার একটি মোটা বালা। চোখ দুটি ঘন কালো। মাথা থেকে বেণীটি এসে পিঠে পড়েছে।

তানপুরার সঙ্গে আব্বাস তায়েবজির মেয়ের গলা ঝর্নার জল হয়ে বেরিয়ে এল। মেয়েটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছে—

সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই
আজও পড়ে মনে মোব
পড়ে যে কেবলি মনে

একটি জায়গা ফিরে ফিরে গাইল মেয়েটি—

সেই চাঁদিনী
সেই যামিনী—

সারাটা ঘর ভরে গেল মেয়েটির ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাওয়ায়—

ওরা হাসে আর বলে
হায়রে মধুর স্বপন
বলে কৃষ্ণকাহিনী কল্পনা কবিকথন
ওরা হাসে জানে না তাই হাসে
আমি মানি তাই জানি
আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি—

ওরা হাসে—গাইবার সময় স-এর ওপর মেয়েটি নরম চাপ দিয়ে সামান্য থেমে ফের গেয়ে উঠল--জানে না তাই হাসে—ফের দন্ত্য স-এ সেই নরম চাপ।

দিলীপ গানটির বাঙলা করেছে চমৎকার। মূল হিন্দি গানটি না জানি কত সুন্দর। শুনতে শুনতে কুমার শচীনদেব বর্মন চোখ বুজে ফেলেছেন। দিলীপেরও চোখ বোজা।

গান কখন শেষ হয়ে গেল কেউ টের পেল না। বাইরে থিয়েটার রোডে ক্রাইসলার গাড়ির রাজহাঁসের ডাকের মতো সুন্দর মনমাতানো হর্ন! হেমেন্দ্রকুমার বলে উঠলেন, কেয়াবত! কী সুন্দর।

সবারই মুখে তারিফের হাসি। বিভূতিভূষণ গানের একটি চরণ ফিরে ফিরে ভাবছেন। ওরা হাসে আর বলে হায়রে মধুর স্বপন—বলে কৃষ্ণকাহিনী কল্পনা কবিকথন—ওরা হাসে

জানে না তাই হাসে। এ কী অনুবাদ করেছে দিলীপ। এ যে কোনও সাধকের বয়ান মনে হয়। দিলীপ আজকাল কী চমৎকার গাইছে—লিখছেও গান চমৎকার। বাঙলা গানের এমন ঢং কোথাও আর কখনো শুনিনি। এর পর দিলীপকুমার একটার পর একটা গান গেয়ে চললেন। গাইছেন না যেন জলে সাঁতার কাটছেন। কোথাও কিছু আটকাচ্ছে না। ওঁর গায়কী সবার থেকে আলাদা।

শুনুন। এই গানটি লিখেছেন কবি নিশিকান্ত। নিশিকান্ত সরকার—আঁধার নিশা—বাকি কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করলেন না বিভূতিভূষণ। যেমন সুন্দর গলা—তেমনি সুন্দর সুর। কথাগুলো মাঝে মাঝে জেগে উঠলেও দিলীপের গলার দরাজ আওয়াজের ভেতর তা ডুবে যাচ্ছে। যদি দিয়েছ দিয়েছ বলে একটি গান গাইলেন দিলীপকুমার। গাইবার আগে বললেন, এই গানটি লিখেছেন রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। সুর আমার।

চমৎকার গান। আজ সন্ধেটি যেন শুধু আমারই জন্যে রেখে দিয়েছিল দিলীপ। না এলে খুব ভুল করতাম। ভাগ্যিস হেমেনদা এসে হাজির হলেন। এই সবই মনে হচ্ছে বিভূতিভূষণের।

একেবারে শেষে দিলীপকুমার গাইলেন নিজের লেখা গান নিজের সুরে। রাত দশটায় সবাই উঠলেন। গানের ভেতর মাঝে মাঝেই এসেছে পাকা পেঁপে। সঙ্গে ঘোল।

দিলীপকুমার সবাইকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। গেটের কাছে এসে অন্ধকারে কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিভূতিভূষণের কানে ভেসে এল দিলীপের গলা।

হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে যত দিন যাচ্ছে সুভাষ কংগ্রেসে ততই একা হয়ে পড়ছে—

অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে কে একজন বললেন, গান্ধীজি এক বছরের ভেতর এবার দু'বার কলকাতায় এলেন। প্রদেশ কংগ্রেসের দলাদলি মিটিয়ে সবাইকে এক করবার চেষ্টা করলেন। হক সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস যাতে সরকার গড়ে তারও চেষ্টা করলেন খুব। কোনওটাই হল না।

বিভূতিভূষণ গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। বুদ্ধদেব বসু, কুমার শচীনদেব—দু'জনই চলে গেলেন। হেমেন্দ্রকুমার গেটের মুখে কথাবার্তায় জড়িয়ে গেছেন। তাতে পরিচয়ের কেউ কেউ। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না—ঠিক কে কে। তবে সৌরীন্দ্রমোহন যে রয়েছেন—তা তাঁর মাথাটি দেখেই বোঝা যায়। বেশ লম্বা। তাঁরই গলা পাওয়া গেল এবার। সৌরীন্দ্রমোহন ওকালতি, সাহিত্য পাশাপাশি করেন। তিনি বললেন, ওঁরা চাইছেন—জমিদারি উচ্ছেদ। চাষির ঋণ মকুব। সুদের হার কমানো। কংগ্রেস তো তাতে সাড়া দিচ্ছেই না—উল্টে তারা যত রকমে পারে সেই মুভমেন্ট যাতে নির্মূল হয়—সেজন্যে দল ভাঙা, নতুন দল পাকানো—হাওয়া পালটানোর আশায় নানা টুকটাক, ছোটোখাটো মুভমেন্ট শুরু করছে।

এবার দিলীপকুমারের বিষণ্ণ গলা শুনতে পেলেন বিভূতিভূষণ। কংগ্রেসের ভেতরেই কন্ট্রাডিকশন রয়েছে। নিজেরা কন্ট্রাডিকশনে ভুগছে। গান্ধীজি কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডের

ারুদ্ধে অনশন শুরু করেছিলেন তা প্রায় পাঁচবছর হয়ে গেল। অ্যাওয়ার্ড খানিকটা পালটে ল—পুনা প্যাক্ট। তিনি আনটাচেবিলিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন—কিন্তু কেন যে াম্বেদকরকে দলে টানার বিশেষ চেষ্টাই করলেন না তা আমি আজও বুঝতে পারি না। দিকে মুসলমানরা ডেজার্টেড্ বোধ করে দূরে সরে যেতে শুরু করলেন। লিগ তাদের াতাল। এখন তারা পলিটিকসে কিছুটা বিরোধী—প্যারালাল পাওয়ার হিসেবে জায়গা করে য়েছে।

এবার যিনি কথা বললেন—তাঁর গলা বা চেহারা কোনওটার সঙ্গেই বিভূতিভূষণ রিচিত নন। তাঁর একদম অজানা একটি গলা বলে উঠল, দু'বছর হল মুজাফফর আহমেদ, সামনাথ লাহিড়ী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, হীরেন মুখুজ্যে বেঙ্গল কংগ্রেসের তো মেম্বার য়েছেন। কিন্তু ওঁরাই বা কী করবেন!

হঠাৎ বিভূতিভূষণ ভাবলেন, রামায়ণ-মহাভারতের যুগের আগে ভারতের বালকেরা, দ্ধেরা কী ভাবত? তখন জীবনের ভাববার মতো কী-ই বা ছিল? তখন তো সীতার াখের জল মানুষ জানত না। রামায়ণই হয়নি। বুদ্ধের কথা বাদই দিলাম। অশোক, ৈতন্য, আকবর—এসব ট্র্যাজিক পসিবিলিটি ভবিষ্যতের ভেতর মিশে ছিল। তাহলে খনকার মানুষ কী ভাবত? কবি, ভাবুক, গায়ক, আর্টিস্ট কী নিয়ে ভাবতেন—কী নিয়ে িল্প গড়ে তুলতেন।

এখনই কবির ভাববার মতো কত কী ঘটছে। এখনই কোনও ট্র্যাজেডি গড়ে উঠছে। কন্তু আমরা তার সমস্তটা দেখতে পাচ্ছি না। বেঙ্গল কংগ্রেস, হকসাহেব, সুভাষচন্দ্র। এই ংরেজ চলে যাবে একদিন—এইসব স্বাধীনতা সংগ্রাম, এই গান্ধী, নেহরু, চিত্তরঞ্জন, এই ুভাষচন্দ্র—ইতিহাসে এসব কথা নতুন নতুন ভাবের জন্ম দেবে। এসব ঘটনা জাতির মনের হাফেজখানায় অক্ষয় আসন পাবে।

এসো বিভূতি—

হেমেন্দ্রকুমার গাড়ির দরজা খুলে ধরলেন। বিভূতিভূষণরা চৌরঙ্গির দিকে যেতে যতে দেখলেন, দোতলা একটা লাল ওয়ালফোর্ড বাস প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে। চৌরঙ্গির িকেই। বাসের ছাদ নেই। দোতলায় প্যাসেঞ্জারদের মাথার চুল উড়ছে, এই বাসের ভাড়া ুপুরে কমে গিয়ে হয় ছ পয়সা। ভিড়ের সময় দু আনা।

আলো নেই

শুধু পাখিরাই এই পৃথিবীকে খুব সহজে দেখতে পায়। কেননা ওরা এক আকাশ থেকে উড়ে আরেক আকাশে যায়। ওরা রোজ কতটা ওড়ে মাটির পৃথিবীর মানুষ আমরা জানতে পারি না।

পাখির চোখে যদি দেখি তো এখন নীচে একটা নদী একটি রেল স্টেশনের পাশ দিয়ে গাছপালার ভেতরে ভেতরে বরিশালের দিকে চলে গিয়েছে। ওদিকে বরিশাল—তা পাখিরা জানে না। জানে মানুষ। রেল স্টেশনটা সকালবেলার রোদে ঝলমল করছে। প্ল্যাটফর্মের ওপরেই একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। নীচে নেমে এলেই দেখা যাবে স্টেশনের নাম—খুলনা। সিমেন্টের স্ল্যাবে বাঙলা আর ইংরেজিতে লেখা। সাইডিংয়ে মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। পাশেই ভৈরবের বুক ঝকঝক করছে রোদে। সেখানে দাঁড়ানো নৌকা থেকে ঝুড়ি করে বরফ চাপা ইলিশ এসে উঠছে মালগাড়িতে। যাবে কলকাতায়। কয়েকটা লঞ্চ দাঁড়িয়ে। তাদের পাশে ফ্লোরিকান নামে একটি স্টিমার দাঁড়িয়ে। স্টিমারটা সন্ধেবেলা বরিশাল রওনা হবে। যাবার সময় তার ডান হাতে পড়বে রূপসা নদী। এই নদীটির রূপ আছে। কিন্তু বর্ষাকালে সে খুব ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তার জল গিয়ে পড়েছে সিপসা নদীতে। এই নদীর নাম খুলনা শহরের লোক শুনেছে। চোখে দেখেনি। অনেক দূরে। এই সিপসা গিয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। খুলনা শহরের আকাশের পাখিরা নিশ্চয় অতদূর উড়ে গিয়ে সিপসা নদীর বঙ্গোপসাগরে পড়া দেখতে পায় না। ভৈরবের বুকে উড়ে বেড়ানো শঙ্খচিলের দল নিশ্চয় শহরটাকে আগে বহরে সবটা দেখতে পায়। কলকাতা থেকে ছুটে আসা রেল লাইন শিরোমণি, দৌলতপুর কলেজ, খালিশপুর স্টেশন হয়ে খুলনা স্টেশনে এসে শেষ। পাশেই ভৈরবের বুকে স্টিমারঘাট, লঞ্চঘাট। আরেকটা সীমানায় রূপসা নদী। ভৈরবের সঙ্গে যেখানটায় রূপসা মিশেছে—সেই ক্রসিংয়ের কাছাকাছি খুলনা জেলা স্কুল, পুলিশ লাইন, বড় মসজিদ, ডিস্ট্রি

ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজের বাংলো বাড়ি। এর পরেই পুবদিকে এগোলে যে কোনও শহরে যেমন থাকে—ঠিক তেমনই—জেলখানা, হাসপাতাল, আদালত, খেলার মাঠ, গেরস্থ পাড়া, ব্যাঙ্কবাড়ি, পার্ক, ধর্মসভা, কবরখানা, শ্মশান, বাজার—আরও—আরও স্কুল। গাছপালা। পিচরাস্তা। মিউনিসিপ্যালিটির অফিস, নাট্যমন্দির।

খুলনার আকাশে সেসব পাখি উড়ে বেড়ায়—যেমন চিল, কাক, শালিক, দোয়েল, চড়ুই—আরও আরও নানান পাখি—উড়তে উড়তে নীচের দিকে তাকিযে তাদেব মনে হয—এই শহরের মানুষগুলো নিজেদের নিযে একদম মজে আছে। কোনও কোনও পাখির মনে হয—এরা নিজেদের নিযে এতই মেতে আছে যে—চাঁদ দেখে না, সূর্য দেখে না, বাতাস দেখে না, অন্ধকার দেখে না।

এরকম একটি শহরের রেলস্টেশনে কলকাতার ট্রেন এসে থামলে তিন চাকার সাইকেল রিকশা প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে নানা পাড়ায় পৌঁছে দিতে যায়। এক এক পাড়ার এক এক নাম। কালীবাড়ি পাড়া। মধ্যম পাড়া। শ্রীশনগর কযলাঘাট। বি দে রোড। কে ডি ঘোষ রোড। টুটু পাড়া। বেনেখামার। যশোর রোড। ডাকবাংলোর মোড়। খান তিরিশ ঘোড়ার গাড়িও শহরের ভেতর চলাফেবা করে।

এ যেন এই পৃথিবীর একটা ছোট স্যাম্পেল। পাখিরা তো সিনেমাহল বলে আলাদা করে কিছু চেনে না। তিনটি উঁচু বাড়ি। রংচংকরা গুদাম ঘর যেন। সেখানে পাবলিক সিনেমা দেখতে যায়। তাদের নাম—উল্লাসিনী—ভৈরবের সামনে বাজারের ভেতর, আরেকটির নাম বাণী—গান্ধী পার্কের সামনে। অন্যটির নাম—নীলা—ডাকবাংলোর মোড়ের কাছে। এই শহরে একটি গার্লস স্কুল আছে। তার গায়েই গার্লস কলেজ। থানা বাড়িটি বেশ বড়। থানার বারান্দায় একটি ঘণ্টা ঝোলানো আছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাতে সমযের জানান দেওয়া হয।

কালো কোট গাযে উকিলরা বেরিযে পড়েন বেলা দশটায়। ডাক্তাররা ব্যাগ হাতে চেম্বারে আসেন আসেন সকাল আটটায। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা বেরিযে পড়ে বেলা দশটা না বাজতেই। যাদের অবস্থা কিছু ভাল তাদের বাড়ির হাতায় ফুলের বাগান, ইউক্যালিপটাস, মাধবীলতা। ছাদে রেডিওর এরিয়াল। আবার দরমাব বেড়া, টালির চাল দেওযা বাড়িও অনেক। শহরটা যতই বেনেখামার পাড়ার দিকে গেছে—ততই বোঝা যায—আরেকটু এগোলে ধানখেত, খোলা মাঠের সঙ্গে দেখা হবে।

যেভাবে একটি নগর গড়ে ওঠে—বসতি বেড়ে ওঠে—ঠিক সেইভাবেই এই খুলনা শহরের বাড়বাড়ন্ত। এই শহরে মাস্টারমশাই আছেন, জমিদার আছেন, কংগ্রেস নেতা আছেন, মুসলিম লিগ নেতা আছেন, কমিউনিস্ট পার্টির অফিস আছে। আবার গাঁজা আফিমের দোকান আছে। বেশ্যালয় আছে। মদের দোকান আছে। মেথরপাড়াও আছে।

পাখিরা তো আলাদা করে কিছু চিনতে পারে না। তারা এই সবের ওপর দিয়ে উড়ে যায। কোথাও খাবার পাওযার থাকলে সেখানে উড়ে গিয়ে বসে। স্টিমারঘাটায় চিন্তাহরণ

হোটেলে কাবুলিরা দল বেঁধে গিয়ে ভাত খেতে বসে। খাওয়া হয়ে গেলে তারা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে—সুদ খাওয়ার জন্যে। লোকে ইচ্ছে করলেই ট্রেনে উঠে কলকাতায় যায়। একশো দু মাইল। ভাড়া এক টাকা দু আনা। ঘণ্টা চারেকের রাস্তা।

পৃথিবী এখানে যেন ঘুমিয়ে উঠে অলস শরীরে চা খেতে বসেছে। তার ভেতরে জজকোর্টের সামনের মাঠে বটতলায় সালসা বিক্রি হচ্ছে—মাথার ওপর চাঁদোয়া টানিয়ে। পাছে বটগাছের পাখিরা সব ময়লা করে দেয়—তাই। নদীর ওপারের মানুষজন মামলা করতে এসে সেই সব সালসা কিনে পরম বিশ্বাসে খেয়াঘাটে ফিরে যাচ্ছে। খেলে উপকার হবে।

আজ এইমাত্র একটা খুনের মামলার রায় বেরোলো। ফৌজদারি আদালতের বারান্দা থই থই করছে। উনিশশো সাঁইত্রিশ সনে এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বড় খুনের মামলা। ভৈরব, রূপসা—দুই নদীর বুকেই ডাকাতি হয়ে থাকে। তা ছাড়া নদী পেরিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে যেতে যত গাঁ-গঞ্জ পড়ে—সেখানে মাঝে মাঝে খুনোখুনি হয়। এমনও দেখা যায়—দশ বছর জেল খেটে ছাড়া পাওয়ার পর ডাকাতরা কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ দেয়। গলায় জবাফুলের মালা। যে দারোগাবাবু তাদের ধরেছিলেন—খুঁজে খুঁজে তাঁর বাড়ি গিয়ে—যদি তিনি তখনো বেঁচে থাকেন—তো তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তবে জেলখাটা ডাকাতরা বাড়ি ফেরে।

মামলাটি সারা জেলায় তোলপাড় তুলেছে। তিন বছর ধরে বিচার চলছে। তেরো বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা হওয়ার পর কুন্তি তার শক্ত সমর্থ ভাসুরপো মনোরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ হয়। মনোরঞ্জনের বন্ধু দশরথও কুন্তির কাছাকাছি হয়। এ সবে আপত্তি করে তেরো বছরের কানাই খুন হল। সকালে দেখা গেল কানাই তাদের বাড়ির সামনের গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। লাশ নামিযে ময়না তদন্ত। খুন করে কানাইকে ঝুলিয়ে দেওয়া হযেছে। কেস। বিচার। কুন্তি জেলে। মনোরঞ্জন, দশরথও জেলে। শুধু আদালত এলাকা নয—সারা শহরে দুটি কথা খুব শোনা যাচ্ছে। নারী ঘটিত। আর রিপু।

রায় বেরিয়েছে। কুন্তির যাবজ্জীবন। মনোরঞ্জন আর দশবথের ফাঁসি। খুলনার আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখিরা এতসবের কিছুই বুঝতে পারে না।

নীচে কোর্টের ভেতর জজসাহেব ফাঁসির রায় লিখে নিয়মমাফিক কলমের নিবটি চেপে ভেঙে দুমড়ে ফেললেন । সারা আদালত চত্বর থমথম করছে।

দায়রা জজের নাম মিস্টার ডবসন। তিনি ইংরেজিতে ডাকলেন, গোসাল—

পেশকার অনন্ত ঘোষাল এগিয়ে এলেন। বয়স এই চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। ছিপছিপে। পায়ে ফিতে বাঁধা কালো জুতো। ধুতির ভেতর ফুলশার্ট গোঁজা। গায়ে কোট। অল্পবয়সেই উন্নতি করেছেন অন্তত ঘোষাল। সেসন জজের পেশকার।

ইয়েস স্যার—

ডবসন ইংরাজিতে যা বললেন, তার মানে কালই ঘোষাল তুমি কলকাতায় চলে

যাবে। রায়ের কপি সঙ্গে নেবে। হাইকোর্ট গিয়ে ফাঁসির অর্ডার কনফার্ম করিয়ে আনবে।

রায় দিয়ে সেদিনকার মতো মিস্টার ডনসন উঠে গেলেন । কোর্ট ইন্সপেক্টর একটু আগে কাঠগড়া থেকে তিন আসামিকেই নিয়ে গিয়ে জেলখানার গাড়িতে উঠেছেন। শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ছিল দশ বরোজন। কুন্তি গেছে আলাদা গাড়িতে। সে মাথা নিচু করে কাঁদছিল। মনোরঞ্জন বা দশরথ একটুও কাঁদেনি। দয়া ভিক্ষা -টিক্ষা তাদের ধাতে নেই। তারা খুলনার ভাষায় ইংরেজ জজকে চেঁচিয়ে কিছু গালাগালি দিয়েছে। সরকারি উকিল মন্মথ ঘোষও চলে গেছেন। বারান্দায় ডিফেন্স কাউন্সিলকে ঘিরে মনোরঞ্জন আর দশরথের আত্মীয়স্বজন দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ যে আদালত ঘর গমগম করছিল—তা একদম শুনশান।

জজসাহেবের আরদালি রতিকান্ত কাগজপত্তর গোছাতে গোছাতে অনন্তর কাছে জানতে চাইল, পেশকারবাবু কত পাবেন ? অনন্ত ঘোষাল নিজের চেয়ারে বসে চোখ বুজে ছিলেন।

ভাবছিলেন—তেরো বছরের ছেলেটা তো বেঘোরে মারা পড়ল। তার মা একটু পা পিছলে গিয়ে সারাজীবন জেল খাটবে। আর জোয়ান বয়সে মনোরঞ্জন আর দশরথকে রিপুর জন্যে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।

রতিকান্ত ফের জানতে চাইল, কত আমদানি হবে পেশকারবাবু ? চোখ খুলে অনন্ত ঘোষাল জানাতে চাইলেন, কিসের ?

এই যে কলকাতার হাইকোর্টে যাবেন—সরকারি খরচে—

সে খবরে তোর কী দরকার ?

বলেন তো চা আনি দু গ্লাস।

দুটি বড় তামার পয়সা বের করে টেবিলে রাখলেন অনন্ত ঘোষাল। রেখে আবার চোখ বুজে ফেললেন। দুটি গ্লাস নিয়ে প্রায় নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাবার সময় রতিকান্ত লক্ষ করল, টেবিলের নীচে পেশকারবাবু তার দুটি পা ভাঁজ করে জোরে এদিকে ওদিকে দোলাচ্ছেন। রতিকান্ত জানে এটা পেশকারবাবুর আনন্দের দুলুনি। জজসাহেবের রায় হাতে নিয়ে সরকারি খরচে কলকাতার ট্রেনে ওঠা। সেখানে হোটেল খাওয়াদাওয়া। তারপর হাইকোর্টে যাওয়া। কাজটা দু-তিন দিন গড়ালে রাহা খরচ নিয়ে সে তো মোটা টাকা।

ইচ্ছে করলেই কোর্ট থেকে বেরোনো যায় না। সত্তর পাতা রায়ের কপি টাইপ হচ্ছে। মেশিনের কার্বন ফুরিয়ে যাচ্ছে। ফিতে বদলাতে হচ্ছে। উকিলদের ভেতর আব্দুল হাকিম সাহেব রাশভারী। ভদ্র পড়াশুনো করা লোক। চোখে সব সময় একটা ঘুম ঘুম ভাব। তিনি একবার এসে আগের একটি মামলার কিছু কাগজ দেখে গেলেন। বোধহয় আপিল হবে।

মনোরঞ্জনদের বাড়ির একজন লোক এল। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনন্তর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আমি মনোর আরেক কাকা—

আরেক কাকা মানে--আসামী কুন্তির দেওর।

অনন্ত ঘোষাল কোর্টের নিয়মকানুন জানেন। কোনও কথা বললেন না। মনোরঞ্জনের কাকার মুখেও তাকালেন না।

কাকা বলল, স্থির ছিল এই শ্রাবণেই মনোর বিয়ে হবে।

এবারও অনন্ত ঘোষাল কোনও কথা বললেন না।

কাল কখন আপনি কলকাতা যাবেন পেশকারবাবু ?

অনন্ত দেখলেন, নদীর ওপারের মানুষ হলেও কাকাটি কোর্ট কাছারির নিয়ম জানে। মুখে বললেন, সময় হলেই যাব।

কোর্ট থেকে বেরোতে বেরোতে বেশ বিকেল হয়ে গেল অনন্ত ঘোষালের। অন্যদিন তো আরও দেরি হয়ে যায়। আকাশে তখন আলো থাকে না। আজ জজসাহেব রায় দিয়ে উঠে যাওয়ায় আদালত ভেঙেছে অনেক আগে। গবমকালের বিকেল। মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে অনন্তব। ক্যাশ থেকে ডবসনের অর্ডারে নগদ সওবটি টাকা তুলেছেন। যদিও কলকাতা থেকে ফিরে এসে কড়ায় ক্রান্তিতে হিসেব দিতে হবে।

কোর্ট এলাকা থেকে বেবিয়ে সামনেই সারকিট হাউসের বড় মাঠ। এখানেই টাউন ক্লাব, পল্লীমঙ্গল ক্লাব, বানিয়াখামাব স্পোর্টিংযেব বড় বড় ফুটবল ম্যাচ হয। বিরাট ভিড়। মিটিং থেকে ভেসে এল চড়া গলা- মানুষের গলা এত দূরে ছড়িয়ে পড়ে না। মাইক্রোফোন নামে একটা যন্ত্র এসেছে ইলেকট্রিক আসার সঙ্গে সঙ্গে। গান, বক্তৃতা সে-যন্ত্রে বহুদূব ছড়িয়ে দেয।

ইনসাল্লা। ভাইসব। আমরা যদি সব এক কাতাবে দাঁড়াই তো কে আমাদেব আটকায—

আরে ! এ তো আমার চেনা গলা। আবদুল সবুরেব গলা। টাউন ক্লাবের সেন্টার ফরোযার্ড। খুলনায় যখন প্রথম আসি সবুব খাঁ আমাকে শ্রীশনগরে বাড়ি খুঁজে দিয়েছিল। ফুটবল সবুরেব পাযে পোষা কুকুর। যা ইচ্ছে করতে পারে সবুব ফুটবল নিয়ে। খুলনার গর্ব। আজকাল অনন্ত ঘোষাল খুলনাব গর্বে গর্বিত হন। এখানে এই শহরে তিনি এসেছেন তা দশ এগারো বছর হয়ে গেল। বড় দুই ছেলেকে নিয়ে এই শহরে আমি আসি। টুনু— ভাল নাম ঋতবান। তখন আট-ন বছরের ছিল। পানু -সত্যবান ছিল পাঁচ-ছ বছরের। এখানে এসে জন্মেছে। তনু—মলয় ঘোষাল। সেও এখন স্কুলে যাচ্ছে। তারপর খোকন আব গৌব। গৌরাঙ্গ নতুন হাঁটা শিখছে। এই খুলনাকে এখন তাব নিজের দেশ মনে হয।

মাইক্রোফোন থেকে সবুব খাঁযের গলা ভেসে এল। শুনতে শুনতে চমকে উঠলেন অনন্ত ঘোষাল। এসব কি বলছে সবুর খাঁ ?

বাঙলার প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসে হকসাহেবকে ভুললে চলবে না—তিনি আগে একজন মুসলমান। তারপর প্রাধানমন্ত্রী। দেশের সব মুসলমানকে লিগের পতাকার নীচে দাঁড়াতে হবে।

সব গোলমাল হয়ে গেল অনন্তর। এই তো ক মাস আগে গত শীতে ভোট হল। আমি

আবুল কাশেম ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির অনেককে চিনি। হকসাহেব আমাকেও চেনেন। হকসাহেবের দেশ পিরোজপুরের খলসেকোঠায়। কখানা গ্রাম পরেই আমাদেরও দেশ। আমার বাবা যাত্রা দলে গান গেয়ে বেড়াতেন। আমি তাঁর ছেলে বলে হকসাহেব আমায় চেনেন। আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে টাইপ শর্টহ্যান্ড শিখে কয়েক মাস হক-সাহেবের কলকাতায় ঝাউতলার বাড়িতে কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করেছিলাম। দিলদরিয়া বড় মাপের মানুষ। ভোটের পর হকসাহেবের বাড়ানো হাত কংগ্রেস ফিরিয়ে দিলো বলেই তো তোমাদের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার করলেন হকসাহেব। নয়তো লিগ তুমি সরকারেই আসতে পারো না। আর এখন সরকারে গিয়ে তাঁরই কুচ্ছো করছো ? ছিঃ ! ছিঃ !

সভা বেশ বড়। পেছন থেকে কাউকে কাউকে চিনতে পারলেন অনন্ত। মডেল স্কুলের ইতিহাস স্যার মোজাম্মেল হক। খুলনা কোর্টের মোহরার আবদুস সালাম।

আফিস কাছারি ফেবত অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়ে শুনছে। সার্কিট হাউসের সামনেব মাঠে তক্তপোশ পেতে মঞ্চ। পাশে পোঁতা হয়েছে সিধে একটি কাঠের পোল। তাতে সবুজের ওপর সাদায় চাঁদতারা—লিগের পতাকা। বিকেলের বাতাসে পতাকা অলসভাবে দুলছে।

ভৈরবের ওপারে সূর্য এবার ডুবে যাবে। মনটা ভার হয়ে গেল অনন্তর। হকসাহেব আগে মুসলমান ? এরকম কথা তো হকসাহেব ভোটের আগে সভায় কখনো বলেননি। খুলনাব এই সার্কিট হাউসেব মাঠেই তো তিনি সভা করে গেছেন। তিনি বলেছেন—দেশের গরিব চাষিদের ঋণের বোঝার কথা। সুদের ভারে তাদের পিঠ নুয়ে গেছে। সেই কথাই যেন তিনি বলেছেন। হাঁটতে হাঁটতে বাজারের দিকে চললেন অনন্ত ঘোষাল। এই সময় নদী থেকে মাছ ধরে ছোট ছোট জেলেরা নদীর পাড়েই বসে যায়। ছোট ছোট কুপি জ্বালিয়ে। নদীর বাতাসে কেরোসিন কুপির আলোয় শিখা থেঁতলে যায়। কিন্তু নেভে না। টুনু কলেজে পড়ছে। পানু ম্যাট্রিকুলেশন দেবে। তনু স্কুলে যাচ্ছে। সবাই বেড়ে উঠেছে। এই বাজারে ওদের জন্যে ডাল ভাত আর মাছই সবচেয়ে ভাল খাবার। হকসাহেব ভোটের আগে দুটি কথা বলেছিলেন, আমি সবার জন্যে ডালভাতের ব্যবস্থা করতে চাই। আর বলেছিলেন—পলিটিক্স অব বেঙ্গল ইজ দি ইকনোমিক্স অব বেঙ্গল। কথা দুটি যে কত বড় সত্যি—তা ভেবে পান না অনন্ত ঘোষাল।

মাইকে সবুর খানের গলা ভেসে আসছে। তার ককেযটা কথা কানে এল অনন্তর। সবুর বলে চলেছে—জমিদার হিন্দু—প্রজা মুসলমান। ডাক্তার হিন্দু—রোগী মুসলমান। মহাজন হিন্দু—খাতক মুসলমান। হাকিম হিন্দু—আসামি মুসলমান। জেলার হিন্দু—কয়েদি মুসলমান। কথাগুলো সিসের গুলি হয়ে অনন্ত ঘোষালের কানে ঢুকতে লাগল। তিনি জোর পায়ে ভৈরবের গায়ে জেলখানার ঘাটের দিকে চললেন। ওখানেই ছোটখাটো জেলেরা বসে। সবুরের কথাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে গিয়ে ভৈরব পেরিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে।

সবুর বলে চলেছে,—এ অবস্থা চলতে পারে না। সব মুসলমানকে লিগের পতাকা তলে এক হতে হবে। ইনসাল্লা ! এক হলে কে আটকায় আমাদের ! মনে রাখবেন কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী নাম নিয়ে যেসব মুসলমান আজও রয়েছেন—তারা কংগ্রেসের শো বয়—মুসলমানের চোখে তারা গদ্দার !

অনন্ত জানে এ এক অদ্ভুত স্লোগান।

হকসাহেবের প্রজাপার্টি কোনও মিটিং করতে পারছে না। না আছে প্রজাপার্টির অফিস—না আছে লোকজন। সবাই গিয়ে ভিড়ছে লিগে।

কী অদ্ভুত দলাদলি শুরু হয়ে গেছে সারা শহরে। এতদিন আমরা পাশাপাশি বাস করে আসছি। অথচ এ কী এক হিংসা—রাগের কথা বলে চলেছে সবুররা। ক'বছর আগেও তো—আমি তখন কলেজে থেকে বেরিয়েছি—হিন্দু মুসলমান দলে দলে এক সঙ্গে জেলে গেছে গান্ধীজির ডাকে। আমি খুলনার চাকরি নিয়ে চলে আসার বছর দুই আগে সিরাজগঞ্জে কংগ্রেস সম্মেলনে দেশবন্ধু বেঙ্গল প্যাক্ট প্রস্তাব তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে তা পাশ হয়ে গেল। সিরাজগঞ্জ অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন মোহম্মদির সম্পাদক মৌলানা আক্রম খাঁ। তিনিও আজ লিগে দিয়ে একজন বড় নেতা।

নদীর মাছ নানারকম। সিলিন্দে। চাপিলা। বাঁশপাতা। খয়রা। খযরা পেয়েও কিনলেন না অনন্ত। ভাজতে বড় বেশি তেল লাগে। সরষেব তেলের সের এখন প্রায় চার আনা। অবিশ্যি খযরা ভাজলে ছেলেরা খুব আনন্দ করে খেত। অনন্ত নিলেন সিলিন্দে। দেড় সের মতো। এক কাঁটার মাছ।

দরাদরি করে পড়ল পাঁচ আনা।

বাজার ফেলে ডাকবাংলোর মোড়। ডাইনে যশোর রোড চলে গেছে সিধে যশোর। সেখান থেকে রাস্তায় সেই কলকাতা অব্দি। এই যশোর রোডের ওপরেই অ্যাডভোকেট আবদুল হাকিমের দোতলা বাড়ি। ভদ্রলোক মানুষ। বেশি চেঁচামেচি করতে পারেন না। একসময নাকি কংগ্রেস করতেন। এখন পলিটিক্স থেকে দূরে। কিন্তু সবাই জানে মানুষটি জাতীয়তাবাদী। সবুরের কথামতো তা হলে আবদুল হাকিমও কি গদ্দার ? কবে স্বাধীনতা আসবে তার কোনও ঠিক নেই। জেলে যাওয়া নেই। মনটা একদম খিঁচড়ে যায় অনন্তর।

শহরের রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। ডাকবাংলোয় মোড় হয়ে ধর্মসভার আটচালা পড়ল। এখানে নামগান হয় বেস্পতিবার। মন্দির আছে। হরির লুটের আসর বসে মাঝে মাঝে। তারপর সাহেবদের কবরখানা। দেওয়াল ঘেরা। এবার শ্রীশনগর। খুলনারই একটি পাড়া। এখানেই থাকেন অনন্ত ঘোষাল। বিশ-বাইশখানা বাড়ি নিয়ে পাড়াটি। সব বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। একটি পুকুর আছে। ছোট ছোট দুটি মাঠও আছে। আর বাড়ির পেছনে নারকেল বাগান। যার ফাঁকে ফাঁকে নোনা আর আতার গাছ।

সন্ধের মুখে পাড়াটি যেন পাখিদের গাছের বাসায় ফেরা। ছোট্ট মাঠটায় তনু খেলছে। পাড়ারই সব ছেলেদের সঙ্গে। সবই ভাড়া বাড়ি। গেরস্থরা এইসময় বাড়ি ফেরেন। অনন্তর

বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। রাস্তা থেকেই তিনি দেখতে পেলেন— ছেলেদের মা রত্না প্রথম হেরিকেনটি ধরিয়ে বারান্দায় রাখছে। তার মানে টুনু বা পানু—এখনো বাড়ি ফেরেনি। এ বাড়ির ভাড়া মাসে চোদ্দ টাকা। তিনখানি ঘর ছাড়াও একটি ছোট ঘর আছে। সেখানি রত্নার ভাঁড়ার ঘর। ভেতব একটি বেশ বড় উঠোন। দেওয়াল ঘেরা। সেখান রত্না টুনু পানুকে নিয়ে মাটি কুপিয়ে লঙ্কা, ঢেঁড়শ দিয়েছে। রাস্তায় মুখোমুখি একটি বারান্দা। ভেতরেও উঠোনমুখো আবেকটি বারান্দা। বলতে নেই—বাড়িটি ভালই পেয়েছেন অনন্ত ঘোষাল। সবুর খাঁই খুঁজে দিয়েছিল। সবুব তো আগে এরকম ছিল না। কী হয়ে গেল দেশটার ? এত ভাল সেন্টাব ফবোযার্ড। কোত্থেকে অ্যাতো বিষ এল ?

যে মাঠে তনু খেলছে—সেদিকেও একটি বারান্দা। অবশ্যি তার ওপর ঢেউ টিনের চাল। বর্ষাকালে টিনের চালে বৃষ্টি পড়লে রাতে বিছানায় শুয়ে শব্দটা শুনতে বড় ভাল লাগে। বান্নাঘরটিই এ-বাড়ির অ্যাসেট মনে করেন অনন্ত। যদিও গোলপাতার টানা চাল—কিন্তু বিশাল রান্নাঘর। এক ইটের দেওয়াল। মেঝে বলতে মাটির ওপর একখানি করে ইট পাতা। একদিকে রান্না হয় কাঠের আঁচে। আরেকদিকটা ঘর হিসেবে ব্যবহার হয় কেউ এলে। সেখানে একখানি চৌকি পাতা আছে। রান্নাঘরের লাগোযা টানা বারান্দায় পিঁড়ি পেতে সবাই খেতে বসে। টুনু বলে—বাবা, এ বাড়ির নাম রাখা উচিত বারান্দা বাড়ি। অনন্ত মনে মনে নিজেকে বলেন, ভাগ্যবান। গরমের দিনে সিঁড়ি আছে বলে সবাই মিলে ছাদে গিয়ে বসা যায়। সেখানেও একটি ছোট্ট চিলেকোটা ঘর। সে ঘরে রত্না লক্ষ্মীর ফটো বসিয়ে বেস্পতিবার পাঁচালি পড়ে। খোকন আর গৌর চুপ বসে শোনে, বাতাসার লোভে। অনন্ত মনে মনে জানেন—শ্রীশনগরে টুনু পানুদের নিয়ে আমার এই পৃথিবী। গভীর স্বপ্নের ভেতরেও জানেন। কিন্তু জেগে থাকলে সে কথা মুখে আনেন না। যদি ভেঙে যায়। অবিশ্যি এই পৃথিবীর ভাড়া কম নয়। অন্য সব একতলা বাড়ি এ পাড়ায় সাত, আট, দশ টাকার মতো

ভাড়া। এই পৃথিবীর ভাড়া মাস গেলে চোদ্দ টাকা। চোদ্দটা টাকা খুব কিছু কম নয়।

ও কি ? তুমি অমন করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন ?

অনন্ত কোনও কথা বললেন না। রত্না তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোট। রত্নার আগে আরও একবার বিয়ে করেছিলেন। সৌরভিনীকে। বিয়ের এক বছরের ভেতর সে মারা যায়। তখন অনন্ত বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে ফার্স্ট ইয়ার আর্টসের ছাত্র। সে যে কী গেছে একটা বছর। কোথাও শান্তি নেই। তারপর গ্রেটওয়ারের পয়লা বছর—সেই উনিশশো চোদ্দ সনে রত্নার সঙ্গে তা বিয়ে হয়। রত্না তখন ন' বছর বয়সের মেয়ে। এটা উনিশশো সাঁইত্রিশ। পৃথিবী কত বদ্‌লে গেল। একটা নতুন শতাব্দীরও পাঁচ আনা গেল। রত্না এখন বত্রিশ। পাঁচ ছেলের মা। আবছা অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রত্না। অনন্ত ঘোষালের যেন পুরনো পড়া মনে পড়ে গেল। আমি গত শতাব্দীর একেবারে শেষদিককার মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র মারা যাবার এক বছর আগে আমার জন্ম। আমাদের চোখের সামনে রবিবাবু রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন। একটু একটু করে।

নাও। এই মাছটা ধর। সিলিন্দে মাছ।

মাছের ব্যাগটি ধরলেন রত্না। এখন আমি রান্না করতে পারব না।

নষ্ট হয়ে যাবে যে। ছেলেরা খাবে বলে এনেছি।

আমি সারাদিন রান্না করেছি।

সারাদিন রান্না কিসের ?

পাশের বাড়িতে নতুন ভাড়াটে এল।

এক্রামুদ্দিন আহমেদ। তার বউ কুলসুমের চার চারটে ছেলে। ওদের জন্যে ভাত বসালাম। ডাল করলাম। এই তো বিকেলবেলা সব রান্না ওরা নিয়ে গেল।

অনন্ত পাশের দোতলা বাড়িটায় এবার তাকালেন। ভূতের মত অন্ধকার বাড়িতে আলো জ্বলছে। ইলেকট্রিক আলো।

লোকজন এসেছে দেখে অনন্তর ভাল লাগল। হাত পা ধুয়ে বারান্দায় বসলেন অনন্ত। বছর চারেকের খোকন তার ছোট ভাই গৌরকে ধরে নিয়ে এল তাদের বাবার সামনে। গৌর সবে এক বছর পেরিয়েছে। টলে টলে হাঁটে।

তাকে সামনে এনে খোকন বলল, একদম কোনও কথা শোনে না বাবা—

এই নালিশের কিছুই বোঝে না গৌর। সে টলে টলে দাঁড়ায়। আবছা অন্ধকারে সে হাসি হাসি মুখে অনন্তর মুখে তাকায়। অনন্ত অবাক হয়ে তার সবচেয়ে ছোট ছেলের মুখ দেখেন। গৌর জানেও না—আজ দায়রা জজ ডবসন দুজন লোককে ফাঁসির অর্ডার দিয়েছেন। ও এই শতাব্দীর লোক। ওর সামনে এখনও শতাব্দীর তেষট্টিটা বছর পড়ে আছে। এই খোকন—গৌর—এদের কি আমি বড় করে রেখে দিয়ে যেতে পারব ? খোকনের তো এখনও হাতেখড়িই হয়নি। আমরা বাবা বরিশালের গাঁয়ে গাঁয়ে যাত্রাপালায় গেয়ে বেড়াতেন। কোনওদিন দেখেননি—আমি কি পড়ি—কি খাই। কতটা বড় হলাম। কতটা বেড়ে উঠলাম।

গৌর এসে অনন্তর কোলে জাঁকিয়ে বসল। ঠিক এইসময় উল্টোদিকের বাড়িতে কাশীডাক্তার তার রেডিওতে কাঁটা ঘোরচ্ছেন। কী ঘড় ঘড় আওয়াজ। কোথায় কলকাতা। সেখান থেকে গান ভেসে আসবে এখন। পঙ্কজ মল্লিক গাইবেন। কিংবা নজরুলের গান গাইবেন কেউ। গৌর এখনও জানে না—বাবা জিনিসটা কি। আমি ওর কে হই।

তনু ক্লাস থ্রিতে পড়ে। খুলনা জেলা স্কুলে। সে এসে বলল, হেরিকেনটা নেব বাবা।

নাও।—অনন্ত ছেলেদের সবাইকে তুমি বলেন। ওরা পাঁচজন যেন তাঁর অতিথি। অনন্তর এক একসময় মনে হয়—টুনু বা পানুও তো জানে না আমি মাস গেলে ক'টাকা মাইনে পাই। কীভাবে সব চলে। কীভাবে সব চলে যাচ্ছে।

এর ভেতর রত্না মাঝে মাঝে বলে, তুমি এত চিন্তা করছ কেন ? সব ঠিকমত চলে যাবে। দেখ—কিছুই আটকাবে না। কলকাতা থেকে ট্রেন এসেছে। কিংবা মাগুরা কালীনগরের লঞ্চ এল। প্যাসেঞ্জার নিয়ে রিকশা সাইকেল হর্ন বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে। এর ভেতর পানু ফিরল। ফিরল টুনু।

রত্না রান্না করতে করতে উঠে এসে আরেকটি হেরিকেন জ্বেলে দিলেন। বড় দুই ছেলে ভেতর বারান্দায় একই টেবিলে হেরিকেনের সামনে মুখোমুখি পড়তে বসে।

টুনু—ঋতবানের মুখখানি হেরিকেনের আলোয় দেখতে পেলেন অনন্ত। গোঁফের রেখা কিছু গাঢ়। বড় বড় চোখ। একমাথা কোঁকড়া চুল। এখন কলেজ। এর পরেই তো চাকরির জন্যে বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়া। অথচ একটিও চাকরি নেই বাজারে। লিগের সঙ্গে হক সাহেবের প্রজাপার্টির কোয়ালিশন সরকার চাকরিগুলো সব কোটায় বেঁধে দিয়েছে। অথচ পরীক্ষায় পাশ করার জন্যে টুনু এখন রাত এগারোটা অব্দি হেরিকেনের আলোয় পড়ে যাবে। রটরিক। প্রোসোডি। ইয়ারো ভিজিটেড্। আনভিজিটেড্। ভাল রেজাল্ট করতেই হবে।

বুকের ভেতরটা টন টন করে ওঠে অনন্তর। তিনি গৌরকে কোল থেকে নামিয়ে গলা তুলে রত্নাকে ডাকেন। —শুনছো। গৌর আর খোকন তো ঘুমিয়ে পড়বে।

আরেকটু রাখো ওদের। আমি আসছি।

রান্নাঘর থেকে রত্নার গলা পেয়ে গৌর তুরতুর করে রান্নাঘরের দিকে চলল। মাঝের ঘরে তনু তাকে ধরে ফেলল। —এই দুষ্টু। কোথায় চললি— ?

অনন্ত অন্যদিন এই সময় বাড়ির শেষ হেরিকেনটি জ্বালিয়ে কোর্টের কাগজ নিয়ে বসেন। যাদের মামলা থাকে—তারা কাগজপত্র গোছগাছ করে দেবার জন্যে অনন্তকে বিকেলবেলা দরকারি কাগজপত্র দিয়ে যান। সে সব কাজ বাড়ি এনে অনেক রাত অবধি বসে বসে ঠিকঠাক করেন অনন্ত ঘোষাল। পরদিন তা কোর্টে নিয়ে গেলে দুটো পয়সা আসে হাতে।

আজ আর সেসব কাগজ খুলে বসলেন না তিনি। আজ নগদ সত্তরটা টাকা তাঁর হাতে গজগজ করছে। ফের টুনুর মুখখানা দেখতে পেলেন তিনি। কেমন যেন গম্ভীব। হেরিকেনের আলোয় মনে হচ্ছে ধোঁকা খাওয়া। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে আছে

ছেলেটার গায়ে।

আমি যদি বাবার মত যাত্রা দলে গান গেয়ে বেড়াতাম ? তা হলে বাবা যেমন আমাকে নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামাননি—আমিও হয়তো টুনুকে নিয়ে মাথা ঘামাতাম না।

বালাম চালের মণ আড়াই টাকায় উঠেছে। ভাগ্যিস মোরেলগঞ্জ থেকে মাস তিনেকের ভাগের ধান আসে। জায়গাটা বাবা পেয়েছিলেন মাকে বিয়ে করে। নয়তো সারা বছরের চাল কিনতে হলে তো ফতুর হয়ে যেতে হত। টুনুর দৌলতপুরে কলেজে যাবার ট্রেনের মান্থলি পাঁচসিকে। অনন্ত একা একাই রোজ বুঝতে পারেন—তিনি রুকমাবাই সার্কাসের তাঁবুতে অনেক উঁচুতে দড়ির ওপর দিয়ে কিছু না ধরে হেঁটে চলেছেন। টাল সামলে।

টুনু আর পানু খেয়েদেয়ে মাদুর বালিশ নিয়ে ছাদে শুতে চলে গেল একসময়। রত্না ডাকলেন, ভাত দিয়েছি। এসো।

খোকন ? গৌর ? তনু ?

গৌর তো ভাত খায় না। ওরা তিনজন খেয়ে শুয়ে পড়েছে। খাবে এসো।

সিলিন্দে মাছটা খুব টাটকা। খেতে খেতে অনন্ত জানতে চাইলেন, তনুকে দিয়েছ ?

সবাইকে দিয়েছি। তুমি খাও তো।

সারা পাড়া ঘুমোচ্ছে। ক'দিনের ভেতর বৃষ্টি নামতে পারে। বাড়ির পেছনে নারকেল বাগানে—আতা গাছতলায় গর্তের ভেতর ব্যাঙ ডাকছে। হেরিকেন ঘিরে বড় বড় পোকা অনন্ত বললেন, কাল কলকাতা যেতে হতে পারে।

কেন ?

জোড়া ফাঁসির অর্ডার কনফার্ম করাতে হাইকোর্টে যেতে হবে। থালা থেকে হাত তুলে নিলেন রত্না। আবার তুমি এ কাজ নিয়েছ ?

বাঃ ! আমি যে সেসন জজের ফার্স্ট পেশকার। আর কে যাবে ?

এ কাজ তুমি ছেড়ে দাও।

ছেড়ে দিয়ে কোন কাজ করব ? কে কাজ দেবে ? তা ছাড়া নগদ সত্তরটা টাকা। বুদ্ধি করে টি এ বিল করলে আরও দশ বারো টাকা বাড়তেও পারে।

রাখো তো টাকা। তুমি তো কোর্টের কাগজ বোঝ।

তা বুঝি।

পেশকারি ছেড়ে দিয়ে মুহুরিদের ওখানে তক্তপোশে বসলে দিন গেলে চাই কি পাঁচ ছ টাকাও পেতে পার।

চারদিকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। অন্ধকার। তার ভেতর অনন্ত ঘোষাল বললেন, ভয় ক রত্না। যদি টাকা না আসে। তা হলে ?

ভাতে জল ঢেলে উঠে পড়লেন রত্না।

সামনের বারান্দার লাগোয়া বড় ঘরে জোড়া তক্তপোশে লম্বা বিছানা। এক ধা অনন্ত। আরেক ধারে তনু। তনুর পাশে রত্না। তারপর খোকন আর গৌর।

বড় মশারি টাঙাতে টাঙাতে অনন্ত জানতে চাইলেন, ছাদে তো টুনু পানুকে মশায় খেয়ে ফেলবে।

রত্না ঘুম চোখে বললেন, কামড়ালে মশাদের মেরে ঘুমোবে।

হেরিকেন খুব নিভু নিভু করে দিয়ে শুয়ে পড়লেন অনন্ত ঘোষাল। এখন ঘুম এসে তার মাথার ভেতর থেকে একটা একটা করে পোকা বেছে বের করে দিতে লাগল। প্রথম পোকার নাম—লিগ-প্রজাপার্টি কোয়ালিশন সরকার। দ্বিতীয় পোকা—দাযবা জজ ডবসন সাহেব। তৃতীয় পোকা—টাউন ক্লাবের সেন্টার ফরোযার্ড সবুর খাঁ। চতুর্থ পোকা আর বের করতে হল না। ঘুম অনন্ত ঘোষালকে আগাগোড়া দখল করে নিল।

পরদিন খুব ভোর ভোর অনন্ত ঘোষাল রেল স্টেশনে এসে হাজির হলেন। রত্না শেষরাতে উঠে সব গুছিয়ে দিয়েছেন কাপড়ের ব্যাগে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় অনন্ত রত্নার হাতে বাইশটি টাকা দিয়ে এসেছেন।

রত্না আপত্তি করেছেন। এত টাকা কিসে লাগবে? তোমার কাছে রাখো। কলকাতার মতো জাযগা।

না না। ও টাকা তোমার কাছেই রাখো। আমার সঙ্গে তো রযেইছে। খাব পাইস হোটেলে। ঘুরব ট্রামে। রাতটা কাটাবো খুলনা নিবাসে। শেয়ালদায নেমেই তো প্যারাডাইস লজ।

প্যারাডাইস লজ?

যাহা প্যারাডাইস লজ—তাহাই খুলনা নিবাস। আমরা খুলনার লোকেরা প্যারাডাইসকে খুলনা নিবাস বলি।

স্টেশনে ঢুকেই অনন্ত দেখলেন, টিকিট ঘরের সামনে মনোরঞ্জনের সেই কাকা দাঁড়িয়ে। তার পাশে ছোট একটি ছেলে। এই যে আপনার টিকিট—

একি? আপনি কাটলেন কেন?

স্টেশন চত্বরে লোক গিজ গিজ করছে। এই ট্রেন শেযালদায ঢুকবে বেলা এগারোটার ভেতর। অনন্ত দেখলেন, মনোরঞ্জনের কাকা তাঁর চেয়ে বযসে কিছু ছোটই হবে। চোখ গর্তে। খালি পা। পাযে কাদা। গাল ভর্তি দাড়ি।

লোকটি বলল, আমি মনোর কাকা।

জানি। এ টিকিট আমি নেব কেন?

লোকটি রেলের টিকিটখানি অনন্তর শার্টের ঝুল পকেটে ফেলে দিয়ে বলল, আমরা বড় ভাগ্যহীন। এই ছেলেটি মনোর ছোটভাই। আমার আরেক ভাইপো।

সকালবেলাতেই মেঘ করে আসা আকাশ। ভাগ্যহীন কথাটা ঝড়ে উড়ে আসা একখানি ঢেউ টিনের মতই সারাটা প্ল্যাটফর্মের ওপর আছড়ে পড়ল।

মনোর মা আপনার জন্যি পরোটা করি পাঠালেন—

খুব খারাপ লাগল অনন্তর। এ সব কেন? না না—বলতে বলতে অনন্ত ঘোষাল

প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেন। পেছন পেছন মনোরঞ্জনের কাকা আর ছোট ছেলেটি। এই বছর দশ বারো বয়স হবে। তারও পায়ে কাদা। তার মানে ভৈরব কিংবা রূপসার ওপার থেকে এসেছে। ভোরের দিকে ভাটায় নদীর জল নেমে যায়। তখন খেয়া থেকে নেমে পেড়ি কাদা ভেঙে তবে ডাঙায় উঠতে হয়। তার মানে অনন্তকে ধরতে ওরা ভোর রাতে বেরিয়েছে।

সামনের কামরাতেই জানলার পাশে বসে থাকা আর একটি ছোট ছেলে হাসিমুখে হাত নাড়ল। বাবা—এই যে-

অনন্ত তাকিয়ে পড়লেন। বছর ছ'-সাতের একটি ছেলে। হাসি হাসি মুখ।

মনোরঞ্জনের কাকা কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমার ছেলেরে বসায়ে রাখিছি। আপনার জন্যি জায়গা রাখলাম আগেভাগে -

কী বলবেন অনন্ত। এই ট্রেনটায় খুব ভিড় হয়। মনোর কাকার হাতে সুতোর কাজ করা একখানি ছোট কাপড়ে বাঁধা মনোরঞ্জনের মায়ের পাঠানো খাবার। ছোট্ট ছেলেটি আগে এসে ট্রেনে বসে জায়গা রাখতে পেরে খুব আনন্দ পেয়েছে। হাসি হাসি মুখ। অনন্ত ঘোষাল কামরায় উঠতেই ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। কামরায় অনেক লোক। কেউ কেউ অনন্তকে চেনে। এই ভিড়ের ভেতর রেলের টিকিট, পাঠানো খাবার নিয়ে হইচই করলে একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে।

মনোর কাকা ধমকে উঠল তার নিজের ছেলেকে। —নেমে আয়। বাবুরে ভাল করে বসতি দে—

অনন্ত জানলার পাশের সিটে আরাম করে বসলেন। পাছে সারা কামরার লোকের চোখ তাঁর ওপর পড়ে—তাই তিনি মনোরঞ্জনের কাকার মুখে তাকালেনই না। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগের ভেতর ধুতি গামছার নীচে দায়রা জজ ডবসন সাহেবের ফাঁসির অর্ডার সমেত আদালতের ফাইলটি রত্না ফতুয়া দিয়ে পেঁচিয়ে দিয়েছে। ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে খোলা জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে তাকিয়ে রইলেন অনন্ত। অথচ তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনোরঞ্জনের বাবা। তার ছোট্ট ছেলেটি আর মনোরঞ্জনের ছোটভাই অনন্তর মুখে তাকিয়ে। একদম এক হাতের ভেতর। একেবারে ছোট ছেলেটি ভোর ভোর স্টেশনে এসে ট্রেন, মানুষজন দেখে খুবই খুশি। না তাকিয়েও অনন্ত বুঝতে পারছেন—ওর মুখের হাসি ও নিজেই মুছে ফেলতে পারছে না। ছেলেটি জানেও না ওর জ্যাঠতুতো দাদার ফাঁসির অর্ডার আমার এই সাধারণ কাপড়ের ব্যাগের ভেতর। জানবেই বা কী করে! বাবার সঙ্গে স্টেশনে বেড়াতে এসেছে আর ফাঁসি কী জিনিস তা ছেলেটির জানার কথাও নয় এই বয়সে। আজকের এই ভোরবেলা যেমন নিরীহ দেখতে—আমার কাপড়ের ব্যাগটাও দেখতে তেমনি নিরীহ।

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল। মনোরঞ্জনের কাকা কাপড়ে বাঁধা খাবারের ছোট্ট পুঁটুলিটা নিয়ে কামরার ভেতর উঠল। অনন্ত ভীষণ অস্বস্তিতে পড়লেন। তিনি কাঠ হয়ে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকলেন। খাবারের পুঁটুলিটা সিটের পাশে রেখে মনোরঞ্জনের কাকা খুব চাপা গলায় বলল, রাগ করবেন না। আপনার পায়ের কাছে দুটো ডাব রাখিছি।

পিপাসা পালি খাবেন'খন।

অনন্ত এবার কোনও কথা বললেন না। তিনি বুঝতে পারছেন—কামরার কেউ কেউ এবার তার দিকে তাকাচ্ছে।

ইঞ্জিন হুইসেল দিয়ে গাড়ি টানতে শুরু করেছে। মনোরঞ্জনের কাকা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে জানলার কাছে চলে এল ফের। সে জানলার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে ছেলে দুটি।

এট্টু দ্যাখবেন। কোনও কেরেমে যদি ফাঁসিটা আটকানো যায়—একেবারে জোযান বয়স—

এবারও কোনও কথা বলতে পারলেন না অনন্ত ঘোষাল।

ট্রেন স্পিড নিচ্ছে। মনোরঞ্জনের কাকা পাশাপাশি দৌড়োচ্ছে। পিপাসা পেলি ডাবের মুখটা খুলি নেবেন।

অনন্ত দেখতে পেলেন ছোট ছেলেটি নিজেরই পায়ে পা বেঁধে হুমড়ি খেযে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। এবার আর থাকতে পারলেন না তিনি। করছেন কি ? যান—যান বলছি—

প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফুরিয়ে এল। ট্রেন বেশ স্পিড নিয়ে ফেলেছে। মনোরঞ্জনের কাকা তখনও জানলার পাশাপাশি। —দ্যাখবেন একটুখানি। দশ বছর—বিশ বছর জেল দ্যান—তাতে কোনও খেতি নেই—জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে অনন্ত ঘোষাল দেখতে পেলেন, মনোরঞ্জনের কাকা দৌড়তে দৌড়তে প্ল্যাটফর্ম যেখানে ঢালু হয়ে শেষ হয়ে গেছে সেখানে এসে টাল সামলাতে না পেরে নিজেরই দুই পায়ে জট পাকিযে একদম দলা পাকানো তামাক পাতার বস্তার মতো গড়িযে পড়ল। যাক। ট্রেনের চাকার দিকে পড়েনি। পড়ল গিযে লাইনের পাশে উঁচু করে রাখা সেম সাইজের সব নুড়ির ওপর।

কিচ্ছু করার নেই। অনন্ত কামরার ভেতর মাথা নিয়ে এসে চুপচাপ বসার চেষ্টাও করলেন। আড়চোখে দেখে নিলেন, কেউ তাঁর দিকে তাকাচ্ছে কি না। হ্যাঁ। কেউ কেউ তাকাচ্ছে। তাঁকে যাতে দেখার জিনিস মনে করে কেউ না-তাকায় সেজন্যে অনন্ত জানলার বাইরে তাকিযে রইলেন।

ট্রেন লাইনের পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া যশোর রোড আস্তে আস্তে গাছপালা আর ঘরবাড়ি, কুঁড়ে ঘরের আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। যেখানেই আড়াল থেকে যশোর রোড ফস করে বেরিয়ে পড়ে—সেখানেই অনন্ত দেখতে পান—রাস্তার দু'-ধারে বসানো—ঝাকড়া মাথার বিশাল বিশাল গাছ। রেনট্রি, গুলমোর, শিরীষের দল। বিরাট মোটা গুঁড়ি। দেড়শো দুশো বছরের পুরনো সব গাছ। কোম্পানি আমলে সাহেবদের বসানো সব গাছ। সেই কলকাতা থেকে শুরু হয়ে বনগাঁ, যশোর, দৌলতপুর হয়ে খুলনা শহরের ভেতর দিয়ে সিধে গিযে রূপসার খেযাঘাটে শেষ। এই রাস্তার গায়েই জেলা স্কুল, স্কুলের হস্টেল।

এরপর আসবে খালিশপুর। সেখানে বিশাল জঙ্গল। একেবারে ভৈরবের গা অব্দি বিরাট বিরাট গাছ। কতকালের কেউ জানে না। এই জঙ্গলে খুলনায প্রথম এসে আদালতের

লোকজনের সঙ্গে একবার খরগোশ শিকারে গিয়েছিলেন অনন্ত। কাঁটাঝোপ। বুড়ো বুড়ে
দশাসই সব আম গাছ। বহুকাল ফল দেয় না। তাদের গায়ের বাকল ফেটে ফেটে পড়ছে
ঝুর ঝুর করে। তার ভেতরে বিষ পিঁপড়ের সার। বেশিরভাগ গাছের গায়ে পরগাছা স
লতা। সে সব লতার বাহারি সব ফুল। কী এক রেণু রেণু জিনিসে সব গাছের গা ভর্তি
খুলনার লোক বলে দযার গুঁড়ো। গায়ে লাগলে গা পুড়ে যায়। চুলকোয়।

অনন্ত ঘোযাল ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না—নদী দিয়ে, গাছ দিয়ে, জঙ্গল দিয়ে, মা
দিয়ে সাজানো এই পৃথিবীটা বানিয়ে তোলার পেছনে কোনও বুদ্ধি—কারও মাথা কা
করেছে কি না। যশোর রোডের গা ধরে কলকাতা অব্দি ছায়া দেবার জন্যে বড় বড় গা
কোম্পানির সাহেবরা মাথা খাটিয়ে লাগিয়েছিল। কিন্তু এই নদী—এই জঙ্গল—এই মাঠ কা
বুদ্ধিতে ?

আর ভাবতে চাইলেন না অনন্ত। তার মাথা ঘুরে উঠল। এ সব ভাবনা—তিনি লক্ষ
করে দেখেছেন—খুবই ঘোরালো। এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে অনন্ত নিজের বু
পকেটের ওপর হাত রাখলেন। ভেতর পকেটে কোর্ট থেকে তোলা টাকা গজগজ করছে
উঃ ! কতদিন কলকাতা যাওয়া হয় না। গত বছর বর্ষার ভেতর একটা ফাঁসির অর্ডা
কনফার্ম করাতে হাইকোর্টে যেতে হয়েছিল। শেয়ালদা থেকে বেরিয়ে বর্ষায় ভিজতে
ভিজতে সেই বৈঠকখানা বাজারে ব্যাপারিদের পাইস হোটেলে খাওয়া। তিন পয়সা
সিরাজগঞ্জের রুইয়ের মুড়িঘণ্ট। পাইস হোটেল থেকে বেরিয়ে সে কি দুর্ভোগ। রাজাবাজারে
মোড়ে লিগের মিটিং থেকে মিছিল বেরিয়ে আশপাশের ট্রাম বাস বন্ধ করে দিল। পিস্ত
হাতে গোরা সার্জেন্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময় আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে দেখি
পায়ে কেম্বিশ। ময়লা ধুতি। খদ্দরের পাঞ্জাবি। একগাল পাকা দাড়ি। একা একা হেঁ
সায়ান্স কলেজের দিকে যাচ্ছেন। আরেকটু এগোলেই তো বিজ্ঞান কলেজ। রাস্তায় একজ
ছাত্র মনে হল— এগিয়ে গিয়ে বলল, স্যার আপনাকে এগিয়ে দিই ? চলুন—

না বাবা। আমার কোনও এসকর্ট লাগবে না। আমাকে সবাই চেনে। ঠিক চলে যাব
কেউ কিছু বলবে না।

কলকাতা বড় আজব জায়গা। যেখানে সেখানে নামী গ্রেটম্যানেরা ঘুরে বেড়ান। ফা
করে দেখাও পাওয়া যায়। টুনু পানু কলকাতায় এলে এঁদের দেখতে পেত। পি সি রা
ভিড়ের ভেতর দিয়ে দিব্যি হেঁটে চলে গেলেন। যেন রাস্তায় কোনও গোলমালই হয়নি

গত বছর বর্ষার ভেতর ফাঁসির অর্ডার কনফার্ম করাতে এসে বেশি সময় লাগেনি
অনন্তর। জাস্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস কাগজপত্র দেখে একবেলাতেই সব দস্তখত করে কাজট
কমপ্লিট করে দিয়েছিলেন। সে দিন বিকেলের দিকে সারা কলকাতা ঘুরে প্যারাডাইস লজ
ওরফে খুলনা নিবাসে রাতটা কাটানো। তার পরদিনও অনন্ত ঘুরে ঘুরে কলকাতা দেখেন
কলকাতা কী তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে।

সেবারে দুপুর দুপুর হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে অনন্ত ঘোযাল টালিগঞ্জের ট্রামে

উঠলেন। বজবজের রেল ব্রিজের নীচে দিয়ে ট্রাম যেন কোন শুনশান গাঁয়ে ঢুকল। এর নাম টালিগঞ্জ। ডিপোয় নেমে দেখেন—একেবারে চুপচাপ চারদিক। সাহেবদের টার্ফ ক্লাবের পাঁচিলের ওপর একটি মাছরাঙা পাখি বসে। শুনেছেন, ওখানে সাহেবদের ঘোড়া দৌড়য়। সরু মতো একটা পিচ রাস্তা চলে গেছে গড়িয়ায়। অনন্ত শুনেছিলেন—এদিকে বড়লোকদের বাগানবাড়ি- ধানখেত —মুলো চাষের বাগান। পুকুর। খুলনার এক উকিলবাবু এ দিকে একটি বাস্তু করেছেন।

হাঁটতে হাঁটতে তিনি কুঁদঘাটের দিকে যান। লোকজন নেই বিশেষ। ফাঁকা ফাঁকা। আদিগঙ্গার লকগেটে আটকানো জমা জলে দুখানি বড় নৌকো ভাসছে। টালি বোঝাই। গাছে গাছে ভর্তি জায়গাটা। পাখিদের কিচির মিচির।

ঝিকরগাছায় ট্রেন থামলে একটু খিদে খিদে লাগল অনন্তর। একবার ভাবলেন, পুটলি বাধা খাবারের কৌটোটা ফেলে দেবেন জানলা দিয়ে । আরেকবার মনে হল—দেখিই না—ফাঁসির অর্ডার হয়ে যাওয়া মনোরঞ্জনের বাড়ি থেকে পরোটাগুলো কেমন দিল। কৌটো খুলতেই সুন্দর পরোটার গন্ধ। পুরু নয়। ঘি মাখানো। খুব সম্ভব বাড়ির গরুর দুধের সর তুলে জ্বাল দিয়ে বানানো ঘি। সঙ্গে আলুর ছেঁচকি। মিহি করে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। অনন্ত ঘোষাল জানলা দিয়ে ঝিকরগাছার প্ল্যাটফর্মের বাইরে পৃথিবীকে দেখতে পেলেন। ঢেঁকি ঘর। ধানের মরাই। সরু রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে একজন লোক। ট্রেনের জানলা থেকে বাইরের পৃথিবী কত সুন্দর লাগে। আর যে বাড়ি থেকে এই পরোটা এসেছে সে বাড়িটাই বা কেমন? দাঁতে জিভে পরোটা। চোখের সামনে ঝিকরগাছা। আর মাথার ভেতর ফাঁসির অর্ডার হয়ে যাওয়া মনোরঞ্জনদের বাড়ির একটা আন্দাজ।

হয়তো মাটির ঘরবাড়ি হলেও বাড়ির সামনে পেছনে পুকুর আছে তাতে ফি বছর মাছ ছাড়ে। পেছন-পুকুরেরও পেছনে নিজ চাষের জায়গা জমিও আছে। ভরভরন্ত সংসার। গোয়াল ভর্তি গরু। ধানের গোলা। কিন্তু —রিপু, কথাটা কত ছোট। কিন্তু কত বড়।

একখানা পরোটা শেষ হয়ে গেল। খুব যত্ন করে বানানো। নিশ্চয় আজ শেষরাতে না। সবকিছু আমার জন্যে, কিন্তু ফাঁসির অর্ডার বহাল বা বাতিল করতে পারে তো শুধু হাইকোর্ট। আমি খুলনার দায়রা জজের ফার্স্ট পেশকার মাত্র।

বনগাঁ থেকে ট্রেন ছাড়ার সময় একজন লম্বাচওড়া চেহারায় মানুষ ছুটতে ছুটতে এসে চলন্ত ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরে কামরায় ঢুকলেন। চোখে কালো চশমা নাকের নীচে কালো গোঁফ। সমান করে ছাঁটা। গায়ের হাফশার্টটি খাকির। ধুতির কোঁচা তুলে ভদ্রলোক ডান পায়ের ওপর বাঁ-পা ভাঁজ করে বসলেন। লাল কেম্বিশের জুতো। কেম্বিশের ফুটো দিয়ে পায়ের আঙুল বেরিয়ে। অনন্তর পাশে হাতের পাকানো রঙিন ম্যাগাজিনটা রেখে পকেট থেকে বের করে একটি বিড়ি নিয়ে ধরালেন মানুষটি। অনন্ত ঘোষাল সুন্দর ছাপা ম্যাগাজিনটির নামটি পড়লেন। ইংরাজিতে লেখা—ওয়াইড ওয়ার্ল্ড।

অনন্ত ঘোষালের ইচ্ছে হল—একবার ইংরাজি ম্যাগাজিনখানি খুলে দেখেন। মানুষটি

বিড়িতে সুখটান দিচ্ছেন। সাদাসিধে। কিন্তু মুখখানিতে কী একটা সুন্দর আছে।

আমি একটু দেখবো--বলে গোল করে পাকানো ম্যাগাজিনখানি হাতে তুলে নিলেন অনন্ত।

দেখুন। দেখুন না। --বলে মানুষটি চোখের চশমা খুললেন।

চোখ দুটি চোখে পড়ল অনন্তর। শান্ত, গভীর, কী যেন জানতে চায়।

তিনি জানতে চাইলেন এ কাগজ কোত্থেকে বেরোয় ?

বিলেত থেকে, বলে মানুষটি ফের বিড়িতে টান দিলেন। বনগাঁ থেকে ওঠা প্যাসেঞ্জারের হাতে বিলেতের ম্যাগাজিন ! গায়ে খাকির হাফ শার্ট ? হাতে বিড়ি ? দেশটার কী হয়ে গেল ! বেশ অবাক হয়েই ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগলেন অনন্ত। ভারী সুন্দর--রঙিন একটা বড় হলঘরের ছবি। সারি সারি চেয়ার। নীচে ইংরাজিতে লেখা—হাউস অব কমন্স। চমকে উঠলেন অনন্ত ঘোষাল। এ-বাড়ির কথা তিনি বহুদিন আগে ব্রজমোহন কলেজে পড়ার বই ঘাঁটবার সময় পড়েছিলেন। এই হলঘর থেকেই আমাদের ভারতবাসীর জন্যে আইন তৈরি হয়।

একবার খুব জানার ইচ্ছে হল অনন্তর—এই ইংরেজি ম্যাগাজিন কোথায় পাওয়া যায় ? কতদিন পড়াশুনোর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। এই মানুষটি কে ? এমন জায়গায় থেকে এমন ম্যাগাজিন পড়েন।

মুখ ফুটে কিছু তার কাছে জানতে চাইতে পারলেন না অনন্ত।

লোকটি তখন কাছাকাছি বসা দুই চাষির সঙ্গে পাটের বীজ নিয়ে কথা বলছেন কথার ধাঁচটা অনেকটা এরকম।

তোমরা পাট চাষ করে মার খাচ্ছ কেন ভাই ?

কিসের চাষ করব তাই বলুন।

কেন ? মেস্তার চাষ কর। তাড়াতাড়ি তোলা যায়। ভাল বাজারও পাওয়া যায়।

রীতিমতো চমকে উঠলেন অনন্ত ঘোষাল। ওয়াইড ওয়ার্ল্ড পড়েন। খাকির হাফশার্ট গায়ে বিড়ি টানেন। আবার চাষিবাসি মানুষজনের সঙ্গে চাষবাস নিয়েও কথা বলেন। এমন লোক তো দেখা যায় না বড়। অনন্ত তাঁর এতদিনকার জীবনে যত মানুষ দেখেছেন—তাঁরা সব একবগ্গার লোক। হয় উকিল না হয় আসামি। কিংবা মুহুরি বা মুন্সেফ। এ কী ধারার লোক !

খাবারের কৌটোটা খুলে অনন্ত খুব মাথা নিচু করে বললেন, আমার সঙ্গে পরোটা আছে। দেব একখানা ?

মানুষটি অনন্তর মুখে তাকালেন। তারপর হেসে বললেন, আমি একখানা পরোটা খেলে আপনি খুশি হবেন ?

আমার খুব ভাল লাগবে।

তা হলে দিন।

ট্রেন ঠিক এগারোটায় শেয়ালদায় ঢুকল। মনোর কাকার দেওয়া খাবারের পুটুলিতে তখনও একখানা পরোটা পড়ে। আলুর ছেঁচকি শেষ। শেষ পরোটাখানা চিবোতে চিবোতে প্ল্যাটফর্মে নেমে অনন্ত ঘোষাল রেলের কলে বাটিটা ভাল করে ধুলেন। ধুয়ে জল ধরে খানিকটা খেয়ে নিলেন অনন্ত। তারপর হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মের বাইরে।

বৈশাখ মাসের রোদ চড়া। টিকিট ঘরের কাছে লম্বা লাইন। তার পাশেই রেলের চায়ের দোকান। কেক বিস্কুট। দুধ সাদা রঙে রাঙানো টিন। তাতে কালো হরফে চা খেলে কী কী উপকার তা বাঙলায় লেখা। এক দুই তিন—বিতাং দিয়ে। একটা বড় তামার পয়সা এগিয়ে দিলেন।

দুধ সাদা রেলের কাপ। বেশ বড়। তাতে রেলের ইঞ্জিনের মুখ আঁকা। তারিয়ে তারিয়ে চা খেয়ে স্টেশনের সামনের রাস্তায় এসে থমকে দাঁড়ালেন অনন্ত। আরে! বৈশাখ মাসের সেই মেলাটা শুরু হয়ে গেল। বাঁ দিকে তাকিয়ে অনন্ত দেখলেন—শিয়ালদায় সামনের রাস্তায় দু ধারের গা ধরে মেলার ব্যাপারিরা বসে গেছে। বসছে। হাঁড়িকুড়ি। কাঠের বাসন। দূরে যেন পাখি সমেত বড় বড় খাঁচা। টিয়া, ময়না, মৌলালির মোড় ছাড়িয়ে সেই ভিড়।

ডানদিকে প্যারাডাইস লজ সে দিকে না গিয়ে অনন্ত ঘোষাল এই চড়া রোদ মাথায় করে মৌলালির দিকে চললেন। বড় বড় কালো তরমুজ। কাঠের নাগরদোলাও বসেছে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হাসপাতালের সামনে। জায়গাটা পেরিয়ে ধর্মতলা স্ট্রিটের মুখোমুখি পূবে সি আই টি চওড়া রাস্তা বানাচ্ছে। ওদিকে নিশ্চয় নতুন রাস্তার গায়ে ঘরবাড়ি হবে

মোড়টা পেরিয়ে অনন্ত বাঁ হাতে মৌলালির দরগার সামনে এসে চোখ বুজে দাঁড়ালেন। তার পর মনে মনে বললেন, টুনু পানু যেন পড়াশুনোয় ভাল হয়। একটা সিকি লোহার সিক বসানো ছোট দরজার ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিলেন। দিয়ে ফের চোখ বুজলেন।

অনন্ত ঘোষাল। টাউন খুলনায় বাসা ভাড়া করে সংসার পেতেছি। ছেলেগুলোকে যেন মানুষ করে তুলতে পারি। হে মৌলা আলি আমাদের দেখো। কলকাতায় তো সবসময় আসা হয় না। এই কাজ পড়ল তো আসা । এলে তিনি জিনিসপত্তর দরদাম করে দেখেন। এখানকার দামের সঙ্গে খুলনায় হরি মিত্তিরের মুদিখানার দাম মনে মনে পাশাপাশি রেখে উনিশ-বিশ তুলনা করে দেখেন।

বড় রাস্তা ছেড়ে বৈঠকখানা বাজারে ঢুকে পড়লেন অনন্ত।

কলকাতার বড় বড় মুদিখানার দোকানের গন্ধই আলাদা। মিছরির চাকে বড় বড় বোলতা। কাঁচা জিরের গন্ধ নাকে যেতেই খুব ভাল লাগল। দাঁড়িপাল্লা ঝুলিয়ে খালি গায়ে দোকানি বসে। তিন চারজন ছোকরা মাল মাপছে। খদ্দের দাঁড়িয়ে—বসে।

চিনি কত করে ?

সের পাঁচ আনা। আড়াই সের নিলে বারো আনা।

অনন্ত মনে মনে বললেন, খুলনার চেয়ে সেরে দু পয়সা কম।

সর্ষের তেল ?

সের আজ ছ আনা। কাল বাড়তেও পারে। সরেস আট আনা।

বাতাসা ?

এবার দোকানি তেতে উঠল। মোটাসোটা। খালি গা ধুতি হাঁটু অব্দি তোলা। বাঁ হাতে তালপাখা। আপনি কী কিনবেন ?

অন্য খদ্দেররাও অনন্তর মুখে ঘুরে তাকাল। লজ্জায় মানে মানে করে সরে পড়লেন অনন্ত। বাজারের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে যেতে যেতে মাছ মাংসের এলাকা পড়ল। পাকা রুইয়ের সের চার আনা। খাসির মাংসের সের সাত আনা আছে আবার আট আনাও আছে আট আনা সেরের মাংস নিলে পছন্দ করা জায়গা থেকে মাংস কেটে দিচ্ছে।

বৈঠকখানা বাজার পেরিয়ে হ্যারিসন রোড। রাজাবাজারের দিকে ট্রাম ঘুরল। অনন্ত ঘোষাল মির্জাপুর স্ট্রিটে পড়ে বাঁয়ে ঘুরলেন। কয়েকটা বাড়ি পরেই প্যারাডাইস লজ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই কলকাতায় ছরছর আওয়াজে জল পড়ার শব্দ। খুলনার লোকজনের জন্যে দোতলায় একখানি বড় ঘরের আট খানি সিঙ্গল তক্তপোশ পাতাই থাকে। মির্জাপুর স্ট্রিটের দিকে বড় বড় তিনটি জানলা। জানলার কাছাকাছি একখানি তক্তপোশে অনন্ত ঘোষাল বসতেই ম্যানেজারবাবুর ডানহাত খগেন এসে জানতে চাইল, ক'দিন থাকবেন ?

আগে তো চানটান করি। জল আছে তো ?

ওই তো শব্দ শুনছেন। কান পাতুন। —বলে খগেন নিজেই বাঁ দিকে মাথা কাত করে জল পড়ার শব্দ শুনল। খগেনই সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে ঘরে ঘরে হিসেব নেয়। খোঁজ করে। একখানা ছেঁড়া খাতা মেলে ধরে সই করায়। ক বছরে এই তো দেখে আসছেন অনন্ত। মাসকাবারি বোর্ডার হলে সিট রেন্ট এগারো টাকা। নয়তো খুচরো বোর্ডারদের

জন্যে দিন গেলে আট আনা। খুলনার বোর্ডারদের জন্যে হাতে গড়া রুটির মতো ফিনফিনে পাতলা তোশক। আর একটি করে মাথার বালিশ।

চান কবাব জাযগাটি চেনা। সরু সিঁড়ি ধরে ঘুপচি চানঘরে ঢুকে খুব তোয়াজ কবে চান কবলেন অনন্ত। জল বেশ ঠাণ্ডা। তারপব মাথাটি আঁচড়ে কাপড়েব ব্যাগ থেকে পাট ভাঙ ধুতি আব ফুলহাতা টুইলের শার্টটি পরে নিলেন। নীচে নেমে রাস্তা পেরিযে পাইস হোটেল। সেখানে ডান হাতের কাজটি সেরেই হাইকোর্টের ট্রাম। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সরু প্যাসেজেব গাযে হাট করে খোলা দরজা দিযে যাকে দেখলেন—তাঁকে দেখে চমকে উঠলেন অনন্ত ' আরে ! আপনি এখানে ? আজই সকালে ট্রেনে একসঙ্গে এলাম–

আমি তো এখানেই থাকি। আপনি ?

কলকাতায এলে এখানে উঠি—বলতে বলতে ঘবে ঢুকলেন অনন্ত ঘোযাল। আগে তো কখনও দেখিনি আপনাকে--

আমাব তো দুপুবে স্কুল থাকে। ফিরিও অনেক সময দেরিতে। তাই হযতো দেখা হযনি।

ঘবেব ভেতব সবেধন কেবোসিন কাঠের চেযাবখানা টেনে নিজেই তাতে বসে পড়লেন অনন্ত। আমাব তো কলকাতায আসা বছরে একবার কী বড়জোর দুবাব।—বলতে বলতে অনন্ত ঘোযাল টেবিলে তাকালেন, খাতা দেখছেন ? স্কুলেব খাতা ?

নাঃ ! -বলে রুলটানা লম্বা বাঁধানো খাতা বন্ধ কবলেন মানুষটি। সিঙ্গল তক্তপোশে খালি গাযে বসে লিখছিলেন। যেন লজ্জা পেযেছেন।

ইস্কুলেব বই লিখছিলেন ? ভাল। ভাল। টেক্সট বইযেব বাজাব আছে।

না। ইস্কুলেব বই নয।

অবাক হযে তাকালেন অনন্ত ঘোযাল।

ছোটদেব একটা উপন্যাস লিখছি।

আপনি লেখেন বুঝি। বাঃ ! খুব ভাল। বইটই আছে বাজাবে ?

দু-চারখানা আছে। আমাব নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায।

অনন্ত ঘোযাল কোনও দিন এ নাম শোনেননি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথেব নাম তো জানেনই। কিন্তু বিশেয কোনও বই তাঁব পড়া হযনি। শবৎচন্দ্রের নাম জানেন। বইও পড়েছেন পথেব দাবী। তিনি জানতে চাইলেন, একখানা দুখানা বইযের নাম যদি বলেন –

বিভূতিভূযণেব কিছু অস্বস্তি লাগল। তবু তিনি বললেন, এই পথেব পাচালী। অপরাজিত।

কিসেব পাচালী বললেন ?

পথেব পাঁচালী।

হুঁ। এই বইখানা যেন দেখেছি মনে হচ্ছে। আমাব সেজো ছেলেব হাতে।

বিভূতিভূষণ কোনও কথা বললেন না।

যেখানা লিখছেন—তার নাম কী দিলেন ? বেরোলে পড়তে হবে।

বিভূতিভূষণ জানেন, ভদ্রলোক কোনওদিনই তাঁর বই পড়বেন না। তবু লেখা চলছে যে বই তার নাম বললেন। চাঁদের পাহাড়।

অনন্ত ঘোষাল উঠলেন। পাইস হোটেলে খেয়েই হাইকোর্টে যেতে হবে। বেরিয়ে আসার সময় জানতে চাইলেন, আজ ইস্কুলে যাবেন না। বিভূতিবাবু ?

আজ ছুটি। অ্যানুয়াল স্পোর্টস গেল।

কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগটি হাত দিয়ে চেপে ধরে অনন্ত ঘোষাল ট্রাম লাইনে নেমে এলেন। উল্টো ফুটপাথেই পাইস হোটেল।

ভর দুপুরে ট্রাম থেকে নেমে হাইকোর্টের সামনে এসে দাঁড়ালেন অনন্ত। যেমন বাড়ি—তেমনি তার চেহারা। এমন জায়গা ছাড়া কোথায় আর ফাঁসির অর্ডার পাকাপাকি ফাইনাল হয়। এর পাশে কোথায় লাগে খুলনার ফৌজদারি আদালত। হাইকোর্টের চুড়োয় অনেক উঁচুতে ঘড়িতে বেলা একটা বেজে দশ।

খিলানের পর খিলান। লাল টকটকে রঙের সাহেব উকিল ব্যারিস্টার গট গট করে হেঁটে যাচ্ছেন। আসছেন। বাঙালি উকিল ব্যারিস্টারও আছেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়, উঠতে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে অনন্তকে। কী বাহারের কালো গাউন। কোনও কোনও উকিল ব্যারিস্টারের হাঁটাচলা কী বাহারের। জজদের খাস বেয়ারা লাল কোট গায়ে ফাইল হাতে যাচ্ছে। অনন্ত ডান হাতে নিজের বুক পকেটটা চেপে দেখল। সেখানে খুলনা কোর্ট থেকে তোলা রাহা খরচার নোট, খুচরো একেবারে একসঙ্গে গজ গজ করছে। রত্নাকে দিয়ে এসেছি বাইশ টাকা। বাকি প্রায় সব টাকাই রয়ে গেছে। পাইস হোটেলে গেল সাড়ে ছ আনা। আরও কম লাগত—যদি না রুই মাছের মুড়িঘণ্ট নিতাম শেষে।

দোতলায় কোণের দিকে জাস্টিস সি সি বিশ্বাসের ঘর। পাশেই খোলা জানলা দিয়ে ইডেন গার্ডেন দেখা যায়। ঘরের সামনে কাঠের বোর্ডে ইংরেজিতে লেখা—জাস্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস।

জজসাহেব এখন ঘরে আছেন কি না বোঝা গেল না। ওঁরা একেবারে ভেতরে বসেন। সামনের দিককার ছোট জায়গায় দুজন কোর্ট ক্লার্ক। একজনের কাছে গিয়ে ফাইলটি বের করে দাঁড়ালেন অনন্ত ঘোষাল। তাকে দেখে কোর্ট ক্লার্ক মুখ তুলে চাইতে অনন্ত ফাইলটি এগিয়ে দিলেন। মানুষটি অনন্তর বয়সিই হবেন। তবে ফুলপ্যান্ট ফুলশার্ট ; সাদা। গোঁফেও সাদার ছিটে। ফাইল দেখে অনন্তকে তিনি বলেন, সাহেব এজলাসে। বসতে হবে।

অনন্ত ঘোষাল সবেধন ফাঁকা চেয়ারটিতে বসলেন। দেওয়ালে পঞ্চম জর্জ। চেয়ারে

বসে অনন্ত এবার কোর্ট ক্লার্কের পেছন দিককার জানলা দিয়ে ইডেন গার্ডেনের কোনাকুনি গঙ্গার বুকে জাহাজের মাস্তুলও দেখতে পাচ্ছেন। এই তো চারুচন্দ্র বিশ্বাস নামে একজন বাঙালি হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। আমি টুনুকে ল পড়াব। যত খরচই লাগুক বুক বেঁধে আমি টুনুকে কলকাতায় পাঠিয়ে আইনে ভর্তি করব। গ্র্যাজুয়েটটা হোক এবার। তারপর।

কোর্ট ক্লার্ক ভদ্রলোকটি কাজ করতে করতে উঠে গেলেন। বেশ ব্যস্তসমস্ত। রীতিমতো ফিটফাট। হাইকোর্ট বলে কথা। এখানে সব-ই দেখেন অনন্ত—সবেতেই তার যেন তাক লাগে। এ তো আর জেলার সেসন কোর্ট নয়। এমন দিন কি হবে আমার—যখন আমার পাঁচ পাঁচটা ছেলেকে পড়িয়ে শুনিয়ে বড় করে মানুষ করে তুলতে পেরেছি। কোর্ট ক্লার্ক ফিরে এলেন, সাহেব তো ডিফেন্স কাউন্সিলের সওয়াল শুনছেন। আপনি আর কতক্ষণ বসবেন!

তাইতো।

একটা কাজ হতে পারে।

অনন্ত ঘোষাল কোর্ট ক্লার্কের মুখে তাকালেন।

সন্ধের মুখে, আমি ফাইলপত্তর নিয়ে সাহেবের বাড়ি যাব। সেখানে বসে সব দেখেশুনে জাস্টিস বিশ্বাস আপনার ফাইল ছেড়ে দিতে পারেন। আপনি যদি একবারটি ওখানে আসেন—

জাস্টিস বিশ্বাস থাকেন কোথায়?

ভবানিপুরে। জগুবাবুর বাজারের কাছে। ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি বলে কোর্ট ক্লার্ক স্লিপ প্যাড থেকে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে খসখস করে লিখতে লাগলেন। তার পর কাগজখানা অনন্ত ঘোষালের হাতে দিয়ে বললেন, চক্রবেড়ে-বকুলবাগানে গিয়ে পড়লেই খুঁজে পাবেন। ট্রাম ধরবেন ডালহৌসিতে। জগুবাজার পেরিয়ে ডাইনে পূর্ণ সিনেমা। তার পরেই বাঁয়ে বকুলবাগান। দেশবন্ধুর বাড়ির গা দিয়ে—

কাগজখানি বুক পকেটে রেখে উঠতে যাবেন অনন্ত। কোর্ট ক্লার্ক বললেন, আরে যাবেন তো। একটু বসুন। আপনাদের খুলনায় এখন চালের মণ কত যাচ্ছে?

বালাম চাল আড়াই টাকা। তবে রেঙ্গুন চাল এসে পড়লে দামটা নামবে। আচ্ছা ভবানিপুরে তো বাস যায়।

তা যায়। কিন্তু আপনি গুলিয়ে ফেলবেন।

হ্যাঁ। আমি শেয়ালদার দিকটাই শুধু চিনি।

আপনি ট্রামই ধরবেন।—বলতে বলতে হাতের ফাইলে ডুবে গেলেন কোর্ট ক্লার্ক ভদ্রলোক।

খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই।

আমি এগোই—

যাবেন?—বলে এক পলক মুখ তুলেই ফের মাথা নামালেন ভদ্রলোক। সামনের

ফাইলে।

হাইকোর্টের চওড়া বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনন্ত ঘোষাল বুঝলেন, তিনি মামলা-মোকদ্দমার একদম বাজবাড়িতে এসে পড়েছেন। এখানে কাউকে তিনি চেনেন না। হয়তো এখুনি তাব পাশ দিয়ে কোনও নামকরা ব্যারিস্টার চলে গেলেন। এখানে একসময় দেশবন্ধু সওয়াল করেছেন স্যার আশুতোষ জজিয়াতি করে গেছেন। স্যার রাসবিহারী আপিসে দাঁড়িয়ে হাবা মামলা ঘবিয়ে দিয়েছেন। এখন শরৎ বোস সওয়াল করেন। ফজলুল হক সাহেবও কবতেন।

হাঁটতে হাঁটতে গভর্নর হাউস। গেটে গোরা সার্জেন্ট। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাটসাহেবের বাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলেন অনন্ত। এত গাছপালা। ভেতরেব কিছুই দেখা যায় না। ঠিক উল্টোদিকে রাস্তার ওপাবে আইনসভার নতুন বাড়ি।

ডান দিকের ফুটপাত ধবে অনন্ত ঘোষাল ইডেন গার্ডেনেব দিকে আইনসভার গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। যদি কিছু দেখা যায়। এই বাড়ির ভেতরেই মন্ত্রী হাসান সোহরাওয়ার্দি, অপোজিশনেব শরৎ বোস, প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব, কিরণশঙ্কর রায়, মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব হয়তো এখন বসে আছেন। চোখা চোখা প্রশ্ন করছেন মেম্বাররা। মন্ত্রীরা দিচ্ছেন জবাব।

হঠাৎ অনন্তর মনে হল—আমি এ সব কী ভেবে চলেছি! কী নিয়ে রোদের ভেতব মাথা ঘামাচ্ছি! আমি তো এক বত্তি ক্ষমতাও ধবি না। মাইনের টাকা কটাও গোনাগুনতি। নেহাত ফাঁসির অর্ডার কনফার্ম কবাতে কলকাতায় আসা বলেই কটা টাকা পড়েছে হাতে। তাই কিছু দিলদরিয়া হয়ে পড়েছি। নয়তো আমি কে? যাঁবা ক্ষমতা ধরেন—ক্ষমতা নাড়াচাড়া করেন—যাঁরা টাকার কাছাকাছি থাকেন—টাকা নাড়াচাড়া করেন—তাঁদের নামই শুনেছি মাত্র। কারও কাবও ছবিও দেখেছি বসুমতী, আনন্দবাজার, অমৃতবাজারে। এই যেমন সম্রাট পঞ্চম জর্জ। প্রধানমন্ত্রী ব্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। ভারতসচিব স্যামুয়েল হোর। খুলনা কোর্ট চত্বরে চায়ের গ্লাস হাতে—পান চিবোতে চিবোতে—তর্কাতর্কিতে এঁদের নাম খুব ওঠে। সেই সঙ্গে আরও কয়েকটা নাম জড়িয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী, মহম্মদ আলি জিন্না, সুভাষ বোস, জওহরলাল, ফজলুল হক, সীমান্ত গান্ধী। দশ বারো বছর আগেও দেশবন্ধুর নাম উঠে আসত।

কিন্তু আমি কে! জেলা সেসন কোর্টের পঞ্চান্ন টাকার ফার্স্ট পেশকার। শ্রীশনগরে চোদ্দ টাকাব ভাড়া বাড়িব ভাড়াটে সেশন জজ ডবসন সাহেবের কথায় উঠি। বসি।

আইনসভাব নতুন বাড়িটা আড়ে বহরে বেশ বড। কাগজে দেখেছেন অনন্ত এই তো ক মাস আগে লাটসাহেব আইনসভা ওপেন কবলেন। নয়তো আগে এবই পেছন দিককার টাউনহলে আইনসভা বসত। দেশবন্ধু তাঁর স্বরাজ্য পার্টির মেম্বারদের নিয়ে সেখানে ঢুকতেন তাঁর সঙ্গে বুদ্ধিতে সাহেব মেম্বাবরা এঁটে উঠতে পারতেন না।

ধর্মতলার ট্রাম গুমটির দিকে ফিরতে লাগলেন অনন্ত ঘোষাল গঙ্গার ওপারে সূর্য

ঢলে পড়েছে। রেড রোডের মুখ থেকে দলে দলে লোক মাঠের দিকে যাচ্ছে। দূরে কাঠের গ্যালারি ঘেরা মাঠের বাইরে লাইন। তার পাশে ঘোড়ার পিঠে তিন তিন জন মাউন্টেড পুলিশ। ফুটবল ? কাদের খেলা ?

অনন্ত দাঁড়িয়ে পড়লেন। এবার তার চোখে পড়ল—মাঠের দিকে ধেয়ে চলা ছেলে, মাঝবয়সি কচি-কাঁচাদের কারও কাবও হাতে ফ্ল্যাগ। ছোট বড়। বাতাসে পত পত করে উড়ছে। চাঁদ তারা। আজ তাহলে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা। কিন্তু কার সঙ্গে ? অনন্ত খেলার খবর কম রাখেন। তবে কানে যা আসে ভোলেন না। ডারহামসের সঙ্গে ? না, ডালহৌসির সঙ্গে ? মোহনবাগানের সঙ্গে নয় তো ? বছর তিনেক আগে মহামেডান ফার্স্ট ডিভিসনে উঠেই একটার পর একটা জিতে চলেছে। আগে শুধুই সাহেব খেলোযাড়দের কীর্তিকথা শোনা যেত। এখন সামাদের খেলার প্রশংসা শুনে অনন্তর বুকটা ফুলে ওঠে। দিয়েছে তো সাহেবদের শিক্ষা ! সামাদ তো ফুটবলের জাদুকর। খুলনার সবুর যদি মন দিয়ে ফুটবলটা খেলত তা হলে আজ হয়তো সে কলকাতার মাঠ চষে বেড়াত।

খেলা দেখতে মাঠে যেন মানুষের ঢল নেমেছে। অনন্ত ঘোষাল সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর নড়তে পারলেন না। মহামেডান ইউরোপিয়ান দলগুলোর ওপর টেক্কা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে—আমরা আর কারও পেছনে নই। গত বছর মহামেডান লিগ-শিল্ড দুইই জয় করেছে। সাহেবদের দলগুলো মহামেডানের চাপে ধসে পড়েছে। রশিদ, বাচ্চি, খাঁ, দুই নুর মহম্মদ। ছোট আর বড়। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকসাহেব এই ক্লাবের সভাপতি।

রোদের ভেতর দিয়ে মানুষের লম্বা লম্বা ছায়া পড়ছে মাঠে। একটার পর একটা ছায়া। কোনওটাই দাঁড়াচ্ছে না। সব চলেছে মাঠের দিকে। দূরে ট্রাম খালি করে লোক নামছে ধর্মতলায়। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে মোহনবাগান শিল্ড জিতে নেওযায় যে গর্বের ঢেউ উঠেছিল—সেই ঢেউ এখন মহামেডান সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। দিচ্ছে। বছরের পর বছর। একটানা।

এই জয় নিয়ে আব্বাসউদ্দিনের গলায় একটি রেকর্ড এসেছে বাজারে। খুলনায় অনন্ত শুনেছেন গানটা। লিগ বিজয়—না দিগ্বিজয় !—এরকম কথা দিয়ে গানের শুরু। আব্বাসউদ্দিনের অনেক গানের মতো এ গানও অনন্ত ঘোষাল শুনেছেন।

মানুষ যেন মাঠের দিকে ধেয়ে চলেছে। সময় থাকলে অনন্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাঠে ঢুকতেন। তিনি জানেন না—কার সঙ্গে খেলা।

হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলায় এসে তিনি বালিগঞ্জের ট্রামে উঠলেন। ট্রাম চলেছে যেন রাজহাঁস ! জানলায় বসে তিনি গ্র্যান্ড হোটেল দেখলেন। ভিড় প্রায় নেই ওই ট্রামে। পার্ক স্ট্রিটের মুখে বাঁ হাতে ঘোড়ার পিঠে সাহেবের মূর্তি। এ সব চেনা অনন্তর। এলগিন রোডের মুখ পেরোতেই দেখা গেল—ভিস্তিরা জল দিয়ে পিচরাস্তা ভিজিয়ে দিচ্ছে। জগুবাবুর বাজার জানা ছিল অনন্তর। তিনি ট্রাম থেনে নেমে পড়লেন।

বাজারের সামনে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে মুদিখানা থেকে জিরের গন্ধ ভেসে এল

নাকে। বিকেল পড়ে এল। কত দিনের দোকান। জজসাহেব তো রায় দিয়ে হুস করে মোটরে ফিরে আসবেন বাড়ি। কিংবা কোর্ট মূলতুবি করে উঠে পড়েছেন কখন। লাল কোট গায়ে আরদালি সামনের সিটে। ড্রাইভারের পাশে। পেছনের সিটে জাস্টিস বিশ্বাস। এরকম অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে অনন্ত ঘোষাল দেশবন্ধুর বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন। সারাটা চত্বর ফাঁকা। এ বাড়ির ছবি তিনি কাগজে দেখেছেন। বাড়ির সামনে একটি কাঠচাঁপা গাছ। বকুলবাগান পেয়ে গেলেন অনন্ত। কিন্তু একটাও তো বকুলগাছ নেই। ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। একটা বাড়ির সামনে বিলিতি তালগাছ। হাঁটতে হাঁটতে চক্রবেড়িয়া রোড পেয়ে গেলেন। ঠিক মোড়ের মাথায় একটা দোতলা বাড়ির গেটের সামনে বড় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। দরজায় পাগড়ি মাথায় লাল উর্দিপরা দুই আরদালি। হ্যাঁ এই বাড়ি। জাস্টিস বিশ্বাস হাইকোর্ট থেকে ফিরে এসেছেন।

অনন্ত ঘোষাল দরজায় গিয়ে কোর্ট ক্লার্ক আছেন কি না জানতে চাইলেন ভেতর থেকে তিনিই বেরিয়ে এলেন। —আসুন। আসুন। সাহেব ওপরে গেছেন। নেমে এসেই আপনার ফাইলে নোট দেবেন। আমি দেখিয়েছি।

অনন্ত ঘোষাল বড় বাইরের ঘরে চেয়ারে বসলেন। এখানেও জাস্টিস বিশ্বাসের ছোট একটি অফিস। চেয়ার টেবিল। র‍্যাক। আলমারি। পরের ঘরখানির আভাস পাওয়া যায় কাটা দরজার ওপর দিয়ে। সে ঘরে বসেন জাস্টিস বিশ্বাস। দেওয়াল থেকে আইনের বই ঘরের সিলিং অব্দি উঠে গেছে। কাটা দরজার নীচ দিয়ে টেবিল ঘিরে দাঁড়ানো চেয়ারগুলোর পায়া দেখতে পেলেন অনন্ত। বাদামি রঙের সিংহের পায়ের মতো।

ওদিকে বিকেল বিকেল দেবু, সত্য আর আবিরলাল প্যারাডাইস লজে এসে হাজির। এ কি স্যার ? এখনো লিখছেন ? যাবেন না ? বিভূতিভূষণ লিখতে লিখতে চোখ তুলে চাইলেন। আবিরলাল দেখে বুঝল, স্যার কোনওদিকে তাকিয়ে নেই। তাঁর মন পড়ে আছে লেখায়।

কোথায় ?

বাঃ ! মনে নেই আপনার। আজ আপনি আমাদের নিয়ে স্কুলের প্রেসিডেন্টের বাড়ি যাবেন। তাঁকে নেমন্তন্ন করে আসবেন।

ওহো। তাই তো। একদম মনে নেই। বোস। তৈরি হয়ে নিই—বলে আবিরলালদের স্যার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে কলঘরে গেলেন।

আবিরলাল স্যারের লেখার খোলা খাতায় তাকাল। স্যার লেখেন পার্কার পেনে। কলমটি খোলা। আবিরলাল কলমটি বন্ধ করে খাতাপত্র গোছাতে যাবে। তার চোখ পড়ে গেল লেখায়। সে কয়েক লাইন পড়ে দেখবে বলে বিছানায় বসল।

'সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই। নদীর ধারে নির্জনে বসে বসে শঙ্কর এই সব কথাই

ভাবছিল। তার মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর, দূর দেশে—শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। লিভিংস্টোন, স্ট্যানলির মতো, হ্যাবিজনস্টন, মার্কোপোলো, রবিনসন ক্রুসোর মতো। এর জন্যে ছেলেবেলা থেকে সে নিজেকে তৈরি করেছে—যদিও একথা ভেবে দেখেনি অন্য দেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালি ছেলেদের পক্ষে তা ঘটা একরকম অসম্ভব।'

পড়তে পড়তে আবিরলালের চোখ আরেক জায়গায় আটকে গেল—'প্রদীপের মৃদু আলোয় সেদিন রাত্রে সে ওয়েস্টমার্কের বড় ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসল। এই বইখানার একটা জায়গা তাকে বড় মুগ্ধ করে। সেটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ জার্মান পর্যটক অ্যান্টন হাউপ্টমান লিখিত আফ্রিকার একটা বড় পর্বত—মাউনটেন অব দি মুন (চাঁদের পাহাড়) আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ। কতবার সে এটা পড়েছে। পড়বার সময় কতবার ভেবেছে হের হাউপ্টমানের মতো সেও একদিন যাবে মাউন্টেন অব দি মুন জয় করতে।'

কী হচ্ছে আবিরচন্দ্র ?

পেছন থেকে স্যারের গলা পেয়ে আবিরলাল চট করে খাতা বন্ধ করে জানতে চাইল, মাউন্টেন অব দি মুন কি সত্যিই আছে স্যার ?

আছে। আছে আবিরচন্দ্র। আমি বাংলায় নাম দিলাম চাঁদের পাহাড়। একটু পড়ে শোনাবেন স্যার—

না। ছাপা হলে পড়িস। আফ্রিকায় এখনও অনেক পর্বত আছে যা আজও কেউ আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। সে সব পাহাড়ে আজও কেউ উঠতে পারেনি। নেঃ! চল সবাই। স্কুলের প্রেসিডেন্টকে নেমন্তন্ন করে আসি।

সনৎ, দেবু রাস্তায় নেমে পড়েছে। আবিরলালও নেমে এল। তাদের স্যার দরজায় টিপতালাটি লাগিয়ে একবার একটু টেনে দেখলেন। এই পৃথিবীতে একই সঙ্গে একই সময়ে কত ঘটনা ঘটে। যে যেখানে তাকি শুধু সেখানকারটুকুই দেখতে পাই। বাকি সব ঘটনা অদেখা থেকে যায়। জাস্টিস বিশ্বাস ধুতি পাঞ্জাবি পরে একটু পড়ে নীচে নামলেন। নেমে কাটা দরজা ঠেলে নিজের চেম্বারে গিয়ে বসলেন। কোর্ট ক্লার্ক ভদ্রলোক অনন্ত ঘোষালের ফাইলটি নিয়ে গিয়ে সাহেবকে দিয়ে এলেন।

একটু পরে বেল বাজিয়ে জাস্টিস বিশ্বাস অনন্তকে ডাকলেন। ভেতরে ঢুকে অনন্ত দাঁড়াতেই তিনি বললেন, বসুন।

জাস্টিস বিশ্বাস পড়েই যাচ্ছেন সেসন জজ ডবসন সাহেবের রায়। অনন্ত দেখলেন সারা ঘর আইনের বইয়ে ঠাসা। জাস্টিস বিশ্বাসের চেহারাটি ছিমছাম বাঙালির।

কোর্ট ক্লার্ক একখানি স্লিপ এনে চারুবাবুর হাতে দিতেই তিনি হাতের ফাইল বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। আরে! দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন ? ভেতরে নিয়ে এস।

তারপর চারুবাবু নিজেই এগিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁকে এখানে দেখে অবাকই হলেন অনন্ত ঘোষাল। তিনি সেই স্কুল মাস্টার যিনি প্যারাডাইস

লজের ঘরে খালি গায়ে বসে খাতা খুলে গল্প উপন্যাস লেখেন ছুটির দিনে। সঙ্গে তিনটি হাফপ্যান্ট পরা ছেলে।

বসুন বিভূতিবাবু। এখানে বসুন বলে নিজেই জাস্টিস বিশ্বাস চেয়ার টেনে এগিয়ে দিলেন।

খোকারা তোমরাও বোসো।

অনন্ত ঘোষাল খুব অবাক হলেন। ইস্কুল মাস্টারকে হাইকোর্টের জজের এতখানি খাতির? কী ব্যাপার? মাস্টারমশাই গল্প উপন্যাস লেখেন বলে? না, অন্য কিছু? ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না অনন্ত।

স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন এবার দেরিতে হচ্ছে।

হুঁ। জানি। গত শীতে ভোটের জন্যে স্কুলবাড়ি রিকুইজিশন হয়েছিল। তাই তখন হতে পারেনি।

আপনি আমাদের খেলাতচন্দ্র ইন্সটিটিউশনেব প্রেসিডেন্ট। আপনাকে যেতে হবে। আপনি প্রিজাইড করবেন।

নিশ্চয় যাব।—বলে চারুবাবু বেল টিপলেন।

একজন আরদালি ঘরে ঢুকলে তিনি বললেন. সবার জন্যে মিষ্টি আনো। গবম সিঙারা আনো।—তারপর বিভূতিবাবুকে জাস্টিস বিশ্বাস বললেন, স্কুলেব খবর কী? কেমন পড়াশোনা চলছে?

ভালই।

এবাব ম্যাট্রিকুলেশনে কেমন রেজাল্ট হবে?

আমরা তো স্পেশাল কেযাব নিয়ে ছেলেদের পড়িয়েছি। এখন ওরা এগজামিন হলে গিয়ে যেমন করে—

বেশ। বেশ। ভালই করবে আশা করি। তা আপনার লেখালিখি কেমন চলছে?

বিভূতিভূষণ মাথা নামালেন।

আপনার লেখা 'দৃষ্টিপ্রদীপ' বইখানা পড়ছি এখন। বড় ভাল লাগছে। বিভূতিভূষণ মাথা তুললেন, দু বছর হল বেরিয়েছে।

আলো নেই

একটা শহরের ভেতর আবার ... নগর আসে কোত্থেকে ?

কিন্তু এসেছে। শহর খুলনার ভেতর শ্রীশনগর একটি পাড়া। আর কোনও পাড়ার মন নাম নেই। রেল স্টেশন দিয়ে ভৈরবের গা ধরে রাস্তা চলে গেছে সেই খুলনা জেলা ল অবধি—পুবে। তারপর ওখান থেকে রূপসার ক্রসিংয়ে রাস্তাটা দক্ষিণে বাঁক নিয়ে পসার গা ধরেই দক্ষিণে ছুটে গিয়ে রূপসার খেয়াঘাটে শেষ। তারপর আর শহর নেই। নখেতের ভেতর দিয়ে শবযাত্রীদের পায়ের লিক ধরে পোয়াটাক গেলেই শ্মশান।

খেয়াঘাট থেকে টানা পিচরাস্তা পশ্চিমে গিয়ে বেনেখামারে শেষ। একদিকে এই াচরাস্তা আর আরেক দিকে ভৈরব নদী—এর ভেতর নানা পাড়া নিয়ে শহর খুলনা। এক ক পাড়ার এক এক নাম। কয়লাঘাটা, কালীবাড়ি, মধ্যমপাড়া, পঞ্চবীথি, ফেরিঘাট রোড, াকবাংলোর মোড়, শ্রীশনগর। এরই ভেতর আদালত, ফরেস্ট অফিস, নতুন বাজার, বনো বাজার, ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন—কত কি!

এখন আষাঢের পড়ন্ত বেলা। রূপসার খেয়াঘাটে একটি বোট এসে ভিড়ল। বছরের থম বৃষ্টি বুঝি আজই এল। সিপসার দিকে বয়ে যাওয়া রূপসার আকাশ জুড়ে একখানি ালচে মেঘ কাত করে রাখা থালার কায়দায় নদীর বুক অবধি ঝুলে পড়েছে।

বোটখানি কোনও শৌখিন লোকেরই হবে। গলুইতে বড় করে চোখ আঁকা। সে চোখ াছের কি মানুষের তা বোঝা যায় না। ধুতি পাঞ্জাবি—পায়ে পাম্পশু—মাথা ভর্তি কালো লের ঢেউ —নাকের নীচে কালো গোঁফ—ভাল স্বাস্থ্যের বছর চল্লিশেকের একজন সম্ভ্রম াগানো লোক—এই পৃথিবীটা যেন শুধু তাঁরই—এই ভঙ্গিতে পায়ের জুতোয় খেয়াঘাটের াঠের তক্তায় মস মস আওয়াজ তুলে রাস্তায় উঠে এলেন।

বাঁ হাতে ফাঁকা মাঠে দিনের আলোর ভেতর শ্মশানে চিতা জ্বলছে। এখনো লাঙল ড়েনি কোথাও। আর ক'দিনের ভেতর পড়বে। ওপার থেকে বোঝাই খেয়া মাঝনদীতে

এসে পড়েছে। তাতে মানুষজনের ভেতর একটি গরু দাঁড়িয়ে তা খেয়াঘাট থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

এবার দেখা গেল—খেয়াঘাট থেকে কিছু দূরে একখানি ঝকঝকে ল্যান্ডো দাঁড়িয়ে। পেছনের চাকা দুটি খুব বড়। সামনের চাকা দুটি সেই তুলনায় বেশ ছোট। কালচে সবুজ রঙে রাঙানো ল্যান্ডোর কোচোয়ান মানুষটি মাঝবয়সী । সামনের দিকে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে—উঁচুতে বসা কোচোয়ানের ঠোঁট পান খেয়ে লাল—মাথায় প্রায় চুল নেই। ধুতির ওপর ফতুয়া। হাতের লাগাম টেনে ধরে সে উঁচু বিরাট ঘোড়াকে রাশে রাখছে। আর অবিকল তারই মতো দেখতে—ফতুয়া গায়ে আরেকজন লোক—তবে মাথায় তার এখনো চুল আছে—নরম ঘাস বেছে বেছে ঘোড়ার মুখে এগিয়ে দিচ্ছে। ফুরিয়ে গেলে কোচোয়ানের বসার জায়গায় নীচে থাক দিয়ে রাখা ঘাস লোকটি তুলে নিচ্ছে। বোঝাই যায়—সে এই ঘোড়ার সহিস।

খুলনা শহরের বাইরে থেকে এসে কেউ যদি কোনও ল্যান্ডো গাড়ির সহিস আর কোচোয়ানের অবিকল একই চেহারা দেখে তো চমকে যাবে। একেবারে যাতে গুলিয়ে না যায়—সেজন্যেই সহিসের মাথায় এখনো ক' গাছা চুল আছে। কিন্তু খুলনার লোক চমকাবে না। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি বাতাসের সঙ্গে উড়ে আসছে। ব্যাপারিরা শহর খুলনায় গস্ত করে বড় ডালা মাথায় খেয়াঘাটের দিকে ঢাল বেয়ে নামছে। যাবে ওপারে কর্ণপুর, মুলঘড়, ভোগেরহাট—কেউ কেউ যাবে সেই মহকুমা শহর বাগেরহাটে। বড়সড় ঘোড়া লেজ ঘুরিয়ে মাছি তাড়াল। পিচ রাস্তায় নাল পরানো পা ঠুকল।

এই কালা—হারামজাদা— !

সহিস তটস্থ। সিধে হয়ে দাঁড়াল।

এই ফোতো—শালা !

কোচোয়ান ঘাড় ঘুরিয়ে চশমা, গোঁফ দেখেই লাগাম জুত করে ধরল। কালা ছুটে এসে ল্যান্ডোর গেট খুলে ধরে দাঁড়াল। ধুতি পাঞ্জাবি পাদানিতে পা দিয়ে গাড়িতে উঠতে গেলেন। আর অমনি ল্যান্ডো গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি খেল।

দেখা গেল বড় সাইজের কালচে ঘোড়া লাগাম সমেত বেরিয়ে পড়ে ছুটছে। ফোতো নামে কোচোয়ান তার বাক্স থেকে পড়ি মরি করে নেমে তার পেছন পেছন ছুটল। পিচ রাস্তা দিয়ে লম্বা লাগাম গড়াচ্ছে। ফোতো দৌড়তে দৌড়তে নিচু হয়ে সেই লাগাম একটুর জন্যে ধরতে পারছে না। ঘসটে যাচ্ছে।

ধুতি পাঞ্জাবি হাতের কাছে সহিস কালাকে পেয়ে সপাটে চড় কষালেন। চড় খেয়ে কালা একটু সরে দাঁড়াতে ধুতি পাঞ্জাবি বললেন, আবার খুলে রেখেছিলি ঘোড়া ? হারামজাদা !

তা কি করব ? নতুন আসা জানোয়ার—গাড়িতে জোতা থাকলে ঘাস মুখে নেয় না যে—

নেয় না শালা ! যা ধরে আন। তোর ভাই একা পারবে না।

কালা একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমিও তো আমাদের ভাই—

কি ! আবার সেই পুরনো কথা ! মারব শালা—বলে ধুতি পাঞ্জাবি তেড়ে এগিয়ে গেলেন।

তাতে কালা নামে সহিস একটু দূরে সরে গিয়ে শান্ত গলায় বলল, ধীরেন। আমি আর ফোতা—দুজনই তোমার ভাই। আমাদের তিনজনের বাবা একই লোক। ঈশ্বর শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য—তেনার নামেই শ্রীশগর—

ধুতি পাঞ্জাবি পরা মানুষটি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। নিচু হয়ে ডান পায়ের পাম্পশুটি খুলে ছুটে গেলেন।

বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। সারা আকাশ কালো মেঘে কাত হয়ে গেল। তার ভেতর সামান্য ভিজে যাওয়া পিচরাস্তাটি দূরে গাছপালার ভেতর এইমাত্র হারিয়ে গেছে। সেই হারিয়ে যাওয়া জায়গাটার দিকে মাঝবয়সী কালা ঘোড়ার খোঁজে—ভাইয়ের খোঁজে আধা দৌড়োনোর ভঙ্গিতে ছুটে যাচ্ছে।

ধীরেন ভট্টাচার্য ল্যান্ডোর কাছে ফিরে এসে ডান পা পাম্পশুতে গলালেন। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ননসেন্স।

ঘোড়াটি এসেছে অল্প দিন। গাড়িতে জোতা থাকলে খেতে চায় না বিশেষ। আবার ভাল জাতের দামি ঘোড়া—খালি পেটে ল্যান্ডো টেনে যদি কাহিল হয়ে পড়ে—তাই ধীরেন নিজেই বলেছেন, বারবার খাওয়াবি। বুঝলি কালা—

সেইমতো ঘেসুড়ের দিয়ে যাওয়া বাছাই ঘাস ঘোড়াকে খাওযাচ্ছিল কালা। গাড়ি থেকে খুলে দিয়ে। অবশ্য লাগাম ছিল ফোতোর হাতে। ঘাড় ঘুরিয়ে কোচোয়ানের বাক্স থেকে ধীরেনকে দেখতে গিয়ে কখন যে লাগাম ঢিলে হয়ে গেছে তা খেযাল করেনি ফোতো। এবার দেখা গেল লাগাম হাতে ফোতো ফিরছে। পেছনে ঘোড়া। ওয়েলার জাতের জানোয়ার। বড়দিনের সময় নানা জাতের ঘোড়া আসে কলকাতায়। সেখান থেকে কেনা।

ফের ল্যান্ডো ছুটতে লাগল। ধীরেন ভট্টাচার্যর মাথায় পেছনে পাদানিতে কালা দাঁড়িয়ে। ফোতো কোচোয়ানের বাক্সে। টুন পাড়া, বি দে রোড পেরিয়ে পঞ্চবীথিতে পাঁচ রাস্তায় ক্রসিংয়ে এসে পড়ল ল্যান্ডো। এবার ডাইনে ফেরিঘাট রোড ধরে এগিয়ে একদম শ্রীশনগরের গেটে। ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ে পা ঠুকছে।

দু দিকে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, গেরস্থদের বাড়িঘর। ইলেকট্রিক লাইটের খুঁটি। কোনও কোনও বাড়ির ছাদে রেডিওর এরিয়ালের তার। আবার ধানের মরাই, ঢেঁকিঘর, পুকুর, গোয়ালে দাঁড়ানো গরুর চোখ, সার দিয়ে আকাশে উঠে যাওয়া নারকেল গাছও চোখে পড়ে। এ দিকটায় বৃষ্টি নেই। ধীরেন ভট্টাচার্য দেখলেন, ফোতো লাগাম টেনে ধরে শ্রীশনগরের গেটে ঢুকবে। এই গেট বাবা মারা যাবার পর বানিয়েছেন ধীরেন। ওপরে

আধখানা চাঁদের ঢঙে কাঠের ওপর বাঙলায় লেখা—শ্রীশনগর। ফি-বছর ধীরেন এই গেট—কাঠের ওপর খোদাই কথাগুলো রং করান। ঠিক বর্ষার পর।

শহর খুলনার ভেতর নিজের বাবার নামে এমন একখানা আস্ত নগরের কথা মনে আসতেই বুকটা ফুলে উঠল ধীরেনের। আবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কথা মনে পড়তেই তিনি কিছুটা ঝিমিয়ে গেলেন।

ঘোড়া এবার পা দিয়ে জায়গাটা চিনতে পারছে। আহ্লাদী ঢঙে ধীরে সুস্থে পা মেলে নিজের বাড়িতে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিরাট তেতলা বাড়ি। বাড়ির গায়ে নেমপ্লেটে ইংরাজিতে লেখা ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিএ, বিএল। সে দিকে তাকিয়ে ধীরেন নিজেকে বললেন, এ বাড়ি আমি বানাইনি। বাবা করেছিল। আমি হলে—

বাড়ির সামনে পেছনে একটি করে পুকুর। তারপর এই বাড়িকে মাঝখানে রেখে তিনদিক মিলিয়ে মোট পঁচিশ ছাব্বিশখানা বাড়ি। সবই আমার বাবাব বানানো। ভেতর দিয়ে বিশ ফুট চওড়া রাস্তা। ভাড়াটেদের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর জন্যে একটি ছোট মাঠ। সেই মাঠ ঘিরে তিনটি একতলা—দুটি দোতলা। মাঠের গাযেই একতলায থাকেন দাযরা আদালতের পেশকার অনন্ত ঘোষাল। লোকটার ছেলেগুলো ধাঁ ধাঁ করে বড় হচ্ছে। অনন্তর পাশের দোতলা বাড়িতে ক মাস হল নতুন ভাড়াটে এসেছে। ভাড়া বত্রিশ টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবইন্সপেক্টর অব স্কুল। এক্রামুদ্দিন আহমেদ। সামনেব পুকুরের ওপারে দোতলায থাকে অনিল দারোগা। কাজেকম্মে লোকটাকে দরকার হয ধীরেনের। সব ভাড়াটের নাম মনে রাখা কি যায ! আমার বাবার বসানো নগর ! আলাদা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বাড়ির পেছনের একতলা বাড়িগুলোর একজন ভাড়াটেকে মনে পড়ে গেল ধীরেনের। ডাঃ যজ্ঞেশ্বব রায। বিনা অস্ত্রে চাঁদসির চিকিৎসা। সাইকেলে চড়ে ঘুমোতে ঘুমোতে কালীবাড়ি পাড়ায যায। সেখানে তার চেম্বার। টিনের ওপর একটি সাপ আঁকা আছে। সেই টিন ডাঃ যজ্ঞেশ্বর রায তার চেম্বারের মাথায টাঙিযে রেখেছে। ধীবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন, একজন চাঁদসিব ডাক্তারের সঙ্গে সাপ ওরফে মা-মনসার যোগ কোথায ! আমি বুঝতে পারি না।

ধীরু ?

ঘুরে তাকালেন ধীরেন্দ্রনাথ। তাঁর মা দাঁড়িযে। পাশে কোমর পড়ে যাওযা বসন্ত বুড়ি। কোমর থেকে বাঁকা হযে দাঁডিযে। হাতে ভাজা তামাকের মিশির কৌটো। সে মিশির একটা চাপা গন্ধ বাতাসে।

তোমার ঘোড়া নাকি বিগড়েছিল ?

আমার কপালই বিগড়ে গেছে মা—

কালা ফোতো দু ভাই মিলে আস্তাবলে ঘোড়া তুলে দিয়ে এসেছিল—ওরাই বলল—

ঘোড়ার কথা বাদ দাও মা। ওরা তো বলছে ওরা, আমাব ভাই হয—

কেন বিদেশি ঘোড়া আনতে গেলি বাবা ?

ঘোড়ার কথা বাদ দাও তো মা। বাবা কী কাণ্ডটাই করে গেছে ভাবো তো একবার।

সে তোর বাবার ব্যাপারে। ব্যাটাছেলে এমন তো করেই থাকে। এ আর এমন কি ধীরু ? কালা ফোতোর তো একটা বোনও আছে। ফ্যাকাশি। সে দাইয়ের কাজ করে।

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বিএ, বিএল—একবার মায়ের দিকে তাকালেন। সাদা থান পরনে সম্পন্ন ঘরের হিন্দু বিধবা। তাঁর চোখের সামনে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। বয়স এখন তাঁর উনত্রিশ বছর আট মাস। দোতলায় উঠে ধীরেন ভেতরবাড়ির ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে দেখতে পেলেন, তাঁর বউ অলকা রেডিওর সামনে মেয়েকে কোলে নিয়ে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে আছে। ক'বছর হল এই এক কল হয়েছে। যখন তখন গান। বক্তৃতা। মায়ের কোলে বছর পাঁচের মানুও রেডিওর দিকে তাকিয়ে। এই মানু হওয়ার পর অলকার আঁতুড়ে ফ্যাকাশি এসে সেঁকতাপ দিয়েছিল।

রূপসার খেয়াঘাটের দিককার মেঘ এখন শ্রীশগরের আকাশে। কালা ফোতো বাড়ির সামনের ডোবাটায় ডুব দিয়ে উঠল। সামনেই সজনে গাছ। তার পাতা সব সময় ডোবায় গিয়ে পড়ে। সেরকম কিছু ভিজে পাতা কালার গায়ে। ফোতোর গায়ে। ওরা হাত দিয়ে সেগুলো ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে উঠোনে উঠে এল। এই ভিটে বাড়ি শ্রীশনগরের পেছন দিকে। দক্ষিণে আরেকটু গেলেই বেনেখামারে যাবার সুরকির লাল রাস্তা।সে রাস্তা এখন আকাশের মেঘের ছায়ায় কালচে। এই উঠোনে দাঁড়িয়ে মাটির বাড়ির গোলপাতার চালে তাকালে বীজ রাখার হলদে হয়ে যাওয়া লাউটা চোখে পড়বেই। গোলপাতার চাল পচে ক্ষীর। এরই ভেতর ডোবা থেকে চারটে পাতিহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে উঠে এল।

মাটির বারান্দায় খেজুরপাতার খোলপে পেতে এক বুড়ি বসে। মাথায় প্রায় চুল নেই। গায়ের কানি মতো কাপড়খানি ধুলোমাখা। তার ভেতর থেকে বুড়ি শালিক ছানার গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আমারি দুটো ভাত দে—গরম ডাল থাকলি ভাল হয়—দিবি নে— ?

উঠোনে দাঁড়িয়ে কালা ফোতোদের ঘরবাড়ির সবকিছু দেখা যায়। নারকেলের ডেগো গোঁজা মাটির উনুনের হাঁ-মুখ, ঘরের ভেতরকার শোওয়ার বাঁশ মাচা, টিনের কৌটোকাটা।

ফোতো এগিয়ে এসে বলল, দুপুরে ভাত খাওনি মা ?

দেবে কে ? তোরা তো বিয়ে থা করলি না। ফ্যাকাশির বে হল না। পাড়ায় পাড়ায় দাইগিরি করে বেড়াচ্ছে। আমারে এট্টু রোদের দিকি ঠেলে দে—

কালা বলল কোথায় মা ? মেঘ আকাশে—

কেন ? পশ্চিম কোণায়—ওই যে—বলে আঙুল দিয়ে দেখাল কালার মা।

তুমি তো অন্ধ। চোখি দেখতি পাও না।

রোদির ওম্ টের পাব না ? কী বোকা রে। চেরকাল তো অন্ধ ছেলাম না। এ জায়গা কেমন ছেল তা শুনবি ? তবে শোন। চাদ্দিক ধানখেত। শিরীশবাবু ফাঁকা মাঠে আমায় নে এসে তোললেন। মাটির ঘর। চাল বলতি গোলপাতা।

ফোতো খেপে উঠল। রাখো তো তোমার শিরীশবাবুর গল্প।

ওমা ! সে কি কথা ? তোগে বাপের কথা শুনবি নে !

তাও তো তোমারে বে করেনি লোকটা। খুব বদমায়েশ ছেল।

ছিঃ ! ও কথা বলতি নেই। খুব দাপের মানুষ ছেল। জমি জায়গা করে বেড়াত। বে করার সময পেল কোথায় ? তোরা দু'ভাই জমজ জন্মালি। চারটে বছর ঘুরতি না ঘুরতি ফ্যাকাশি পেটে এল।

আর অমনি ধীরেনের মায়েরে বে করে বসল লোকটা !

ওমা ! তখন যে শিরীশবাবু বড়লোক। নে অনেক বকালি। দুটো ভাত দে—বলে কালা ফোতোর মা অন্ধকার হয়ে আসা আকাশে তাকাল। কিছুই দেখতে পায় না। আশপাশে শ্রীশনগরের পেছনে দিককার বুনো জঙ্গল। চোখ থাকলে কালাফোতোর মা দেখতে পেত—সেই জঙ্গলে বুনো ধুঁধুল অল্প বাতাসে একটু একটু দুলছে। এবার সে বলে উঠল, বাপের নিন্দে মহাপাপ। লোকটা এই দুগগা দাসীর নামে ক'বিঘে জায়গা বেনেখামারের মাঠে লিখে দে গেল বলেই না তোরা এখনও ক'মাসের খোরাকি ধান পাস। তোদের ভাইয়ের কোচোয়ানি করে মাসকাবারে টাকাও মেলে।

কালা আর ফোতো ল্যান্ডো চালায়। ডোবার পাড়ে মানকচু ওলকচু বসায় বর্ষার মুখে মুখে। ভেঙেপড়া মাটির ঘরের গোলপাতার চাল টুকটাক সারাইও করে। আবার ফ্যাকাশি না থাকলে ভাত রাঁধে। ভাত বাড়ে। পরের পাঁঠা-খাসি পোষানি নিয়ে বড় করে দৌলতপুরের হাটে গিয়ে বেচে দিয়ে দুটো পয়সাও করে।

ফ্যাকাশি দাইগিরিতে বেরোবার আগে আজ ভাত রেঁধে গেছে। সেই ভাত কলাই থালায় বেড়ে ফোতো তার মায়ের জন্যে আনছিল। ঠিক এই সময় দুগ্‌গা দাসীর মুখে ভাই কথাটা শুনে ফোতো ভেঙচে উঠল, ভাই ! থামো তো মা—

ঠিক এই সময় অলকার ঘর থেকে একটি গান ভেসে এল। রেডিও থেকে।

অনেক ছিল বলার যদি
দু'দিন আগে আসতে—

গানটিতে যেন কী আছে। পুরুষের গলা। ধীরেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি ঝুলবারান্দা থেকে ঢাকা বারান্দায় চলে এলেন। একেবারে নিজের ঘরের সামনে বাবার আমলের ঘর। ধীরেন্দ্রাথের বিয়ের বছর এ পাড়ায় ইলেকট্রিক আসে। এখনও ভাড়াটেদের কয়েক ঘরে ইলেকট্রিক আসেনি। যেমন অনন্ত ঘোষাল। নিজের ঘরে ঝকঝকে আলোয় রীতিমতো ফরসা অলকা মন দিয়ে গানটি শুনছে। মানুও তার মায়ের সঙ্গে একটু একটু মাথা দোলাচ্ছে।

অনেক ছিল বলার যদি....

কথাগুলো কেমন অন্যরকম লাগল ধীরেন্দ্রনাথের। গানটি শেষ হতে তিনি বুঝতে পারলেন, গানের বাণীতে একটা আড়াল আছে। মন জানতে চায়—কী বলার ছিল ? তিনি

অলকাকে বললেন, কার লেখা গান ?

ওই যে বলল—কার নাম যেন বলল ? ও হ্যাঁ—নজরুল ইসলাম।

তাই বল। কবি কাজি নজরুল ইসলাম। কলকাতায় ল পড়ার সময় ওঁকে একবার দেখছি। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে গান গাইতে এসেছিলেন।

রেডিওটা গজগজ করছে। তাই শুনে অলকা বলল, কলকাতায় নিশ্চয় ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে।

এখানেও একটু পরে বৃষ্টি নেমে আসবে। দেখছো না চারদিক কালো করে মেঘ—

দিনে দিনে তাইতো ইলেকট্রিক জ্বেলে গান শুনছিলাম। যাক তুমি ভালয় ভালয় ফিরে এসেছ। কী দেখলে কর্ণপুরে ?

কী আর দেখব ! বাবার ভাগে দেওয়া জায়গাগুলোয় ভাগচাষিরা সময় মতো যাতে হাল নিয়ে নামে। আষাঢ় পড়ে গেল। বীজতলা করেছে কিনা— এইসব ।

তোমার বোট ?

রূপসার খেয়াঘাটে নেমেছি অলকা। আজকের রাতটা মাঝি দাঁড়ি খেয়াঘাটেই থাকবে।

রূপসায় কেন ? ভৈরবঘাটেই তো নামো তুমি।

কালা ফোতোদের বলা ছিল যে—

ওভাবে বোলো না—বলে অলকা গম্ভীর হয়ে গেল।

তা হলে কি বলব ওদের ? সহিসবাবু ? কোচোয়ানমশায় ?

তা না। ওদের তো বয়স হয়েছে। তোমার চেয়ে বড়। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি ?—বলে চিৎকার করে উঠলেন ধীরেন্দ্রনাথ। তারপর সামলে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, তুমি ! তুমিও অলকা !

রেডিওটা গজ গজ করে চলেছে। অলকা একদম চুপ করে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। অলকারা যশোর বনগাঁর মানুষ। ওখানে খুলনার মতো অত নদী নেই। ধীরেন্দ্রনাথ নিজের কথাবার্তা অলকার কথাবার্তার পাশে রেখে টের পান -যশোর অনেক নরম, ছিমছাম। নিজের চেঁচিয়ে ওঠায় নিজেই লজ্জা পেলেন ধীরেন্দ্রনাথ। মানু অব্দি ঘাবড়ে গেছে। সে একবার তার বাবার মুখে—একবার তার মায়ের মুখে তাকাচ্ছে। জানলার বাইরে বছরের পয়লা বৃষ্টি। উল্টোদিকে পুকুরের ওপারে অনিল দারোগার দোতলার বারান্দায় ইলেকট্রিক আলো।

ধীরেন্দ্রনাথ নিজেই বলে উঠলেন, আমার আর কত দূর হবে বল ! বি এ, বি এল হয়েছি ঠিকই—কিন্তু আমি তো আসলে সেই শিরীশচন্দ্রেরই ছেলে ! তাই না অলকা ?

অলকা একবার ফিরে তাকাল ধীরেন্দ্রনাথের মুখে।

ধীরেন্দ্রনাথ এগিয়ে গিয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন। চল্ মানু—তুই আর তোর মাকে নিয়ে এই রবিবার কর্ণপুর বেড়িয়ে আসি। সেখানে গিয়ে ছোট রেলে চড়ে আমরা সবাই মিলে বাগেরহাট যাব।

মানু রেল জানে না। বাগেরহাটও বোঝে না। তার মুখ দেখে বুঝতে পারেন ধীরেন্দ্রনাথ। এত বড় বাড়ি। একতলা, দোতলা, তেতলা মিলিয়ে ঘরের পর ঘর—বারন্দার পর বারান্দা। সব খা খা করছে। একতলাটা মায়ের মহল সেখান মাজা বাঁকা বসন্ত বুড়িকে নিয়ে মা একা একা ঘুরে বেড়ায়। কাজের লোকজন খাটায়। দোতলার সব ঘরে যাওয়া হয় না ধীরেন্দ্রনাথের। তেতলার প্রায় সবটাই তালা বন্ধ। নীচে বৈঠখানায় গিয়ে দোবেলা বসেন বটে ধীরেন্দ্রনাথ—কিন্তু বেশিক্ষণ থাকেন না। এখন তিনি বুঝতে পারছেন—তিনি না মেয়ে—না বউ—কাউকেই আনন্দ দিতে পারছেন না। বাবার করে যাওয়া বাড়িঘর—জায়গাজমি—ধান চাল পাট—পুকুরের মাছ নাড়াচাড়া করতে করতে তার ভেতরেই ডুবে আছেন। এমনকি যে বোটে তিনি নদীতে এদিক ওদিক যান—তার গায়েও বাংলায় লেখা আছে—শ্রীশচন্দ্র।

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আজ কেন জানি রাস্তায় ইলেকট্রিক খুঁটিতে এখনও আলো জ্বলে ওঠেনি। এবার বড় ফোঁটায বৃষ্টি নামল। ভেতর বারান্দায মাদুরে বসে অনন্ত ঘোষাল একটা রাহাজানি কেসের সুরতহাল রিপোর্ট দেখছিলেন। অন্য কাগজপত্র ছড়ানো চারদিকে।

রথের মেলায তিন টাকা দিয়ে রত্না একটি কাঠের বাক্স কিনে দিয়েছিল। সেটাই এখন অনন্তর টেবিল। কাজ হযে গেলে কাগজপত্র বাক্সের ভেতর পুরো রাখেন তিনি। দুবার জেলখাটা আসামি এবারেব রাহাজানি কেসে দারুণ ফেঁসে আছে। ডিফেন্সের উকিল বলেছেন, অনন্তবাবু একটা রাস্তা বের করতেই হবে—নইলে আসামির ম্যাক্সিমাম কনভিকশন হযে যাবে।

হেরিকেন ধরিযে সেটি কাঠের বাক্সের কোণে ঠক করে নামিযে দিযে রত্না বললেন, কোরোসিন আনাবে। আর মোটে চার বোতল আছে।

অনন্ত কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, দিব্যি চলে যাচ্ছিল—আমার জন্যে হেরিকেন ধরাতে গেলে কেন ? এখন ছেলেরা বড় তিনজন পড়ুযা। যা পাবে সব ওদের জন্য বাঁচিযে রাখবে তো।

এ কথার জবাবে রত্না একদম অন্য জায়গা থেকে শুরু করলেন। এই অন্ধকারে কাগজের ওপর তো হুমড়ি খেযে পড়ছো। চোখ দেখিযে চশমা নাও। আবার বলছো হেরিকেনের কি দরকার ? এবার কাগজ রেখে অনন্ত হেরিকেনের আলোয় দাঁড়ানো রত্নাকে পুরোপুরি দেখলেন। তার পাঁচ ছেলের মা। ন'বছর বয়সে বিয়ে হয়ে জবরদস্ত জননীও। মাঠের দিককার বারান্দায টিনের চালে বড় বড় ফোঁটায় চড়বড় করে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি এসে সারা পৃথিবী থেকে তাঁদের এই বাড়িটাকে যেন আলাদা করে দিযেছে। উঠোনের কচুপাতায, ঢেঁড়শ গাছে ঝরঝর করে জল পড়ছে।

টুনু পানু ফেরেনি ?

ট্রেন হযতো দৌলতপুর থেকে ছেড়েছে।

রত্নার এ কথার মানে দৌলতপুর কলেজ থেকে বেরিয়ে সামনেই কলেজের শাটেল ট্রেন উঠেছে পানু। খুলনা স্টেশনে পৌঁছতে লাগে পনেরো কুড়ি মিনিট। খানিক বাদেই কলেজ ফেরত টুনু খুলনা স্টেশনে নেমে এ-দোকান সে-দোকানের শেডে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরবে।

পানু ?

সে দ্যাখোগো স্কুল ফেরত মাছ ধরছে কোথাও। একদিন তো দুটি কাঁকড়া নিয়ে ফিরে বলে—ভেজে দাও মা। খাব।

কাঁকড়া ?

হ্যাঁ। কাঁকড়ার গর্ত থাকে পুকুরের পাড়ের গায়ে। তার ভেতরে লাঠি ঢুকিয়ে দিলে কাঁকড়া তার দাঁড়া দিয়ে কামড়ে ধরে লাঠি। তখন পানু টেনে বের করে কাঁকড়া। তাই তো বলল তনু।

তনুও যায় নাকি সঙ্গে ? তুমি কিছু বলনি রত্না ?

পানু পড়ে নাইনে। নীচের ক্লাসের ছোট ভাইকে নিয়েই তো বাড়ি ফেরে।

উঁহু। এ একদম ভাল না রত্না। কাঁকড়া তাড়িয়ে ওদের গর্তে অনেক সময় সাপও থাকে। ও বাবা ! এ আবার কোন নতুন বিপদে পড়লাম—বলতে বলতে মাদুরে দুহাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অনন্ত ঘোষাল।

বিপদ কোথায় ? এই বয়সে তো এ সব করবেই ছেলেরা। তনু পড়ে থ্রিতে। এখনই ধীরেনবাবুর সামনের পুকুরে ডুব দিয়ে পুকুরের মাটি তোলে।

তাই নাকি ? আমি তো কিছুই জানি না। ওরে বাবা ! কোন দিন ডুব দিয়ে আর উঠবে না।

সবটাতে তোমার অ্যাতো ভয়। এ সব তো ভালই। পানু তো সে দিন গাছে উঠে ডাব পেড়েছে।

কাদের গাছে ?

ধীরেনবাবুর বাগানে। আমাদের বাড়ির পেছনে।

কী কেলেঙ্কারি ! ছিঃ ছিঃ ! ধরা পড়লে লজ্জার একশেষ। তারপর পড়ে গিয়েও তো হাত পা ভাঙবে।

এই বয়সে একটু আধটু ভাঙুক।

রত্নার মুখে তাকালেন অনন্ত। বউ হয়ে এসে বরিশালে শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে খালে নাইতে নেমে বালিকা রত্না কিছুতেই উঠতে চাইত না। এক একদিন স্বামী হিসেবে তাঁকে লাঠি নিয়ে খাল পাড়ে যেতে হত। অনেক দিন অনন্ত পাড়ে দাঁড়িয়ে লাঠি দেখিয়ে তবে বালিকা বউকে জল থেকে তুলছেন। তারই তো ছেলে !

আমি হয়তো পারলাম না—

স্বামীর মুখখানি অন্ধকার উঠোনের দিকে তাকিয়ে। সেখানে হেরিকেনের আলোর

ভেতর বৃষ্টির সব ছেঁড়া সুতো।

কি পারলে না ?

চোখ তুলে তাকালেন অনন্ত ঘোষাল। খানিকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না। তারপর মুখ খুললেন। মাইনে পাই পঞ্চান্ন।

বাড়ি ভাড়ায় যায় চোদ্দ। হাতে থাকে একচল্লিশ। ভাগ্যিস কোর্টের কাগজ দেখতে শিখেছিলাম—তাই দুটো পয়সা আসে।

আমি তো বলেইছি—তুমি ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে সেরেস্তা খুলে কোর্টের কাগজই দ্যাখো। তাতে ঠিক চলে যাবে আমাদের।

যদি টাকা না আসে রত্না ?

আসবে আসবে। আমি বলছি আসবে।

আমার মোক্তারির সার্টিফিকেটও নেই। আমি সেরেস্তা খুলে বসতেই লোকে কেন আসবে !

এখন যে আসে ?

আসে—কারণ, আমি সেসন জজ ডবসন সাহেবের ফার্স্ট পেশকার। তাই—একটু থেমে পড়লেন অনন্ত ঘোষাল। শেষে বললেন, ভেবেছিলাম—যত তাড়াতাড়ি পারি টুনু পানু তনুদেব বড় করে পাশটাস করিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলব। কিন্তু বা বোধহয় পারলাম না। ওদের আর মানুষ করা হবে না আমার। পানু ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশের ছেলে। সে কাঁকড়া ধরে বেড়াচ্ছে। গাছে উঠে ডাব পাড়ছে। তার তো রুটিন করে সারাদিন পড়া দরকার।

হেসে ফেললেন রত্না। তুমি কি ওদের টেনে বড় করবে নাকি ! এ হাসিতে যোগ দিলেন না অনন্ত। বললেন, আমরা চাকরি থাকতে থাকতে খোকন আর গৌরের তো পড়াশুনোই শেষ হবে না। চাকরি আছে আর বারোটা বছর। গৌর সবে হাঁটতে শিখেছে। তার ওপর আমায যে কোনও সময় যশোর কোর্টে বদলিও করে দিতে পারে। অত চিন্তা করছ কেন তুমি ! তোমার চাকরির ভেতরেই টুনু তো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সে তার ভাইদের দেখবে। তারপর পানু আছে। সে-ও তোমার রিটায়ারের আগে আগে কাজে ঢুকে যাবে দেখ।

চাকরি পাওয়া—কাজে ঢুকে যাওয়া অত সহজ নয় রত্না। এখন লিগের সঙ্গে হক-সাহেবের কোয়ালিশন সরকার চাকরির কোটা বেঁধে দিয়েছে। খুব ভাল ছেলেরাও থই পাচ্ছে না। ভেবেছিলাম চাকরির দিকে না তাকিয়ে টুনু, পানু, আবদুল হাকিম সাহেবের মতো জ্ঞানী, গুণী উকিল হয়ে উঠবে। স্বাধীনভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবে। আমি তা অন্য কোনও দিকে তাকাইনি রত্না। শশী পেশকার, উপেন পেশকার ওরা জায়গা কিনেছে। বাড়ি করবে। আমি যে ক'টা পয়সা পাই, তাই দিয়ে ওদের খাওয়াই। পড়াই।কি খেলে ওদের ভাল স্বাস্থ্য হবে সে জন্যে দেখেশুনে বাজার করি।

ঠিক এই সময় খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরা তনু—আগাগোড়া ভিজে—অন্ধকারের

ভেতর তিরবেগে ছুটে এসে বলল, মা—খালোইটা দাও। খালোই—

অনন্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে তনু। শেষে জ্বর বাঁধাবি ভিজে ভিজে। এই সেদিনও পালা জ্বরে বিছানায় পড়ে ছিলি।

তনু যে বেগে ঢুকেছিল—তার চেয়েও বেশি স্পিডে রান্নাঘর থেকে মাছের খালোই নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। সবটা ঘটে গেল কয়েক পলকে।

রত্না চেঁচিয়ে জানতে চাইলেন, কোথায় যাচ্ছিস ?

যেতে যেতে অন্ধকার বৃষ্টির ভেতর তনু চেঁচিয়ে বলে গেল, বড়দা মেজদা কই মাছ ধরছে—

অনন্ত ঘোষালের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, শেষে টুনুও—

হুঁ। তাতে কি হয়েছে ? কলেজ থেকে ফেরার পথে পানুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সাহেবের জলার পাশে ক'দিনই কই ভাসছে।

এখন তো উস কই। ভীষণ ছোট।

আনুক না ধরে। হালকা ঝোল করে দেব। তুমি অত চিন্তা কোরো না। টুনু পানু ঠিকই মানুষ হবে। বড় হবে। আর ওদের শরীর স্বাস্থ্য—বলতে নেই মা হয়ে—খারাপ তো নয়। দিব্যি লম্বা হয়েছে দুজনই।

হঠাৎ অনন্ত ঘোষাল বছরের প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে বছরের প্রথম কইয়ের সবুজ সবুজ পিঠ যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন। রত্না কাঁচা লঙ্কা আর হলুদ দিয়ে এই উস কইয়ের একটা ঝোল রাঁধে—একদম মারভেলাস ! একটু জিরেবাটা দেয় বোধহয়। গরম ভাত ভেঙে তাতে—

অনন্তদা। ও অনন্তদা—বাড়ি আছো নাকি ?

উস কইয়ের স্বপ্ন খান খান হয়ে ভেঙে গেল। আজ সকাল সকাল কোর্ট থেকে ফিরে কাগজ নিয়ে বসেছিলেন অনন্ত। রাহাজানি কেসের কাগজপত্র দেখে গলে বেরোবার ফাঁকফোকর খুঁজে বের করে দিলে নগদ সাত সাড়ে সাত টাকা এসে যেত কাল কোর্টে গেলেই।

কি রে ফ্যাকাশি ?

মাথায় ভিজে কাপড়ের ঘোমটা টেনে ভিজে পায়ে একদম ভেতর বারান্দায় হাজির। বিয়ে থা হয়নি। লম্বাটে চেহারা। গলা তুলে কথা বলে।

রত্না কোনও কথা না বলে এসে দাঁড়াল।

হ্যাঁ অনন্তদা, তোমার শেষের তিন ছেলেই তো আমার হাতে হল।

অনন্ত ঘোষাল আমতা আমতা করে বললেন, তোর হাত তো ভাল ফ্যাকাশি। পড়াশুনো করে পাশ করা থাকলে তুই লেডি ডাক্তার হতিস।

এ কথায় গেল না ফ্যাকাশি। তার সারা গা ভিজে। সে বেশ আদুরি গলায় জানতে চাইল, তা শেষের খোকাটির কী নাম রাখলে অনন্তদা ?

রত্না খুবই বিরক্ত হলেন। হোক না দাই। মেয়েমানুষ তো। ভিজে কাপড়ে গেরস্থ বাড়ির একদম ভেতর-বারান্দায ঢুকে পড়ে এই কি ছেলের নাম জানবার সময ?

অবাকও হলেন রত্না যখন দেখলেন তাঁর স্বামী ফ্যাকাশির এই অদ্ভুত—অসময়ের আদুরিপনায ধমকধামক না দিয়ে বরং আরও যেন কুঁকড়ে যাচ্ছেন।

বত্না তেতে উঠছিলেন ঘরের ভেতর থেতে টলতে টলতে গৌর বেরিযে এল। একদম খালি গা। নীচে কিছু নেই। রত্না তাকে খপ করে কোলে তুলে নিয়ে আঁচল দিয়ে যতটা পারেন ঢাকলেন।

ওমা ! হাঁটাতেও শিখে গেল। কী নাম রাখলে ?

অনন্ত ঘোষাল যেন কোনও মতে বলতে পারলেন, গৌর—ঠিক শোনা গেল না।

ফ্যাকাশি জানতে চাইল, কী বললে ?

গম্ভীর গলায রত্না বললেন, গৌবাঙ্গ—

উহুঁ। হল না। আমি বলি কি ওব নাম রাখো—পাঁচসিকে !

কিচ্ছু বুঝতে পারছেন না রত্না।তিনি চেঁচিযে উঠলেন, তোর দেওযা ওই কুচ্ছিত নাম রাখতে যাব কেন রে ?

রাখবে বৌদিদি। রাখবে। —বলতে বলতে ফ্যাকাশি দাই তার মাথার ঘোমটা কোমরে জড়িযে নিযে চেঁচিযে উঠল। পেট থেকে পড়ে ছেলে হাঁটতে শিখে গেল। দাই খালাসির আটটা টাকা আধুলি ,সিকি দিযে শুধে শুধে তোমার স্বামী এখনও পাঁচসিকে ফেলে বেখেছেন যে—

রত্না একবার তাব স্বামীর মুখে কটকট করে তাকালেন। অনন্ত ঘোষাল কালি তোলা হেরিকেনটার দিকে মুখ করে দাঁড়িযে।

কোল থেকে গৌরকে নামিযে দাঁড করিয়ে দিলেন রত্না। তারপব আঁচলের গিট খুলে একটা কাঁচা টাকা ঝনাৎ করে মাদুরের ওপব ফেলে দিলেন। এই নাও। কাল সকালে টুনু গিয়ে সিকিটা দিযে আসবে।—বলতে বলতে ফের গৌরকে কোলে তুলে সামনের ঘরে ঢুকে গেলেন।

অনন্ত ঘোযাল তখনও মন দিযে হেরিকেনটা দেখছেন।

আলো নেই

নিশুতি রাতে শ্রীশনগরের আকাশ সারা খুলনা শহরের সঙ্গে নীলচে হয়ে এল। এই সময়টায় আকাশ দেখার কেউ নেই। কোম্পানির আমলে বসানো যশোর রোডের গুলমোহর, শিরিষ, রেনট্রি গাছের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ডালপালার ভেতর যে যার বাসায় ঘাড় গুঁজে পাখিরা ঘুমোচ্ছে।

অনন্ত ঘোষাল তাঁর বাসাবাড়ির পুকুরের দিককার বড় ঘরখানায় অঘোর ঘুমে। জোড়া তক্তাপোশের একদিকে তিনি ডানকাতে শুয়ে। তারপর তনু। তনুর পর খোকা। শেষে গৌরকে জড়িয়ে রত্নাও ঘুমের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে একদম অসাড়ে পড়ে আছেন। পাশের ঘরে টুনুর হাত মশারির বাইরে। তার ওপর রক্ত খেতে বসে মশারাও ঘুমিয়ে পড়েছে। পানুর নাক ডাকছে। এই সময়টায় সারা পৃথিবীতে যারা ঘুমোয় না তারা গাছপালার আড়ালে থাকে। টেবিল চেয়ারের খাঁজে লুকিয়ে থাকে। ঘুনপোকা। আরশোলা। ঝিঁঝি। টিকটিকি। সাপ। নতুন বর্ষার জেগে ওঠা ব্যাঙের দল। তারা যে যার কাজ করে চলেছে। ভাড়ায় দেওয়া বাসাবাড়িগুলোর পেছনে ধীরেনবাবুর বাগানে বছরের প্রথম বর্ষার জল পেয়ে নারকেল গাছ, সুপারি গাছ, আতা গাছের শেকড় মনের আনন্দে মাটি থেকে জল, প্রাণ শুষে নিচ্ছে।

এ সবের ভেতর শুধু ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বি এ, বি এল-এর ঘুম আসছে না। তিনি ঘুমোতে পারছেন না। যতবার চোখ বোজেন ততবারই তাঁর চোখের সামনে রূপসার ওপারে কর্ণপুরে জমিজায়গার টানা মাঠটি ভেসে ওঠে।

বাবা যে কোথায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে জমিজায়গা করে গেছেন তার ঠিক নেই। একদিকে তো এই শ্রীশনগর। ধীরেন্দ্রনাথ শুয়ে শুয়েই তাঁর বাবা শ্রীশচন্দ্রের জমিজায়গার একটা ছবি পাওয়ার চেষ্টা করেন মনে মনে। বেনেখামার, মাঝবেড়ে, কর্ণপুর, ভৈরবের ওপারে বেলফুলিয়ায়। ধীরেন্দ্রনাথ নিজে উকিল। তিনি সবই বুঝতে পারেন। আমার বাবা শ্রীশচন্দ্র

দাবাখাবা মানুষ ছিলেন। আমার ছ-সাত বছর বয়সে তিনি গত হন। মা-ই আমাকে লেগে থেকে পড়াশুনো করেছিলেন। নয়তো আমার বয়ে যাওয়ারই কথা ছিল। সোনার ভরি এখন একুশ টাকা। বাবা তাই সোনাদানায় টাকা রাখেননি। জমিতে রেখেছেন। বাড়ি ঘরদোর বানিয়ে একটা নগর বসিয়ে রেখে গেছেন। মাস গেলে ভাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সোনার গয়না তো ভাড়ার টাকা দেয় না। টাকা দেয় ভাড়াটেরা । ধান দেয় ভাড়াটেরা। ধান দেয় ভাগচাষিরা। চাল দেয় ভানকিরা।

ঘুমোওনি ?

অ্যাঁ !ওঃ ! অলকা—না। ঘুম আসছে না। আসলে অলকা তুমি যশোরের মেয়ে। যশোরের মানুষ নরম-সরম ভদ্র হয় আমাদের চেয়ে। সব ব্যাপারেই মধ্যম। কথা মিষ্টি। রান্নায় তেল-ঝাল কম।

ছিঃ ! ও সব কথা বলছ কেন ?

খুলনা তো সমুদ্রের লোনা জল ঘেরা জায়গা। তাই তো প্রায় একশো বছর আগে যশোর জেলার গা থেকে কেটে নিয়ে আলাদা জেলা খুলনার জন্ম।

মাঝরাত্তিরে এ সব ইতিহাস ভূগোল রাখো তো। কর্ণপুর থেকে ফিরলেই গম্ভীর হয়ে—কী ব্যাপার ?

ধীরেন্দ্রনাথ কিছু বললেন না। শ্রীশনগরের বাড়িগুলোর গা ঘেঁষে বাগান, জঙ্গল, খোলা মাঠ—আবার ঘরবাড়ি। জঙ্গলে কোন না জানা পাখি ঘুমের ভেতর জেগে উঠে ক্যাঁ করে ডেকে উঠল। মানুর না ঘুম ভেঙে যায়, একবার তাই দেখল অলকা।

জমি জায়গা আর রাখা যাবে না অলকা—

কেন ? তোমরা তো আর জোর করে কারও জমি কেড়ে নাওনি।

কোনও 'কেন' নেই। কোনও যুক্তি নেই। গত ভোটের আগে থেকেই হক সাহেবের কৃষক প্রজাপার্টি চাষিদের খেপাচ্ছে। প্রজাস্বত্ব বিল। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকসাহেব আইনসভায় আনতে চাইছেন।

তাই ?

প্রজারা নেচে উঠেছে ভোটের আগে থেকেই। বলা হচ্ছে—যে যে-জমি চাষ করে ভাগে—সে জমিতে তার ভাগ-চাষের অধিকার জমিদার কেড়ে নিয়ে অন্য কাউকে ইচ্ছেমতো ভাগে চাষ করতে দিতে পারবে না।

সে তো ভাল কথা। হকসাহেব তো অন্যায় কিছু বলেননি।

নিশুতি রাতে ধীরেন্দ্রনাথ বিছানায় উঠে বসলেন। ঘরের ভেতর সব সময় জ্বেলে রাখা খুব কম পাওয়ারের নীল ডুমটা মানুর জন্যে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসে যাতে পালঙ্ক থেকে পড়ে না যায়। অন্ধকার দেখে ভয় না পায়। সেই আলোয় অলকা তার স্বামীব শরীরটা আবছা মতো দেখতে পাচ্ছে। '

তুমিও এ কথা'বললে অলকা ? তুমিও ?

অন্যায়টা কোথায় তা বুঝে উঠতে পারছে না অলকা।

তোমাদের মতো লোকেরাই হকসাহেবের হাত শক্ত করছ। আরেক জুটেছেন নরেশ সেনগুপ্ত! উপন্যাস লেখেন। আবার ওকালতিও করেন। তিনি তো হকসাহেবের প্রজাকল্যাণের ম্যানিফেস্টো মুসাবিদা করে ওকালতি বুদ্ধি নিয়ে সাতকাহন করে লিখেছেন। প্রজাপার্টি তা হাটেবাজারে—গাঁয়ে গাঁয়ে ভোটের মুখে মুখে বিলিও করেছে। যত্ত ছোটলোক সব নেচে উঠেছে। হকসাহেবের পার্টির পেছনে ফাইনানসিযাব কে জানো?

অলকা এত সবের কিছুই জানে না। সে বোঝে হযে চোখ খুলে আবছা আলোয তার স্বামীর মুখখানি খুঁজছে।

অন্য কেউ নন—ইনসিওরেন্সের নলিনীরঞ্জন সরকার! হকসাহেবেব কোযালিশনে অর্থমন্ত্রী।

হকসাহেবেব জন্যে কি আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে কোনও?

ক্ষতি? ক্ষতি বলে ক্ষতি। চাষ করার অধিকার থেকে যদি ভাগচাষিকে হটাতে না পারি তো সে জমি বরবাদ অলকা। এমনিতেই চাষিরা সব কুঁড়ের হদ্দ। ঠিক মতো চাষ করে না। যাও বা সামান্য ধান হয—তার ভাগ ঠিক মতো দেয না। টিকে আছি শুধু একটা কারণে। বাবা জমিদারির পর জমিদারি কিনে—করে রেখে গেছেন। কযেক শো বিঘে জমি বলে মোট ধানটা চোখে দেখা যায়। নয়তো কী হত বলতো?

ঠিক কী হত তা বলতে পারবে না অলকা। যশোরের সিভিল কোর্টের উকিলের মেয়ে সে। তার বাবা উকিল আবার জমিদারও এমন ছেলে দেখেই ধীরেন্দ্রনাথকে জামাই করেছেন। কিসের থেকে কী হয় তা কোনও দিনই জানে না অলকা। সে অন্ধকারে বিছানায চিত হযে শুযে ভ্যাবলা মতো তাকিযে আছে। বাপেব বাড়িতে সচ্ছল সংসারে এসব নিযে তাকে কোনও দিন ভাবতে হযনি।

একবার এ আইন পাশ করিয়ে ফেলেন যদি হক সাহেব—তা হলে টাকার দরকারেও জমি তো বেচাও যাবে না অলকা। কেউ কিনবে না। অথচ দরকারে তো এতদিন জমি বেচে এসেছি আমরা।

এত জমি জাযগা কি শ্বশুরমশাই কিনে রেখে গেছেন?

আঃ! তুমিও যেমন! তোমাকে বোঝানোই কঠিন।—বলতে বলতে ধীরেন্দ্রনাথের খেযাল হল তিনি আবার কঠিন হয়ে উঠছেন। অলকার শরীরটার একটা আন্দাজ পাওযা যাচ্ছে। আবছা রেখার মতো। বাকিটুকু অন্ধকার। কর্নোওয়ালিশের নাম শুনেছ?

শুনেছি বোধহয। ক্লাস টেনের ইতিহাস বইতে ছিল মনে হচ্ছে। লর্ড কর্নোওযালিশ। নাও শুযে পড়। অ্যাতো রাতে আর এ সব কথা কেন? ঘুম পাচ্ছে—

ধীরেন্দ্রনাথ ঘুমতে পারছেন না। বাবা হঠাৎ চলে যাওযায সাত আট বছর বযস থেকেই তিনি জমিদারের মতোই বড় হয়েছেন। যদিও বকলমে মা-ই সব চালিযে এসেছেন অ্যাতকাল। বড়টি হযে ধীরেন্দ্রনাথ শক্ত হতে লাগামটি ধরেছেন। ততদিনে তিনি কলকাতা

ফেরত বি এ বি এল। যশোরের সিভিল কোর্টের পসারওয়ালা উকিলের জামাই। কিন্তু গত পাঁচ সাত বছরে সব কেমন যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। সাধারণ চাষিবাসিদের লিডাররা সবাই খেপিয়ে মাথায় তুলে দিয়েছেন। কারণটা কী তা জানেন ধীরেন্দ্রনাথ। ভোট! ভোট! ভোটের রাজনীতি। ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি। কী বা ক্ষমতা। নামেই ক্ষমতা! আসল সব ক্ষমতা ব্রিটিশ গভরনরের হাতে। সেজন্যে কোপটা পড়েছে আমাদের ওপর। তাই মনে হচ্ছে ধীরেন্দ্রনাথের। যতক্ষণ তিনি জেগে থাকেন—ততক্ষণ এই চিন্তাটা তাঁর মন জুড়ে থাকে। পুরনো ব্যথার মতো। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েও তিনি গোড়াতেই এসব ভাবনায় চলে আসেন। ভাবেন—তা হলে কী একটানে আমাদের সব চলে যাবে? সবকিছু? একেবারে রাস্তার ভিখিরি হয়ে যাব?

তা হলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর কথাও শুনেছ নিশ্চয়? মনে পড়েছে নিশ্চয়?

হয়তো শুনে থাকব। পড়েও থাকতে পারি।

নিজের স্ত্রীর গলায় এই অনিচ্ছার কথা শুনে বেশ আহত হলেন ধীরেন্দ্রনাথ। তিনি বুঝতে পারছেন না—তার স্বামীর এই মরণবাঁচন ব্যাপারে অলকার আগ্রহ এত কম কেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ে গেল—অলকা তো জমিদারির পরিবার থেকে আসেনি। আমার শ্বশুরমশায়ের পয়সা ওকালতির পসার থেকে। সব বুঝেও বুকের ভেতরে কষ্ট হল ধীরেন্দ্রনাথের। তিনি এখন সবটা বলতে না পারলে তাঁর বুকের ভেতরের কষ্টটা বাড়তেই থাকবে। মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে উঠবে। তিনি বুঝতে পারছেন অলকার শরীরে আর সাড় নেই। সে এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তবু যেন অলকাকেই বলছেন—এ ভাবে ধীরেন্দ্রনাথ নিজেকে শুনিয়ে চললেন—থেমে থেমে—বিড়বিড় করে—আবার কখনও বা বেশ স্পষ্ট করে।

বন্দোবস্তটা চিরস্থায়ী হয়েই চলে আসছিল আজ প্রায় দেড়শো বছর। আমরা জমিদাররা নদী বাঁধ বেঁধেছি একসময়। দেশের যাতে ভাল হয়—তেমন তেমন দায়িত্ব সরকার আমাদের ওপর দিয়েছেন। আমরা করেওছি সে সব কাজ। কিন্তু গত ক বছরে আমাদের সে সব কাজ মিথ্যে হয়ে গেল একেবারে! নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গল্প উপন্যাস লিখছিলেন—ঠিক ছিল। ওকালতি করছিলেন—ঠিক ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দায়িত্ব নাকি আমরা এই দেড়শো বছর ঠিকমতো পালন করিনি বলছেন। হকসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির ম্যানিফেস্টোতে এ সব কথা তিনি তুলেছেন। আর মাঠে মাঠে হকসাহেব আর তাঁর পার্টির আবুল মনসুর আহমদ এ সব বলে বেড়াচ্ছেন গত দু-তিন বছর ধরে। প্রজারা এখন মাথায় উঠে বসেছে।

অলকার নাক এখন ডাকছে। ঠিক বুঝতে পারলেন না ধীরেন্দ্রনাথ। তিনি নিজেকেই বলতে থাকলেন, ভরসা এখন মুসলিম লীগ। ভরসা এখন কংগ্রেস। বাঙলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকসাহেবের কোয়ালিশন সরকারের লিগের মন্ত্রী সোহরাওয়র্দি সাহেব—নাজিমুদ্দিন-সাহেবরা প্রজাস্বত্ব আইনটাইন চান না। অপোজিশনের কংগ্রেসও মনেপ্রাণে এ সব চায় না।

ামার মতো জমিদাররাই তো কংগ্রেসের ব্যাকবোন।

অলকা ঘুমের ভেতর থেকেই বলে উঠল, তুমি তো খুলনা জেলা ভূস্বামী সমিতির ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। তোমরা কিছু করতে পার না ?

রীতিমত খুশি হয়ে ধীরেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, ওরে দুষ্টু ! ঘুমোওনি তা হলে ? মটকা মেরে পড়েছিলে ! আমাদের সমিতির কথা আর বোলো না অলকা। সবাই যে যার জায়গা মি বাঁচানোর জন্যে এক এক পার্টিতে ঢুকে পড়েছে।

কীরকম ?

আমার মতো হিন্দু জমিদাররা বেশিরভাগই কংগ্রেসে। কেউ কেউ হিন্দু মহাসভায়। কসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টিতে আমাদের মতো অনেকে ঢুকেছে। যদি হকসাহেবের াতার নীচে গিয়ে নিজের জায়গা জমি বাঁচানো যায়। মুসলমান জমিদাররা মুসলিম লিগে। লগ তো এ সব কোনওদিন চায়নি বলেই এতদিন হকসাহেবের সঙ্গে হাত মেলায়নি। শেষে কায়ালিশন সরকার করতে গিয়ে শুধু মুখে সায় দিয়েছে। একবার আইন হয়ে গেলে কি ভাবে জায়গা জমি বাঁচানো যায় ? তাই যায় নাকি কখনো ! সব উটপাখি অলকা—সব টপাখি। মাঝখান থেকে জেলা ভূস্বামী সমিতির ফোঁপরা দশা ! আমাদের মেমোরেন্ডাম াঠালে গভর্নরসাহেব এখন পড়েও দেখেন না।

খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই। অলকার ঘুম কেটে গেছে। সে আস্তে আস্তে শান্ত লায় জানতে চাইল, এত জায়গা আমার দাদাশ্বশুরের ছিল ? তিনি জমিদার ছিলেন ?

না না। তিনি ভৈরবের ওপারে বেলফুলিয়ায় যজমানি করতেন শুনেছি। আমরা তো দীর ওপারের লোক।

তা হলে আমার শ্বশুরমশায় অ্যাত জমি কিনেছেন ? কী করতেন ?

বাবা ডানপিটে ছিলেন। পড়াশুনো করেননি। কিছু জায়গা-জমির ব্যবসা করে কনেছেন। কিছু দখল করেছেন গায়ের জোরে। শেষে নিলাম থেকে কর্ণপুরের জমিদারি কেনেন। একটা কথা বলব অলকা ?

অলকা উঠে বসল বিছানায়। মাথার কাঠের জানলায় ভোর এসে পড়ার আভাস। স একটু অবাক হয়েই বলল, বল।

আমার বাবা ঈশ্বর শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর যৌবনে সম্ভবত ডাকাতিও করতেন।

এ কথা তোমায় কে বলল ? মা ?

না। আমি শুনেছি। নায়েবমশায় আভাসে ইঙ্গিতে বলেছেন। আমার খুব ছোটবেলায় াবার যে চেহারা আমার চোখে ভাসে—তা হল—তিনি ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন। গালে াঁচাপাকা দাড়ি। মাথাভর্তি রুক্ষ চুল। আমার বয়স তখন তিন চার বছর। বাবার তো াভাবিক মৃত্যু হয়নি।

তাই ?

বাবা খুন হয়েছিলেন রূপসার বুকে। কর্ণপুর যাচ্ছিলেন বোটে করে।

অলকা কোনও কথা বলতে পারল না। খানিক চুপচাপ।

শেষে ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, তোমার বাবা তো সিভিল কোর্টে ওকালতি করেন। তাঁ
জিজ্ঞাসা কোরো। জমিজমা কী করে হয়—কী করে বাড়ে—কী করে দখলে রাখতে হয়

ভোর হওয়ার মুখে মুখে ফিকে মতো স্বপ্নগুলো আসে দুগ্‌গা দাসীর। এমনিতেই তার পাত
ঘুম। কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা ঘুম তা আলাদা করে উঠতে পারে না দুগ্‌গা। কারণ,
মানে অন্ধকার। জেগে থাকাও তার কাছে অন্ধকার। কেননা কালা ফোতোর মা অনেক
হল অন্ধ। শুধু স্বপ্নের সময়টায় দুগ্‌গা দাসী আলো দেখতে পায়। স্বপ্নে কেউ আর অন্ধ থা
না। অন্ধও স্বপ্নে মানুষজন, নদীনালা, গরুবাছুর, গাছপালা সবই দেখতে পায়।

এই দুগ্‌গা ? কোথায় গেলি ?

কে ? যেন চেনা লাগে—

বাইরে এসে দ্যাখ না—

ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না দুর্গার। সে সজনে গাছতলায় মাটির ঘরের ছই থেকে বাই
উঠোনে এসে পড়েই তো অবাক। ওমা ! এ যে আমাগো শিরীশবাবু। কোথায় ছি
এতদিন ?

আমি তো কোথাও যাইনি দুগ্‌গা।—বলতে বলতে ঘোড়া থেকে নামলেন শ্রীশচন্দ্র
নেমে বললেন, বসতি জায়গা দিবি তো। না দাঁড়ায়ে থাকবো ?

দুর্গা ছুটে গিয়ে ঢেঁকিঘর থেকে ধান কুটতে বসার মুদগলটা টানতে টানতে নিয়ে এ
নাও। এটায় বসোদিকি। ভাল করি দেখি তোমার মুখখানা। দাড়ি রাখিছো কেন ? এ
সোন্দর মুখি দাড়ি মানায় শিরীশবাবু !

ঘোড়ার পিঠে বনে-বাদাড়ে রাত-বিরেতে ঘুরতি হয় দুগ্‌গা। কখন দাড়ি কামাবো
কত জায়গায় জমিজমা। ত্যাড়াব্যাকা লোকেরে পিটোয়ে সিধে করতি হয়। নাহলি
জমিজমা রাখা যায় !

জমিজমা ছাড়ান দ্যাও তো এখন। আর কী হবে ? কী কাজে লাগবে ?

হো হো করে উঠল শ্রীশচন্দ্র। দুপুরবেলার হেলেপড়া রোদ্দুরে সজনে গাছের ছায়া
পুকুরে গিয়ে পড়েছে। সে দিকে তাকিয়ে শ্রীশচন্দ্র বলল, যমজদুটো ছেলে—কালা আ
ফোতো—মেয়ে ফ্যাকাশির জন্যি ভবিষ্যতির কথা ভাবি সব করে কম্মে যাচ্ছি দুগ্‌গা। প
দেখবি সব লাইগে যাবেনে—

তাও তো আমারে এখনো বে করতি সময় পাওনি !

হবে। হবে। সময় হলি দেখবি সব হয়ে যাবেনে। কিছু আটকাবে না। দে দু
চালভাজা খাই। লবণ আর তেলে মাখি দুটো কাচালঙ্কাও দিস দুগ্‌গা—

চালভাজা আনতে ছুটে গিয়ে দুগ্‌গা দাঁড়িয়ে পড়ল। তোমার ঘোড়ারে আগে বাে
বাধো বলতিছি শিরীশবাবু। পাড়ায়ে মাইরে ফেলবে দেখতিছি—

ওরে নারে। এ ঘোড়া তেমন নারে দুগ্‌গা। বড় বাধুনা আমার—

তবু বলতিছি বাধো আগে—

শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য হাসতে হাসতে ঘোড়াকে টেনে সজনে গাছের গুঁড়িতে লাগাম পাক দিয়ে বাঁধল। তারপর একটা হাঁক দিল, কালা ফোতো কোথায় গেলি ?

ওরা বাইনে খামারের মাঠে বিলির মাছ ধরতি গেল ভাত খাইয়ে। ঘরের ভেতর মাটির কালো মাইটের ভেতর থেকে চালভাজা বের করতে করতে বলল দুগ্‌গা। এ হল গিয়ে বাপের খোঁজ নেওয়া ! কতকাল আসো না বল তো শিরীশবাবু ?

আসতি সময় পালাম কোথায় দুগ্‌গা ? নিজির নামে নগর বসাবো। তার ভিতরি রাস্তা থাকবে। রাস্তায় গায়ে দু ধারে অনেকগুলো বাড়ি বানাবো।

সর্ষের তেল লবণ দিয়ে একথালা চালভাজা মাখতে মাখতে গোলপাতার ঘরের ভেতর থেকে দুগ্‌গা দাসী জানতে চাইল, তার একটাতি থাকতি দেবে ? এই মাটির ঘরে ঠাণ্ডা লাগে শীতির সময়।

দূর বোকা ! তুই ওসব একতলা বাড়িতি থাকবি কেন ? ওসব বাড়িতি তো ভাড়া বসাবো। মাস গেলি টাকা আসবে। তুই থাকবি শ্রীশনগরের সবচেয়ে উঁচু তেতলা বাড়িতি। তোর নিজির তেতলা বাড়িতি।

দুটো কাঁচালঙ্কা উঠোনের গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে থালায় বসিয়ে দিয়ে দুগ্‌গা দাসী বলল, এই নাও শিরীশবাবু। সত্যি সত্যি তোমার নামে নগর বসাচ্ছ ?

দু গাল চালভাজা মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে শ্রীশচন্দ্র বলল, তা না তো কি ? তুই ভাবিস কি আমারে দুগ্‌গা ? শ্রীশনগর হবে। সারি সারি বাড়ি হবে। খুলনা আদালতে, থানায়, স্টিমারঘাটায় যেসব ভদ্দরলোক বাইরে থেকে চাকরি করতি আসেন—তারা থাকার জায়গা পান না। তাদের আমি শ্রীশনগরে বাড়িভাড়া দেব। সব ভদ্দরলোক। তোর আমার মতো না।

তুমিও শিরীশবাবু একজন ভদ্দরলোক হয়ে উঠতিছো !

যাঃ ! আমি আবার করে ভদ্দরলোক হলাম ?

তুমি যখন আমার কাছে প্রথম আসিছিলে তখন ছিলে খালি পা। এখন দেখতিছি জুতো পায়ে না দিলি চলতি ফিরতি পারো না।

সে তো কাজের জন্যি। কত জায়গায় যাতি হয় আমার। তুই বুঝবি কি তার দুগ্‌গা ? নে—এবার আমার মাইয়েডারে নিয়ে আয়। একবার দ্যাখবো। কোলে নেব।

ফ্যাকাশি ? ফ্যাকাশির কথা বলতিছো। সে তো এখানে নেই।

কোথায় রাইখে দে আলি তারে ?

আমাব বুকি এট্টু দুধ নেই। রূপসার ওপারে আমাগে বাড়িতি আমার ছোট বুনির কাছে রাইখে আলাম তারে। আমি ছেলে দুটো নিয়ে পারিনে। আমার বুন ফ্যাকাশিরে বড় করে তবে দিয়ে যাবে।

মারবো এক ঘা। নিজির মাইয়েরে নিজির সুখির জন্যি পরের কাছে রাইখে আলি
আমি চললাম—বলতে বলতে শ্রীশচন্দ্র চালভাজাসুদ্ধ থালাখানা উঠোনে আছড়ে ফেলল
চালভাজা ছড়িয়ে পড়তে আশপাশের আশফল, আমড়া, সজনে গাছ থেকে শালিক, কাকে
দল নেমে এল।

দুগ্‌গা ছুটে গিয়ে শ্রীশচন্দ্রের হাত ধরল—তুমি আমাগে গেরামে যাতি পারবা না
ওহানে ডাকাতি করতি তো ধরা পড়তি পড়তি বাইচে গ্যাছো।

তাই তো দুগ্‌গা তোরে পালাম। তোগে বাড়িতি পালায়ে ছেলাম তিনদিন। বাঁশে
মাচার নিচি। তুই পেরথম আমারে দেখতি পাইয়ে চেঁচায়ে উঠেছিলি। আমি তো মুখ চাই
ধরলাম।

শ্রীশচন্দ্রের আর ঘোড়ায় ওঠা হল না। দুগ্‌গা তার হাত ধরে আছে। সে তা
শিরীশবাবুর হাত চেপে ধরে বলল, রূপসার ওপার থে আমারে তুলে আইনে এই ঘর বাই
রাখলে শেষে। আর ডাকাতি করা কেন ?

ফের বসে পড়ল শ্রীশচন্দ্র। হেই হেই বলে চালভাজা খুঁটে খাওযা কাক শালিকদে
সে তাড়াতে লাগল। তারপর এক সময় বলে উঠল, শহর খুলনা চারিদিকে বাড়তিছে। রা
হতিছে নতুন নতুন। কোর্ট-কাছারি, থানা, ইস্টিশন, স্টিমারঘাটা, দু দুটো তাজা নদী
ধারে। কিছুরই অভাব নেই এখানে। এখানেই আমি নগর বসাবো। নাম হবে তা
শ্রীশনগর।

এট্টা কথা বলব ?

এট্টা কেন দশটা বল দুগ্‌গা। কোন আক্কেলে তুই নিজির দুধের মাইয়েডারে রূপসা
ওপারে বুনির কাছে রাইখে আলি ?

আমার বুন কাচা বিয়োনি। এট্টা ছল হয়ে মারা গেছে। বুকভর্তি দুধ তার। ফ্যাকা
খাইযে বাচবে। আমার কথা হল একটা। তুমি বলে খুন হয়ে মইরে গ্যাছো শিরীশবাবু

হেসে উঠল শ্রীশচন্দ্র। দুর বোকা ! শিরীশচন্দ্রর অত সহজে মরার পাত্তর না। হ্যা
বুকি গুলি লাগছিল।

তাহলি ?

মড়া ভাইবে রূপসায় ভাসায়ে দেছিল। ভাসতি ভাসতি রূপসা'দে সিপসায়। সিপ
দে সমুদ্দুরে গে পড়লাম। মরে পচে ঢোল হয়ে যাতাম। কিন্তু বাইচে গেলাম—

সত্যি ? কিন্তু লোকে যে বলে তুমি মইরে গ্যাছো।

দুর দুগ্‌গা। আমি কি মরতে পারি ? ছেলে দুটো ছোট। মাইযেডা এখনো হাট
শেখলো না।

সত্যি তুমি মরনি ?

না তো বললাম।

তবে ? আমার যেন মনে হয় শিরীশবাবু তুমি কত বছর আসো না।

আলো নেই

যাঃ ! এই অঘ্রাণের পূর্ণিমের দিন তো আলাম।

এই অঘ্রাণ ? এই পূর্ণিমে ? তাহলি লোকে বলে কেন—তুমি আর নেই শিরীশবাবু ? মাটির ঘরে গুড়ের লোভে, চালভাজার লোভে, মুড়ির লোভে ইঁদুরেব দল যেখানে সেখানে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে। সেই সব রাস্তা দিয়ে ডেঁয়ো পিঁপড়েরা সবসময় যাতায়াত করছে। ওদের যাতায়াতের কোনও দিনরাত নেই। তাদেরই একজন দুগ্‌গা দাসীর ডানপায়ের নীচে পড়ে থেঁতলে যাচ্ছিল। সে দুগ্‌গা দাসীর পায়ে মরণ কামড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুগ্‌গা ঘোর অন্ধকারের সমুদ্রে পড়ে গেল। এতক্ষণ সে সবই দেখতে পাচ্ছিল। এখন জেগে গিয়ে সব অন্ধকার।

গোলপাতায় ছাওয়া মাটির বারান্দার একধার কাঁথাকানি টাঙিয়ে রাতের ঠাণ্ডা ঠেকানোর চেষ্টা। আর তিন ধারে মাটির দেওয়াল। সারা তল্লাটা শুনশান। দুগ্‌গা দাসী কান পেতে শুনল কী যেন। না। কোনও ঝিঁঝিঁর ডাক নেই। তা হলে এখন ভোর হচ্ছে। খুব সাবধানে হাত এগিয়ে দিল। নরম কি ঠেকছে। ছেলের কাল বিকেলে বেড়ে দেওয়া ভাত। সবটা খেতে পারে নি দুগ্‌গা। বেশ কিছুকাল সে একসঙ্গে সবটা খেতে পারে না। রেখে রেখে খায়। বুঝতে পারল কালা ফোতোর এখনও ঘুম ভাঙেনি। একটু পরে দু ভাই বীরেনবাবুর ঘোড়াকে দানাপানি দিতে যাবে। ডলাইমলাই করবে। ফ্যাকাশিও ঘুমে।

নিজে নিজেই নিজেকে বলল দুগ্‌গা দাসী—অ্যাতখোন্ কী পৃথিবীতেই ছেলাম ! আর এ কোথায় আসি পড়লাম ভগবান— খুলনার আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিটা যা হল তা তো বেশিদুর জুড়ে হয়নি। মেঘেরা রূপসার ওপর দিয়ে উড়ে এসে শহর খুলনার মধ্যমপাড়া, কয়লাঘাট, ডাকবাংলোর মোড় ভিজিয়ে দিয়ে শ্রীশনগর, বেনেখামারের আকাশ দিয়ে খালিশপুর অব্দি পৌঁছে ফুরিয়ে গেল। তারপর কলকাতা অব্দি একশো দু মাইল রেললাইনের দুধারের মাঠঘাট বলতে গেলে একদম খটখটে। এখানে সেখানে রেললাইনের পাশে ধানখেতের মাথায় একটা দুটো মেঘ। এই যশোরে। এই বনগাঁয়।

খাস কলকাতায় এখন খাঁ খাঁ দুপুর। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো এমনিতেই সারাদিন শুনশান দশা। শোনা যাচ্ছে এখান থেকে ওয়ালফোর্ড কোম্পানি ধর্মতলা অব্দি বাস চালাবে। মাস দুই। যদি তেমন প্যাসেঞ্জার হয় তো রুট চালু থাকবে। নয়তো ওরা বাস তুলে নেবে। কে আর লোকসান দিয়ে রুট চালু রাখে এ বাজারে !

ট্রাম ডিপো থেকে আরও দক্ষিণে মিনিট দশেক হাঁটলে মেয়েদের একটা নতুন স্কুল হয়েছে। ডান হাতে একতলা বাড়ি। এ দিকে কোনও স্কুল নেই মেয়েদের। আশপাশের সবাই জানে—স্কুলটি হয়েছে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের দেওয়া জমিতে। তাঁরই টাকায়। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ ভারতের বড়লাটের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার। সারা দেশ জুড়ে এ নাম সবাই জানে। কেউ কেউ এও জানেন—তিনি কলেজ জীবনের বাংলার এখনকার প্রধানমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজজুল হকের ক্লাসফ্রেন্ড ছিলেন প্রেসিডেন্সিতে । ভোটের সময় কুঁদঘাটে মিটিং করতে এসে এ কথা বলেছিলেন হকসাহেব।

আলো নেই

স্কুলটির পাশেই উঁচু দেওয়াল ঘেরা বিরাট জায়গা। বাইরে থেকে দেখা যা দেওয়ালের ওপর দিয়ে বিশাল বিশাল গুদামঘরের মাথা। সেই মাথা ছাড়িয়েও একটি বলশালি ফলসা গাছ ডালপালা ছড়িয়ে চণ্ডী ঘোষ রোড, কুঁদঘাটের আদিগঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে। উঁচু দেওয়ালের গেটে দারোয়ান বসে। গেটের বাইরে উৎসুক মুখে সারাদিনই কিছু লোক দাঁড়িয়ে থাকে। কোনও হাম্বার বা ভক্সহল বা অন্য কোনও বিলিতি গাড়ি ঢুকলো বা বেরোলে—অবিশ্যি সব গাড়িই তো বিদেশি—বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন গাড়ির ভেতরে বসে থাকা কাউকে কাউকে দেখে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—ওই যে! ওই যে! কাননবালা! সায়গল! প্রমথেশ—ওই যে! ওই যে—চন্দ্রাবতী—

জায়গাটা স্যার নৃপেন্দ্রনাথের। তাঁর ছেলে বীরেন্দ্রনাথ সরকার। বিলেত থেকে ইঞ্জিনিযার হয়ে ফিরে এসে জাযগাটার চারদিকে দেওয়াল তুলে নিয়েছেন। ভেতর ঢুকলে দেখা যাবে--তিনি তিনটি অমন ঢাউস গুদামঘরও তৈরি করিয়েছেন। ঢুকেই বাঁ হাতে প্রথম গুদামঘর। পাশে ফুলবাগান। তার পরেই ঘাট বাঁধানো একটি পুকুর। আর একটু এগোলে বাকি দুটি গুদামঘর। পর পর। এই দেওয়াল ঘেরা জায়গাটার গেটে সাইনবোর্ডে লেখা আছে—নিউ থিয়েটার্স। এই নামটি বাঙালিরা সবাই তো জানেনই—বাংলার বাইরে রাওয়ালপিন্ডি থেকে তিনসুকিয়ার মানুষজনও সবাই জানেন। কারণ এখানে টকি নামে যা তোলা হয় তা শুধু বাংলায় হয় না— হিন্দিতেও তোলা হয়।

আজ নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর গুদামে--যাকে এখানে সবাই বলেন ফ্লোর—একটি দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। অবশ্যই কাঠের ওপর রং দিয়ে বানানো। যেন সত্যি সত্যি দোতলা বাড়ি। ফ্লোরে ছিমছাম চেহারার ট্রাউজারের ভেতর শার্ট গোঁজা ছিপছিপে এক পুরুষ দাঁড়িয়ে। তিনি মাঝে মাঝে কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে ক্যামেরার ভেতর দিয়ে অ্যাকটর অ্যাকট্রেসদের দেখে নিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে বলতে থাকলেন, লাইট!

অমনি ফ্লোরের ওপরদিকে কাঠের কার্নিশে দাঁড়িয়ে এক একজন লোক হাজার হাজার কিলো আলো জ্বেলে দিতে থাকল।

ছিপছিপে লোকটি বলতে থাকেন, ফেসলাইট—

অমনি ফ্লোরে দাঁড়ানো একজন মহিলার মুখে আলো পড়ল। আলো পড়ল একজন পুরুষের মুখে। তার মাথার চুল বেশ কম। এই দুটি মুখ সবার চেনা। দুজনেই খুব নাম করেছেন। একজন কাননবালা। অন্যজন কুন্দনলাল সায়গল। অভিনয়ে গানের গলায় দুজনই টকির দর্শকদের গত ক বছরে মাতিয়ে তুলেছেন।

সায়গল বলে উঠলেন, মিস্টার বোস। বড্ড গরম লাগছে—ফ্লোরে দাঁড়িয়ে সবাই টের পাচ্ছেন—কতটা গরম। তিনটি স্ট্যান্ডিং পাখা আলোর বাইরে দাঁড়িয়ে ঘুরে চলেছে। অনেকেই ঘেমে কাই। কাননবালাও বললেন, লাইট রেডি হতে হতে আমিও একবার পাখার কাছে যাই নীতিনবাবু?

নিশ্চয়। তোমার চুলটা ঠিক করে নাও কানন—

নীতিন বোস নামে এই ছিপছিপে মানুষটির সব দিকে নজর। তার কর্তালিই বুঝিয়ে দিচ্ছে তিনিই এই ছবির ডিরেক্টর। আলোগুলো সব নিভিয়ে দিতে অন্ধকার মতো। একটি মেয়ে এসে দাঁড়ানো পাখার বাইরে চিরুনি, হাতআয়না নিয়ে দাঁড়াল। কাননবালা এগিয়ে এলে তাঁর মাথার চুল ঠিকঠাক করে দেবে। আর-একটা পাখার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সায়গল পাঞ্জাবির বোতাম খুলে দিলেন।

নীতিন বোস চেঁচিয়ে বললেন, লাইটস—

সঙ্গে সঙ্গে ফের ওপর থেকে আলো জ্বলে উঠতে লাগল।

ব্যাক লাইট—

দুটো নতুন আলো জ্বলে উঠল।

নীতিন বসু পর পর বলে চললেন, ফেস লাইট। ফিলার—

কানন আর সায়গল যে যার জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। নীতিন বসু বলতে লাগলেন, সায়গল সাহেব। আপনি কবি অনন্ত রায়। কানন তুমি সতী চ্যাটার্জি। তোমাদের বাড়িতে এক তলায় কবি অনন্ত রায় ভাড়া থাকেন। আজ রাতে সতীদের বাড়িতে খাওয়ার কথা ছিল কবি অনন্ত রায়ের। অনেক রাতে কবি বাড়ি ফিরলেন। সতী অভিমানের সুরে দেরির জন্য অনুযোগ করল। ডায়ালগ পড়ে শোনাতে হবে?

সায়গল, কানন একইসঙ্গে বলে উঠলেন, না—না—

গুড। ফিলার লাইট—ফিলার লাইট।

নতুন আরও একটা আলো জ্বলে উঠল।

সাউন্ড—স্টার্ট। সাইলেন্স—

ফ্লোরে টুঁ শব্দটি নেই।

কাননবালা: আজ না আমার ওখানে নেমন্তন্ন ছিল। রাত কটা হয়েছে খেয়াল আছে? চলুন খেতে চলুন।

সায়গল: আজ উৎসবে যে-গানটা তুমি গাইলে এটা কার লেখা?

কাননবালা: কেন? আপনার।

সায়গল: কে তাতে সুর দিয়েছিল?

কাননবালা: কেন? আপনি।

সায়গল: কে তোমাকে শিখিয়েছিল?

কাননবালা: কেন? আপনি।

সায়গল: আর তার জন্যে আমি কী পেলাম? অনাদর, অবহেলা। সবাই মিলে তোমারই গলার জয়মালা পরিয়ে দিলে।

কাননবালা: কিন্তু কবি আমি যদি সত্যি জয়লাভ করে থাকি, সে তো আপনারই জয়।

কাট!—বলে চেঁচিয়ে উঠলেন নীতিন বোস। একটা একটা করে আলো নিভতে লাগল। কাঠের তৈরি দোতলা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে খানিক নেমে এসে কাননবালা এতক্ষণ

ডায়ালগ বলছিলেন। ড্রেসার এসে কাননের শাড়ির পাড় সিজিল মিছিল করে দিতে লাগলেন।

সায়গলের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। তিনি সিধে গিয়ে পাখার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। ওদের সবার মাথায় ওপর লম্বা মতো একটি লোহার ছিপের ডগায় মাইক ঝুলছে।

. পরের কাজের জন্য গোছগাছ চলছে।ট্রলির ওপর ফরাসি সুপার পারভো ক্যামেরা। তার ভেতর দিয়ে নীতিন বোস এতক্ষণ লুক থ্রু করেছিলেন। তিনি ট্রলি থেকে নেমে এলে কাননবালা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

নীতিন বসু বললেন, খুব ভাল হয়েছে। আমরা লাকি—পুরো শটটার কোথাও এন জি হল না। মেকআপমান দাঁড়িয়ে সায়গলের চোখের নীচে ছোট তুলি বোলাতে বোলাতে চাপা গলায় বলল, সায়গল সাহেব শরীরের যত্ন নেবেন তো। আপনার কাছে আমরা এখনও অনেক কিছু পাওয়ার আশা রাখি।

বোঝাই যায় সিনেমার এ সব মানুষ কুন্দনলাল সায়গলের খুব ঘনিষ্ঠ। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, চিন্তা করবেন না মদনবাবু। রোজ সকালে একটা করে করলা কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছি।

তা তো খাচ্ছেন। কিন্তু ওটা কি কমিয়েছেন ?

কোথায় আর পারলুম ! না খেলে যে আমি ঠিক মতো গাইতে পারি না।

ওটা আপনার ভুল ধারণা। নিন্ চোখ বুজুন। ভ্রূ তুলুন।

মুখ তুলে ধরলেন সেই দশায় । না না । ভুল ধারণা নয় মদনবাবু। না খেলে আমার গলায় জোয়ারি আসেই না।

নীতিন বসু দেখলেন, কাননবালা দাঁড়িয়ে আছেন।

কিছু বলবে কানন ?

নাঃ !

নীতিন বসু গলায় ঝোলানো একটা ছোট্ট বাক্সমতো জিনিস ডান হাতে চোখের কাছে নিয়ে তার ভেতর দিয়ে আলোর মাপ, মাত্রা বুঝে নিতে চাইলেন। দেখে ফের লক্ষ্য করলেন,তখনও কাননবালা দাঁড়িয়ে।—কিছু বলবে মনে হচ্ছে কানন ?

এবারও কাননবালা বললেন, নাঃ !

কিছুক্ষণের ভেতর সাজো সাজো রব পড়ে গেল। এবার কানন সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে এলেন। কবি অনন্ত রায় হিসেবে কে এল সায়গল একতলায় ঘরের মাঝমাঝি দাঁড়িয়ে।

লাইটস ! ব্রজ, 'কি' লাইটটা দাও। সাউন্ড—

ক্যামেরার সামনে থেকে ফ্লোরবয় ক্ল্যাপস্টিক সরিয়ে নিল। বেশি রাতের বাঙালি 'বাড়ি। ব্যাকগ্রাউন্ড লাইটে পাশের বাড়ির আভাস।

নীতিন বোস চেঁচিয়ে উঠলেন। সাইলেন্স। স্ট্যার্ট—

সায়গল বলতে লাগলেন, নাম, যশ, খ্যাতি অর্থ, প্রতিপত্তি—একদিন আমি সবই চেয়েছিলাম। পেয়েওছি। কিন্তু তা না পেয়েও বেঁচে ছিলাম। কিন্তু আজ যা চাই তা যদি না, পাই, বাঁচব না।

কানন: কী চান আপনি ?

সায়গল: তোমাকে—

কানন: এ কী বলছেন আপনি। আমার স্বামী না আপনার বন্ধু ?

সায়গল: বন্ধুর জন্য আমি দুঃখিত। সে তোমাকে পেয়েও পেল না।

নীতিন বোস গলা তুলছেন। কাট্। ঠিক যা চেয়েছিলেন।

ওয়ান্ডারফুল ! সায়গল সাহেব !

সায়গল মাথা নিচু করে সামান্য হাসলেন। পাতলা ঠোঁটে। চোখ নামিয়ে। তারপর চাপা গলায় জানতে চাইলেন, আজ তোমার কী হয়েছে বল তো ?

কোথায় ? কিছু না তো।

মন খারাপ হয়েছে। চল তোমায় গান শোনাবো। আরেকটু পরেই তো লাঞ্চ।

না। আজ আর আমার গান শোনা হবে না আপনার।

একটু অবাকই হলেন সায়গল। সুটিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে একটু কোণের দিকে বসে প্রায়ই তিনি চোখ বুজে আপন মনে মাঝে মাঝে গান করে থাকেন। তখন আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে স্টুডিওর ফ্লোরের সবাই একে একে তাঁর কাছে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েন। চুপ করে সায়গলের গান তাঁরা শুনতে থাকেন। এই সব মানুষের ভেতর চোখ খুলেই যার মুখ প্রায়ই সায়গলের চোখে পড়েছে—সে হল কানন। বড় বড় চোখে সুন্দর মুখে তাকিয়ে থাকে কানন। সেই কানন তার গান শুনতে চাইছে না ? আশ্চর্য !

হঠাৎ ডিরেক্টর নীতিন বোস বললেন, আজ এখানেই প্যাক আপ।

কাননবালা জানতে চাইলেন, আজ আর সুটিং হবে না ?

না। ধর্মতলায় সরকার সাহেব নিউ সিনেমায় তাঁর অফিসঘরে আমাদের সবাইকে ডেকেছেন। বেলা তিনটেয় মিটিং।

এই সবাই যে কারা কারা তা জানেন কাননবালা। নীতিন বোস, প্রমথেশ বড়ুয়া, অমর মল্লিক, মিস্টার রায়—আরও কে কে। লাঞ্চ আসতে শুরু করেছে। বেলা নটা থেকে মোটমাট তিনটে টেক হয়েছে। আরও দুটো টেক অতি সহজেই হতে পারত। একটা কথা ভেবে কাননের মন খারাপ হয়ে গেল। নিউ থিয়েটার্সে কী ভীষণ সময়ের অপচয়। টাকার শ্রাদ্ধ। এ কথা যদি এখানে কাউকে বলা যায় তো সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে এমন একটা ভাব দেখাবে—যা দেখে মনে হবে এটাই নিউ থিয়েটার্সের স্টাইল। তা না হলে আর নিউ থিয়েটার্স কি ! আবার অন্য একটা কারণে তাঁর মনটা আনন্দে ভরে গেল। ঠিক এই সময়ে স্টুডিও থেকে বেরোতে পারলে একজন মানুষকে ধরা যাবে। তাঁকে কাননের ধরতেই হবে। এই সময়টাতেই তিনি

মুড়ে থাকেন। সাযগল, কাননবালা, নীতিন বোসের লাঞ্চ ফিরপো থেকে আসে।

ফ্লোরের বাইরে ফুলবাগানের ভেতর আঁশফল গাছটার ছায়ায় টেবিল পাতা হয়েছে। সাযগল ডাকলেন, এসো কানন—

ওখানে বসে অনেকদিন লাঞ্চ সেরেছেন কানন। পাশেই পুকুর। এই পুকুরেই বিদ্যাপতি ছবির সুটিং হযেছিল। কানন সেজেছিলেন অনুরাধা।

না। আজ খাবো না—বলতে বলতে কানন তার ব্যাগটায় টুকিটাকি জিনিস ভরে নিচ্ছিলেন।

নীতিন বসুও ডাকলেন, কী হল কানন ? এসো।

আজ খাবো না। খিদে পায়নি। সকালে বেরোবার সময় বেশি করে খাইযে দিয়েছিলেন।

কুন্দনলাল সাযগল এগিযে এলেন। তিনি কিছু অবাক। আজ তোমার এত তাড়া কিসের কানন ? কোথায় যাবে বল তো ?

একজনের কাছে যেতে হবে আমাকে। এখনই। এই সময়েই তিনি মৌজে থাকেন।

কে সেই ভাগ্যবান ? তাঁকে চিনি আমি ?

বাঙলাদেশসুদ্ধ লোক তাঁকে চেনে। আঙুরবালা, ধীরেন দাস, কমলা ঝরিয়া, মৃণালকান্তি, ইন্দুবালা—সবাই—সবাই—তাঁর কাছে লাইন দিযে রয়েছে। যদি একটা গান পাওযা যায।

কে বল তো কানন ?

কমল দাশগুপ্ত তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িযে আছেন। এই সময়টায় তিনি রিহার্সেলরুমে থাকেন।

ওঃ ! আপার চিৎপুর রোডে বিষ্ণুভবনের কথা বলছো বুঝি।

গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল রুম। হ্যাঁ এখন কাজিদাকে ওখানে পাবে। তিনি নিশ্চয এখন হারমোনিযম বাজাচ্ছেন ফিরে ফিরে—আর সেই সুরে কথা বসাচ্ছেন। একটা একটা করে। সামনে একথালা পান—

যাই।—বলতে বলতে কাননবালা বাজারে নতুন ওঠা স্ট্র্যাপ বাঁধা 'কাননবালা লেডিজ চপ্পল' পাযে গলিযে নিলেন। দু বছর আগে রিলিজ হযেই হিট ছবি মানময়ী গার্লস্ স্কুলে কানন এরকম স্লিপার পায়ে দিয়েছিলেন। যেতে যেতে তার মনে পড়ল—বিদ্যাপতি ছবিতে অনুরাধা চরিত্রটি ছিলই না। সবটাই কাজি নজরুল ইসলামের কল্পনা। এই রোলেই আমার ভারত জোড়া নাম হয়।

চলি—যদি একটা গান পাই। ভাল গান—বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে ফিরে দাঁড়িযে কানন সায়গলকে হাত নাড়লেন। গাড়ি ছেড়ে দিল। কুন্দনলাল সায়গল একদম চুপ হযে গেছেন। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল, 'কেয়াবৎ !'

লালবাজারকে বাঁয়ে ফেলে জোড়াসাঁকোর দিকে যেতে আপার চিৎপুর রোডের ওপর

বিষ্ণুভবন। বাড়ির নম্বর ১৬০। উত্তরে আরেকটু এগোলেই বাঁযে নতুন বাজার। ডাইনে বিষ্ণুভবন মানে একটি তেতলা বাড়ি। ট্রামলাইনের ওপর একতলার ঘরগুলোয লুঙ্গি, কলিদার পাঞ্জাবি, চিকনের কাজ করা টুপি, পায়ের নাগরা—কি নয় ?—এমনকি হুঁকো, গড়গড়ার সব দোকান। দোকানিরা যে যার জিনিসের নমুনা টাঙিয়ে রেখেছে। এদের সব দোকানের সাইনবোর্ডের ভিড়ে সিমেন্টে বাংলা হরফে লেখা বিষ্ণুভবন কথাটি কোথায় হারিয়ে গেছে।

গাড়ি থেকে নেমেই কাননবালা প্রায় ছুটে একটা গড়গড়ার দোকানের পাশ দিয়ে বিষ্ণু ভবনের ভেতরে ঢুকে গেলেন। রাস্তায় দাঁড়ালেই যেখানে সেখানে দেখতে দেখতে ভিড় হয়ে যায়। বিশেষ করে বিদ্যাপতি ছবির হিন্দি ভারসন সারা ইন্ডিয়ায রিলিজ হওয়ার পর সেই থেকেই এই দশা। 'অঙ্গনে আওব জব রসিয়া' গানটি তো লোকের মুখে মুখে।

বিষ্ণুভবনের সামনের দিকটায় দোকানপাট। ভেতরে ঢুকেই উঠোন। কাননবালাকে দেখে দশরথ টুল থেকে উঠে দাঁড়াল।

আছেন ?

অল্পবয়সী ছেলে দশরথ। এখানে গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডের গান রিহার্সেল দিতে এসে কানন ওকে দেখেন প্রথম। সেই মানময়ী গার্লর্স স্কুল ছবির গান যখন খুব পপুলার হয়ে উঠল—তখন—সে তো দু বছর আগের কথা—লোকের মুখে মুখে কাননের গান ফিরছে তখন। সে সেজেছিল নীহারিকা।

দশরথ মাথা কাত করল। তার মানে আছেন। কাননের বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই ভগবতীবাবু। একদম মুখোমুখি। ভগবতী ভট্টাচার্য। বছর যাটেব হবেন। রিহার্সেলের ইনচার্জ।

কাননকে দেখেই বললেন, আসুন। আসুন। আসতে আজ্ঞা হোক। মানুষটি হুগলির। কথায় কথায় সেবারে জেনেছিলেন কানন, গাঁয়ের নামও বলেছিলেন ভগবতীবাবু। এখন ঠিক মনে পড়ছে না কাননের। ভগবতীবাবু রোজ মানকুন্ডু স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে ঠিক বেলা দশটায় চলে আসেন। তাই তো বলেছিলেন। তারপর একে একে আসেন গীতিকার শৈলেন রায়। সুবোধ পুরকাযস্থ। আরও কেউ কেউ। সুরকার কমল দাশগুপ্ত আসেন বিকেল চারটে নাগাদ। আসেন কমলা ঝরিযা। মৃণালকান্তি। আঙুরবালা।

কাননবালা মাথা নামিয়ে একটু হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন বলল, এখন কি আমার এতটা মাথা নামাবার কোনও দরকার আছে ? মানময়ী গার্লস স্কুল সুপারহিট। ডবল ভারসনের বিদ্যাপতিও সুপারহিট। বিশেষ করে অনুরাধার রোলে সারা ভারতবর্ষ আমায এখন একডাকে চেনে। তারপর তো বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে মুক্তি। রিলিজ হতেই কী কলকাতা—কী মফস্বল—সব জায়গার হল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ছবিটা।

ডানদিকের ঘরে মল্লিকমশায় শ্যামাসঙ্গীতের রিহার্সেল দিচ্ছেন। বরং ও ঘরে যান। ও ঘরে পাবেন ওঁকে।

আলো নেই

মল্লিকমশায় মানে কে মল্লিক। শ্যামাসঙ্গীতে মাতিয়ে রেখেছেন বাঙালিকে। কাননবালা ওঁর গলায় ডি এল রায়ের 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' শুনেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের গলাতেও একই গান শুনেছেন। দু'জনেরটাই ভাল লাগে কাননের।

দরজা ঠেলে ঢুকতেই কাননের চোখের সামনে পুরো ছবিটা একসঙ্গে চোখে এসে লাগল। পাঞ্জাবি গায়ে, একমাথা বাবরি চুল। আস্তে আস্তে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন নজরুল ইসলাম। বাজাতে বাজাতে গুন গুন করে সুর ভাঁজছেন। চোখ দুটি বুজে। ঘরের পেছন দিককার জানলা দিয়ে বিকেলের আকাশের আলো ঢুকে পড়েছে। একবার যেন চোখ দুটি খুললেন। এদিক ওদিক আনমনাভাবে তাকালেনও। কাননবালা বুঝতে পারলেন, এখন কাজিদার মন অন্য জগতে। চাউনি দেখেই সেটা বোঝা যায়।

হারমোনিযাম থামিয়ে নজরুল ইসলাম এবার কাননকে দেখলেন। বড় বড় চোখ। হারমোনিযামের পাশে এক থালায কযেকটি পান। আপনাআপনি খুলে গেছে সেগুলো। পাশের থালায কয়েকটি সন্দেশ।

কানন দেখলেন, চোখ দু'টি বড় উজ্জ্বল। যে মানুষটিব বুকের ভেতরটা চোখের ভেতর এসে তার সামনে মেলে দিল। কাননবালা গুটিযে গেলেন।

আরে ! কানন যে ! কী ভাল গেযেছো বিদ্যাপতিতে। করাচি—বম্বে—সব জায়গায তোমাব গলার গান লোকের মুখে মুখে ফিরছে কানন।

আমাব ভাগ্য। আপনার আশীর্বাদ।

না না। সবটাই তোমার নিজের গুণ কানন। এমন চেহারা তোমার—

কাননবালা এ কথায় আরও গুটিযে গেলেন।

এমন সুন্দর গলা তোমার—অনুরাধার গলায—

অনুরাধা চরিত্রটাই তো আপনার কল্পনা।

গেয়েছো কী সুন্দর। অঙ্গনে আওব জব রসিযা—

রাইচাঁদবাবু খুব রিহার্সেল দিয়েছিলেন।

রাইবাবুর সুর তো। হবে না কেন ? ভাল তো হবেই। সেই সঙ্গে অমন গলা তোমার কানন।

কাননবালা এবার সহজ হযে উঠলেন। তার জড়োসড়ো ভাবটি কেটে গেল। ঠিক এই সময় রিহার্সেল ইনচার্জ ভগবতীবাবু ঘরে ঢুকলেন। তাকে দেখে নজরুল চেঁচিযে উঠলেন—আরে। এই তো ভটচাযমশায। আমার তো খিদে পেযেইছে—মুখ দেখে মনে হচ্ছে কাননেরও খিদে পেয়েছে।—বলতে বলতে হা হা করে হেসে উঠলেন নজরুল। হঠাৎ থেমে গিয়ে নজরুল গম্ভীর মুখে বললেন, দাদা। এ বিষয়ে একটু তৎপর হোন।

নিশ্চয নিশ্চয় বলতে বলতে ভগবতীবাবু যেমন এসেছিলেন তেমনি বেরিয়ে গেলেন।

নজরুল আপনমনে হারমোনিয়ামের রিড চেপে চেপে নিজের হাতের আঙুল নিয়েই

যেন খেলছেন। খেলে চলেছেন। কানন বুঝতে পারছেন—সুর এসে গেছে। কিন্তু কথাগুলো এখনও এসে পৌঁছয়নি। হয়তো সকাল থেকেই কাজিদা এই করে চলেছেন। নিশ্চয়ই খাওয়া নাওয়া হয়নি। সুর এসে গেছে। জুৎসই কথা খুঁজে পাচ্ছেন না কাজিদা। হারমোনিয়ামের পাশেই খোলা খাতা। তার ওপর খোলা কলম। চোখ বুজে গুনগুন করছেন। কী ব্যাকুল। হারমোনিয়াম তোলপাড় করে কথা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

একথালা সন্দেশ। সঙ্গে বড় প্লেনে পান জর্দার স্তূপ। কোনও শব্দ না করে দশরথ সব কিছু হাতের সামনে নামিয়ে রাখল।

'খাও' বলে চার-পাঁচটা সন্দেশ কাননের হাতে তুলে দিলেন নজরুল। নিজেও নিলেন। একসঙ্গে দু'টি সন্দেশ। দু'টিই একই সঙ্গে মুখে পুরে দিলেন কাজিদা। হয়তো সারাদিন খাওয়াই হয়নি মানুষটির। হাতের কাছেই জলের গ্লাস ঢাকা দেওয়া। খানিকটা জল খেয়ে কাননের অবাক হয়ে চেয়ে থাকা দেখে বললেন, ডাগর চোখে দেখছ কি ? আমি হলাম ঘটক। তা জানো ?

কাননবালা কিছুই বুঝতে পারছেন না।

এক দেশে থাকে সুর। অন্য দেশে কথা। এই দুই দেশের বর-কনেকে এক করতে হবে। কিন্তু দুটির জাত আলাদা হলেই বে-বনতি। বুঝলে কিছু ?—বলতে বলতে মুখখানি হাসি হাসি করে কাননের চোখে তাকালেন নজরুল।

মাথা নেড়ে স্পষ্টই কানন বললেন, না। বুঝিনি।

পরে বুঝবে। নাও তো এই গানটা তুলে নাও—।

আমি ?—বেশ অবাক হলেন কাননবালা।

হ্যাঁ। তুমি। নয়তো সুরটা ভুলে যাব। কথাগুলো প্রায় লিখে ফেলেছি। তোমার গলায় তোলা থাক। তাহলে হারাবে না গানটা।—বলতে বলতে হারমোনিয়ামটা ঠেলে কাননবালার দিকে এগিয়ে দিলেন নজরুল।

আমি পারব না।

ভয়ের কি ? খুব পারবে। খুব সহজ সুর। কথাগুলোর দু-একটা হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে বদলাব।

দরজা ঠেলে যিনি ঢুকলেন—তিনি দেখতে বেশ। চোখে চশমা। ট্রাউজার ভেতর গুঁজে পরা শার্ট। মুখখানি খুব চেনা চেনা লাগছে। রীতিমত সুশ্রী।

কানন জানেন, তাকে দেখে কোনও পুরুষের পক্ষে চোখ সরিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া খুব কঠিন। তার ওপর তিনি নিজেই চোখ তুলে দরজায় দাঁড়ানো যুবকটির মুখে তাকিয়েছে। এরপর কি আর কোনও কথা থাকে।

নজরুল ইসলাম তাঁর নতুন গানে ঢুকে পড়ছিলেন। থেমে গিয়ে দু'জনের মুখেই তাকিয়ে বলে উঠলেন, তোমরা দু'জনে দু'জনকে চেনো নাকি ?

দরজায় দাঁড়ানো যুবকটি চোখ দিয়ে কাননকে দেখিয়ে বললেন, ওঁকে কে না চেনে !

সারা ইন্ডিয়া আজ কাননবালাকে জানে।

একথায় নজরুল একটু হেসে কাননের মুখে তাকালেন। তুমি ওকে চেনো নাকি কানন ?

কেমন চেনা চেনা লাগছিল— বলতে গিয়ে কানন গুটিসুটি মেরে গেলেন।

যুবকটি বলল, আমাকে এখন ওঁর চিনতে কষ্ট হবে কাজিদা। ওঁর মনে থাকার কথাও নয়—

মেঝেতে বসা কাননবালা, নজরুল ইসলাম—দু'জনই একসঙ্গে যুবকটির মুখে তাকিয়ে পড়লেন। অনেক আগে—তা সাত-আট বছর তো হবেই—উনি কৃষ্ণ সেজেছিলেন—

কানন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তাই বলুন ! গোড়াতেই আপনাকে আমার চেনা চেনা লাগছে। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষ্ণুমায়া ছবিতে আমি কৃষ্ণ সেজেছিলাম। আপনিও ছিলেন—

ও আব্বাস ? তুমি ছবিও করেছ ?—বলতে বলতে নজরুল হা হা করে হেসে উঠলেন।

কানন জানতে চাইলেন, যে আব্বাসউদ্দিন সুন্দর গাইছেন তিনিই কি আপনি ?

হ্যাঁ কানন। সে নয়তো আবার কে ? তুমি ছবিতে নেমেছো ? এ কথা তো কোনওদিন বলনি আব্বাসউদ্দিন।

বলার মতো নয় বলে বলি নি কাজিদা। বিষ্ণুমায়া ছবি হয়ে যাবার পর টাকা চেয়েছিলাম। সব শুনে জ্যোতিষবাবু বললেন, পরের ছবিতে কাজ দেব। টাকাও পাবে। হেঁটে হেঁটে দু'জোড়া জুতো ক্ষয়ে গেল। আর যাইনি।—বলতে বলতে আব্বাসউদ্দিন দুই পা ভাঁজ করে মেঝেতে পাতা শতরঞ্জিতে বসে পড়লেন। বেশ ঝকঝকে চেহারা। নিজেই তিনি বলে উঠলেন, থিয়েটার পাড়াতেও ঘোরাঘুরি করেছি কাজিদা—

থালায় তখনও চার-পাঁচটা সন্দেশ পড়ে। দুটি তুলে নজরুল তার হাতে দিয়ে বললেন, খাও। খেয়ে নাও—

আব্বাসউদ্দিন একটি সন্দেশ মুখে দিয়ে বললেন, নাট্য নিকেতনে গিয়ে শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে দেখা করলাম। শিশিরবাবু চোখ বুজে আমার গান শুনলেন। গান শেষ হলে চোখ খুলে বললেন, বেশ। ভাল গাও দেখছি। ড্রপ উঠলেই গাইতে হবে। পারবে তো ?

খুব পারব। ড্রপ উঠল। গাইলাম।

নজরুল জানতে চাইলেন, কোন গানটা গাইলে ?

আব্বাসউদ্দিন গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন—

আমার গহিন গাঙের নাইয়া...

সে-গানে সারা ঘর ভরে গেল। কানন চোখ বুজে ফেলেছেন। গান শেষ হতে নজরুল বললেন, এত তোমাদের কোচবিহারের তুফানগঞ্জের গান।

হ্যাঁ কাজিদা। বেনা বাজিয়ে গাইতে হয়।

কানন জানতে চাইলেন, বেনা ? সে কি যন্ত্র ?

আব্বাসউদ্দিন বললেন, অনেকটা বেহালার মতো। ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে তৈরি। একদিন প্লে-র শেষে গ্রিনরুমে গান গাইতে বললেন শিশিরবাবু। আমি রাজি হলাম। কিন্তু শর্ত দিলাম। আমার গানের সঙ্গে তবলা বাজানো চলবে না।

গাইলে ?

হ্যাঁ। গাইলাম। বলেই আব্বাসউদ্দিন গেয়ে উঠলেন। দরাজ গলা। জলের মতো। কোথাও কোনও বাধা মানে না। কাননের বড় ভাল লাগছে। এ যে গানের জগৎ—

'ওরে মাঝি তরী হেথা, বাঁধবো নাকো

আজকের সাঁঝে—'

গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে পড়লেন আব্বাসউদ্দিন। থেমে পড়তেই কানন এই সুদর্শন যুবকের মুখে একদম সরাসরি না তাকিয়ে পারলেন না। মনে মনে বললেন, এত নিষ্ঠুর কেউ হয় ? এত সুন্দর গান এভাবে কেউ থামিয়ে দেয় ?

কে যেন আমার গানের সঙ্গে তবলায় চাঁটি মেরে বসে আছে। লোভ সামলাতে পারেনি। বললাম, লাখ টাকা দিলেও আর গাইব না। শেষে শিশিরবাবু বললেন, নতুন বই নামাচ্ছি আব্বাস। সীতা। তোমায় বৈতালিকের পাট দেব। এখন থেকে তুমি আমার কঙ্কাবতীকে গান শেখাবে।

তা এ রকম গান শেখাচ্ছি কিছুদিন। কঙ্কাবতী সে সব গান গলায় তুলে নিচ্ছেন। এ রকম একদিন শেখাবার সময় শিশিরবাবু ঘরে ঢুকলেন। চোখ লাল। কেঁদে ফেলে শিশিরবাবু বললেন, ফাইনানসিয়ার বলেছে—রামায়ণের যুগে কোনও মুসলমান ছিল না। মুসলমান নেওয়া হবে না সীতা বইতে।

সারা ঘর এতক্ষণ আনন্দে ভাসছিল। আব্বাসের একথায় কাননবালা, নজরুল ইসলাম—খানিকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না। হারমোনিযামের ওপর নজরুলের বাঁ হাত। কিন্তু তিনি বেলো করতে পারছেন না। ডান হাতের আঙুল রিডে একই জায়গায় থেমে আছে। নজরুল আবাবাসউদ্দিনের মুখে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, কিছু বলবে ? আব্বাসউদ্দিন কিছু না বলে নজরুলের মুখে তাকিয়ে থাকলেন।

নজরুল এবার কাননবালার মুখে তাকালেন, আজ তুমি বাড়ি যাও কানন।

কাননবালা এতক্ষণ গানের ভেতর ভাসছিলেন। গানের কথার ভেতর—তাই নিয়ে আব্বাসউদ্দিনের গল্পের ভেতর তিনি ডুবে ছিলেন। একরকম বেখাপ্পা জায়গায় এসে সব কথা শেষ হয়ে গেল। কাননবালা উঠে দাঁড়িয়ে দু'জনকেই একসঙ্গে বললেন, আজ তবে আসি—

কাননবালা চলে যেতে নজরুল জানতে চাইলেন, এখন তো সেখানেই আছ আব্বাস ? না ফের ডেরা ডাণ্ডা তুলে অন্য কোথাও উঠেছো ? কোথায় আর যাব ! ১২২-এর বি, বৌবাজার স্ট্রিটের মেসের চারতলায় থাকি। খাওয়া থাকা মাসে দশ টাকা। মাসের শেষ রবিবার ওই টাকায় যা বাঁচে তাই দিয়ে ফিস্টি হয়। রাইটার্সে চাকরি করি। রেকর্ডিং

এক্সপার্ট টু দ্যা গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল। মাস গেলে মাইনে পাই পঞ্চাশ টাকা।

ও বাবা ! সে তো অনেক টাকা। তোমার বেঁচেও যায় অনেক। এত টাকা দিয়ে কী কর আব্বাস ?

এবার ভাবছি বাসা ভাড়া করে বউকে নিয়ে আসব কলকাতায়। একটা কথা বলছিলাম—

বল। তবে একটা শর্তে—

কি ?

এমন কোনও কথা বলবে না আব্বাস—যাতে মন একদম খারাপ হয়ে যায়।

না না। পুরনো দিনের কথা এসে গেল, তাই ওকথাটা বলে ফেলেছি। আমি বলছিলাম কি কাজিদা—মুসলমানরা তো আগের থেকে একটু মিউজিক মাইন্ডেড হয়েছে—

কী বলতে চাইছ ?

আপনি যদি ইসলামি গান লেখেন তাহলে মুসলমানের ঘরে ঘরে আবার উঠবে আপনার জয়গান।

নজরুল খানিকক্ষণ কোনও কথা বললেন না। তারপর মুখ তুলে আব্বাসের মুখে তাকালেন। বাইরে আকাশের কোথায় মেঘ ডাকল। নজরুল বললেন, আব্বাস। তুমি ভগবতীবাবুকে বলে তাঁর মত নাও। আমি ঠিক বলতে পারব না।

একথা বলেই নজরুল আবার হারমোনিয়াম তোলপাড় কবে কথা খুঁজতে শুরু করে দিলেন। কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। বলা ভাল সুর হারিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জমা করা কথাগুলোও। কোথায় যে গেল সব !

আব্বাসউদ্দিন গুটি গুটি উঠে ঘর থেকে বেরোলেন। সামনেই করিডর। করিডরের শেষে কে মল্লিক শ্যামাসঙ্গীতের রিহার্সেল দিচ্ছেন। নতুন রেকর্ড বেরোবে। এ-গানে তাঁব গলাটি যেন পেটেন্ট হয়ে গেছে। গান ভেসে আসছে দরজার ফাঁক দিয়ে। বেহালা তবলা—ফুল রিহার্সেল চলছে।

ও মা অন্তে-এ-এ যেন-ও ও চরণ পাই—

বাঁ দিকে রিহার্সেল ইনচার্জ ভগবতীবাবুর ঘর। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন আব্বাসউদ্দিন। ভগবতীবাবু নতুন রেকর্ডের বিজ্ঞাপনগুলো মন দিয়ে দেখছেন। দেখতে দেখতে মুখ তুলে চাইলেন। চশমার পেছনে ঘুমন্ত চোখ। কোনও কথা নেই মুখে। বহুদিন ধরে ভগবতী ভট্টাচার্য গানের এই ম্যানেজারি করে আসছেন। রোজ বেলা ন'টা দশে মানকুণ্ডু স্টেশন থেকে লোকাল ধরে হাওড়ায় এসে নামেন। তারপর পনটুন ব্রিজে গঙ্গা পেরিয়ে হ্যারিসন রোডে এসে ট্রাম। চিৎপুরে পড়েই ট্রাম থেকে নেমে বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে এসে এই বিষ্ণুভবন। তারপর সন্ধে অব্দি ওই চেয়ারখানিতে বসে গান, গায়ক, রেকর্ড, বিজ্ঞাপন নিয়ে নাড়াচাড়া।

আব্বাসউদ্দিন বললেন, ভগবতীবাবু ! জানলাটা আটকে দিই'। বৃষ্টির ছাট আসছে।

আসুক না। বছরের পয়লা বৃষ্টি। আসতে দিন।

একটু অবাক হলেন আব্বাসউদ্দিন। মুখে বললেন, আপনি আজকাল কবিতা ড়ছেন মনে হচ্ছে।

কেন ? কেন ?

বৃষ্টি দেখতে ভাল লাগছে আপনার ! বৃষ্টির ছাট আসতে দিচ্ছেন ঘরে !

সে তো আপনাদের সঙ্গে থেকে থেকে সঙ্গদোষে ! কী বলেন ? হা হা করে হেসে ঠলেন আব্বাসউদ্দিন। তরতাজা যুবক। বয়স এই বত্রিশ তেত্রিশ। কোচবিহারের কার ভাওয়াইয়া, চটকা গান গেয়ে কিছু নাম ডাক হয়েছে। রেকর্ড বেরিয়েছে যেকখানা। তা বিক্রিও হচ্ছে। নতুন বয়সের শরীর মন—দুই-ই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

বললেন, আপনি বেশ রসিক ভগবতীবাবু।

ভগবতী ভট্টাচার্য হাতের বিজ্ঞাপনটি টেবিলে রেখে চোখের চশমাটি হাতে তুলে লেন। ধীরে সুস্থে মুছে নিয়ে ফের নাকের ওপর চশমাটি বসালেন। কিছু বলবেন মনে চ্ছে ?

একটা বিজনেস আইডিয়া মাথায় এসেছিল।

আমি তো গান ছাড়া অন্য কোনও বিজনেসের কথা জানি না।

আহা ! অস্থির হচ্ছেন কেন ? আমি গানের বিজনেসের কথাই বলছিলাম।

ভগবতী ভট্টাচার্য চুপ করে তাকিয়ে রইলেন, আব্বাসউদ্দিনের মুখে। মল্লিকমশায়ের মাসঙ্গীতের রেকর্ড অনেকদিন ধরে করে আসছেন। চলছেও বাজারে। এবার—

ভগবতী ভট্টচার্য চুপ করে আব্বাসউদ্দিনের মুখে তাকিয়ে। —এবার ?

এবার ইসলামি গানের রেকর্ড বের করে দেখুন না। খুব চলবে দেখবেন।

ভগবতীবাবু যেন তেলে-বেগুনে চটে উঠলেন। দাঁড়িযে উঠে বললেন, না না। ওসব ন চলবে না। একদম বাজার নেই। কে কিনবে বলুন তো ? ও হতে পারে না।

আচ্ছা একটা এক্সপেরিমেন্টই করে দেখুন না। যদি বিক্রি না হয় তো আর বের রবেন না। ক্ষতি কি !

ভগবতীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আব্বাসউদ্দিন দেখলেন, ভদ্রলোকের মুখ কিছুটা চকে গেছে।

তিনি ঘর থেকে বেরোবার আগে তাকে বললেন, নেহাতই নাছোড়বান্দা আপনি। াচ্ছা আচ্ছা। করা যাবে। নিন। এখন পথ ছাড়ুন।

আব্বাসউদ্দিন সরে দাঁড়ালেন। তিনি জানেন, ভগবতীবাবুকে বারবার বাথরুমে তে হয়। বহুমূত্র রোগের কোপে পড়েছেন।

আব্বাসউদ্দিন সরে দাঁড়ালেন। তার নিজেকে খুব অপমানিত লাগল। মনে পড়ে ল—কয়েক বছর আগে শিশির ভাদুড়ির মতো মানুষ তার জন্যে কেঁদে ফেলেছিলেন। মাগণের আমলে মুসলমান ছিল না বলে সীতা নাটকের ফাইনানসিয়ার আব্বাসউদ্দিনকে

বৈতালিকের পার্টে নিতে রাজি হননি।

জানলার বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। বিকেলও প্রায় শেষ। বিষ্ণুভবনের বাইরে বেরো
এখন ভিড় আর আওয়াজে দলা পাকানো চিৎপুরের মুখোমুখি হতে হবে। নিজেকে বড় হতা
লাগছে আব্বাসউদ্দিনের। দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এসে কোণের ঘর থেকে কে
মল্লিকের বিহার্সেল শুনতে পেলেন তিনি। আরেকখানি গানের ফুল বিহার্সেল চলছে তার

'আর কবে দেখা দিবি-ই ই—'

শ্যামাসঙ্গীতের সেই পেটেন্ট টান। গাইছেন কে মল্লিক। ভক্ত হিন্দুরা বলে
মল্লিকমশায়। পুরো নাম কাশেম মল্লিক কিন্তু রেকর্ডে লেখা হয়—কে মল্লিক। শ্যামাসঙ্গীতে
রেকর্ডের বিজ্ঞাপনেও তাই লেখা থাকে। আব্বাসউদ্দিন বিষ্ণুভবন থেকে বেরি
পড়লেন।

খানিকবাদে বৃষ্টিভেজা আপার চিৎপুর রোডের ফুটপাত ধরে ধর্মতলার দিকে হাঁটতে
হাঁটতে আব্বাসউদ্দিন মেছুয়াবাজারের কাছাকাছি এসে পড়লেন। ফলপাট্টি। নোংর
চারদিক। তাও তো বাজারে এখনও ল্যাংড়া আসেনি। সন্ধেবেলার আলো জ্বলে উঠে
দোকানে দোকানে। দুর্গন্ধ। গরম। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ তার মনে পড়ল
প্রমথেশ বড়ুয়ার মুক্তি ছবিতে অ্যাতো ভাল অভিনয় করেছেন পঙ্কজ মল্লিক—অ্যাতো ভা
গান গেয়েছেন। তাঁকে তো আসল পুরো নাম লুকিয়ে পি মল্লিক লিখতে হয় না? অম
মল্লিক একজন ভাল অভিনেতা তিনিও তো তার নাম এ মল্লিক লেখেন না? আমি তো
সংস্কৃতে কাব্যরত্ন। পরীক্ষা দিয়ে উপাধিটি পাই। হিন্দুরা যারা আমার গান ভালবাসেন-
তারা তো বটেই—আরও হিন্দু যাতে আমার গান শোনেন—ওঁদের জন্যে আমি কি নিজে
নামের শেষে কাব্যরত্ন কথাটি লিখে দিতে বলব গ্রামোফোন কোম্পানিকে। রেকর্ডে
রেকর্ডের বিজ্ঞাপনে?

এখন ট্যাং ট্যাং করে বৌবাজার স্ট্রিটে সিঁড়ি ভেঙে মেসের চারতলায় উঠতে হবে
ভাবতেই আব্বাসউদ্দিনের মনটা কালো হয়ে গেল। মাস মাইনে পঞ্চাশ টাকা। এই টাকা
বাড়ি ভাড়া নিতে ভরসা হচ্ছিল না তাঁর। কিছুকাল হল বিয়ে করে বউকে কলকাতায় আ
হয়নি। তুফানগঞ্জের বাড়িতে পড়ে আছে। রেকর্ড থেকে কিছু পয়সা আসছে। বাড়ি
খুঁজতে শুরু করেছেন আব্বাসউদ্দিন মুসলমান পাড়া রোডে একখানা দেড় কামরার ছো
জায়গা—সব কিছু সেপারেট - একটুর জন্যে ফসকে গেল। ভাড়াটাও ছিল কম। আট টাকা

হাঁটতে হাঁটতে আব্বাসউদ্দিন লালবাজারের কাছাকাছি এসে গেলেন। এবার বাঁ
বেঁকলে বউবাজার স্ট্রিট। খানিক এগোলেই চারতলা মেসবাড়ি। বাঁ ফুটপাতে হারমোনিয়া
ডুগি তবলার পরপর দুটি দোকান পাশাপাশি। একটা কথা মনে পড়তে আব্বাসউদ্দিন ফিক
করে হেসে ফেললেন।

আদিগঙ্গার ওপর কাঠের পোল পেরিয়ে চেতলার সবজি বাগান লেন। সেখানে
গেরস্থপাড়ায় এক তলায় দু'কামরার বাড়ি সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। ভাড়াটা এক

া। মাসে বারো টাকা। বাড়িওয়ালা আব্বাসউদ্দিনেরই বয়সী হবেন। পাট কোম্পানিতে রি করেন। তাঁর বউটিরও বয়স বেশি না।

এক মাসের ভাড়া আগাম দিতে গিয়েছিলেন আব্বাসউদ্দিন। রসিদ লিখে নিয়ে তে চিঠি লিখবেন। বাড়ি পাওয়ার সুখবর দিয়ে। দোতলায় নিজের ঘরে বসিয়ে ওয়ালা চা খাওয়ালেন। ভেতর থেকে প্লেটে করে তার বউ দু'খানা বিস্কুটও পাঠালেন ার সঙ্গে। অনেক গল্পগুজবের পর রসিদ লেখার সময় বাড়িওয়ালা জানতে চাইলেন, নার নাম ?

তাঁর একটু গর্বই হয়েছিল। আব্বাসউদ্দিন ভেবেছিলেন, নাম বললেই বাড়িওয়ালা ক চিনতে পারবেন। গায়ক আব্বাসউদ্দিন। নাম বললেন আব্বাসউদ্দিন। বাড়িওয়ালা খ তুলে চাইলেন তার মুখে। তারপর বললেন, একটু বসুন। আমি একবার ভেতর থেকে াছি—

টাকাটা নিয়ে যান—বলে একখানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

ততক্ষণে ভদ্রলোক পাশের ঘরে। পর্দার ওপাশে। সেখান থেকে বাড়িওয়ালার য়ের মিষ্টি চাপা গলা ভেসে এল। স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন। —ওমা! ভদ্রলোক তো াতে ঠিক ভদ্রলোকের মতো। তা ভদ্রলোক মুসলমান ?
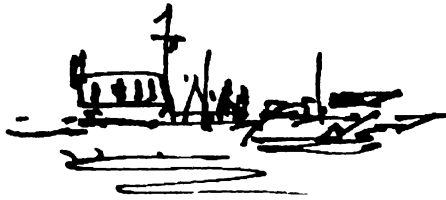
ম স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকে চললেন বিভূতিভূষণ। এখন প্রায় বিকেল টু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। শিয়ালদা থেকে ট্রেনটা ছেড়ে দত্তপুকুরের ইঞ্জিন িতে আজ অনেক সময় নিয়ে নিয়েছে। গতকাল খেলতাচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশনে য়ে বিকেলে প্যারাডাইস লজে ফেরার সময়েই বাড়ির জন্যে মনটা কেমন করে উঠল। তেই আর প্যারাডাইসের ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না তাঁর। এই জীবন যেন কেমন য়ে হয়ে উঠেছে। তবু খেলাতচন্দ্রে পড়াতে গিয়ে নতুন নতুন ছেলেদের কচি

মুখগুলো দেখে মনটা ভরে যায়। আরও ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে ছ
দেখতে দেখতে—লেখা পড়তে পড়তে তিনি পৃথিবীর কত দূর দূর দেশে চলে যান। তাহি
দ্বীপপুঞ্জের বেলাভূমিতে মহাসমুদ্রের রকমারি ঝিনুক এসে জমা হচ্ছে ঢেউয়ের সঙ্গে
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রাগৈতিহাসিক বনভূমির ভেতর একদিকে বেগুনি রঙের ফুল ফু
আছে। দেখার কেউ নেই। ফুটেই চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে। ওয়াইড ওয়া
ম্যাগাজিনের ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরায় সে ছবি ধরা পড়েছে। লন্ডনে হাউস অব কমন্সে
বাঁ দিকে ব্লক টাওয়ার। বিখ্যাত বিগবেন। ওখানে আমাদের ভারতবাসীদের জন্যে আই
তৈরি হয়। কোটি কোটি ভারতবাসীর ভাগ্য স্থির হয়ে আসছে সত্তর ফুট লম্বা ওই চেম্বারে
ওখানে পার্লামেন্ট বসে।

বিভূতিভূষণ কাল সন্ধেটা খাতা নিয়ে বসেছিলেন লিখবেন বলে। মৌচাে
ধারাবাহিক বের হচ্ছে তার চাঁদের পাহাড় উপন্যাস। কিন্তু লিখতে পারেননি। কখন বা
যাবেন। কখন গিয়ে ইছামতীর পাড়ে দাঁড়াবেন। এজন্যে তাঁর মনটা আকুলি বিকু
করছে। রাতে রিপন লজে গিয়ে আর খাওয়া হয়নি তাঁর। আজ স্কুলে গিয়েই ছুটি হয়ে গেল
খেলাতবাবুদের বাড়িতে কে মারা গিয়েছেন। কাল রবিবার। বনগাঁয় নেমে এখন শুনছে
রানাঘাট যাবার ট্রেন আজ লেটে ছাড়বে। বনগাঁ থেকে এই ট্রেনে উঠে গোপালনগরে নে
আরও প্রায় মাইল তিনেক হেঁটে তবে বাড়ি। চালকি আর বারাকপুর—গায়ে গায়ে দুখা
গ্রাম। বারাকপুর বিভূতিভূষণের বাড়ি।

বনগাঁর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে তাঁর ভাল লাগছে। নিজেব অজান্তেই তিনি বনগ্রা
ইস্কুলের কাছাকাছি চলে এলেন। ওই তো ক্লাশ টেনের পাশে হেডমাস্টারমশায়ের ঘর। প্রা
বত্রিশ বছর আগে এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। স্কুলের মাঠে লিচুগাছটির ঝাঁকড়া মাথা বর্ষা
জলে ভিজে কালচে সবুজ। আজ শনিবার। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এখানে দুজ
ক্লাশফ্রেন্ডের সঙ্গে আজও যোগাযোগ আছে। একজনের নাম তাঁরই নামে—বিভূতিভূষণ
তাঁকে তিনি মিতে বলে ডাকেন। মিতে এখন কলকাতায়। আরেকজনের ভাল নামটা ক
হারিয়ে গেছে। তাকে সবাই জেলি বলে ডাকে। কাছাকাছি বনগ্রাম ডাকঘর।

ডাকঘরের পেছন দিকে জেলিদের বাড়ি। একবার গেলে হয়।

বিভূতিভূষণ মতিবাজারের পাশে দিয়ে ডাকঘরে চলে এলেন। একটি একতল
বাড়ির সামনের দিককার দুখানি ঘর নিয়ে ডাকঘর। এখন দরজা বন্ধ। দরজার কপাটে
ম্যালেরিয়ার মশা তাড়াবার জন্যে কী কী করতে হবে তার পোস্টার আঁটা। বর্ষার জলে
ছাটে পোস্টাবটি কপাটের কাঠের ওপর ফুলে উঠেছে। বিভূতিভূষণ পাশের সরু রাস্তা দিয়ে
পিছনের বাড়িতে গেলেন। উঠোনে একটি বেলগাছ। ছাদ থেকে জল নিকাশের মাটি
পাইপটা মাঝখান থেকে ভেঙে গেছে। সেখানে বিকেলের রোদ পড়ে পোড়ামাটির পাই
গনগনে লাল দেখাচ্ছে।

জেলি আছো? জেলি?

ছিটকিনি খুলে একটি বছর বারো তেরোর ছেলে বেরিয়ে এল। পরনে ইজের। গায়ে কানও জামা নেই। চোখে চশমা। হাতে পেন্সিল। বোঝাই যায় দোর আটকে পড়াশুনো রছিল।

বাবা তো নেই।

কোথায় গেছে ?

জেলে।

চমকে গেলেন বিভূতিভূষণ। কি করেছে জেলি ?

ওই যে কী যেন— সিকিউরিটি আইনে। মা ভাল জানে। বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। খন দমদম জেলে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণের মনে পড়ল। জেলি তো স্কুলের পর থেকেই কংগ্রেস করে। াপনি ?

আমি তোমার বাবার বন্ধু। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি। আমার নাম বিভূতিভূষণ ন্দ্যোপাধ্যায়—

ও। আপনি লেখক কাকু। বাবা আপনার নাম বলেন। দাঁড়ান—মাকে ডেকে আনি।

তোমার মা কোথায় ? বাড়িতে আছেন ?

না। মা গেছেন নারীকল্যাণ সমিতিতে। কাছেই। যাব আর আসব।

না। থাক থাক। তোমার মাকে ডেকে কাজ নেই। আমি আরেকটু পরেই ট্রেন ধরব। ারেকদিন সময় করে আসব।

ছেলেটির মুখখানি খুব উজ্জ্বল। মনে পড়ল, জেলির বিয়ের চিঠি তিনি ভাগলপুরে ড় বাসায় বসে পেয়েছিলেন। তখন তিনি খেলাতচন্দ্র এস্টেটে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের াজ করেন ওখানে। বিয়েতে আসা হয়ে ওঠেনি তাঁর।

মহাযুদ্ধের প্রথম বছরে আমরা এন্ট্রান্স পাশ করেছিলাম। আমি, মিতে আর জেলি।

স্টেশনে ফেরার পথে বিভূতিভূষণ দেখলেন, বাজারের রাস্তা জমে উঠেছে। খানকার শনিবারের হাটে পাশের জেলার ঝিকরগাছা, নাভারণ, গদখালির লোকও াসে। এই হাটে একসময় মাঝের গ্রামের নামকরা মানকচু উঠতো একসময়। বনগাঁ থেকে ট্রনে রানাঘাট থেকে মাঝেরগ্রাম পড়ে গোপালনগরের পরেই।

বাজার পেরিয়ে বনগাঁ স্টেশনে যেতে বড় একটা গুদামঘরের দেওয়ালে আলকাতরা দয়ে লেখা—সামাজবিরোধীদের দেখিলে থানায় সংবাদ দিন।

বিভূতিভূষণ দাঁড়িয়ে পড়লেন। এটি বাংলা সরকার লোক দিয়ে লেখাচ্ছে। যেখানে দেওয়াল পাচ্ছে সেখানেই লিখছে। সমাজবিরোধী মানে আমার ক্লাশফ্রেন্ড জেলির মতো ানুষজন। যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা হুকুম দিচ্ছেন, পঁচিশ ছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক সাবালক হিন্দু যুবককে আইডেনটিটি কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে। াকা শহরে নাকি পার্কে বা খেলার মাঠে আসতে বারণ করা হয়েছে বাঙালি হিন্দু যুবকদের।

সন্ধ্যায় তাদের ঘরে থাকতে হবে। যে কোনও সময় পুলিশ তাদের খোঁজখবর করবে খানাতল্লাশি করবে।

বনগাঁ স্টেশনে নেমে তিনি হাতের সুটকেসটি স্টেশনমাস্টারের ঘরে রেখে এসেছেন স্টেশনে পৌঁছে রানাঘাটের ট্রেন ধরবেন বিভূতিভূষণ। আর খানিক বাদেই সন্ধে হবে বনগাঁ থেকে গোপালনগর স্টেশনে পৌঁছতে মিনিট কুড়ি। খানেক বাদে অন্ধকার করে রা নামলে সারা বাঙলা দেশ মুছে যাবে। মাঠের ভেতর গোপালনগর, চালকি বারাকপু ইছামতী নদী। দেওয়ালে লেখা সমাজবিরোধী কথাটাও মুছে যাবে। সবই কি সামান্য ম হয় অন্ধকারের কাছে। ব্রিটিশ সরকারও, বিভূতিভূষণের মনে হল আরেকজন অন্ধকার ওরা আমাদের মানুষ মনে করে না। সন্ধের পর বাড়িতে থাকতে হবে। বেরোনো যাবে না যে কোনও সময় খোঁজ করলে এই যে আছি বলে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তখন ও ইচ্ছে করলে খানাতল্লাশি করতে পারবে। কোনও বাধা দেওয়া যাবে না। আম ভারতবাসীরা যেন গাছপালা; কিংবা পাঁঠাছাগল। অপমানে সন্ধেটা কালো লাগ বিভূতিভূষণের। স্বাধীনতা তো নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো।

জেলির সঙ্গে কতদিন দেখা হয় না। ইংরেজি সেই ১৯১৩-১৪ সনে আমি, জেলি আ মিতে এক একদিন বিকেলে এই বনগাঁর রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। সামনে এন্ট্রা এগজামিশেন। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। তখন বনগাঁ এত বড় জায়গা নয়। এ দোকানপাট হয়নি। এক একদিন দেখেছি—খুলনা যাবার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে

স্টেশনমাস্টারের ঘর থেকে ছোট সুটকেসটা নিয়ে রানাঘাটের ট্রেন চেপে বসলে বিভূতিভূষণ। বিশেষ প্যাসেঞ্জার নেই। কামরার আলোয় কোনও জোর নেই। কয়লা ইঞ্জিন বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে চলতে শুরু করল। প্রথমে গোপালনগর। তারপর মাঝে গ্রাম। শেষে গাঙনাপুর পেরোলেই রানাঘাট। এই রানাঘাট স্টেশনের কাছে একটা শা জঙ্গলে আমি বাবার সঙ্গে এক গরমের রাতে চাদর পেতে ঘুমিয়েছিলাম। আমার তখন আট ন-বছর বয়স। বাবা কোথায় কথকতা করতে গিয়েছিলেন। জায়গাটার নাম আজ আর ম নেই। লাস্ট ট্রেন চলে গেছে। কোথায় যাব? বাবা বললেন, চল—আমরা ওই শাল জঙ্গ গিয়ে শুয়ে থাকি। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যাবে। তাই গিয়েছিল। সেদিন আকাশে খু জ্যোস্না ছিল। সম্ভবত তখন ফাল্গুন মাস। সারা রাত কী বাতাস।

ট্রেনের কামরায় কোণের দিকে বসে তিনজন লোক খুব টাকার হিসেব করছে। নো গুনছে। তর্ক করছে। বিভূতিভূষণের মনে হল—ওরা খুব সম্ভব গরুর দালাল। গরু বে ফিরছে। কিংবা কালকে কোন গোহাটায় যাবে।

গোপালনগর স্টেশনে কয়েকজন চাষিবাসি মানুষ নামল। ছোট্ট স্টেশন। সিঙ্গ লাইন। স্টেশনমাস্টারের টেবিলে কাচের ভেতর উসকে দেওয়া ফিতের ডগায় কেরোসিনে আলো। প্ল্যাটফর্মের বাইরে বর্ষাকালের আকাশে সবে চাঁদের আভাস। জ্যোৎস্না ফু বেরোলে দেখা যাবে—হয়তো আকাশ জুড়ে একখানি ভাসা মেঘ। ধানখেতের ভেতর দি

খোয়া ফেলা রাস্তা দেখে দেখে হাঁটতে হচ্ছে বিভূতিভূষণকে। সুটকেসটি ভারী নয়। এর ভেতর রয়েছে তাঁর লেখার খাতা। চাঁদের পাহাড়ের সামনের কিস্তি দু'-পাতা লেখা হয়েছে। আরও সাত আট পাতা লিখবেন। তাই সঙ্গে আনা। রাস্তার দু'ধারে ধান চারা এঁটে বসেছে। মেটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ গম্ভীর। ফিকে অন্ধকারে কোত্থেকে এড়াঞ্চি ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে। গন্ধটা যেন তার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলেছে। কখন বাড়ি গিয়ে পৌছবো। বর্ষায় ইছামতী ভরে যায়। কখন গিয়ে তার তীরে দাঁড়াব।

বাড়ির কাছাকাছি কুঠির মাঠে এসে যখন পড়লেন বিভূতিভূষণ—তখন আকাশ জুড়ে চাঁদ উঠেছে। বর্ষায় জলে ধোযা আকাশে কোনও মেঘ নেই। কিছু দূরে এখানে সেখানে অন্ধকারের ভেতর কুপির আলোর ফুটকি। মনে হল—সারাটা চালকি বারাকপুর তাঁকে বরণ করে নেবার জন্যে চুপ করে অপেক্ষা করছে। এই বুড়োনিমতলায় দুপুরবেলা রানুদির সঙ্গে খেলেছি। কত হাসি—কত আনন্দের পাট এখানে ঘাসের নীচে মাটির সঙ্গে মিশে আছে।

নিজেদের বাড়ি থেকে বিভূতিভূষণ তার চেনা বকুলগাছটির নীচে দাঁড়ালেন। গরমের দুপুরে এই গাছের নীচে সুটকেস কোলে নিয়ে বিভূতিভূষণ দৃষ্টিপ্রদীপের অনেকগুলো পাতা লিখেছেন। বর্ষায় জলে ভিজে গিয়ে বকুল ফুলের গন্ধ বাতাসে ভারী হয়ে ভাসছে। নিজের বাড়ি না গিয়ে বিভূতিভূষণ ডানদিকে এগিয়ে খুড়িমার বাড়ি গেলেন। মাঝে একটা বাঁশবাগান। বাঁশের গোড়া থেকে সোনালি রঙের কোড বেরিয়েছে। তাতে সদ্য-ওঠা জ্যোৎস্নায় খানিকটা পড়ায় কোড়গুলোকে মনে হচ্ছে—বাঁশঝাড়ে কে ভুল করে দিনেরবেলায় সোনার গয়নাটযনা ফেলে গেছে।

সম্পর্কে খুড়িমার বয়স হয়েছে। শ্যামাপদকাকার স্ত্রী। অনেকদিন হল বিধবা হয়েছেন। শ্যামাপদকাকা বিভূতিভূষণের বাবাকে দাদা বলে ডাকতেন। কারা যেন খেতে বসেছে। খুকু তাদের ভাতের পাতে নারকেল মালার বড় হাতায় ডাল দিল। কুপির আলোয় সবটা আলো হয়নি। বিভূতিভূষণ ঢুকতে ঢুকতে বললেন, খুড়িমা। অতিথি আছে।

তাঁর গলা পেয়ে খুকু চমকে উঠল। অন্ধকারে তাকাল।

বিভূতিভূষণকে এখনও দেখতে পায়নি। অভিমান করে বলল, আপনার না গত শনিবার আসার কথা ছিল। আসেননি বলে আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল।

বিভূতিভূষণ ঘরে ঢুকবেন বলে মাটির বারান্দায় পা থেকে নিউকাট পা দিয়েই ঠেলে খুলছিলেন। খুড়িমা বলে উঠলেন, আঃ ! খুকি, আগে তো খাবার জল দিবি।

খেতে বসেছে বোঝা গেল শ্যামাপদকাকার জমি যারা চষে তারা। তিনজন। এই সময়টায় চষা, রোয়ার কাজ শেষ। জমির যারা যত্ন নেয়—তারা এই সময়টায় ধান চারার গোড়ায় একটা নিড়েন দেয়। আগাছা তুলে ফেলে। বেশি জল দাঁড়ালে পাছে গোড়ায় পচা রোগ ধরে তাই নালা কেটে জলও বের করে দেয়। আবার পাছে বর্ষার জল বেরিয়ে গিয়ে জমি শুকিয়ে যায়—তাই জায়গামত মাটি উঁচু করে বাঁধ দিয়ে দেয়। বিভূতিভূষণ বুঝলেন, শ্যামাপদকাকার জমিতে এখন সেই কাজ চলছে। শ্যামাপদকাকার কোনও ছেলে নেই।

মা মেয়েতে তো এই কাজ করতে পারবে না।

খুকু একটা খেরো গ্লাসে জল গড়িয়ে এগিয়ে ধরল। আপনি একটু বসুন। এখুনি সব
হয়ে যাবে।

কোনও তাড়া নেই খুকু। আমি বনগাঁ স্টেশনের বাইরে পেট পুরে রসগোল্লা সিঙাড়
খেয়ে এসেছি।—বলতে বলতে বিভূতিভূষণ মাটির ঘরে যেমন হয়—পাকা বাঁশের মাচায়
লেপ তোশকের ওপর বসলেন। এখানে শোয়া বসা দুইই হয়।

খুকু এগিয়ে এসে বলল, খেয়ে এলেন কেন ?

খুড়িমা চাষিদের খাওয়া দেখছিলেন। জগো-আর দুটি ভাত নাও—বলতে বলতে
খুড়িমা খুকুর দিকে তাকালেন। ও কি কথা ! খিদে পেলে খাবে না ?

বিভূতিভূষণ খুড়িমার এ কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ আনমনে বাঁশের কঞ্চি বসানে
জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জ্যোৎস্নায় একদম দিনের আলো ছড়ানো আকাশ দেখতে
পেলেন। সেই আলোয় ভিজে বকুলগাছটা যেন শুকিয়ে উঠল। বিভূতিভূষণ অবাব
হলেন। খুকুর এই মান অভিমানের ভেতর তিনি ভাবছেন—কত গ্রামগঞ্জে গাছগাছালিব
ছায়ায় এই সন্ধ্যার শুরুতে কিশোরী মেয়েরা গা ধুয়ে চুল বেঁধে নিজেদের ছেলেমানুষি মন
নিয়ে কত কি ভাবছে—কত ভাঙাগড়া করছে মনে মনে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে—কত স্বপ্ন
দেখেছে—তারপর এক অজো পাড়াগাঁয়ে হাড়িকুঁড়ি নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিল।

চাষিরা একসময় চলে গেল। যাবার সময় ওদের একজন বলে উঠল, মা একটু
মটরের ডাল রাঁধেন যেন কাল। মটর ডালটা আপনার হাতে বড় খোলে।

বিভূতিভূষণকে কাপড়ের আসন পেতে খেতে বসতে বলছিল খুকু। চাষিদের কথা
কানে যেতে সে অন্ধকার উঠোনের দিকে তাকাল। সেখানে ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে
জ্যোৎস্নায় ওদের মাথা দেখা যাচ্ছে। খুকু গলা তুলে বলল, গতকাল মটরডাল মা রাঁধেনি
আমি রেঁধেছিলাম। বেশ তো কাল জিরে ফোড়ন দিয়ে এক কড়াই রেঁধে রাখব—

চাষি তিনজন চলে গেল। বিভূতিভূষণ আসনে বসে বসেই দেখতে পাচ্ছেন—খুকু
মাটির বারান্দার এককোণে শিক তোলা উনুনে তুলে রাখা শুকনো বাঁশের চ্যাঙাড়ি দিয়ে
পলকে আগুন জ্বেলে চাল চড়িয়ে দিল। দিয়েই ঘরের একমাত্র কুপিটি হাতে নিয়ে উঠোনে
নেমে পড়ল খুকু।

আরে ! কোথায় যাচ্ছো ?

বসুন না। আমি এখুনি আসব।

উঠোন থেকে চড়া জ্যোৎস্নার আভা আলো হয়ে অন্ধকার মাটির ঘরে ঢুকছে। খুড়িমা
উনুনে গুঁজে আসা চ্যাঙাড়ির ভেতর আরও দুখানি চ্যাঙাড়ি গোলপাতার চাল থেকে নামিয়ে
গুঁজে দিলেন উনুনে। তারপর বিভূতিভূষণের দিকে তাকিয়ে খুড়িমা বললেন, জগোরা ছিল
বলে জমিটুকুর চাষ হচ্ছে। ধান তুলে ওরা মটর কড়াই ফেলে।

বিভূতিভূষণের মনে পড়ল—তাঁর ছোটবেলায় দেখেছেন—শ্যামাপদকাকা নিজে

ঝমঝম বর্ষাব ভেতব মাটি মেখে হাল দিচ্ছেন। সে সব কতকাল আগেব কথা। মানুষ কত যুগ যুগ ধবে এমন সংসার বসাচ্ছে। তার ভেতব থেকে নিজেই আচমকা চলে যাচ্ছে।

জ্যোৎস্নাব ভেতর দিয়ে কুপি হাতে খুকু ফিবে এল। বাবান্দায উঠে কুপিটা বেখে নিজেই বলল, আপনাদেব উঠোনে লঙ্কা দিযেছিলাম জষ্টিব গোডায। গত শনিবাব এলে ভেবেছিলাম আপনাকে ফুল দেখাবো। এই তো চাবটে লঙ্কা ছিঁডে নিযে এলাম। আপনাব তো আবার ভাতেব পাতে চাই।

খুঁডিমা বলে উঠলেন, ও কি কবলি খুকু। বাতে গাছেব গাযে ব্যথা দিলি।

বর্ষাকাল তো। সযে যাবে মা। নিন। খেতে বসুন এবাব।

ভাত ফুটুক আগে।

খেতে খেতে আবেকটু বাত হল। সময বোঝার উপায নেই। বিভূতিভূষণ হাতে ঘডি পবেন না। গৌবীব সঙ্গে বিযেব সময সেই কবে গৌবীব বাবা হাতঘডি দেবেন বলেছিলেন। দিযে উঠতে পাবেননি। মোক্তাবি কবে সংসাব চালাতেন। হযে ওঠেনি। সেই গৌবী কবে চলে গেছে।

কুপি নিযে বেবিযে যাবাব সময খুকু যে তাব সুটকেসটি নিযে গেছে তা লক্ষ কবেননি বিভূতিভূষণ। খেযে উঠে মুখ হাত ধুযে বিভূতিভূষণ যখন আমাব সুটকেস গেল কোথায— বলে উঠলেন—তখন খুকু বাবান্দা থেকে বলল, ঘবে গিযে পাবেন। আবেকটু বসুন না—

না খুকু। যাই—বেবিযেছি সেই সাডে বাবোটায—

খুকু কোনও কথা বলল না। কুপি নিযে পথ দেখিযে দিতে এগিযে এল।

না না। এমন চাঁদেব আলোয কুপিব দবকাব কি ?

প্রায চাব মাস পবে বিভূতিভূষণেব নিজেব ঘবে আসা। স্কুলেব অ্যানুযাল পবীক্ষাব পবে ডিসেম্ববে এগজামিনেব খাতা নিযে তিনি এখানে এসে টানা চাবদিন ছিলেন। তাবপব আজ এই আসা। ঘবে ঢুকে বুঝলেন, খুকু লঙ্কা তুলতে কুপি নিযে বেবোযনি। বিছানা পাট পাট কবে পাতা। মশাবি টানিযেছে খুকু। মাথাব কাছে টুলেব ওপব খাবাব জল ঢাকা দেওযা। পাযেব কাছে কাঁথা। যদি তিনি পডাশুনা কবেন—তাই তেল ভবে নিভু নিভু কবে বাখা। সব দিকে নজব আছে খুকুব।

বিভূতিভূষণ মশাবিব এক দিকটা খুলে বিছানাব ওপব সুটকেস থেকে লেখাব খাতা বেব কবলেন। তাবপব ঘবেব জানলা খুলে দিলেন। বাবা এই জানলাব কপাট শিশু কাঠ কেটে কবিযেছিলেন। তখন বিভূতিভূষণ বনগাঁযে স্কুলে ভর্তি হযে গেছেন। হেবিকেনটা বাডিযে টুলেব ওপব বাখলেন। পাছে খাবাব জলে কেবোসিনেব গন্ধ হযে যায—তাই জলসুদ্ধ গ্লাসটি দেওযালেব কুলুঙ্গিতে বাখলেন। কদিনই এই লেখাটি নিযে তাব মুবগিব দশা। তা দিতে বসলে মুবগিকে সেখান থেকে টেনেও তোলা যায না। নেশাব মতো। বিভূতিভূষণ চাঁদেব পাহাড লিখতে লিখতে ডুবে যাচ্ছেন। লেখাব চেযে কম পডতে হচ্ছে না তাঁকে। আফ্রিকাব কঙ্গো নদীব অববাহিকা—বিশেষ কবে বিখটাব ভেলট পাহাড,

মাউন্টেন অব দ্য মুন—গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অভিযাত্রীদের হাতছানি দিয়ে ডেকে আসছে। এই ডাকে অনেকেই ঘরে বসে থাকতে পারেন নি। অনেকেই শীতে, গরমে, খিদেয় নয়তো সিংহের পেটে হারিয়ে গিয়েছেন। কেউ কেউ ডায়েরি লিখে গেছেন। সে সব লেখা তিনি পড়ে চলেছেন। পর্তুগিজ, ফরাসি, জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ। সাহারা মরুভূমিতেই তিনজন অভিযাত্রী মিলিয়ে গিয়েছে। তাদের রোজনামচা পরে পাওয়া যায়। সেইসব লেখা থেকে পরে বই হয়েছে।

গায়ের শার্টটা খুলে বিছানায় আসন করে বসলেন বিভূতিভূষণ। বছর দুই হল চশমা পরতে হচ্ছে। শেষ লিখেছেন গতকাল সকালে। স্কুলে যাবার আগে। কাগজের পৃষ্ঠার ওপরে লেখা—৩৩। তিনি শেষটুকু মনে মনে পড়তে শুরু করলেন।

'লোকটার জ্বর তখন যেন কমেচে। সে বললে—তুমি কি বলছিলে? আমার ভয় করচে ভাবছিলে? ডিয়েগো আলভারেজ, ভয় করবে? ইয়াং ম্যান, তুমি ডিয়েগো আলভারেজকে জানো না। লোকটার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হতাশা, বিষাদ ও ব্যঙ্গ মেশানো অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা দিল। সে অবসন্নভাবে বালিশের গায়ে ঢলে পড়ল। এই হাসিতে শঙ্করের মনে হল এ-লোক সাধারণ লোক নয়। তখন ওর হাতের দিকে নজর পড়ল শঙ্করের বেঁটে বেঁটে মোটা মোটা আঙুল—দড়ির মতো শিরাবহুল হাত, তাম্রাভ দড়ির নীচে চিবুকের ভাব শক্ত মানুষের পরিচয় দিচ্ছে। এতক্ষণ পরে খানিকটা জ্বর কমে যাওয়াতে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসছে যেন ধীরে ধীরে

এই অব্দি লেখা রয়েছে। লেখার সময় সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবেন বিভূতিভূষণ তার মানে তিনি নিজের ভেতর তাকিয়ে আছেন। এবার খস খস করে লিখতে লাগলেন—

'লোকটা বললে, সরে এসো কাছে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ। আমার নিজের ছেলে থাকলে এর বেশি করতে পারত না। তবে একটা কথা বলি—

'আমি বাঁচব না। আমার মন বলচে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমার উপকার করে যেতে চাই। তুমি ইন্ডিয়ান? এখানে কত মাইনে পাও? এই সামান্য মাইনের জন্যে দেশ ছেড়ে এত দূর এসে আছ যখন, তখন তোমার সাহস আছে, কষ্ট সহ্য করবার শক্তি আছে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর আজ তোমাকে যে-সব কথা বলব—আমার মৃত্যুর পূর্বে তুমি কারো কাছে তা প্রকাশ করবে না?

শঙ্কর সেই আশ্বাসই দিলে। তারপরই সেই অদ্ভুত রাত্রি ক্রমশ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এমন এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ধরনের আশ্চর্য কাহিনী শুনে গেল—যা সাধারণত উপন্যাসেই পড়া যায়।'

এই অব্দি লিখে হঠাৎ থেমে গেলেন বিভূতিভূষণ। এখন চালকি ব্যারাকপুরে কোনও শহর নেই। আমার নিজের ছেলে থাকলে এর বেশি করতে পারত না। ডিয়েগো আলভারেজের মুখে এই কথাগুলো বসানোর সময় কিছু মনে হয়নি বিভূতিভূষণের। কিন্তু এখন সারা চালকি ব্যারাকপুরে সবাই যখন চড়া চাঁদের আলোয় ঘুমাতে যাচ্ছে -কেউ বা

ঘুমিয়ে পড়েছে– কেউ বা জেগে জেগে ঘর গেরস্থালি করছে—তখন আমার নিজেব বলতে কে আছে ? ছেলেও নেই। মেয়েও নেই। খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনে পড়াতে গিয়ে একেকটি ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি চুপ করে যান। তখন বুকের ভেতরে যেন কি হয ! আর লিখতে ইচ্ছে হল না। অথচ ভেবেছিলেন, আজ রাতেই লিখে লিখে অনেকটা এগিয়ে যাবেন। ডিয়েগো আলভারেজ এখন তাঁর সেই অবিশ্বাস্য আশ্চর্য কাহিনী বলে যাবেন –যা কিনা বিভূতিভূষণ মনে মনে ভেবে রেখেছেন। লিখতে পারলেন না তিনি আব জানলার বাইরে যতদূর দেখা যায়--গম্ভীর ধানখেতের ওপর চাঁদের আলোর পড়ে আছে। এখন ইছামতীর তীরে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যেত –একখানি কাচ পড়ে আছে নদীব বুক জুড়ে। খযরামারির মাঠের কাছে ইছামতী বাঁক নিয়েছে। কাচখানিও সেখানে বাঁক নিল।

বিভূতিভূষণ লেখার খাতা, কলম সুটকেসে ভরে দেওয়াল ঘেঁষে মেঝেতে রাখলেন তারপর হেরিকেনটি নিভিয়ে দিলেন। শোবার সময তিনি ডান কাতে শুতে ভালবাসেন পায়েব কাছে কাঁথাটি বুক অব্দি টেনে নিলেন ঘব একদম অন্ধকার হওযাব কথা তা হযনি। বাইবে জোবালো চাঁদের আলোব ঝাঁঝ ঘরেব ভেতর এসে পড়েছে। তাতে আবছা দেখা যায সবই। তেভাগে হেরিকেন। কুলুঙ্গিতে ঢাকা দেওযা জলেব গ্লাস।

হঠাৎ তিনি দেখলেন, বিদেশি পোশাক পবা একজন সাহেব মতো লোক—ঘরেব দবজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছেন। চমকে উঠলেন বিভূতিভূষণ। দরজায খিল তুলে দিইনি নাকি ? মনে কবতে পাবছেন না তিনি। খুবই অবাক হলেন বিভূতিভূষণ। যখন যা লেখেন তিনি- সেই সময ওই লেখার ভেতব বিভূতিভূষণ বাস করেন। সবই জীবন্ত মনে হয তাঁর। তবে কি ডিয়েগো আলভাবেজ দেখা কবতে এল ? অনেক সময লেখার মানুষগুলো খাতার পাতা থেকে সিধে তার কাছে চলে আসে।

থ্রি পিস স্যুট। চোখে মনোকল। নাকেব নীচে ঝোলা গোঁফ। তার দিকে এগিয়ে আসতে বিভূতিভূষণ বুঝলেন, নাঃ ! এ তো আলভারেজ নয। কেমন আত্মবিশ্বাসে ভবপুব – কর্তালিচালে পা ফেলে এগিয়ে এল সাহেবটি। কিন্তু এখানে সাহেব আসবে কোত্থেকে ? সব গুলিয়ে গেল বিভূতিভূষণের। এবার যেন খুব চেনা লাগল সাহেবকে। যেন আগেই আলাপ হয়েছিল। ঠিক মনে করে উঠতে পারছেন না এখানে এখন আলোর রং রঙিন

আসুন মিঃ ব্যানার্জি। এখুনি সেশন শুরু হবে। আপনি গ্যালারি থেকে আমার কথা পরিষ্কার শুনতে পাবেন।

কোথায যাব ?

হাউস অব কমন্সে। আজ আমি ভারতসচিব হিসেবে কম্যুনাল অ্যাওযার্ডের ওপর মেম্বারদের আশ্বস্ত করব। ইন্ডিয়ার প্রজারাও সব জানবে।

চমকে গেলেন বিভূতিভূষণ। ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ? ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায যিনি ভারতবর্ষেব ভার পেযে থাকেন। তাকেই সব দেখতে হয। সেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে খোদ লন্ডন শহরে একে পড়েছি। যিনি ভারতবর্ষে কে গভর্নর জেনারেল

হবেন—তা ঠিক করেন--যাঁকে দেখা যায় না—ধরাছোঁয়ার বাইরে—সেই স্যামুয়েল হোর ? আমাকে ডাকছেন ?

আসুন। আসুন মিস্টার ব্যানার্জি। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনার পথের পাঁচালী পড়লাম। অপরাজিত শেষ করে এনেছি। আর কয়েক পাতা বাকি। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে আমাদের লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণামই আপনার লেখার সাবজেক্ট।

বিভূতিভূষণ ঠিক বুঝতে না পেরে স্যার স্যামুয়েল হোরের মুখে তাকালেন। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। কনজারভেটিভ পার্টির একজন হোমরা-চোমরা মেমবার।

স্যার স্যামুয়েল বললেন, কর্নওয়ালিশের পার্মানেন্ট সেটেলমেন্টের দরুন বাঙালি সম্প্রদায় একদিকে পেয়েছে বেনিভোলেন্ট কিছু জমিদার আর তাদের জমিদারি। আরেক দিকে সারাটা সম্প্রদায়কে দেড়শো বছর ধরে ভুগতে হচ্ছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণাম হল হরিহর বাঁড়ুজ্যে, অপু, ইন্দির ঠাকরুন—। আপনার সব ক্যারেক্টার। আসুন আসুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বেশ অবাকই হলেন বিভূতিভূষণ। স্যার স্যামুয়েল এত কাজের ভেতর পথের পাঁচালী, অপরাজিত পড়ে ফেলেছেন ? আশ্চর্য ? কত আইন তাঁকে বানাতে হয়। এর ভেতর—

ঘর থেকে বেরিয়েই বিভূতিভূষণ বিখ্যাত বিগবেনের মুখোমুখি হলেন। পূর্বদিকে ক্লক টাওয়ার। খুব চেনা বিভূতিভূষণের। খেলাতচন্দ্র ইন্সটিটিউশনে একদিন এই বিগবেনের ছবি ক্লাশঘরে আবিরলালদের উঁচু করে দেখিয়েছি। কোত্থেকে ছবি পেলাম—কিছুতেই মনে করতে পারছি না। এ সবই আমার চেনা। ১০৯৭ সনে এ বাড়ি তৈরি হয়। হ্যামার-বিম ছাদ। ১৩৭০ সনে অদল বদল করা হয় কিছু। ১৮৪৩ সনে আগুন লেগে খুব ক্ষতি হয়েছিল। ফিরে বানানো হল। একদম ঝকঝক করছে সব কিছু।

স্যার স্যামুয়েল তাঁকে যে পথ দিয়ে তড়িঘড়ি নিয়ে চলেছেন সেটি চিনতে পারলেন বিভূতিভূষণ। কালো পাথরে তৈরি ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে। পাশেই ছোট্ট সেন্ট্রাল গার্ডেন। এ সব করিয়েছিলেন প্রথম উইলিয়ম। সেন্ট্রাল গার্ডেনে কার স্ট্যাচু চিনতে পারলেন না বিভূতিভূষণ।

এই তো কমন্সসভায় ঢুকছি আমরা মিস্টার ব্যানার্জি—

বিভূতিভূষণ একেবারে যাকে বলে মুগ্ধ। চেম্বার লম্বায় সাতানব্বই ফুট। পাশে সত্তর ফুট। জানলা দিয়ে দেখা গেল—দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিক্টোরিয়া টাওয়ার। কত উঁচু বিভূতিভূষণের জানা। তিনশো ছত্রিশ ফুট। যেমন ঘড়ি ঘরটি উঁচু তিনশো উনত্রিশ ফুট। সবই মুখস্ত বিভূতিভূষণের। বিগবেনের ওজন তেরো টন। এই বাড়ির বাইরেই টেমস নদী লন্ডনের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে। নদীর ওপর ব্রিজ। ব্রিজ পেরোলেই ওয়াটারলু স্টেশন। ব্রিজ দিয়ে স্যার স্যামুয়েল নিয়ে এলেন বলে বাঁয়ে পড়ল হাউজ অব কমন্স।

বিভূতিভূষণকে গ্যালারির দিকে এগিয়ে দিয়ে স্যার স্যামুয়েল বললেন, আমি তা হলে

এবার হাউসে যাচ্ছি।

বিভূতিভূষণ এই প্রথম কিছু জানতে চাইলেন। বললেন, স্যার স্যামুয়েল—বেঙ্গলে হিন্দু-মুসলমানের ভেতর এই বাঁটোয়ারা কোন বেসিসে ? কিসের ভিত্তিতে ?

কেন ? নাইনটিন থার্টিওয়ানের সেনসাস। বাঙলাদেশে মুসলমানেরা ৫১ পার্সেন্ট। হিন্দু ৪৮ পার্সেন্ট। কিন্তু দেশ শাসনের কাঠামো আমরা লন্ডন থেকে বাঁটোয়ারায় এমন করেই সাজিয়ে দিচ্ছি--বাঙালি মুসলমান—কী বাঙালি হিন্দু—কোনও তরফই আইনসভায় মেজরিটি পাবে না।

চেঁচিয়ে উঠলেন বিভূতিভূষণ। তার মানে ? কেউ মেজরিটি পাবে না ? হাঙ পার্লামেন্ট ?

কেউ তাঁর দিকে তাকালো না। কনজারভেটিভ পার্টির চাঁই-চাঁই মেম্বার সব ডানদিকে বসে। লেবার পার্টি, লিবারেলরা--গত ইলেকশনে হেরেছে। তারা বসে বাঁ দিকে। স্যার স্যামুয়েল বলতে শুরু করে দিয়েছেন।

আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও কিছু বলতে চাই না—বিশেষত ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে তো কিছু বলতেই চাই না।—এই অব্দি বাঙলায় বলে স্যার স্যামুয়েল হাউজ অব কমন্সের ফ্লোর থেকে একবার গ্যালারিতে বসা বিভূতিভূষণের মুখে তাকালেন। একটু মিচকি হাসলেন। যাকে বলে অর্থপূর্ণ হাসি। তারপরেই ইংরাজিতে গড় গড় করে বলতে থাকলেন--

But I would ask the honourable members to look very carefully at the proposals which we have made in the white paper for the constitution of the federal legislature that will be almost impossible, short of landslide—বলতে বলতে স্যার স্যামুয়েল আবার গ্যালারিতে বসা বিভূতিভূষণের মুখে তাকালেন। তারপরেই ফের তিনি বাংলায় বলে উঠলেন—ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার চরমপন্থীরা এই বাঁটোযারায় কোনওদিনই দখল করতে পারবে না। একেবারে কম করে ধরলে বলা যায়—বাঙলার মতো প্রদেশে ওদের গরিষ্ঠতা পাওয়া খুবই কঠিন হবে। সরকার গড়তে হলে যে কোনও তরফকেই আমাদের ওপর নির্ভর করতে হবে।

বিভূতিভূষণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, কী সব্বোনাশ !

তিনি জানেন, কনজারভেটিভদের চোখে চরমপন্থী মানে কংগ্রেস। বাঁটোয়ারার নামে যা করেছেন স্যার স্যামুয়েল—তাতে শুধু হিন্দু নয়—মুসলমানদেরও যে ওরা বিশ্বাস করে না তা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন বিভূতিভূষণ।

হাউজ অব কমন্সের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে স্যার স্যামুয়েল তখনও তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। বিভূতিভূষণ চটেমটে গ্যালারি থেকে উঠতে গেলেন।

ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। খোলা জানলায় ভিজে ধানখেত সকালের রোদে শুকিয়ে উঠছে।

কদিন ধরে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টিই হচ্ছে। থামার নাম নেই। শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য যখন তাঁর নিজের নামে এই শ্রীশনগর বসান—তখন পগ মিলের ইটভাটি করার মতো মুরোদ ছিল না তাঁর। কোনও রকমে পাঁজা করে ইট পুড়িয়ে নিয়ে তিনি এই সব একতলা বাড়ি করেছিলেন। ঘেঁষ, চুন, সুরকির মোটা পলেস্তরা। ওপরে খোয়া, চুন, সুরকির পেটাই ছাদ। কোনও বাড়ির বারান্দার মাথায় টিনের চাল। কোনও বারান্দার মাথায় টালি। দরজা জানলায় পাছে উই ধরে, তাই তাতে মোটা করে আলকাতরা মাখানো। কাঠের কড়ি বরগা। তা ভাড়াটেদের এই সব বাড়িই সই। তারা খুলনায় চাকরি করতে এসেছে। পাকাপাকি থাকতে নয়। শ্রীশনগরের সবেধন খেলার মাঠের গায়ে বারান্দায় উঠেই বড় ঘরখানিতে রত্না শেষের তিন ছেলেকে নিয়ে শুয়েছে। নিশুতি রাত। বৃষ্টি থামার নাম নেই। ছেলেদের বাবা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। রত্না চোখ বুজেও বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছেন যেন। এই ভাবে একটানা বৃষ্টি পড়লে বাড়ির আনাচে কানাচে বনঝাল, মানকচুর পাতা মাথা নুইয়ে ভিজতে থাকে। ঘরের কোণে হেরিকেনটি নিভু নিভু করে রাখা। রত্নার শুতে শুতে রাত হয় রোজ। পাশের ঘরে বড় দুই ছেলে টুনু আর পানু ঘুমিয়েছে। তাদের মশারি টাঙানো হল কি না—তা দেখা। তারপর দরজাগুলোয় খিল তোলা। দুই ঘরে খাবার জল রাখা। হেন তেন করে শুতে শুতে রাত হয়ে যায়। এখন সারা শ্রীশনগর খুলনা শহরের সঙ্গে এক সঙ্গে ভিজছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির তোড় বেড়ে যাচ্ছে। এরই ভেতর খাট থেকে নেমে রত্না হেরিকেনটি একটু উস্কে দিলেন। দিয়ে দেখতে পেলেন মেঝের একটি জায়গা। কেমন ভিজে ভিজে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হেরিকেন উঁচু করে ধরে সিলিংয়ে তাকালেন। কড়িকাঠের একটি জায়গা দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টির জল পড়ছে। টপ টপ করে।

এ বৃষ্টি কি কোনওদিন থামবে না ?—বলতে বলতে হেরিকেন হাতে রত্না ছোট্ট ভাঁড়ার ঘরটি পেরিয়ে ভেতর বারান্দায় এলেন। এই বারান্দার গায়েই মাঝের ঘরটি। নীচে

নামলে উঠোন। উঠোনের শেষে পাঁচিলের ও পিঠে ধীরেনবাবুদের বাগান। সেদিকটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। রত্নার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—এই হয়েছে এক বর্ষাকাল। একবার নামলে আর থামার নাম নেই।

মাঝের ঘরের বারান্দার দিকের জানলাটি খোলা। বৃষ্টি মাখা বাতাস ঘরে ঢুকে হেরিকেনটি নিভিয়ে দিয়েছে। পানুর বুকের ওপর টুনুর বাঁ হাত। শক্ত করে ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন রত্না। তার পেছনে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের ভেতর বাগানের নোনা গাছগুলোর মাথা ভিজতে ভিজতে একবার ঝুঁকে পড়ছে—আবার এইমাত্র ঠেলে উঠল।

রত্না বিড় বিড় করে বলে উঠলেন, বৃষ্টি কি থামবে না আর ?—তিনি ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। অন্ধকার আর এই বৃষ্টির তোলা দেওয়ালের ভেতর সারাজীবন বন্দি হয়ে থাকতে হবে! ছাঁদ চুইয়ে বৃষ্টি পড়ছে। বাইরের অন্ধকার পৃথিবীর হাত থেকে এই বাড়ি আমাদের বাঁচাতে পারবে না। জলে ভিজে ভারি ছাদ না ভেঙে পড়ে।

পানুর বুকের ওপর থেকে টুনুর হাতখানি আলতো করে নামিয়ে দিলেন রত্না। বাতাসে উড়ে যাওয়া মশারি ফের গুঁজে দেওয়ার আগে ওদের দু'জনের বুক অব্দি কাঁথা টেনে দিলেন। তনুর জন্যে একখানা কাঁথা বানাতে হবে বড় করে। ধাঁ ধাঁ করে বড় হয়ে যাচ্ছে তনু। দরজাটি বাইরে থেকে টেনে শক্ত করে ভেজিয়ে দিয়ে এবার রত্না হেরিকেন উঁচু করে তুলে উঠোনের দিকে তাকালেন। মাছের আঁশের সাইজ সব ফোঁটার একটা দিকে আলো পড়ে চিকমিক করে উঠল। এ বৃষ্টি থামবে না। তাঁর মনে পড়ে গেল, এই মাঝরাতে বাবা অনেক সময় ঘুম ভেঙে উঠে গিয়ে আমাদের বোনেদের গা থেকে সরে যাওযা চাদর টেনে ওপরের দিকে তুলে দিতেন। কতদিন বা মা-বাবার কাছে থাকা হল। বাবা আমাদের বোনেদের ন দশ বারো বছর বয়স হতেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন পর পর। আমরা দশ বোন দুই ভাই। ঢাকা শহরে পাতলা খাঁয়ের গলিতে বিরাট ভাড়া বাড়িতে সন্ধে হলে বাবার কাছে কত লোক আসতেন। এখনও এসে থাকেন। ইলেকট্রিক লাইটের আলোর ভেতর বসে কত ব্যাপারে কথা হয় বাবার আড্ডায়। বাবা কলেজে পড়ান। বসার ঘরে দুধ সাদা কাপে চা আসে ঘন ঘন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ—কত বড় বড় মানুষের নাম ওঠে সে আড্ডায়। সে সব কথা এখন স্বপ্ন রত্নার কাছে। যেন অন্য জগৎ। মা ফুল হাতার ব্লাউজ গায়ে কাজের লোকের হাতে ট্রে-তে চায়ের কাপ বসিয়ে ঘরে ঢুকছে—ঢাকার নবাববাড়ির ছোট নবাব নড়ে চড়ে বসলেন—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন রত্না। তার দুই দিদির বরেদের চেয়ে মা বয়সে কিছু ছোট ছিলেন।

এই ভাড়াবাড়ি, এই অন্ধকার, মাথার ওপর জলে ভিজে ভারি ছাদ—তার ভেতর স্বামী আর পাঁচ পাঁচটি ছেলে নিয়ে রোজ রাতে হেরিকেন নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়া—ভোর না হতে জেগে ওঠা—এ এক ভীষণ কঠিন খেলা মনে হল রত্নার। কোথাও একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই সব হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

ভেতর বারান্দায় জানলার কাছে হেরিকেন তুলে দুই ছেলেকে ভাল করে দেখলেন

রত্না। পানু হাফপ্যান্ট। টুনু পাজামা। গায়ে কোনও জামা নেই। বুকের লোম সরু রেখা হয়ে নীচে নেমে গেছে পানুর। টিকোলো নাকের নীচে গোঁফ ঘন মতো। দুই ভাইয়েরই মাথা ভর্তি চুল। কী একটা গর্ব হল রত্নার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল নিজের চোখে ছেলেকে সুন্দর দেখা ভাল নয়। তিনি জানলা থেকে সরে এলেন।

ভাঁড়ার ঘরটি ছোট। বোঝাই যায় বাড়িটা করার সময় এই জায়গাটা বেরিয়ে পড়ে। বাইরের বাবান্দার সঙ্গে ভেতরের বারান্দা একসঙ্গে জুড়ে দিলে ঘরগুলোর কোনও আব্রু থাকত না। তাই এই জায়গাটা দেওয়াল দিয়ে ঘিরে ঘর বানানো। এই ছোট ঘরখানি রত্নার ভাঁড়ার। পুবনো খুদ থেকে মাস খোরাকি চাল-ডাল-কৌটোয় কৌটোয় গোছানো। এমনকি মাটির কলসি গলা অব্দি ঠেসে রাখা বছরকার পুরনো তেঁতুল। কী খেয়াল হতে রত্না চালের হাঁড়ির মুখ সরালেন। ভেতরে হেরিকেনের আলো শেষ অব্দি পৌঁছল না। ঝুঁকে পড়ে ভেতরটা দেখে আঁতকে উঠলেন। চাল না বাড়ন্ত হয় শেষে। নাগাড়ে বৃষ্টির দরুন ভানকি মেয়েরাও ওদিকে আসছে না যে কিছুটা কিনে রাখবেন। এ কি বৃষ্টি রে বাবা ! মোরেলগঞ্জ থেকে ভাগের ধান চাল আসতেও তো এখনও কয়েক মাস বাকি।

এদিন ভোর সবার আগে মশারির ভিতর ঘুম ভাঙল দু'জনের—খোকন আর তার ছোট ভাই গৌরের। বাইরে তখনও বৃষ্টি। খোলা জানলা দিয়ে আলো মশারির ঢুকতেই খোকন দেখল—গৌর গায়ের কাঁথা সরিয়ে আড়মোড়া ভাঙছে। একদম ল্যাংটো। খোকন গৌরকে সবসময় চোখে হারায়। তার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। একটু আধটু হাঁটতে পারে। সে তাকে সবসময় ছোট ভাই বলে ডাকে। বর্ষাকালে ডেঁয়ো পিঁপড়ে বারান্দায় উঠে আসে। সে সব সময় ছোট ভাইকে পাহারা দেয়। পাছে পিঁপড়ে কামড়ায়। পারলে নিজেই পায়ের গোড়ালি দিয়ে ডেঁয়ো পিঁপড়ে থেঁতলে দেয়। খোকনের নিজের পা-ও খুব নরম। চার সাড়ে চার বছরের ছেলেদের পা যেমন হয়। খোকন দেখল ছোট ভাই তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। হাত তুলে শুয়ে শুয়ে সে ডাকছে। দু'ভাই -ই বুঝতে পারছে—মা বাবা ঘুমিয়ে। আরেক ভাইও ঘুমোচ্ছে। খোকন মশারি তুলে নীচে নামল। তার পর ছোট ভাইয়ের কাছাকাছি গিয়ে চাপা গলায় বলল, আয়—

জলের ডাক, অন্ধকারের ডাক, বাতাসের ডাক যে কোনও প্রাণীই বুঝতে পারে। ছোট হোক। বড় হোক। গৌর হাঁটতে শিখে যতটা পারে হাঁটতেই চায়। সে একটা মাছের মতোই সড়াৎ করে একদম কোনও শব্দ না করে খোকনের কাছে চলে এল।

খোকন তার ছোট ভাইকে এমনভাবে নাড়েচাড়ে যেন সে তার একার জিনিস। আর কারও নয়। ছোট ভাই অতশত বোঝে না। রোজ ঘুম থেকে উঠে সে একটা নতুন পৃথিবী পায়। খোকনের পেছন পেছন গৌর এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। খোকন পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে বারান্দার দিকে দরজা খুলে ফেলল।

তারপর দু'ভাই একদম বারান্দায় কিনারে। ওপরে টিনের চাল বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা চলেছে। সামনের খেলার মাঠটুকু সবুজ ভিজে ঘাসে বোঝাই ! আশপাশের বাড়ির দরজা

এখনও খোলেনি। একটা কুকুর সারারাত বারান্দায় ঘুমিয়েছে। সে ওদের দেখে নীচে নেমে গিয়ে রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল।

গৌর বলল, কু—

খোকন বড়র মতো বলল, হ্যাঁ কুকুর।

গৌর মনের আনন্দে ল্যাংটো হয়ে বারান্দায় একদম শেষে দাঁড়িয়ে হাত পেতে বৃষ্টির ফোঁটা ধরতে চাইছে।

খোকন দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। পাছে নীচে পড়ে যায়। আর মুখ বলতে লাগল, ধরে না। ধরে না ছোট ভাই--

তাতে গৌরের ফুর্তি আরও বেড়ে গেল। সে সব সময় বাড়ির সবার পাহারায় পাহারায় থাকে। এমন ভোরবেলা কখনও পায়নি। এখন ছুট লাগাল।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে খোকন ছুটলো । ছোটে না। ছোটে না ছোট ভাই—বৃষ্টি একটু ধরে আসায় তিনটে শালিক মাঠে নামল। তারা ঠোঁট দিয়ে কী খোঁটে মাঠে। আর মাথা তুলে দুই ভাইকে দেখে। গৌর শালিকদের চোখ দেখে চোখ ফেরাতে পারে না। হলুদ বর্ডারের ভেতর কালচে মণি। নড়ে চড়ে। এত রঙ কোনও থই পায না দুই ভাই। দু'জনেরই ছোটাছুটি বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টি আসছে যাচ্ছে। তারা স্তব্ধ হয়ে শালিকদের দিকে তাকিয়ে।

সবুজ মাঠ। মেঘ করা আকাশ। একে একে আশপাশের বাড়ির দরজা খুলে যাচ্ছে। খোকন বুঝতে পারছে না-- সে এখন ছোট ভাইকে নিয়ে কী করবে! এক্রামুদ্দিন আহমেদের বড় ছেলে ফেরদৌস বারান্দায় এসেই ওদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, এই খোকন! কী করছিস! তোদের তো ঠাণ্ডা লাগবে।

গৌর মাঝেমধ্যে ফেরদৌসের কোলে উঠে থাকে। সে হাত নেড়ে ফেরদৌসকে দেখে কল কল করে কী বলতে লাগল।

ক-ক-ল পি পি—

তাই শুনে আনন্দে খোকন হাততালি দিয়ে উঠল।

ঘুম ভেঙে গিয়ে দু'পাশে দু'জনকে দেখতে না পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন রত্না। অন্য দিন অনেক আগে উঠে পড়েন তিনি। তনু তার বাবার পাশে ঘুমোচ্ছে। বারান্দায় দিকের দরজা খোলা দেখে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

ছুটে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দু'জনকে কলকল করে কথা বলতে দেখে কয়েক পলক চুপ করে থাকলেন রত্না। গৌরের গায়ে কিছু নেই। খোকনের শুধু ইজের। পাশের বাড়ির বারান্দায় ফেরদৌস। রত্না গৌরকে কোলে তুলে আঁচলে গা ঢাকলেন। আর বাঁ হাতে খোকনকে ধরে ঘরে ঢুকলেন।

অনন্ত ঘোষালের বাড়িতে ঘটি খুব দরকারি জিনিস। দু'টি খুব জরুরি কাজে লাগে। ঘুম থেকে উঠে অনন্ত বললেন, চা বানাও তো রত্না। আজ একটু খেতে ইচ্ছে করছে।

সে কথা শুনে কলেজে পড়ুয়া টুনু বলল, আমিও একটু খাব মা। কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা

লাগছে।

রত্না হেসে বললেন, ঠাণ্ডা তো লাগবেই। ঘুমোলে গায়ের কাঁথা রাখতে পারিস না

সকালবেলা ঘোষালবাড়ির জগাখিচুড়ি দশা। গৌর দৌড়াচ্ছে। খোকন বারান্দার মাদুরে চিৎ হয়ে শুয়ে ডান পা শূন্যে তুলে দিল তনু আর পানু একই টেবিলে মুখোমুখি টুনু একা তক্তাপোশে আসন করে মোটা একখানা বই খুলে বসল। সে রিডিং পড়ে পড়ে না। মনে মনে পড়ে

এর ভেতর চেলাকাঠ গুঁজে উনুন ধরিয়ে ফেললেন রত্না। এ বাড়িতে চা নামে জাল দিয়ে খাবার এই প্যাকেট মাঝমধ্যে আসে। সে রকম একটি প্যাকেট তোশকের নীচে চাপা ছিল। বের করে গন্ধ শুঁকে বোঝার চেষ্টা করলেন রত্না— নষ্ট হয়ে যায়নি তো ? তারপর বললেন, টুনু, আর দু'খানা চেলাকাঠ গুঁজে দে তো।

অনন্ত সারা বছরের কাঠ চেলা করে রান্নাঘরের বারান্দায় থাক দিয়ে রাখেন। সেখান থেকে দু'খানা কাঠ বের করে উনুনে গুঁজে আগুন উসকে দিল টুনু। তাকে ছাড়া এ বাড়ির কোনও ছেলেকে রত্না এ সব কাজ করতে বলেন না। পানু ছেলেদের ভেতর তাঁর সবচেয়ে পুরনো সঙ্গী। সে এবার পেটমোটা একটি ঘটিতে জল ভরে উনুন বসালো।

ক' গ্লাস জল দিলি ?

কেন ? ছোট গ্লাসের তিন গ্লাস।

এ বাড়িতে কোনও কাপ প্লেট নেই। কাপ নেই। আছে হাতা, ঘটি, বাটি, থালা। ওই গ্লাসের মাপেই জল চাপান রত্না। মাথা পিছু এক গ্লাস করে।

জানো মা - কাল কলেজ যাওয়ার সময় দেখলাম—তিনটে লোক কলের গান বাজিয়ে লোক জড়ো করছে— আর সবাইকে বিনে পয়সায় চা খাওয়াচ্ছে।

যাঃ ! বিনে পয়সায় ? তা হয় নাকি !

অনন্ত বললেন, হয়। আমাদের সেসন কোর্টের সামনেও প্রায়ই বিকেলে এসে ওরা রেকর্ড বাজিয়ে ফ্রি-তে চা খাওয়ায়।

রত্না ঘটির ভেতর একই সঙ্গে দুধ চিনি ঢেলে দিতে দিতে জানতে চাইলেন, কার গান বাজায় ?

টুনু বলল, কাল বাজাচ্ছিল কাননদেবী।

অনন্ত বললেন, সবার নাম তো জানি না। মনেহল আব্বাসউদ্দিনের। কী গলা। চড়ায় উঠে তির তির করে। কোনও কোনওদিন কানা কেষ্টরও বাজায়। শুনতে লোক ভিড় করে তখন কাঁধে ঝোলানো টিনের বড় ড্রাম থেকে চা ঢেলে খাওয়ায়।

বিনে পয়সায় ?

একদম বিনে পয়সায় রত্না।

ওদের লাভ ?

আরে ! ওরা তো খাওয়াচ্ছে না। খাওয়াচ্ছে বড় বড় চা কোম্পানি। বিনে পয়সায়

খেয়ে খেয়ে আমাদের নেশা হয়ে যাবে যখন –তখন আর ফ্রিতে খাওয়াবে না ওরা। তখন আমরা দোকানে গিয়ে কিনবো।.

রত্না বললেন, এই চায়ের প্যাকেটটা তো তুমিই কিনে এনেছো।

আমিই তো কিনে এনেছি। সবাই তো কেনে না। সারা দেশে অনেক লোকই চা খায় না। তাই ওরা গান শুনিয়ে লোক ডেকে ফ্রি খাইয়ে চায়ের অভ্যেস করিয়ে দিচ্ছে। দাও দাও চা দাও—

রত্না প্রথম গ্লাসটি ভরে চা এগিয়ে দিলেন অনন্তকে। টুনু তার গ্লাস নিতে নিতে বলল, এ জন্যেই তো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন— চা পান না বিষ পান।

বলেছেন নাকি ?

অনন্ত বললেন, কোথায় নাকি লিখেছেন পি. সি রায়। আব্দুল হাকিম বলেছিলেন কোর্টে।

পানু পড়ার টেবিলে থেকেই বলল, মা, ঘটির নীচে যে দাগ হয়ে গেল। এর পরে ইস্ত্রি করবে কী করে ?

মেজে নেব। বলে নিজের গ্লাসে প্রথম চুমুক দিলেন রত্না। মাঝে মধ্যে এ বাড়িতে ইস্ত্রি করার দরকার হলে রত্না ঘটির ভেতর গরম জল ঢেলে মুখ বন্ধ করে ইস্ত্রির কাজ চালিয়ে নেন। মাড় দেওয়া জামা কাপড়ের ওপর গরম ঘটিটা চেপে চেপে।

খানিক বাদে রত্না বালতি পেতে ধরে রাখা বর্ষার জলে চায়ের গ্লাস ধুতে ধুতে বললেন, চাল কিন্তু বাড়ন্ত।

আর দু'টো দিন চালিয়ে নাও।

তা না হয় নিলাম।

যা বৃষ্টি এখন তো ভানকিবাও আসছে না রত্না।

না আসুক—আবও দুদিন এই চালে চলে যাবে। কিন্তু—

বৃষ্টি আবার জোরে এল। অনন্ত ঘোষাল হঠাৎ দেখলেন, চা খাওয়ার কয়েক মিনিটের নিশ্চিন্তির পর ফের বৃষ্টি এসে তাঁর এই পৃথিবীকে বাকি জগৎ সংসার থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এখানে খোকন গৌবকে নিয়ে বড় ঘরের বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। ভোরবেলার আলো মুছে গিয়ে ধীরেনবাবুদের বাগানের গাছপালা বৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। টুনু বড় হয়ে উঠেছে। খানিক বাদে ট্রেনে উঠে দৌলতপুর কলেজে যাবে। পানু আর তনু স্কুলের বই খুলে বসা। একবারও তার মনে হল না—কিছুর অভাব আছে এই পৃথিবীতে।

কিন্তু কী রত্না ?

রত্না কিছু বলতে পারলেন না তাঁর স্বামী—তার তিন ছেলে তাঁর মুখে তাকিয়ে। কুলসুমদের বাড়ির বারান্দায় তার বড় ছেলে ফেরদৌস গলা তুলে স্কুলের পড়া মুখস্থ করছে। ডান দিকের বাড়ি কাশী ডাক্তারের পায়ের খড়মের আওয়াজ। সারা শ্রীশগর এই বৃষ্টির ভেতর জেগে উঠেছে। ধীরেনবাবু বোধহয় বৃষ্টি মাথায় করে কোথাও বেরোচ্ছেন। তাব

ল্যান্ডোর পাদানি থেকে ঘণ্টির আওয়াজ।

বুঝেছি। টুনু—

বাবা ?

পানু। তোরা দু'ভাই ঝোড়া থাকলে নে। কোদলটা কোথায় রত্না !

কেন ?

কিছু নেই তো ঘরে !

তাই বলেছি আমি। চালেডালে খিচুড়ি করতে কতক্ষণ লাগবে ! কোথায় যাচ্ছো তোমরা ?

কিছু নেই তো নেই ! তাতে কি ! ধীবেনবাবুদের বাগানে—ঘাটের মাঠে কোপালেই তো গাঠি কচু উঠে আসবে। বাগানের পেছনের জোলে ছেলেদের নিয়ে গামছা পাতলেই খাল ভাসা চিংড়ি মাছ ঠিক পড়বে। তুমি ভাত চাপাও রত্না—

অনেক দিন পরে বাবার এই গলা পেয়ে তনু নেচে উঠল। বাবা ঠিক এমন হই হই করে তাদেব নিয়ে পুকুরে নামে রবিবার। —আমিও যাব বাবা—

কোদাল হাতে বেরোতে বেবোতে অনন্ত ঘোষাল চেঁচিয়ে বললেন ,না তুই থাক। খোকন আব গৌরকে পাহারা দিবি। ওবা যেন জলে না নামে।

সামনেব বারান্দায় বেরিয়ে এসে রত্না চাপা গলায় বললেন, এই বৃষ্টিতে গরু বাছুব বেরোচ্ছে না। তুমি ছেলেদুটোকে নিয়ে কোথায় চললে ?

এ ক্রামুদ্দিন সাহেবের বাড়ির পাশ দিয়ে বাঁ দিকে এগোলে বাগান। টানা বৃষ্টির দরুন ঘাসের ফাঁক দিয়ে মাঠে মাঠে কেঁচো উঠেছে। ধীরেনবাবুর পুকুর থেকে শামুক উঠে এসে ঘাটের ধাপে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসেছে। তাল গাছ, নারকেল গাছ ভিজতে ভিজতে একশেষ তাদেব গায়ে শ্যাওলা বেরিয়ে পড়েছে।

বাগানে ঢোকার মুখে অনিল দারোগার বাড়ি। দরজা জানলা বন্ধ। কোদাল হাতে আগে আগে অনন্ত ঘোষাল। তার আজ বৃষ্টি ভিজতে খুব ভাল লাগছে। সকালটার ভেতরেই যেন কী আছে। টুনুর হাতে ঝুড়ি। পানুর হাতে দা। টুনু ভেবে পায় না—ভগবান কী করে মাটির মতো একটা জিনিস বানালো। এর ভেতর থেকে যেমন কেঁচো ওঠে। তেমনি খুঁড়লে মাটির ভেতর থেকেই এখানে ওখানে গাঠি কচু পাওয়া যায়। আবার এই মাটিতে জমে থাকা জলে মাছ হয়। শাপলা হয়। ভৈরব, রূপসা থেকে চিংড়ির দল ভাসা খালের জলে পড়ে এ মাঠে—সে মাঠে—যেখানেই নাবিতে জল—সেখানেই ছড়িয়ে পড়ে।

দেখে এগোস।

পানু আর টুনু অনন্ত ঘোষালের পেছন পেছন। পাশে পাশে। পানুর এই শ্রীশনগর খুব অঢেল লাগে। সে এক এক দুপুরে তাকে নিয়ে যতীন সিংঘির মাঠে গাব গাছে উঠে পাকা গাব পেড়ে খায়। তখন দেখেছে—গাব খেয়ে ভরপেটে কাক গলা খুলে বলছে— কা-কা—নারকেল গাছের মাঝে মাঝে আতা গাছ বসানো। এখানে সেখানে জামরুল গাছ। স

গাছেরই গুঁড়ি —গাছ তলা—সব টানা বর্ষার ধুয়ে মুছে সাফ। এখন ধোয়া মাটির ওপর নারকেল গাছের শেকড় জেগে উঠেছে।

নে। সরে দাঁড়া টুনু। এখানটা কোপাই।

পানুকে নিয়ে টুনু সরে দাঁড়াল। মাটি ভিজে ভিজে নরম। গাঠি কচুর শীষ মাটির ওপর জেগে। অনন্ত ঘোষাল দেখে শুনে কোদাল কাৎ করে মাটিতে বসাচ্ছেন। খুব জোরে নয়। তিনি জানেন, এই বৃষ্টিতে কেউ বেরিয়ে দেখতে আসবে না কে বাগানে কোদাল বসাচ্ছে।

দু'জায়গায় বেশ বড় হয়ে ওঠা গাঠি কচু কোদালের কোপে দু'ফলা হয়ে গেল। টুনু আর পানু তাই কাদা ছাড়িয়ে ঝোড়ায় তুলে নিল। ধীরেনবাবুদের বাগানের শেষে আবার যেন কাদের বাগান। এখানে অনেক বাগান এমনি পড়ে থাকে। কেউ কোনও দিনও আসে না। অনেক কালের বাগান। আম গাছ জাম গাছ আছে সে সব বাগানে। সব বুড়ো গাছ। আর ফল দেয় না। ফাটা বাকলের ভেতর সেই সব গাছে শুধুই বিষ পিঁপড়েদের বাসা। এ সব কথা শ্রীশগরের সবাই জানে। মানে পানু টুনুরা জানে। যারা খেলতে খেলতে গাছে ওঠে। গাব খায়। আম পাড়ে। জাম পাড়ে

কোপাতে কোপাতে বৃষ্টি ধরে এল। এখন অনন্ত ঘোষালের হাত পেকে এসেছে। গাঠি কচু আর জখম হচ্ছে না।

টুনু বলল, আর দরকার কি বাবা?

পানুর হাতে ঝোড়ার দিকে তাকালেন অনন্ত।

আর দরকার নেই বলছিস—

ওতেই হয়ে যাবে বাবা। আমাদের তো চিংড়ি মাছ ধরা বাকি এখনও।

অনন্ত ঘোষাল সামনের দিকে তাকালেন। ধীরেনবাবুদের বাগানের শেষে নাবিতে জল তোড়ে বয়ে যাচ্ছে। ওই তোড়ে মাছও যায়। সেখান দিয়ে একটা কাঠবেড়ালি পাঁই পাঁই করে ছুটে গেল। ওপারেই আরেকটা বাগান। সেখানে বোধহয় মানুষ যায় না কোনওদিন। বা অনেকদিন।

দেখি আর দুটো কোপ মারি—বলে অনন্ত কোদাল বসাতেই ড্যাবঢেবে শব্দ করে কোদাল ফিরে এল। বাগান জুড়ে শুধু জল পড়ার শব্দ। বৃষ্টি পড়লে সে শব্দ জোরে জোরে—নয়তো শুধুই টপ টপ। আকাশ ফুঁড়ে রোদ ওঠার কোনও চেষ্টাই নেই। অনন্ত বসে পড়ে খোবলানো মাটি ভাল করে দেখতে লাগলেন

পানু হঠাৎ কোনের ঝোড়া ফেলে লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—বাবা! কচ্ছপ!

অনন্ত দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন, চেঁচাস নে পানু।

ভিজে প্রায় অন্ধকার সব গাছতলা। এতক্ষণ অনন্ত একটা আতাগাছের নীচে কোপাচ্ছিলেন। আচমকা উঠে গিয়ে কিসে একটা লাথি কষালেন।

সঙ্গে সঙ্গে টুনু উল্টে যাওয়া একটা কচ্ছপ দু'হাতে থালার মতো তুলে ধরল। সে মুখ

বের করে টুনুর হাত কামড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না।

শক্ত করে ধরবি—বলে অন্য কোদাল দিয়ে মাটি থ্যাঁতলাতে লাগল। এখানে ওদের বাসা—

পানু খুব ভারিক্কি চালে বলল, এতক্ষণ কী আর ওরা এখানে আছে! অনন্ত ঘোষাল চাপা গলায় বললেন, দ্যাখ না পানু গাছের ওপারে কোনও গর্ত—

তার কথা শেষ না হতেই পানু লাফিয়ে উঠল। ওই যে—ওই যে বাবা—আরেকটা পালাচ্ছে—

অনন্ত ঘোষাল ছুটে গিয়ে কোদালের বাঁট দিয়ে সেটিকেও উল্টে দিলেন। এটা আগেরটার চেয়ে ছোট। পানু—তুই ও দুটো সামলা—টুনু আয়—এদিকে আয়।

টুনু তার হাতের কচ্ছপটি ঝোড়ার ভেতর চিৎ করে রাখল। সাইজে ভাতের থালার চেয়ে কিছু বড়ই হবে। আজকের এই বৃষ্টিভেজা সকালটা তার ভীষণ সুন্দর লাগছে--নিয়ে আয় পানু--

পানু একটু ভয়ই পেয়েছে। কচ্ছপটা ছোট হলে কি হবে—গলাটা বোধহয় বেশি লম্বা। সে হাঁ করে পানুর হাতের আঙুলে কামড়ে দিতে চাইছে। ছুটে এসে পানু বলল, দে দাদা—

ঝোড়ার ভেতর সেটাকেও চিৎ করে দিয়ে টুনু বলল, চেপে রাখবি। পানু বলল, কী দিয়ে রাখবো?

কেন? পা দিয়ে চেপে রাখ--

পানু পারল না। পা রাখতে তার ভয় করছে। একটা ইট চাপা দিই দাদা?

এখানে ইট পাবি কোথায়! দূর বোকা!

ওদিকে থেকে অনন্ত ডাকলেন, এলি টুনু—

যাই বাবা—বলে টুনু পানুর দিকে তাকালো। তাহলে বুকের ঠিক মাঝখানটা তোর দু' হাত দিয়ে দুটোকে চেপে ধরে রাখ।

কামড়ায় যদি?

তোর হাতের নাগালই পাবে না!

ততক্ষণে অনন্ত ঘোষাল বাঁট থেকে কোদাল খুলে ফেলেছেন। কোদালখানা জল বোঝাই নাবির গায়ে একটা বড় গর্তের মুখে রেখে তাতে নাবির ভিজে মাটি তুলে তুলে চাপা দিচ্ছেন। টুনু দেখল-- তার বাবার ধুতি কাদায় মাখামাখি। মুখেও ভিজে পাঁক পাঁক মাটি ছিটকে এসে লেগেছে। গায়ের গেঞ্জিটি জলকাদায় ভর্তি।

এটাই বাঁট গুঁজে দিয়ে এগোবো। বাসায় থাকলে ওরা এই গর্ত দিয়ে বেরোতে চাইবে তুই কিন্তু কোদালখানা চেপে রাখবি টুনু।

টুনু মাথা নাড়ল।

তবু অনন্ত ঘোষাল জানতে চাইলেন, পারবি তো? ভয় করবে?

খুব পারব বাবা। ভয়ের কি ! যদি বেরিয়েও আসে উল্টে দেব সঙ্গে সঙ্গে।

পানু দু হাতে কচ্ছপ দুটোর মুখ চেপে আছে। তাবা ঝোডাব ভেতর চিৎ হয়ে গলা বের করে পানুর হাত কামড়াতে চাইছে বার বার। একটুর জন্যে পাবছে না। পানুকে এই দশায় দেখে একটা কাঠবেড়ালি বুঝতে পেরেছে—পানু তার কিছু কবতে পাবরে না। তাই সে পানুর প্রায় গা ঘেঁষে পায়ের পাতা ঘেঁষে চলতে ফিবতে শুরু করে দিল। অন্য সময় হলে পানু তাকে খপ করে ধরে ফেলত।

এখন বৃষ্টি নেই। পানু বুঝতে পারছে—তারা ঠিক ফেরদৌসদাদের বাড়ির পেছনটায় এখন। সে-বাড়ির কথাবার্তাও কানে আসছে তার। ফেবদৌসদাব দাদির দাঁত নেই।পান ছেঁচে খান। ছোট্ট হামানদিস্তায় পান ছেঁচছেন একা একা দোতলায় বসে। সে শব্দও শুনতে পেল পানু।

অনন্ত ঘোষাল কোদালের বাঁটখানি মাটিতে পিটিয়ে পিটিয়ে দেখতে লাগলেন। বৃষ্টি না হলে শুকনো মাটিব ভেতবকার খোঁদলেব আওয়াজ বুঝতে সুবিধে। ফাঁকা হলে তাব আওয়াজ অন্যরকম। কিন্তু এখন যে ঘোর বর্ষাকাল। জোরে পেটালেও সব জায়গাতেই একইরকম ড্যাবডেবে শব্দ।

রূপসা দিয়ে সিপসায় পড়ে বড় নদীর গায়ে মোরেলগঞ্জ। সেখানে অনন্ত ঘোষালেব বাবার বিয়ে করে পাওয়া ভাগচাষেব জায়গা জমি। শীতকালে সেখানে ভাগের ধান চাল আদায়ে গিয়ে অনন্ত ঘোষাল অনেক কিছু শিখেছেন। বোয়াল মাছ ধরার ফাতনায় কেমন করে ডিমের ফাঁপা খোল গেঁথে দিতে হয়। কচ্ছপের বাসাবাড়িব খোঁদলেব মুখ কেমন হয়।

তার মন বলছে এখানে এখনো আরও তিন-চারটে কচ্ছপ আছে। ছোট বড় মিলিয়ে। ওদের বেবোবাব রাস্তা থাকে জলের দিকেই। সেখানে টুনু দাঁড়িয়ে। অনন্ত ঘোষাল কোদালের বাঁট দিয়ে জায়গাটা দু' তিনবার পেটাল—আর খানিকবাদে গাঠি কচুর জন্যে খুঁড়ে ফেলা মাটিব ভেতর দিয়ে বাঁটখানি যতটা পারেন ঠেলে গুঁজে দেন। গর্ত মতো জায়গা খুঁজে খুঁজে।

ভোরে উঠে বৃষ্টির সঙ্গে দেখা। আকাশ কালো হয়ে থাকলেও ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন একটা আলোর গলি—সেই মেঘ অব্দি চলে গেছে। নয়তো গাঠি কচু তুলতে এসে কচ্ছপ পাবো কেন ?

একথাই নিজেকে বোঝালেন অনন্ত ঘোষাল। রত্না কচ্ছপ খুব ভাল রাঁধে। শীতকালে বাজার থেকে কিনে এনে কেটেকুটে দেন অনন্ত। রত্না উঠোনে কাপড় কাচার কডাইয়ে মশলা মেখে চাপিয়ে দেয়। খানিক বাদে মাংসের গন্ধে বাতাস ভুর ভুর করে ওঠে। কাক এসে বসে পাঁচিলেব ওপর। লাইন দিয়ে। ওরা সেখান থেকে নড়তে পাবে না।

ভাল করে চেপে ধবে আছিস তো পানু ?

হ্যাঁ বাবা। আর কতক্ষণ ?

আলো নেই

বেয়ারা এসে বলল, সাহেব ডাকছেন।

সাহেব মানে বাঙলা সরকারের প্রচার দফতরের সেকশন অফিসার—তমিজউদ্দিন সাহেব। দফতরের মাথায় চৌকশ আলতাফ হোসেন। তিনি দফতরটিকে এমন করেই ঢেলে সাজিয়েছেন—যাতে কোয়ালিশন সরকারের পার্টনার মুসলিম লিগের চিন্তাভাবনা দিকে দিকে ছড়িয়ে যায়। আব্বাসউদ্দিন টেবিল ছেড়ে উঠলেন। তিনি এই অফিসে রেকর্ডিং এক্সপার্ট টু দি গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল।

তমিজউদ্দিন সাহেবের মুখোমুখি হতেই তিনি আব্বাসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন। জানতে চাইলেন, ক'দিনের ছুটি নিয়ে কোথায় যাওয়া হয়েছিল? আব্বাসউদ্দিন সব সময় মুখখানি খারাপ করে রাখা এই দুর্মুখ অফিসারকে এড়িয়ে চলেন। তিনি নিচু গলায় বললেন, আজ্ঞে বায়ু পরিবর্তনে গিয়েছিলেন। দার্জিলিংয়ে—

সে তো বুঝতেই পারছি এই চিঠিখানি পেয়ে। আব্বাসউদ্দিন দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে মনের আনন্দে তমিজউদ্দিন সাহেবকে চিঠিখানি লিখেছিলেন। এতদিনে পেলেন সেই চিঠি? পোস্ট অফিসের যা গোলমাল-

আব্বাসউদ্দিনের ও কথায় একদম কান না দিয়ে তমিজউদ্দিন সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন, পঞ্চাশ টাকার কেরানির আবার বায়ু পরিবর্তন কেন!

আব্বাসউদ্দিন চুপ করে থাকলেন।

তমিজউদ্দিন এবার বললেন, আপনার তো খুব সাহস। আমি অফিসে আপনার সুপিরিয়র। আমাকে পার্সোনাল চিঠি লিখেছেন কেন?

দার্জিলিং থেকে পাঁচ-ছ পাতার এই চিঠিখানিতে আব্বাসউদ্দিন কিছু কাব্যও করে ফেলেছেন। কিন্তু তমিজউদ্দিন সাহেবের ওই কথাটি তাঁর একদম সহ্য হল না। তিনি স্পষ্ট করে বললেন, আপনার ভাগ্য যে আমি আপনাকে চিঠি লিখেছি। আমি আব্বাসউদ্দিন

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন আব্বাসউদ্দিন। তারপর একখানি কাগজ টেনে নিয়ে তাতে খস খস করে রেজিগনেশনের কথা লিখলেন। লিখে সেটি তমিজউদ্দিন সাহেবের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর লালবাজার পেরিয়ে বাঁয়ে চিৎপুরের দিকে চলতে লাগলেন।

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু চাপা গরম রয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে নিজেকেই তিনি বললেন, চাকরি ছেড়ে দিলাম—তাই বলে না খেয়ে মরব না। খান কয়েক গানের রেকর্ড তাঁর ভালই চলছে। মাসে মাসে এখন গান থেকে টাকা আসে। তা থেকে কিছু টাকা পাঠাতে হয় তুফানগঞ্জে—বউকে। আমি তো দিব্যি আছি বউবাজারের মেসে। খাওয়া-থাকা দশ টাকা।

চাকরিটা ছেড়ে দিতে পেরে নিজেকে আব্বাসউদ্দিনের শেকল কাটা পাখি মনে হচ্ছে। তিনি রাস্তার বাঁ ফুট ধরে হাঁটতে লাগলেন। গুন গুন করে গাইতে গাইতে। একসঙ্গে তার মাথার ভেতর পর পর সব ছবি ভেসে উঠছে। গাইছি। লোকে শুনছে। তাদের ভাল লাগছে। একদিন এমন পপুলার হয়ে গেলাম যে, দেশসুদ্ধ সব্বাই চেনে। এ সব যেন ছবির মতো পর পর দেখতে পাচ্ছেন আব্বাসউদ্দিন। আর গুন গুন করে গাইছেন। কাজিদার লেখা গান। এখনও সুরে পড়েনি। আল্লা নামের বীজ বনেছি...পরের লাইনটা মনে পড়ছে না।

বিষ্ণুভবনে আজ একদম কে মল্লিকের মুখোমুখি পড়ে গেলেন আব্বাসউদ্দিন। একেবারে সাধা গলা কে মল্লিকের। কথা বলেন ঢিমে তালে। সেই তালেই চলতে থাকলেন, নজরুল তো ইসলামি গান লিখছেন শুনছি। এবার আমি ওঁর লেখা ইসলামি গান গাইব। আব্বাস ভাই, তুমি এর একটা ব্যবস্থা কর। আমি এতকাল শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে আসছি। সবাই আমাকে জানে মল্লিকমশাই। আমি মুসলমানের ছেলে হয়ে ইসলামি গান গাইব না?

ভগবতীবাবুকে বলুন—

ওই ভট্টাচার্যকে আমি বলতে পারব না। তুমি বল আব্বাস। তোমার কথায় কাজ হবে। তোমরা হলে গিয়ে নতুন কালের গাইয়ে।

আব্বাসউদ্দিন বুঝতে পারছেন, ভগবতীবাবুকে কে মল্লিক খুব ভয় খান। কিছু না বলে তিনি আপন মনে গেয়ে উঠলেন—

দাদা, কেবা কার পর কে কার আপন
পথিকে পথিকে পথের আলাপন

গাইতে গাইতে আব্বাসউদ্দিন থামতেই কে মল্লিক বললেন, থামলে কেন ভায়া!

শুধু মুখটা মনে আছে। সেই কোন ছোটবেলায় তুফানগঞ্জে যাত্রার আসরে শুনেছিলাম। যাই দেখি ভগবতীবাবু কোথায়—

তুমি ঠিক করে বললেই হয়ে যাবে।

কথাটা পাড়তেই ভগবতীবাবু বিড় বিড় করে উঠলেন। তিনি বললেন, তা হলে

আব্বাসউদ্দিন আপনি মল্লিকমশায়ের পড়ে থাকা শ্যামাসঙ্গীতের রেকর্ডগুলো কিনে নিয়ে কোম্পানিকে লোকসানের হাত থেকে বাঁচাবেন। আপনার কথায় কোম্পানি রাজি হওয়ায় ট্রায়াল দিতে ইসলামি গান লিখছেন নজরুল। সুর দিচ্ছেন। আপনারা গাইবেন। খুব ভাল কথা। এ অব্দি ঠিক আছে। কিন্তু মল্লিকমশায়কে অন্য গানে টানা ঠিক হবে না।

কি বলছেন? তিনি একজন মুসলমান। মুসলমানের ছেলে হয়ে ইসলামি গান গাইবেন না?

শিল্প জগতে এমন তো হয়েই থাকে আব্বাসউদ্দিন। ঠিক হয়েছে ধীরেন দাশ এবার থেকে রেকর্ডে ইসলামি গান গাইবার সময় গণি মিঞা নাম নিয়ে গাইবেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক নতুন নাম গাইতে না এলে ইসলামি গান ক্লিক করবে কী করে। তাই ঠিক হয়েছে চিত্ত রায় ইসলামি গান গাইলে রেকর্ডে তাঁর নাম হবে দেলোয়ার হোসেন। গিরীন চক্রবর্তী—সোনা মিঞা। আশ্চর্যময়ী হবেন সাকিনা বেগম।

বাঃ! বেশ বুদ্ধি আছে তো আপনার

ভগবতী ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রশংসায় একটুও গললেন না। বললেন, সবার গলাই যে বিক্রি হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু ধরুন ধীরেন দাশ গণি মিঞা নাম নিয়ে ইসলামি গান গেয়ে যদি সফল হন—তা হলে কোম্পানির স্বার্থে তাঁকে গণি মিঞা হয়েই থাকতে হবে। ইসলামি গানই গাইতে হবে। হিন্দুর ছেলে বলে কীর্তন গাইবার বায়না করা চলবে না ধীরেনবাবুর। আপনি যখন ইসলামি গানের জেদ ধরেছেন—কোম্পানি তা করবেই। কে গাইবেন—কে গাইবেন না—এসব ব্যাপার আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।

নজরুলের ঘরে যেতেই তিনি বললেন, আব্বাস! দশরথকে বলে এক ঠোঙা পান আর চা আনিয়ে দাও।

আব্বাসউদ্দিন বুঝতে পারছেন, কাজিদার মাথায় গান এসেছে। ওসব এলে নজরুল বললেন, বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করে দাও।

আধ ঘন্টাও হয়নি। নজরুল ডেকে পাঠালেন। দ্যাখো তো আব্বাস—

ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে

এল খুশীর ঈদ-

তখনই হারমোনিয়ম ফিরিয়ে ফিরিয়ে নজরুল গানটিকে সুরে বসিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, বলি এসো আব্বাস—

খুশিতে টগবগ করতে করতে আব্বাসউদ্দিন তাঁর মেসে ফিরে এলেন। আজ যে তিনি রাইটার্স বিল্ডিংসে তার চাকরিতে রিজাইন দিয়েছেন—সে জন্যে তাঁর কোনও দুঃখই নেই বরং আনন্দ এই ভেবে যে, কাজিদা ইসলামি গান লিখতে শুরু করেছেন। পরদিন নজরুল ইসলাম আরেকখানি নতুন গান লিখলেন—

ইসলামের ঐ সওদা লয়ে

এলো নবীন সওদাগর—

শুধু হারমোনিয়াম আর তবলা। ভগবতীবাবু জানালেন, চারদিন পরেই রেকর্ডিং।

তখনও ভাল করে গানটা মুখস্ত হয়নি আব্বাসউদ্দিনের। নজরুল বললেন, আমি আগে যেমন চার্জড হয়ে শ্যামাসঙ্গীত লিখেছি—এবার আব্বাস তোমার ইন্সপিরেশনে তেমনি চার্জড হয়ে ইসলামি গান লিখলাম। এখন সবটাই তোমার গায়কী আব্বাস।

তা কেন কাজিদা? আপনার এত সুন্দর বাণী।

রেকর্ডিংয়ের সময় নজরুল ইসলাম গানের পাণ্ডুলিপি হাতে ধরে আব্বাসউদ্দিনের চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

দু মাস পরে ঈদ উল ফেতর। তখন গান দুটি রেকর্ড হয়ে বেরোলো। ঈদের বাজার করতে ধর্মতলায় গেছেন আব্বাসউদ্দিন। পথে সেনোলা রেকর্ড কোম্পানির বিভূতিদার সঙ্গে দেখা। দেখেই তিনি বলেন, আরে আব্বাস যে! আমার দোকানে একবার এসো।

আব্বাসউদ্দিন সেনোলা কোম্পানির দোকানে গিয়ে বসতেই বিভূতিদা একজন ফটোগ্রাফারকে ডেকে এনে আব্বাসউদ্দিনকে দেখালেন। তারপর বললেন, এঁর একটা ফটো নিন তো।

ব্যাপার কি বিভূতিদা?

তোমার একটা ফটো নিচ্ছি। ব্যস! আবার কি?

ঈদের বন্ধের পর একদিন মেস থেকে বেরিয়ে আব্বাসউদ্দিন ট্রামে করে কলেজ স্ট্রিটে চলেছেন। যাবেন ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে। কৃষ্ণচন্দ্র দে গাইবেন। তাই শুনতে যাওয়া। হঠাৎ তার পাশে এক যুবক গুন গুন করে গাইছে—

ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে—

চমকে উঠলেন আব্বাসউদ্দিন। এ গান ছেলেটি কী করে শুনল? কলেজ স্ট্রিটে আর যাওয়া হল না। আব্বাসউদ্দিন ট্রাম থেকে লাফিয়ে নেমে উল্টোদিকের ধর্মতলার ট্রাম ধরলেন। সেনোলা রেকর্ডের দোকানে যেতেই আব্বাসউদ্দিনকে জড়িয়ে ধরলেন বিভূতিদা।

কামাল করে দিয়েছো আব্বাস—তারপর একজনকে ডেকে বললেন, সন্দেশ, রসগোল্লা, চা নিয়ে এসো তো। আব্বাস খাবে। খানিক বাদে আব্বাস খেতে খেতে দেখলেন— ওই গান দুটি বড় আর্ট পেপারে ছাপানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ছাপানো হয়েছে তাঁর নিজের বিরাট ছবি। সব বান্ডিল বান্ডিল।

বিভূতিদা বললেন, আব্বাস কিছু পোস্টার নিয়ে যাও। বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিলি করে দিও। আমি প্রায় সত্তর আশি হাজার ছাপিয়েছি। ঈদের দিন এ সব বিলি করেছি। এই দেখ দু হাজার রেকর্ড এনেছি তোমার।

আব্বাসউদ্দিন কোনও কথা বলতে পারলেন না। তাঁর দুই চোখ দিয়ে টপ টপ করে

জল পড়ছে। বিভূতিদা তার পাশে এসে চাপা গলায় বললেন, তুমি দোকানে আসায় অনেকে তোমার দিকে তাকিয়ে। তুমি এখন বিখ্যাত গাইয়ে। তুমি এভাবে প্রকাশ্যে কাঁদতে পার না আর এখন।

তবু চোখের জল বাধা মানছে না আব্বাসউদ্দিনের। বিভূতিদা ফের চাপা গলায় বললেন, চোখ মোছো আব্বাস। চোখ মোছো। ও কি সন্দেশটা পড়ে রইল কেন?

•আব্বাসউদ্দিন কোনও মতে বলতে পারলেন, অ্যাতোটা ভাবিনি বিভূতিদা। আপনারা সবাই আমাকে ভালবাসেন।

বিষ্ণু ভবনে যেতে যেতে প্রায় সন্ধে। আব্বাসউদ্দিন দেখলেন, কাজিদা রিহার্সেল রুমে খুব মন দিয়ে ধীরেন দাশের সঙ্গে দাবা খেলছেন। এই খেলার সময় তিনি সব ভুলে যান।

কাজিদা!

আব্বাসউদ্দিনের গলা শুনে তাকে জড়িয়ে ধরলেন নজরুল। আব্বাস, তোমার গান কী যে—

আব্বাসউদ্দিন তাঁর কাজিদাকে আর কথা বলতে দিলেন না। তাঁর পা ছুঁয়ে কদমবুসি করলেন।

খানিক বাদে ভগবতীবাবুর ঘরে গেলেন আব্বাসউদ্দিন। তা হলে এক্সপেরিমেন্টের ধোপে টিঁকে গেছি। কেমন?

ক'দিনের ভেতর ধর্মতলা স্ট্রিটে সব গ্রামোফোন আর রেকর্ডের দোকানে একই গলা শোনা যায়। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গান শুনে লোকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আব্বাসউদ্দিনের গলায় নজরুলের বাণীতে ইসলামি গান। মফস্বল থেকে কলকাতায় হাটবাজার করতে এলে অনেকেই ফেরার পথে আব্বাসউদ্দিনের এই রেকর্ডখানি কিনে নিয়ে যান।

গানের পর গান লিখছেন নজরুল—

নাম মোহাম্মদ বোল রে মন
নাম আহমদ বোল—

কমলালয় স্টোর্স থেকে গ্রামোফোন বিক্রি করছে। ঘরে ঘরে গ্রামোফোন। কে সি দে, পঙ্কজ মল্লিক, কাননদেবী, সায়গল—যেমন আছেন—তেমনি আছেন আব্বাসউদ্দিন, গণি মিঞা, সাকিনা বেগম। গাঁয়ে গাঁয়ে আল্লা রসুলের গান।

একদিন আব্বাসউদ্দিন চিৎপুর রোডে বিষ্ণু ভবনে যেতেই ভগবতী ভট্টাচার্য একখানি চিঠি এগিয়ে দিলেন।

কার চিঠি?

আপনার। পড়ে দেখুন।

চিঠিখানি এসেছে কুষ্ঠিয়ার কামারখালি গ্রাম থেকে। লিখেছেন—কোনও এক মকবুল

ইসলাম। চিঠিখানি এরকম--

হুজুর। কুকুর মার্কা হলুদ রেকর্ড অর্থাৎ 'টুইনে' গান দিলে আমরা বারো আনা, এক টাকায় অনায়াসে কিনতে পারি।

আব্বাসউদ্দিন ভগবতীবাবুকে বললেন, আমি টুইনে গাইব। কথাটা কাজিদার কানে গেল। তিনি তো মহা আপত্তি করে উঠলেন। বললেন, পাগল! এই কিছুদিনের ভেতর রেকর্ডে রয়ালটি চালু হবে। টুইনে গাইলে আব্বাস আর্থিক দিক দিয়ে ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আব্বাসউদ্দিন বললেন, না কাজিদা। হোক গে আর্থিক ক্ষতি। অনেকের কাছে তো সস্তায় আমার গান পৌঁছে যাবে। কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত হলে টুইন রেকর্ডেই গাইব। রেকর্ড পিছু পাবো একশো টাকা।

নজরুল মাথা নিচু করে বললেন, যা ভাল বোঝো।

এদিকে অল্পদিনের ভেতরেই ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আগের থেকে অনেক বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। শ্রীশনগরের আকাশ এখন অন্ধকার। তিনি ঘোড়ার গাড়ি নেননি। দিব্যি পায়ে হেঁটে একা একাই চলেছেন। ধুতির ওপর ফুলশার্ট। পায়ে কলকাতা থেকে আনানো মোকাসিন। হাতে কিন্তু ছড়ি নেননি আজ। অন্য সময় নিয়ে থাকেন। কেন জানি ছড়িখানি আজ তাঁর অতিরিক্ত মনে হল। পঞ্চবীথির মোড়, ডাকবাংলো রোড, গান্ধী পার্ক—সব জায়গাই যেন কেমন ম্যাড়মেড়ে। এ সব মোড় পেরিয়ে গার্লস কলেজের সামনে মহেন্দ্র ঘোষের বাড়ির মুখোমুখি হলেন ধীরেন্দ্রনাথ। শহরে যে-ক'জন জমিদার আছেন—তাঁদের ভেতর মহেন্দ্র ঘোষের বাড়িটি--তার সামনের বাগান—সবই খুব সুন্দর করে সাজানো। এঁদেরই জ্ঞাতিভাই কালিদাস ঘোষ। একসময় স্টেজ বেঁধে থিয়েটার করতেন। মহেন্দ্রবাবুর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। কালিদাস ঘোষের সম্ভবত ছিয়ানব্বই কিংবা সাতানব্বই বছর বয়স হয়েছে। লম্বাচওড়া চেহারা। কিন্তু শরীরের বাঁধুনি ঢিলে হয়ে গেলেও কালিদাস ঘোষ একজন ষোল আনা জমিদার। কথাবার্তায়। পোশাকে। মর্যাদায়। তিনি মহেন্দ্র ঘোষদের জমিদারির ছ-আনার অংশীদার একাই। কিন্তু তিনি মারা গেলে সব সম্পত্তি মহেন্দ্র ঘোষে বর্তাবে। কালিদাস নিঃসন্তান। এখন শহরের লোকজন বলাবলি করেন, কালিদাসের আগে মহেন্দ্রই না চলে যান।

ধীরেন্দ্রনাথের চোখে কালিদাস একজন কালারফুল মানুষ। মন খারাপ হলে তিনি কালিদাস ঘোষের কাছে ছুটে ছুটে আসেন। এই ঘোষ পরিবার থেকেই শহরের অনেকেই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন। এখন আর কিছুকাল এ সব হওয়া হচ্ছে না। ধীরেন্দ্রনাথ বিশাল বৈঠকখানায় ঢুকতেই কালিদাস বলে উঠলেন, কী খবর ধীরেন্দ্রনাথ?

চলে এলাম আপনার কাছে।

কালিদাস একখানি কোচে হেলান দিয়ে বসে। কোমর অব্দি জামেয়ার টানা।

ছাগলের লোম দিয়ে বোনা এই জিনিসটি খুব গরম। অন্যত্র শীত কমে গেলেও কালিদাস ঘোষের বিশাল বৈঠকখানায় শীত এখনও যায়নি।

দুজন ছোকরা খুব মন দিয়ে কালিদাসের গা হাত পা টিপে দিচ্ছে। পেছনে বিরাট মহল। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। স্ত্রী ছিলেন। নেই। মেয়ে ছিল। নেই। তাঁর ছেলেমেয়েরা ছিল। এখন আর তাঁরা নেই। বিলেতে থাকে।

ধীরেন্দ্রনাথ তুমি যেভাবে চিন্তিত মুখে এসে বসো—ঠিক এইভাবে তোমার বাবা শ্রীশচন্দ্র এসে বসত। তবে শ্রীশচন্দ্রের জমিদার হওয়াটা তোমার চেয়ে অনেক কঠিন ছিল।

এখন তো জমিদার হয়ে টেকাই দায় হয়ে উঠেছে জ্যাঠামশায়।

কোনও চিন্তা কোরো না ধীরেন। জমিদার হিসেবে যদি টিকতে না পার তো আরেকরকম লোক হয়ে টিকে থাকবে। প্রতিষ্ঠা পাওয়া মানুষ কোনও না কোনওভাবে টিকে যায়। সব রাস্তা তো মসৃণ হয় না ধীরেন।

হকসাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সব পাপের বোঝা জমিদারদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। আমরা বিলুপ্ত হলেই যেন চাষিদের অবস্থা ফিরে যাবে।

ধীরেন্দ্রনাথ, আমার জন্ম সিপাহী বিদ্রোহের আগের বছর। আমি ছোটবেলা থেকে অনেককিছু দেখে আসছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—সমাজের কোনও অংশই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে পারে না।

এখানে এলে মনটায় জোর পান ধীরেন্দ্রনাথ। তিনি জানতে চাইলেন এ সব কথা কোন বিশ্বাস থেকে বলেন জ্যাঠামশাই।

খানিকক্ষণ কী ভাবলেন কালিদাস ঘোষ। তারপর বললেন, জমিদার হয়েছিলেন কারা? যারা সাহসী। উদ্যমী। পরিশ্রমী। এঁদের ভেতর কেউ কেউ ছিলেন লাঠিয়াল। কেউবা নদী-ডাকাত। কিন্তু বিত্ত, প্রতিষ্ঠা মানুষকে সুষম করে তোলে।

আপনি কি মনে করেন না- আমাদের সব জমিজায়গা চলে যাবে? আমরা পথের ভিখারি হয়ে যাব। যেমন হয়েছে রাশিয়ায়।

রাশিয়া আর ভারত এক ধরনের দেশ নয়। এখানে আগামী তিরিশ বছরে অনেক পরিবর্তন আসবে। কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষে কোনওদিনই নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা জনসমর্থন পাবে না। ধীরেন্দ্রনাথ কিছু খাবে?

আপনারই খাবার থাকে না তো আমি কী খাব?

কে বলেছে—খাবার থাকে না?

আমার এখন ঠিক খিদে পায়নি। আপনি বরং কিছু বলুন।

তুমি ঠিক কোন সময়টা শুনতে চাও?

আপনার যেখান থেকে ইচ্ছে—বলে ধীরেন্দ্রনাথ লক্ষ করলেন, আজ রাতে কালিদাস ঘোষ দরবারি পোশাক পরেছেন। মাথার মুকুটটি একটি গোল টেবিলের ওপর রয়েছে হাতে বড় একটা হিরের আংটি

আংটির ওপর আলো পড়ায় হিরেটা চক চক করে উঠেছে। গোল টেবিলে রাখা ওরকম কোনও মুকুট ধীরেন্দ্রনাথ কোনওদিন মাথায় পরেননি। তার বাবা শ্রীশচন্দ্রর একটি ছবিতে দেখা যায়—তিনি মাথায় কী একটা পরে আছেন। ছবি দেখে যা মনে হয়েছে ধীরেন্দ্রনাথের তা হল—সেটা ঠিক মুকুট নয়। অনেকটা ছবির বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাথায় যেমন আছে—তেমনি বিড়ে পাকানো কাপড়ের পাগড়ি যেন। কালিদাস ঘোষকে এত বিরাট বৈঠকখানায় মনে হচ্ছে—তিনি যেন দরবারে বসেছেন। পাহাড়ি ছাগলের কালো লোমে বোনা জামেয়ারের বাইরে বেরিয়ে থাকা শরীরের ওপরটা গরদের পাঞ্জাবিতে ঢাকা। তার ওপরে কালিদাস ঘোষের মুণ্ডুটি বসানো। ঘিয়ে রঙের চামড়া। তার ওপরে চোখের জায়গায় চোখ। নাকের জায়গায় নাক। মাথায় সাদা ফুলের সমান কিছু চুল। কালিদাস ঘোষ ডান কনুইটি একটি তাকিয়ায় ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছেন। এগিয়ে দেওয়া পা জামেয়ার দিয়ে আগাগোড়া ঢাকা। পালঙ্কের নীচেই দেখা যায় তার নাগরা জোড়া সাজানো।

কালিদাস ঘোষ ছোকরা দুজনকে ইশারা করতে তারা ভেতরে চলে গেল। ওরা যাবার সময় ধীরেন্দ্রনাথ লক্ষ করলেন—কাজের লোক দুটির গায়ে এমনই পিরান—যার সামনে পেছনে সমান কলকার কাজ করা—আগেকার ছবিতে হুকুমবরদারদের গায়ে এমন জামা দেখেছেন তিনি।

আজ এখন ধীরেন্দ্রনাথের মনে হচ্ছে—এই নির্জন বিশাল জমিদার বাড়ির মধ্যে অন্ধকার বৈঠকখানায় কালিদাস তার দরবার বসিয়েছিলেন যেন। কোনও শব্দ নেই। কোনও প্রজা নেই। কোনও হুকুম নেই। কোনও শাস্তি নেই। শুধু আগেকার পোশাক পরে কালিদাস যেন মুছে যাওয়া দিনের মহড়া দিচ্ছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ আচমকাই বলে ওঠেন, আপনার বয়স ছিয়ানব্বই সাতানব্বই ?

হ্যাঁ। কোনও সন্দেহ আছে ?

না। তা হলে বয়স কমিয়ে বলেন কেন—যে আপনি জন্মেছেন সিপাহি বিদ্রোহের আগের বছর ?

বয়স তো কমাইনি আমি। আমার সতেরো বছর বয়সে সিপাহি বিদ্রোহ হয় ধীরেন্দ্রনাথ।

তাহলে। আপনিই তো স্বীকার করছেন—আপনি সতেরো বছর বয়স কমিয়েছেন।

না। কমাইনি ধীরেন্দ্রনাথ। সিপাহি বিদ্রোহের আগের বছর আমি জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি পাই। তাই ওই বছরটিকে আমার জন্মসন মনে করি।

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, কিছু বুঝলাম না জ্যাঠামশায়।

ধমকে উঠলেন কালিদাস। আমায় জ্যাঠামশায় বোলো না। তোমার কোনও জ্যাঠামশায় থাকলে—তারও জ্যাঠামশায় হতাম আমি। এর ভেতর না বোঝার কিছু নেই ধীরেন্দ্রনাথ। আমার যখন সতেরো বছর বয়স—তখন কোর্ট অব ওয়ার্ডস আমায় জমিদার

হিসেবে স্বীকার করে নিল—অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর। জীবনের বিত্তহীন প্রথম সতেরোটি বছর আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি জীবন থেকে। তাই সিপাহি বিদ্রোহের আগের বছরটিকে আমি আমার জন্মসন মনে করি।

খুবই ঘাবড়ে গিয়েছেন ধীরেন্দ্রনাথ। কোনও মানুষ তার জীবনের সতেরোটি বছর এভাবে ইচ্ছেমতো বাদ দিতে পারে? সেই সতেরোটি বছর কি জীবন নয়। বিত্তই সব?

ঠিক এই সময় কলকাদার পিরান গায়ে কালিদাস ঘোষের দুই হুকুমবরদার দুটি বিরাট তামার থালা এনে রাখল গোল টেবিলের ওপর। পাথর বসানো মুকুটটির পাশে।

ঘরের ইলেকট্রিক আলোয় তামার থালার ওপর সবুজ মিনার কাজ চোখে পড়ে। তার ওপর থরে থরে আখরোট। আরও কী সব ফল। নানা রঙের। ধীরেন্দ্রনাথ অ্যাতো ফল চেনেন না।

নাও খাও—

ধীরেন্দ্রনাথ হাত গুটিয়েই বসে রইলেন।

দু-চারটে খাও। আমি এসব খেয়েই থাকি বলে বাইরে রয়েছে—আমার খাবার কিছু থাকে না। আমি বাতাস খেয়ে বেঁচে আছি। লোকে খাবার বলতে বোঝে ভাত—নানা রান্না। আমি ধীরেন্দ্রনাথ অতি অল্পবয়স থেকেই শুকনো ফলটল খেয়ে বেঁচে আছি। ভালই আছি। লোকে আমাকে টুকটাক খেতে দেখে ভাবে—আখরোট আবার একটা খাবার নাকি! অথচ দ্যাখো প্রথন জীবনের সেই সতেরোটি বছর জুড়লে আমার বয়স তো একশো হতে আর তিনটি বছর বাকি। তাই না? কী বলবেন ধীরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারছেন না।

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ আমার জ্ঞাতি ভাইয়ের ছেলে। তাকে শহরের লোক চেনে কারণ সে এই শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিল। আমাকে যারা চিনতো তারা কবেই মরে হেজে গেছে।

ধীরেন্দ্রনাথের মনে হল—ঘিয়ে রঙের মুখের ভেতর পাতলা. আবছা ঠোঁটে কথাগুলো বুজগুড়ি হয়ে ফুটে উঠছে। একটা কথার ভেতর কেমন করে যেন আরেকটি কথা ঢুকে যাচ্ছে।

একটা আখরোট তুলে মুখে দিলেন ধীরেন্দ্রনাথ। কালিদাস ঘোষ বললেন, প্রায় দেড়শো বছর আগে কোম্পানি আমলের রিটায়ার্ড ফৌজি অফিসার মিস্টার রেনি এই খুলনায় বড় জমিদার। তখন অনেক সাহেবই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে সারা বাংলাদেশে জমিদারি করে বসে। রেনি ছিল তেমনই একজন ইংরেজ। আমার জন্মের পর যশোর থেকে কেটে খুলনা হল মহকুমা। আমি যখন চল্লিশ বেয়াল্লিশ ধীরেন্দ্রনাথ—তখন খুলনা হয়ে গেল জেলা। রেল এসে গেল। আসাম থেকে ছেড়ে বিহারে যেত স্টিমার খুলনা হয়ে। সে এক অদ্ভুত সুন্দর সময় ধীরেন্দ্রনাথ। রোজ কোনও না কোনও নতুন ঘটনা ঘটত। রেল লাইন বসার সঙ্গে সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটি হয়ে গেল এখানে। সবই আমার চোখের সামনে ঘটল। তখন কতই বা লোক থাকত এই শহরে। বড়জোর ন-দশ হাজার।

ইংরেজ জমিদার রেনির কী কথা বলছিলেন ?

ও হ্যাঁ। বেনেখামারের জমিদার ছিলেন শিবনাথ ঘোষ। রেনির সঙ্গে শিবনাথের লড়াই লেগেই থাকত। আমরা হলাম গিয়ে সেই শিবনাথের বংশধারা।

তাহলে আপনি কেন বিত্তহীন ছিলেন জীবনের প্রথমদিকে ?

সুদূর দৃষ্টিতে কালিদাস ধীরেন্দ্রনাথের মুখে তাকিয়ে রইলেন। বাইরে রাস্তায় কার ল্যান্ডো বা ব্রুহাম গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। ঘোড়ার পায়ের টগবগ। কোনও কথা নেই। শেষে বৈঠকখানার আবছা আলোয় কথা বলতে লাগলেন কালিদাস ঘোষ।

আমি যে জমিদার শিবনাথ ঘোষের বংশধারার একজন—এটাই প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

অবাক হলেন ধীরেন্দ্রনাথ। কোনও কথা বললেন না।

আমার বাবা অগোছালো ছিলেন। মাকে বিয়ে করার সময় পাননি। সেটাই ছিল বাবার প্রথম দাম্পত্য জীবন

তাহলে ?

কোম্পানির হাত থেকে দেশের শাসন মহারানির হাতে আসেনি তখনও। খুলনা আদালতের সামনে তখন হোগলা আর বাবলার বন। বৈঁচি গাছে ভর্তি। যশোর থেকে জেলা জর্জ ইউনি সাহেব এসে খুলনায় জজিযতি করে যশোরে ফিরে যান। বাবা নেই। মাকে নিয়ে আমি থাকি হেলাতলায়। কোর্টে দাঁড়িয়ে মা বললেন, বাবার সঙ্গে তাঁর মালাবদল করে বয়রার কালীবাড়িতে বিয়ে হয়েছে।

ইউনি সাহেব মানলেন ?

তখন ইলেকট্রিক আসেনি। কেরোসিন বেরোয়নি। কলকাতা থেকে রেল লাইন খুলনায় এসে পৌঁছয়নি তখনও। কোম্পানি আমল। জজেরা লোকাল মানুষের ধর্মবিশ্বাসে নাক গলাতেন না। ইউনি সাহেব রায় দিলেন—আমিও শিবনাথ ঘোষের জমিদারির অংশীদার। জমিদার হিসেবে পঞ্চাশ বছর আগেও আমরা কী করেছি জানো ? ধীরেন্দ্রনাথ কথাটি না বলে তাকিয়ে রইলেন।

আমরা বর্ষায় যে যার জমির গায়ে নদীবাঁধ মেরামত করে দিয়েছি। ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারে বসেছি—যে যার জমিদারির ভেতর। এই যে পোশাক দেখছ আমার গায়ে—এই পোশাকে কলকাতায় বড়দিনে ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমরা তো তখন আজকের মতো এমন দলছুট অনাথ দশায় ছিলাম না ধীরেন্দ্রনাথ। ইংরেজ তো আমাদের কথা শুনতো। আমাদের পরামর্শ নিত।

তাহলে আজ আমাদের এই দশা কেন ? জেলা ভূস্বামী সমিতির মেমোরেন্ডাম পাঠালে লাটসাহেব খুলেও দেখেন না।

সময় বদলে গেছে। ভোট এসেছে। আইনসভা হয়েছে। দেশের লোক মন্ত্রী হচ্ছেন। গান্ধীমহারাজ, দেশবন্ধু এসে গেলেন। এখন যে হাওয়া অন্যরকম। এখন শহরে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে দেখবে। এ বাড়িগুলো কাদের ?

ধীরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারলেন না।

দেখবে বেশিরভাগ বাড়ি উকিল নয়তো মোক্তারদের। মামলা মোকদ্দমায় আমরা শেষ। আর পয়সা গিয়ে উঠছে উকিলের ঘরে। ওরা ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। পলিটিক্স করছেন। পাকা বাড়ি করছেন। কংগ্রেস, লিগ—সব দলেরই তাবড় তাবড় নেতারা তো সবাই পেশায় উকিল।

ধীরেন্দ্রনাথের মনে পড়ল—তিনি নিজেও উকিল। তার শ্বশুরমশাইও যশোরের একজন বড় উকিল। মুখে তিনি বললেন, তাহলে আপনি বলতে চাইছেন—একসময় উদ্যমীরাই জমিদার হতেন—

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছি। তোমার বাবা শ্রীশচন্দ্রের কথাই ধরো না কেন।

আপনি বলতে চাইছেন—উদ্যমীরাই উকিল হয়ে যাচ্ছেন!

হ্যাঁ। অবশ্যই। তাঁরা উকিল হচ্ছেন। মন্ত্রী হচ্ছেন। নেতা হচ্ছেন। জমিদারদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেছে উকিলদের হাতে। অথচ ওঁরা প্রথম উদয় হয়েছিলেন আদালতে। জমিদারদের কাগজপত্র নিয়ে মামলা লড়তে।

ধীরেন্দ্রনাথ একা একা জমিদার শিবনাথ ঘোষের বংশধারার একদা বিত্তহীন—পরে বিত্তশালী কালিদাস ঘোষের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই কবে এখানে মহকুমা শহর হয়েছিল। তারপর জেলা সদর হল। জেলা আদালত হল। উকিল, মোক্তার, জজ, পেশকার এলেন। শহর জমে উঠল। ইংরেজ জমিদার রেনি সাহেবের আমল কবেই কেটে গেছে। এখন কোনও শিবনাথও নেই। পড়ে আছে কিছু জমিদার। উকিলরা যাদের চুষে খেয়ে ছিবড়ে করে ফেলেছে মামলা মোকদ্দমায়। বাকি যা পড়ে আছে তাও আবার পলিটিকাল পার্টিগুলোর চোখের বিষ।

জানো ধীরেন্দ্রনাথ—আজ থেকে তিরিশ বছর আগেও ছোট লাটসাহেবের জন্যে আমরা শিকার পার্টির আয়োজন করতাম। তখন কতরকমের সাহেব ছিল এদেশে। ছোটলাট কে ছিলেন লর্ড কার্জনের সময় ?—এখন তার নাম আর মনে পড়ছে না। তিনি শিকারে এসেছিলেন। আমাদের তো রূপসা নদী ছাড়িয়ে সুন্দরবনে মহাল আছে। সেখানে ছোটলাটকে নিয়ে যাই। তখন তার সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন পাটকলের সাহেব—কয়লাখনির সাহেব—চা-বাগানের সাহেব। এখন সে সব সাহেব কোথায় গেলেন ?

আছেন! তাঁরা আছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁরা মেম্বার। তাঁদের ভোটের জোরেই লিগের সঙ্গে হকসাহেবের কোয়ালিশন সরকার টিকে আছে। আজ উঠি।

রাস্তায় বেরিয়ে একটু শীত শীত লাগছে ধীরেন্দ্রনাথের। তিনি জোরে হাঁটতে লাগলেন। এভাবে তিনি শহরের রাস্তায় অনেকদিন হাঁটেন না। যাতায়াত তার ঘোড়ার গাড়িতেই। তা ছাড়া তিনি শুধুই একজন ধেনো জমিদার নন। দেশগাঁয়ে জমিজমা থেকে যেমন ভাগের ধান আসে—তেমনি শহর খুলনায় আস্ত একটি মহল্লা তারই বাবার নামে—সেখানকার বাড়িগুলো থেকে মাস গেলে ভাড়াও আসে। কালিদাস ঘোষের কথা মতেক—

ীরেন্দ্রনাথ একজন বিশেষ বিত্তশালী লোক। বিষয় মানুষকে বিশিষ্ট করে।

খালিশপুর থেকে তিনটি মৌজা কেটে নিয়ে খুলনা শহরের সঙ্গে জোড়া হয়। এই নটি মৌজা হল—হেলাতলা, বেনেখামার আর টুটপাড়া। জমিদার শিবনাথ ঘোষেদের মিদারি গোড়ায় ছিল এই হেলাতলায়। বাবুখান রোডে জমিদার হাজি নোয়াব আলি খান ব দেখাশুনো করেন। তার সঙ্গে ভাল পরিচয় আছে ধীরেন্দ্রনাথের। হাজি নোয়াব আলি ন সময় বদলে যাওয়ায় বিশ্বাস করেন না। ধীরেন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। তিনি ায়ই বলেন, ধীরেন্দ্রবাবু, জমিদারি থাকে দাপে।

দাপে মানে দাপটে। ধীরেন্দ্রনাথ জানেন, হাজি নোয়াব আলি খান মুসলিম লিগে য়েন করেছেন। নোযাব আলি খানের কাছে পলিটিক্সটা খুবই পরিষ্কার। তিনি বলেন, বেন্দ্রবাবু! আপনি কংগ্রেসে জয়েন করুন। লিগ বা কংগ্রেস কেউই মনে মনে চায় না যে ামাদের জমিদারি উঠে যাক। আমরা জমিদাররা এই দুই দলে জয়েন করে মদত দিলে জলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি একার জোরে জমিদারি তুলতে পারবে না দেখবেন।

নোয়াব আলি সিধে লোক। তিনি বোঝেন না যে—ভোট পাওয়ার জন্যে ইলেকশনে নমে সব দলই হক সাহেবের প্রজা পার্টির সুরে জমিদারদের বিরুদ্ধে বলে চলেছে।

বছর বারো-তেরো আগেও ধীরেন্দ্রনাথের কাছে জীবন খুব সুন্দর লাগল। নবীন মিদার হিসেবে তিনি জেলা ভূস্বামী সমিতির সভায় নিজের ওপর ভরপুর বিশ্বাস নিয়ে থা বলতেন। অন্য প্রবীণ জমিদার—যেমন টুটপাড়ার শশিভূষণ সরকার তাঁর দিকে চুপ বে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি ঠিকই করে ফেলেন—দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দবেন। তা দেশবন্ধু তো মরেই গেলেন। গত বারো তেরো বছরে আস্তে আস্তে কৃষক প্রজা র্টি মাথা ঠেলে উঠেছে। পাশাপাশি উঠেছে মুসলিম লিগ। সেই তুলনায় কংগ্রেসের কেমন ছেড়ে দেওয়া দশা। ধীরেন্দ্রনাথ এখন আর নিজের ওপর বিশ্বাসে ভরপুর নন। একসময় ার মনে হত আমি পায়ের তলায় মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি। এখন আর তা মনে হয় না ার। কে যেন ম্যাজিকের জোরে পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে বাঁয়ে টাউন ক্লাবের বাড়িটা বাঁয়ে ফেলে এগিয়ে চললেন তিনি। াইনে গান্ধী পার্ক। আরেকটু এগিয়ে বাঁয়ে রাস্তার ওপরে জেলা কংগ্রেস অফিস। দোতলা ড়িব এক তলায় দুখানি ঘর নিয়ে অফিস। সামনে বারান্দা। মাথায় পার্টির সাইনবোর্ড। রে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। ভেতরে কয়েকজন বসে। টেবিল চেয়ারে বসে একজন লিখছে। ধীরেন্দ্রনাথ বুঝলেন, আমাদের খুলনা জেলা ভূস্বামী সমিতির এখন কোনও ফিস নেই। অফিসঘর করার মতো বাড়িঘর যথেষ্ট আছে। কিন্তু ভলান্টিয়ার কোথায়? ামরা যে সংখ্যায় গোনাগুনতি। ছোটখাটো সভা করতে পারি—ঘরের ভেতর। কিন্তু মাঠে মে মিটিং মিছিল করার মতো লোক কোথায় আমাদের! আরও একটা জিনিস তিনি ঝতে পারলেন। সব দলেরই একটা আদর্শ আছে। কংগ্রেস চায় স্বাধীনতা। মুসলিম লিগ য় পাকিস্তান। কৃষক প্রজা পার্টি চায় চাষিদের ঋণমকুবের ঋণ সালিশি বোর্ড। আমরা কী

চাইব ? আমাদের জমিজমাগুলো থাকুক। যেন হাত ছাড়া না হয়। আমাদের ভাগের ধ
যেন ঠিকমতো পাই। এই বিষয়বুদ্ধি নিয়ে কি কোনও আদর্শ গড়ে তোলা যায় ? না
আদর্শে দেশসুদ্ধ লোককে একত্র করা যায় ? কোনও আন্দোলন করা যায় ?

দিনে গরম থাকলেও আজকাল রাতের দিকে শীত পড়ে। বর্ষাকাল শেষ হয়ে এল। র
দেখলেন, বেনেখামারের দিককার আকাশ জুড়ে মেঘ ভাঙা রোদ। টুনু কলেজে। পানু অ
তনু স্কুলে গেছে। তাদের ফিরতে এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি আছে অন্তত। গৌর এক কা
ঘুমোচ্ছে। এখন পরিষ্কার কথা বলতে পারে।

খোকন ! ও খোকন ! কোথায় গেলি ?—বলতে বলতে রত্নার বুক কেঁপে উঠল
পাশেই এক্রামুদ্দিন আহমেদের বাড়ি। সে বাড়ির জানলা দিয়ে কুলসুমের গলা ভেসে এল
—এ কি ? ছেলেকে পলকে চোখে হারাও দেখছি !

রত্নার বুকটা ভয়ে ধড়াস ধড়াস করছিল। সাঁতার জানে না। পুকুরে যায়নি তো
কুলসুমের গলা পেয়ে তিনি জানতে চাইলেন, খোকন কি তোমাদের ওখানে কুলসুম

হ্যাঁ দিদি। আমার বজলুরের সঙ্গে খেলছে।

ধড়ে প্রাণ এল রত্নার। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সারাদিনে এই সময়টায় খানিক
বিশ্রাম পাওয়া যায়। অন্যদিন খোকা ঘুমোয। কিন্তু বজলুর ওর খুব বন্ধু। দুজনে একস
টানা বারান্দা ধরে ছোটে। মুখ বাজায়। হি হি—হো হো—হা হা হাসে। আবার গম্ভীর হ
দুজনে মেঝেতে বসে খেলে। এক সঙ্গে আবার দুজনে খেলা ভেঙেও দেয়। হাতেখড়ি
পর খোকনকে যা কিছু পড়ানো হয়েছে—সবই সে ভুলে যায়। কিন্তু হেসে হে
আদর্শলিপির ছড়া—কবিতা মুখস্ত বলতে পারে। বজলুর লিখতে পারে। স্লেটের পাশে
সবসময় ভিজে ন্যাকড়া রাখে। মুছবার জন্যে।

রত্না গিয়ে দরজায় চুপ করে দাঁড়ালেন। সামনের মাঠে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠলে
কুলসুমদের বাড়ি। ফিরদৌস, সামসুর—বড় দুই ছেলে এখন স্কুলে। অনন্ত ঘোষালে
মতোই এক্রামুদ্দিন আহমেদও এখন অফিসে।

কুলসুম হাতের আঙুলে বেলে বেলে ময়দার ছোট্ট ছোট্ট পুলি খবরের কাগজ পে
শুকোতে দিচ্ছেন। রত্নাকে দেখে কুলসুম উঠে দাঁড়ালেন। তুমি তো একদম আসো না
বসো। ওই তো তোমার ছেলে খেলছে দিদি।

বজলুর আর খোকন মিলে সুপুরি গাছের খসে পড়া ডেগো জোগাড় করেছে একটা
একবার বজলুর বসছে। তাকে খোকন টানছে। আবার খোকন বসলে বজলুর টানছে

রত্না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কুলসুমের ঘর গেরস্থালি দেখছে। বাড়িটি দোতলা। কুলসুমে
শাশুড়ির বয়স হয়েছে। তিনি দোতলায় বসে একা একা ছোট্ট হামানদিস্তায় পান ছেঁচছেন
পান সুপুরি একদম মিশে গেলে তিনি কাই মতো করে মুখে দেন। সেই পান ছেঁ

ব্দ। সাবা শ্রীশনগব চুপচাপ। শুধু পাঁচিলেব ওপব কিছু কাকেব কা কা।

কী দেখছ দিদি ?

তুমি খুব গোছানি কুলসুম।

কী কবব। ছেলেবা দুধ সিমাই খেতে ভালবাসে। তাই বানিয়ে বাখছি। তবে শুকোতে ায়ে বসে থাকতে হয়।

কেন ?

নযতো কাক এসে খুঁটে খেযে যাবে।

খাটে বসলেন বত্না। এই কাঁথা কে বুনেছে ?

আমি দিদি। তোমাব পছন্দ ?

খুব সুন্দব বুনেছ।

তাহলে শীত পডাব আগে তোমায একখানা বানিয়ে দেব।

ও মা। এ ঃ ভাগ্যি আমাব।

তা কেন ? তুমি আমাব আব জনমেব দিদি। তোমায একখানা কাঁথা বানিযে দিতে াবব না ?—বলে কুলসুম বত্নাব গলা দুহাতে জডিযে ধবল।

বত্না হেসে বললেন, ছাড ছাড। কানে লাগছে। ভাবী সুন্দব গন্ধ তো তোব গাযে। মেখেছিস ?

তাক থেকে ছোট্ট একটা শিশি এনে কুলসুম বলল, আতব এক্রামুদ্দিনসাহেব লকাতায গেলেন গতমাসে। তখন এনেছিলেন।—বলতে বলতে কযেক ফোঁটা বত্নাব াধে শাডিতে লাগিযে দিলেন কুলসুম।

আমায দিচ্ছ কেন কুলসুম। তুমি একজন সুন্দবী বেগম। তোমায আতব মানায।

আহা। আমাব দিদিব চেযে কাকে বেশি মানাবে আতবে ? পাঁচ ছেলেব মা তুমি। খনও কত সুন্দব। চল দিদি—আজ আমবা দুজনেন মিলে একটা জাযগায যাই।

কোথায ? বাডি ফেলে যাবই বা কী কবে ? ঘবে গৌবাঙ্গ একা ঘুমোচ্ছে।

বজলুব আব খোকনকে তোমাব ঘবে গৌবেব পাহাবায বেখে যাব।

কোথায যাবি ?

বেশিদবে নয। কাছেই। ওই দ্যাখো— বলে কুলসুম হাতেব আঙুল তুলে ধীবেন চার্যেব বাডিব দোতলায একটি খোলা জানলা দেখাল।

জানলাটি প্রমাণ সাইজেব। দোতলাব মেঝে থেকে উঠে মাঝখানে জানলাটি দুভাগ ঃ জানলাব শিক ধবে ছবিব মতো একটি বউ দাঁডিযে। মুখখানি ভাবী সুন্দব ডুবে শাডি ব আছে। চোখ আকাশেব দিকে।

ওঃ। অলকা। ধীবেনবাবুব স্ত্রী।

বত্নাব একথায কুলসুম বলল, চল যাই দিদি— আলাপ পবিচয কবে আসি।

পাগল হযেছিস। আমাদেব জমিদাব গিন্নি। কোথায আমবা—আব কোথায—

কুলসুম রত্নাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। হাত ধরে টেনে তাঁকে বাইরে বারান্দায় নিয়ে এলেন। এনে বললেন, ও কথা বললে চলবে কেন দিদি! আমরা তো ধীরেনবাবুর জমিদারির প্রজা নই। আমরা ওর বাড়ির ভাড়াটে। ভাড়া দিয়ে থাকি। তা চলো তো দিদি।

পাগলামি কোরো না কুলসুম। আমরা চোদ্দ টাকার ভাড়াটে। আর অলকা হলে গিয়ে জমিদারবাবুর স্ত্রী।

অলকা দোতলার জানলা দিয়ে দুই মহিলাকে এই পড়ন্ত বিকেলে হাত ধরাধরি টানাটানি করতে দেখে একটু অবাকই হয়েছেন। খুব উৎসুক হয়ে তিনি কুলসুম আর রত্নাকে দেখছেন। দুজনকেই তিনি দূর থেকে দেখে থাকেন। খানিক জানেন। খানিক তার শোনা। একজন অনন্ত ঘোষালের স্ত্রী। পাঁচ পাঁচটি ছেলের মা। অন্যজন এক্রামুদ্দিনসাহেবের স্ত্রী। ওঁরও ছেলেদের অলকা বারান্দায় বসে পড়তে দেখেছেন।

সারা পাড়া নির্জন। এখন সবাই স্কুল কলেজ কাছারিতে। জলের ভারীরা সবে বিকেলের জল দিতে শুরু করেছে বাড়ি বাড়ি। কুলসুম রত্নার হাত ধরে তাঁকে টানতে টানতে বাড়ির সামনের মাঠে নামিয়ে নিয়ে এলেন।

রত্না বললেন, ছাড়ো কুলসুম। কী হচ্ছে এসব ?

কুলসুম পরোয়াই করলেন না। রত্নার ডানহাতখানি শক্ত করে ধরে ধীরেনবাবুর দোতলার জানলায় তাকিয়ে গলা তুলে বললেন, এই আমার দিদি। আপনি তো অলকা-

অলকা হেসে বললেন, হ্যাঁ। আমিই অলকা ভট্টাচার্য। আপনারা ওপরে আসুন না। আপনাদের দুজনকেই আমি চিনি। মানে রোজ দেখি—

রত্না একটু লজ্জাই পাচ্ছিলেন। নীচের থেকে দোতলায় দাঁড়ানো কারও সঙ্গে কথা বলতে এমনিতেই অসুবিধে হয়—খারাপও লাগে—তার ওপর সে যদি হয় বাড়িওয়ালা জমিদারের স্ত্রী—তাহলে তো কিছুটা অস্বস্তি হবেই। কিন্তু অলকার গলায় এমন একটা ডাক ছিল—যা ফেলা যায় না।

অলকা মুখ তুলে বললেন, তোমাকে তুমিই বলছি। হ্যাঁ ?

নিশ্চয়। তুমিই বলবেন আমাকে।

তোমাকেও আমরা রোজ দেখি। আজ আমার এই দুষ্টু বোন কুলসুমের জন্যে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

কুলসুম গলা তুলে বললেন, আমার এই সুন্দরী দিদি তোমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলেন।

রত্না চাপা গলায় বললেন, কী হচ্ছে কুলসুম !

দোতলার জানলা থেকে অলকা বললেন, আপনারা আসুন না। বেশ গল্প করা যাবে।

রত্না বললেন, যাব একদিন।

কুলসুমও বললেন, দুজনে মিলে যাব একদিন। এই তো আলাপ হয়ে গেল। তোমা

মেয়েকে দেখছি না। সে কোথায় ?

ঘুমোচ্ছে। আপনারা ওপরে এসে বসে গল্প করতে করতে মানু উঠে যাবে।

বড় আন্তরিক লাগল অলকার গলা। রত্না বললেন, চল কুলসুম ঘুরে আসি। যাব আর আসব।

তাহলে বজলুর আর খোকনকে দিদি তোমার ঘরে দিয়ে আসি। গৌর খাটে ঘুমোচ্ছে। খাটের নীচেই মেঝেতে বজলুরের সঙ্গে খোকনকে বসিয়ে দুই সখী চললেন জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টচার্যের বাড়ি। যাবার সময় কুলসুম বজলুরকে বললেন, ছোট ভাই ঘুমোচ্ছে। জাগে না যেন।

খোকন খুব চিন্তিত হয়ে জানতে চাইল, যদি জেগে ওঠে ?

রত্না বললেন, তাহলে তোমরা দুজন ওর দুপাশে বসে থাকবে।

বজলুর জানতে চাইল, যদি কেঁদে ওঠে।

কুলসুম বললেন, তাহলে আদর করে কান্না থামাবে।

রত্না বললেন, চল চল ঘুরে আসি। যাব আর আসব।

রত্নার চিরুনি দিয়েই কুলসুম মাথাটি আঁচড়ে নিলেন। নিয়ে বললেন, শাড়িটা বদলাই ?

কোনও দরকার নেই। বেশ দেখাচ্ছে।

জমিদার বাড়ির ভেতরে কোনওদিন যাননি রত্না। টুনু পানু গেছে। একতলায় উঠোনে শনি সত্যনারায়ণের সিন্নি হয় মাঝে মাঝে। সেখানে গিয়ে ওরা সিন্নি খেয়েছে। প্রসাদ নিয়ে এসেছে বাড়িতে। কুলসুমও কোনওদিন জমিদার বাড়ির ভেতরে যাননি। রাস্তা থেকে দেখা যায়—ধীরেনবাবুর বিরাট বৈঠকখানা একতলায়। চারপাশ দিয়ে ভেতরে গিয়ে কোনদিকে যাবেন তা ঠিক করতে পারছিলেন না রত্না বা কুলসুম। ঠিক এই সময় সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন অলকা। আসুন আসুন—আপনারা এলে পারেন। এলে তো গল্প করা যায়।

আজ কিন্তু ভাই আমরা বসতে পারব না। তুমি ডেকেছ। তাই এলাম। তোমাকে কাছের থেকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল।

বেশ তো। কয়েক মিনিট বসবেন। ভাল সময়েই এসেছেন। একটু পরেই রেডিও খুললে কলকাতা থেকে কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গান ভেসে আসবে।

কুলসুম এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। দোতলায় উঠে বিরাট শোবার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তার ইচ্ছে হল—জমিদার বাড়িটা ভাল করে দেখে যাই না কেন। কোনওদিন আসা হয় না। তিনি বললেন, ভালই হল—রেডিওর গান একেবারে সামনে বসে শোনা যাবে। দিদি থাকি না একটুক্ষণ। গান শুনেই নীচে নেমে যাব।

রেডিওর সামনে বসে রেডিওর গান রত্নাও কোনওদিন শোনেননি। তবু তিনি বললেন, না। গৌরকে পাহারা দিচ্ছে দুটি অবুঝ শিশু। আরেকদিন এসে রেডিওর গান শুনব।

এই সময় সকালবেলায় এক রকমের ঝকঝকে রোদ্দুর ওঠে। সারাটা বর্ষায় জল খেয়ে গাছপালা সবুজ। বুনোলতাটাও কালচে সবুজ। ধীরেন্দ্রনাথ তার দোতলার জানলা দিয়ে সারাটা শ্রীশনগর দেখতে পাচ্ছেন। শ্রীশনগর পেরিয়ে দূরে বেনেখামারের গায়ে যতীন সিংঘির বিরাট মাঠ। মাঠের শেষে চাক চাক সবুজ ধানের মাঠ। এখন ভাদ্র শেষ হয়ে আসছে। ধীরেন্দ্রনাথ জানেন, এই সময়টায় ধান চারার গর্ভথোড় ভরাট হতে থাকে। সারা মাঠ গম্ভীর হয়ে ওঠে। ধানচারার বিয়েনকাঠি বেরিয়ে সারা মাঠ এখন ভরাট হয়ে উঠছে। শ্রীশনগরের ভাড়াটেদের একতলার ছাদগুলো বর্ষার শেষে এখানে সেখানে শ্যাওলায় সবুজ। এবার রোদে রোদে এইসব শ্যাওলা মুছে যাবে।

বেনেখামারের দিকে তাঁর আস্তাবল। ধীরেন্দ্রনাথ দেখলেন—তাঁর ওয়েলার ঘোড়াটির লাগাম ধরে কালা ফোতো চলেছে। তিনি কালই বলেছেন ওদের—দামি ঘোড়া। বসিয়ে খাওয়ালে বাতে ধরবে। হাঁটাহাঁটি করানো দরকার।

তাই ঘোড়াটাকে নিয়ে বেরোলো ওরা। আজকাল ধীরেন্দ্রনাথের গাড়ি চড়া হয় না। যাবেন কোথায় ? যাবার জায়গা কমে এসেছে। কার কাছে যাবেন বুঝে উঠতে পারেন না।

ঘোড়াটির গা কালচে লাল। তাতে রোদ পড়ে চিকচিক করে উঠছে। মাঝে মাঝে ফুটে ওঠা ঘাম। লেজের বালামচিতে রোদ পড়ে নানা রঙ। কালা আর ফোতো ওয়েলারকে নিয়ে বেনেখামারে যাবার সুরকির লাল রাস্তায় পড়তে দু ধারের শেয়ালকাঁটার ঝাড় দেখে বিদেশি হলে হবে কি, ঘোড়া দিব্যি মুখ বাড়িয়ে দিল।

দু ভাই সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মাথা ঘুরিয়ে দিল। ঘোড়া কি মানে ! সে বার বার মাথা নামিয়ে আনতে চায়। আর অমনি কালা আর ফোতো হা হা করে ওঠে। রাস্তার দু ধারে বসতবাড়ির লোকজন ওয়েলার ঘোড়াকে দেখে। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে দু ভাই বেনেখামারের শেষে পল্লীমঙ্গল স্কুল ছাড়িয়ে একদম ধানখেতের সামনে এসে পড়ল। তখন

কালা চেঁচিয়ে বলে উঠল, আরে ! ওই তো আমাদের জায়গা।

ফোতো বলল, তাইতো ! শ্রীশবাবুর লিখে দেওয়া পাঁচ বিঘের দাগ ওই জমিটা তো আমাদেরই। দিব্যি ধান—

মোটা খুঁটো পুঁতে তাতে ঘোড়ার লাগাম বাঁধতে বাঁধতে ফোতোর কথার ভেতর কালা বলল, এখন ধান দেখলি কোথায় ফোতো ! বল—ভাল ধান হবে এবার।

দু ভাই কথা বলতে বলতে তাদের ভাগে দেওয়া পাঁচ বিঘের দাগে নেমে পড়ল। দু জনের কেউই কোনওদিন চাষবাস করেনি। দুগগা দাসী সেই কোনকালে ভাগে দিয়ে রেখেছে জায়গাটা। বছরে একবার ধান দিতে আসে মদন বুনো। সে যে কোথায় থাকে তাও জানে না কালা ফোতো।

জমিতে জমা জল গরম হয়ে আছে। আগে হাঁটতে হাঁটতে কালা কাত হয়ে সেই জমিতে পড়ে যাচ্ছিল। ফোতো ধরে ফেলল, দেখে হাঁটবি তো।

খুব ভাল ধান হবে ফোতো।

ফোতো এ কথায় আলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিক তাকাল। আমরা নিজের হাতে এ জমি চষতি পারিনে ? তাহলে খেটে খুটে অনেক ফলাতাম।

দু ভাইয়েরই এই চড়া রোদে কষ্ট হচ্ছে। তবু তার ভেতর দু জনেরই খুব ভাল লাগছে। এই অ্যাতোখানি জায়গা আমাদের ? এ কি কম কথা। এরকম ফাঁকায়—একদম আকাশের নীচে—এখানে ধান কাটা হয়ে গেলে জল ছেঁচে আমরা আলু দিতি পারি। চাই কি মটর কলাই দিতি পারি।

এসব ভাবতে ভাবতে ফোতোর কথা জড়িয়ে গেল। সে একটা অদ্ভুত অজানা আনন্দে চেঁচিয়ে বলে উঠল, মদন বুনোর কাছে চল। যদি ছেড়ে দেয় জায়গাটা—

কালাও ধানচারায় এঁটে যাওয়া মাঠের ভেতর গরম পাঁক মাটিতে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে। তার যেন একটুও গরম লাগছে না। সে হাসি মুখে বলল, মদন বুনো সেই কবের থে ভাগে করি আসতিছে এ জায়গায়—সে কি ফেরত দেবে ?

একথার পর দু ভাইয়ের মুখে কোনও কথা এল না খানিকক্ষণ। এ জায়গায় তারা তেমন করে আসেনি কখনো। ধীরেন্দ্রনাথ ল্যান্ডো কেনার পর থেকেই দু ভাই মিলে ঘোড়া দলাইমালাই করে। সেটাই ওদের পাকা কাজ। এক ভাই সহিস। আরেক ভাই কোচোয়ান। ভাগের ধান, মাসমাইনে এসব নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া বাস্তুভিটের গায়ে ডোবার পাড় ধরে ওল কচু বসানো। বর্ষার ভাসা মাছও পড়ে ডোবাটায়।কিন্তু আজ যেন একদম অন্য রকম লাগছে কালা ফোতোর। একদম আমাদের জমি। এক লপ্তে পাঁচ বিঘে। এখানে ধান হলে ধান। ধান না হলে ফাঁকা জমি। তাতে শুয়ে থাকা যায়। দাঁড়ানো যায়। কোপানো যায়। কারও কিছু বলার নেই। এই সব মনে হতে হতে দুভাইই একটু একটু বুঝতে পারছে—মদন বুনো অনেক কালের ভাগচাষী। এই জমি ভাগে করে সে যা ধান পায় তাই দিয়ে তার চলে। তার হাত থেকে জমি ছাড়িয়ে নেওয়া তো খুব ভাল কাজ হবে না। এই সব মনে

আসতেই ভাদ্র শেষের নীল আকাশ—সাদা রোদ্দুর—সব কেমন ছায়ায় ঢেকে যেতে লাগল।

কালা ফোতোকে—তাদের হিসেব মতো তাদেরই ছোটভাই ধীরেন্দ্রনাথ শালা হারামজাদা করে থাকেন—জুতোটুতো মেরে থাকেন। তবু কালার মনে আনন্দের কোনও অভাব নেই। সে হঠাৎ আলে উঠে পড়ে চারদিক দেখতে দেখতে হাসি মুখে ফোতোর মুখে তাকালো। এই ফোতো ল্যান্ডো হাঁকানোর সময় কালা ধীরেন্দ্রনাথের মাথায় পেছনে পাদানিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন ল্যান্ডোর দু পাশ দিয়ে খুলনা পিছলে পিছলে পড়ে যেতে থাকে।

ফোতো কালাকে বলল, হাসলি কেন ?

একটা সুখ হচ্ছে তাই। বাবা অ্যাতখানি জায়গা দিয়ে গেল মারে—আমরা তো আসিনে কোনওদিন ইদিকে—

তাই সুখ হচ্ছে ? অমন বদমাশরে কেউ বাবা বলে ! চল। ঘোড়াটারে হাঁটাই। সুখী ঘোড়া রোদে না মুর্ছো যায়—চল—

বিদেশি ওয়েলার ঘোড়ার দাবনা জুড়ে ভাদ্রের চড়া রোদে ঘাম ফুটে উঠেছে। তবু সে আলের গা ঘেষে চ্যাপ্টা নধর পাতি ঘাসের লোভে ভারী মাথাটি নামিয়ে দিয়ে বেনেখামারের মাটির গন্ধে নেশা ধরা চোখে এগিয়ে এগিয়ে যতটা পারে খাচ্ছে।

খুঁটোর থেকে লাগাম খুলতে গিয়ে ফোতোর চোখে পড়ল—ঢোলা হাফপ্যান্ট পরা দুটো ছেলে ধানচারায় ঠাসা মাঠের ভেতর দিয়ে অনেক দূর থেকে এগিয়ে আসছে। বড় চেনা লাগছে যে। সাদা রোদ্দুরে ভেসে যাওয়া কালচে সবুজ ধান খেতের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসা মানুষ দু জনের মুখ দেখা যায় না।

ফোতো ঘোড়ার লাগাম না খুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। খুব চেনা যে—

কালা এবার ভাল করে দেখতে পেয়েছে। সে বলল, ও তো আমাদের পানু—ভাড়াটে অনন্ত পেশকারের ছল।

দেখতে দেখতে মাঠের ভেতর দিয়ে দুই মূর্তি এখন কাছাকাছি এল—তখন কালা ফোতো পানুর সঙ্গীকেও চিনতে পারল। আরেক ভাড়াটে এক্রামুদ্দিন আহমেদের বড় ছেলে—ফেরদৌস। কালা ফোতো দু ভাই ওদের চেনে, কারণ—কোনও কোনও দিন ধীরেন্দ্রনাথ ছাড়াই ল্যান্ডো যখন এদিক ওদিক যায়—তখন শ্রীশনগরের ভাড়াটেদের ইস্কুলে যাওয়া ছেলেপেলে ল্যান্ডোর পেছনের পাদানিতে চড়ে থাকে।

এ কি ফোতোদা, কালাদা যে—তোমরা এখানে ?

ঘোড়ার লাগাম খুলে তাকে কাছাকাছি গাছের ছায়ার নেবার জন্য ফোতো আগে। পেছনে কালা। মাঝখানে একদম অন্যদেশের এক ঘোড়া। কালচে সবুজ ধান চারায় ঢাকা মাঠের পাশে ঘামে ভেজা লালচে গা। বিশাল শরীর নিয়ে ওয়েলার এগোয়। পানু আর ফেরদৌস দেখে আর চোখ ফেরাতে পারো না।

তোমরা দুজনে কোত্থেকে পানুদাদা ?

ফোতোর এইভাবে এই চালে কথা বলা শ্রীশনগরের ভাড়াটে বাড়িওয়ালার ছেলেপেলেদের খুব পছন্দ। বয়স্ক লোক। ল্যান্ডো চালায়। আর কালা ফোতোরা থাকে তো শ্রীশনগরেরই পেছনে। যেতে আসতে দেখা হয়।

তার আগে বল তোমরা ঘোড়া নিয়ে এখানে কেন ?

বাঃ। ঘোড়ার হাঁটাহাঁটির জন্যি আমাদের এখানে আসা।

ফোতোর একথায় ফেরদৌস হো হো করে হেসে উঠল। শোনো পানুদা। ঘোড়া তো এমনিতেই গাড়ি নিয়ে দৌড়চ্ছে। তারপর আবার হাঁটাহাঁটিতে কি হল ?

পানুর এখন ক্লাশ নাইন। সে ফেরদৌসের এক ক্লাশ উঁচুতে পড়ে। সে অবাক হয়ে জানতে চাইল, সত্যিই তো ফোতোদা—দৌড়োদৌড়ির পরে আবার হাঁটাহাঁটি করবে কেন ঘোড়া ?

বেলা বাড়ছে। গাছতলা ছাড়া ছায়া নেই। পানুর গায়ে হাফপ্যান্টের ওপর গলা কাটা নিমা। ফেরদৌসের ওপরের দিকটায় হাফশার্ট। ধুতি গুটিয়ে পরা কালা ফোতো—দুজনই খালি গা। চারজোড়া পায়েই কাদামাটি শুকিয়ে খরখরে দশা।

ফোতো কালার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই বল।

কালা বলল, তুই বল না।

ফোতো শেষে সেই বিরাট খোলা মাঠে ঘোড়ার লাগাম হাতে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক বুঝতি পারতিছি নে জমিদারির কি হল ? ধীরেন্দ্রর ঘোরাঘুরি কমে গেল কেন ?

ধীরেনবাবু আর ঘোরেন না ?

কোথায় ঘোরে আর ধীরেন্দ্র ! কেমন যেন চুপচাপ।

এবার ফেরদৌস চানতে চাইল, শরীর খারাপ হয়নি তো জমিদারবাবুর ?

কালা বলল, শরীর তো দেখি ঠিকই আছে। মনটোন খারাপ হতি পারে।

পানু আর ফেরদৌস বুঝে উঠতে পারে না—জমিদারের আবার মন খারাপ হয় কি করে ! টাকা পয়সা আছে। ধানচাল আছে। বাড়িঘর আছে। ঘোড়ার গাড়ি আছে। দোতলার ঘরে রেডিও বাজে ধীরেনবাবুর। মন খারাপ হয় কোত্থেকে !

হাঁটতে হাঁটতে ঘোড়াকে নিয়ে ওরা চারজন ছায়াওয়ালা একটা বড় আঁশফল গাছতলায় এসে দাঁড়াল। ছায়ার বাইরেই রোদ থাবা মেরে বসে। গিয়ে পড়লেই কামড়াবে।

পানু বলে উঠল, কালাদা—তোমরা যে বল—ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তোমাদের ভাই হয়।

হয়ই তো।

তাহলে তার মন খারাপ কেন জানতে পার না ?

আমরা তো আর ধীরেন্দ্রর মায়ের পেটের ভাই না পানুদাদা—

ফেরদৌস পানুর মতো অতটা জানে না। শোনেনি। তার কাছে সবটাই আবছা মতো। তবু এটা তার শোনা যে—জমিদার ধীরেন্দ্রবাবুর সহিস কোচোয়ান—দুজনই তার

কোনও এক রকমের ভাই হয়। সে বলে বসল, মন খারাপ হয় সেখানে—যেখান থেকে আমরা এখন আসছি। তাই না পানুদা—

কালা আর ফোতো এ কথায় একবার পানুর মুখে—একবার ফেরদৌসের মুখে তাকাল। তারপর ভাই দুজন নিজেদের ভেতর তাকাল।

শহরের বাইরে ধানখেতের গায়ে আঁশফল গাছতলায় দাঁড়িয়ে ধু ধু মাঠ ছাড়া আর কিছুই নেই। ঘোড়াটা ওখানে খাবার মতো কিছু না পেয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে। তার চোখ দুটিতে যেন মোটা করে কাজল টানা। কালা ফোতোর চেয়ে পানু আর ফেরদৌস অনেক ছোট হলেও এমন জায়গায় কথাবার্তায় ফারাকটা অনেক কমে আসে।

কোনদিকি যাওয়া হইছিল পানুদাদা ?

আমরা তো রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ি প্রায়ই।

ফোতো বলল, সে কথা জানতি চাওয়া হয়নি। আজ কোথায় গিইছিলে ? সেইডে বল দিকি। বেশ করে গুছোয়ে বল।

কালা বলল, ও ফেরদৌস ভাই। কত রাতে বেরোও তোমরা ?

ঘুম ভেঙে গিয়ে এক একদিন দেখি চাঁদ নিভু নিভু। পানুদাও ঘুম থেকে উঠে বারান্দায়। তখন দুজনে খালিশপুর যাই। কোনদিন বা শিরোমণির দিকে গেলাম।

আজ কোথায় গিইছিলে সেডা বল।

পানু কাদা মাখা পা চুলকোতে চুলকোতে বলল, বেনেখামারের পর মাঝিবেড়ে। তারপর মগরমপুর।

সে তো একেবারে বাদা। সেখানে কী করতি গিইছিলে তোমরা ?

ফেরদৌস বলল, কুবো পাখির ডিম পাওয়া যায় শুনে—

কুবোর ডিম দিয়ে কি করবা তোমরা ? আর কুবো পাখির বাসা তো থাকে বড় বড় গাছে। সেখানে তোমরা ওঠবা কি করে ?

পানু বলল, ফেরদৌস মুরগির তা দিয়ে পাখির ডিম ফোটাতে পারে।

তাই বলে—বলতে বলতে ফোতোর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সে তো অনেক দূর ফেরদৌস ভাই।

আমরা রাত থাকতে এক এক দিকে বেরোই। রোদ একটু উঠলে ফিরে আসি ফোতোদা। আজ পানুদা আর আমি এমন জায়গায় গিয়ে পড়লাম—যেখানে মানুষের কোনও ঘরবাড়ি নেই। সবাই গাছতলা—নয়তো উঁচু ডাঙা খুঁজে নিয়ে সেখানেই পড়ে থাকে।

এবার পানু বলল, কুবো পাখির ডিম পাওয়া যাবে বলে মগরমপুর যাওয়া। যদি ডিম ফুটিয়ে পাখি পাওয়া যায় তো পোষা হবে। কিন্তু সেখানে মানুষজনের যা দশা—

কেমন ? কেমন ?

ফেরদৌস বলল, ওরা বলছিল, ওরা সব সুন্দরবনের চন্দনীমহলের মানুষ। সেখানে

খাবার নেই। কাজ নেই। নামাজ পড়ার মসজিদ পর্যন্ত নেই।

কালা জানতে চাইল, মগরমপুরে মসজিদ আছে ?

পানু বলল, দেখলাম না তো। একখানা কুঁড়ে ঘর নেই তো মসজিদ থাকবে কোত্থেকে ?

পাশে বয়ে যাচ্ছে দুয়ানি নদী। মাটি ভাল না একদম। দু একটা ঝাঁকড়া গাছ। একটা বড় শিরীষ গাছ। তা তাদের গায়ে কুবো পাখির বাসা খুঁজবো কি ! গাছতলা জুড়ে মানুষ পড়ে আছে।

ফেরদৌস এবার নিজের থেকে বলতে লাগল। তার দুই চোখে জল এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা তো অনেকেই মুসলমান পানুদা। বেশির ভাগই তাই মনে হল। কারও মাথায় কোন ছাদ নেই। অনেক আশা করে চন্দনীমহল থেকে এসে খুবই বিপদে পড়েছে ওরা। ভরসা এক দুযানি নদীর মাছ। বার বার জাল ফেলে তবে দু'চারটে ধরা পড়েছে।

ফেরদৌস বলল, কেউ দেখার নেই ওদের। ওরা খুলনাও চেনে না যে পায়ে হেঁটে এদিকে চলে আসবে। পৃথিবীর কোন জায়গায় আছে তাও বোঝে না ওরা।

পানু আর থাকতে পারল না। সে চেঁচিয়ে উঠে বলল, বুড়ো বুড়ো লোক একটুখানি মাছের জন্যে কামড়া কামড়ি করছে।

ফেরদৌস কাঁদতে কাঁদতে বলল, একজন দেখলাম পাগল হয়ে গেছে ফোতোদা। সে চোখে দেখা যায় না—

কালা মাটিতে বসে পড়ল। এ কোথাকার দেশ পানু দাদা ! এ তো একজনও বাঁচবে না দেখতিছি।

পানু বা ফেরদৌস কোনও কথা বলতে পারল না। ধীরেন্দ্রনাথের ঘোড়ার গায়ে মশা বসতে সে লেজ মুচড়ে মশা তাড়িয়ে যাচ্ছে। রোদ এখন একেবারে যাকে বলে ঝাঁ ঝাঁ। ফোতো দিগন্তের দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে অনেক দূরের মগরমপুর জায়গাটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করল। ওদিকে তার কখনো যাওয়া হয়নি।

কালা আস্তে আস্তে ফেরদৌসের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কাইন্দে কি হবে ভাই। তোমরা ভদ্দরলোকের ছল। শহরবন্দরে থাকা হয়। মানুষির কষ্ট তো আগে কখনো এভাবে দ্যাখোনি। ন্যাও—চোখ মোছো।

ফেরদৌস তার কান্না থামাতে পারছে না। কিছুতেই পারছে না। কালচে মাটি। ঘাস নেই। ছায়া নেই প্রায়। একখানা কুড়েঘরও নেই। ভরসা দুয়ানি নদী। হাতজাল। পোলো। আঁটল। ওর ভেতবেই শাক, লতাপাতা দিযে চাপানো রান্নার বোঁটকা গন্ধ। বুড়ো একজন—গালে লম্বা দাড়ি—বোধহয় বড় কোনও অসুখ—কাদায় শুয়ে পড়ে কোনও কালাম আওড়াচ্ছে। কোন কালাম তা বুঝতে পারেনি ফেরদৌস।

পানুও মাটিতে বসে পড়েছে। হে হুড়মুড় করে বলে ফেলল, উঃ ! কি কষ্ট। একজন মেয়েলোকের মড়ার আধখানা নদীর জলে ধুয়ে যাচ্ছে। বাকি আধখানা ফোতোদা—সে

তোমায় কি বলব ফোতোদা—নদীর পেড়িতে গেঁথে আছে—বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল পানু।

ফোতো দাবড়ে উঠল। তোমরা হলে ভদ্দরলোকের ছল। কেন তোমাদের মাঠ ভাইঙে অত দূর যাওয়া। থাকবা শহরে। টাউন খুলনায়। খাবা কলের জল। মা রাইন্ধে দেয় মাছের ঝোল ভাত। তাই খাইয়ে ইস্কুলে যাও। এইসব দেখে তোমাদের কি সহ্য হয়! আমাদের মতো তো কচুঘেচু খাইয়ে থাকো না তোমরা। আসো। কাছে আসো পানুদাদা। তোমার বুকি হাতে বুলোয়ে দিই।

পানু এগিয়ে এল না। ফোতোই এগিয়ে গেল। সে গায়ের নিমার ভেতর দিয়ে পানুর বুকে হাত দিয়ে বলল, এ তো ঘামে ভিইজে গেছ। নাও। পিরানটা খোলো তো—বলতে বলতে সে কান্নায় ভেঙে পড়া কিশোরের গা থেকে নিমাটি খুলে ফেলল। শ্রীশনগরের সবাই জানে—কালা আর ফোতো—দুই ভাই কিছু অন্যরকম লোক। খোলামেলা। এক ভাই ঘোড়ার লাগাম হাতে পায়ের পাতার চাপে ঘণ্টি দিয়ে শহরের রাস্তায় ল্যান্ডো নিয়ে ছোটে। আরেক ভাই সেই ল্যান্ডোরই পেছনের পাদানিতে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন বড় কোনও পুতুল। এক গাল হাসি। তার দু'ধার দিযে খুলনা শহর পিছলে পিছিয়ে পড়ছে।

কালা বলল, নাও ওঠো। বাড়ি ফিরতি হবে না নাকি? রোদ্দুরের তো কোনও মায়াদয়া নেই। চল—

ওয়েলার ঘোড়া সবার আগে। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। তার ভেতর দিয়ে জ্যান্ত বিশাল ঘোড়া যেন কোনও রূপকথার পাতা থেকে উঠে এসে খুলনার দিকে ফিরে চলেছে।

আজ আমরা নিজেরাই এলাম অলকা—

অলকা বিশাল পালঙ্কে বসে মানুর মাথা আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথের দোতলাটি এই সময় একেবারে নির্জন থাকে। বলা যায় এটা অলকারই মহাল। এত ভরাট রাজহাঁসের মতো গলা—সারাটা দোতলার ভেতর দিয়ে বয়ে গেল। সে সড়াৎ করে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়ে বলল, কি ভাগ্যি। আপনি নিজে এসেছেন—

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রত্না কোল থেকে গৌরকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, আরও কাকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে দ্যাখো।

পেছন পেছন কুলসুম উঠে এলেন ওপরে। মুখে লজ্জা লজ্জা হাসি। তাঁর পেছনে খোকন আর বজলুর। ওরা ঘরে ঢুকেই দৌড়োদৌড়ি লাগিযে দিল। সেই সঙ্গে কিছু না বুঝে গৌর টলে টলে এগোতে গেল। মানু তো সব দেখে একদম চুপ।

প্রায় সন্ধে। একতলার বাগান থেকে উঠে আসা শিউলি গাছটার মাথা শরতের প্রথম মুকুলের সঙ্গে সুবাস চারিয়ে দিল ঘরের বাতাসে। অলকা গৌরকে কোলে নিয়ে রত্না—কুলসুম—দুজনকেই বললেন, খেলুক ওরা। আপনারা কিন্তু বকতে পারবেন না। মানু—

মানু কোনও কথা না বলে এগিয়ে এল। এসে মায়ের দিকে মুখ তুলে তাকাল। রত্না দেখলেন, একেবারে ডল পুতুল। চোখ দুটি অলকার মতোই টানা টানা। টুস করে তার গাল টিপে দিতে মানু রত্নাকে ভাল করে দেখতে গেল। চোখ তুলে।

অমনি অলকা বললেন, ওদের নিয়ে তুমি বারান্দায় খেলো। ওখানে তোমার সব খেলা আছে মা—

কুলসুম বলে বসলেন, তা কেন ? ওকে আমি কোলে নিয়ে এখন একটু চটকাবো। রোজ নীচে থেকে জানলায় ডল পুতুলটাকে দেখতে পাই।—বলতে বলতে মানুকে কোলে তুলে নিলেন কুলসুম।

এই আমাদের দোতলা—বলতে বলতে অলকা পেছনের খোলা ছাদ—তার লাগোয়া পর পর তিনখানি ঘর দেখাতে লাগলেন। সঙ্গে রত্না। পাশে কুলসুম। তাঁর কোলে মানু। একদম ডল পুতুল। রত্না আর কুলসুম—যা-ই দেখেন তা-ই তাঁদের নতুন লাগে। আনকোরা মনে হয়। এ রকম আর কোথাও নেই মনে হয় তাঁদের। অলকা বললেন, আপনাদের সবাইকে দোতলার জানলা দিয়ে দেখতে পাই।

রত্না হেসে ফেললেন। আমরা তোমাকে অল্প অল্প দেখতে পাই। আমি তো আপনার বড় ছেলেকে দেখি। বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে। কলেজে পড়ছে। তাই না ?

হ্যাঁ।

ওরই নাম টুনু ?

হ্যাঁ। ভাল নাম ঋতবান। কুলসুমের বড় ছেলের নাম ফেরদৌস। ক্লাশ এইট।

ফেরদৌস তো একজন কবির নাম।

অলকার এ কথায় রত্না আর কুলসুম একই সঙ্গে তাঁর মুখে তাকিয়ে পড়ল।

অলকা হেসে ফেললেন। না না। ওভাবে আমার মুখে তাকাবেন না। আমি শুধু নামটিই জানি। তা ফেরদৌস তো বড় হয়ে উঠেছে। সাইকেল চালিয়ে যায় দেখি।

রত্না দেখলেন, অলকার ঘরখানি একেবারে হলঘরের মতো। দেওয়ালে মুণ্ডু সমেত একটি বাঘছাল ঝোলানো। বিরাট আয়না। আয়নার মুখোমুখি মুণ্ডু সমেত হরিণের শিং। পালঙ্কের কাঠে কালো রঙের পালিশ। জানলার তাতে বিরাট এক কৌটো—ডায়না পাউডার।

কুলসুমের তো তাক লেগে গেছে। তিনি দুই ঘরের মাঝখানে টাঙানো লেসের পর্দায় অজান্তে হাত দিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে রত্না তাঁকে নিঃশব্দে চোখে বারণ করলেন। সে চোখ দেখে কুলসুম হাত সরিয়ে নিলেন।

মাঝের ঘরটি তত সাজানো নয়। কিন্তু এ ঘরখানিও বেশ বড়। অলকা বললেন, এটা মানুর বাবার স্টাডি।

ওঁরা দুজন দেখলেন, ঘর ভর্তি বই। কাচের আলমারির ভেতর। ওরা দুজন চুপচাপ তাকিয়ে আছে বলে অলকা বললেন, এ ঘরে বসে ওর বাবা মাঝে মধ্যে পড়াশুনো করেন।

দেওয়ালে একখানি বড় ছবি টাঙানো। তাই দেখে রত্না জানতে চাইলেন, এ ছবি কার ?

অলকা পলকে 'আমার শ্বশুরমশাই' বলেই পাশের ঘরে চলে যাচ্ছিলেন।

রত্না ছবিখানি ভাল করে দেখতে লাগলেন। কেমন রুক্ষ মুখখানি। গালে ছাড়া ছাড়া দাড়ি। খাড়াই নাক।

কুলসুমও ছবিখানি ভাল করে দেখছেন। দেখে রত্নাকে বললেন, ইনিই শ্রীশচন্দ্র ?

অলকা এগিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ। ওঁর নামেই এই শ্রীশনগর। অলকা পাশের ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন, এ ঘরখানা দেখবেন না ?

রত্না বললেন, একটু বোসো অলকা। আমি তো এই চেয়ারেই বসছি। দাও—গৌরকে আমার কোলে দাও এবার। তোমার ব্যথা ধরে গেছে নিশ্চয়।

কুলসুমও আরেক খানি চেয়ারে বসলেন। বসে বললেন, নামই শুনেছি শুধু। আজ ছবিগুলি দেখা হল।

অলকা কোনও কথা বললেন না। তিনি চুপ করে আরেকখানি চেয়ারে বসে কুলসুমের কোল থেকে মানুকে নিয়ে বললেন, একটু চা চাপাই।

এখন আর ওসব দরকার নেই। বোসো না একটু।

তাহলে ওভালটিন করে আনব ?

ও কি অলকা ? আমাদের অসুখ করেছে নাকি !

বেশ। তাহলে আমি নকুলদানা এনে দিচ্ছি। কাল কিনেছিলাম অনেকটা।

অলকা উঠে যেতে কুলসুম আবার ছবির শ্রীশচন্দ্রের মুখে তাকালেন। এই লোকটিই নিজের নামে শ্রীশনগর করেছিলেন। একজন মানুষ কত কি করে যান ! তারপর তাঁর সময়, তাঁর লোকজন—কিছুই থাকে না। অন্য লোকজন—অন্য সময় চলে আসে।

রত্নাও ছবিখানি দেখছিলেন। তিনি শুনেছেন, প্রথম জীবনে শ্রীশচন্দ্র সাধারণ লোক ছিলেন। পরে নিজের জোরে নিজের ভাগ্য ফেরা[illegible]

বিশাল কাচের রেকাবিতে সাদা সাদা নকুলদানা। রেকাবিটি নামিয়ে রেখে অলকা জানতে চাইলেন, কি দেখছেন আপনারা দুজনে ?

তোমার শ্বশুরমশাইয়ের ছবি।

অলকা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, এ ঘরে পারতপক্ষে আমি আসি না।—বলেই তিনি অন্ধকার হয়ে আসা ঘরের ভেতর খুট করে আলোর সুইচ টিপে দিলেন।

এ ঘরে সবই জ্যান্ত। বিশেষ করে গৌর, মানু, বজলুর, খোকন। কথা বলছে না ছবি, বই, আলমারি আর চেয়ার।

তুমি তো তোমার শ্বশুরমশাইকে দ্যাখোনি নিশ্চয়।

নাঃ। তবে শুনেছি।

তোমার শাশুড়ি কিছু বলেন না ওঁর স্বামীর কথা ?

নাঃ।

খুব উদ্যমী মানুষ ছিলেন—

রত্নার একথায় খানিক চুপ থেকে অনেক পরে অলকা জোর দিয়ে বললেন হ্যাঁ। রেকটু নকুলদানা আনি ?

না। এই তো রয়েছে অনেক।

ঠিক তখনই বজলুর আর খোকন মুঠো মুঠো করে নকুলদানা তুলে নিতে লাগল।

অলকা বললেন, না। আরেকটু আনি। আপনারা তো কিছুই মুখে দিচ্ছেন না।

বলে উঠে যেতে যেতে যেন নিজের মনেই অলকা বললেন, শুধু ছবি। তার হাত কেও আমার ছাড়ান নেই ?

নিজের ঘরে এসে অলকা নিজের চেনা জায়গাগুলো এই মাত্র ভুলে গেল। এই টোখানি দেখলে তার সব গুলিয়ে যায়। কোন ঝোলায় যে নকুলদানাগুলো রেখেছি ?

তিন বছর হল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব কলকাতায় ফুটবল মাঠে সেকেন্ড ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে উঠেছে। ফার্স্ট ডিভিশনে উঠে সে সবাইকে চমকে দিয়েছে। খিদিরপুর, তালতলা পার্ক সার্কাসের মুসলমানদের ভেতর মহামেডানের জয়ের পর জয়ে সাড়া পড়ে গিয়েছে। যেদিন খেলা থাকে মহামেডানের—সেদিন ধর্মতলার দিকে যত ট্রাম যায়—দুপুর থেকেই খেলা পাগল মুসলমানরা সেই সব ট্রাম বোঝাই করে মাঠের দিকে ধেয়ে চলে।

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গোড়াপত্তনে ছিলেন আবদুল গফুর মাওলানা। এখন ক্লাবকে তাজা রেখেছেন হবিবুল্লাহ বাহার। তিনি চামড়ার ব্যবসা করেন। আর ক্লাবের সভাপতি বাঙলার প্রধানমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজলুল হক। তিনি অবশ্য মাঠে যাওয়ার সময় পান না। তিনি এখন ক্লাবের অলঙ্কার। খেলার মাঠে মহামেডানের একটানা জয়—সারা

বাঙলার মুসলমানদেব মনে যেন খুশির জোয়ার এনে দিয়েছে। কলকাতায তো কথাই নেই। মোহবাগান, মহামেডান, ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ানস-এর বাঙালি প্লেয়াররা খালি পাযেই সাহেবদের টিমের বুট পরা পায়ের সঙ্গে যুঝে আসছে। ডারহামস, ডালহৌসি কিংবা ক্যালকাটা ক্লাবের প্লেয়াররা বুট ছাড়া মাঠে নামেই না। ইউরোপিয়ানদের মিলটারি টিম তো গায়ের জোরেই খেলে এগিয়ে যায়। স্পোর্টিং ইউনিয়ন, হাওড়া ইউনিয়নের মতো দিশি টিম মাঠে নেমে থই পায় না।

সেই কবে উনিশশো এগারো সনে মোহবাগান আই এফ এ শিল্ড পেয়েছিল। তারপব ছাব্বিশ সাতাশ বছর কেটে গেছে। উনিশশো এগারো আজও বাঙালির মনে বিরাট এক জয়। আর সেই জয়কে মহামেডান স্পোর্টিং আজ কয়েক বছর ধরে মশালের মতো বযে নিয়ে চলেছে। উনিশশো চৌত্রিশে ফার্স্ট ডিভিশনে উঠে মহামেডান একের পর এক জয় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এতদিন মাঠে ডারহামসের রিচার্ড কিংবা ডালহৌসির হপকিন্সের পাযের কিক নিয়ে পাবলিক আলোচনা করত। সে আলোচনায় দৈবাৎ কোনও দিশি টিমের প্লেয়ারের নাম আসতো। মাঝে মধ্যে দু-একজন দিশি খেলোয়াড় পাবলিকের প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু দল হিসেবে সাহেবি টিমই এতদিন খেলার কেরামতিতে বাঙালিদের মন কেড়ে রেখেছিল।

সমাদ, শিব ভাদুড়ি—বিজয ভাদুড়ির খেলার তারিফ শোনা যেত বইকি। সামাদকে ফুটবলের জাদুকর বলে বাঙালিদের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবরাও অঢেল প্রশংসা করেছে। এবাব মহামেডান স্পোর্টিং প্রমাণ করে দিযেছে—দল হিসেবেও খেলাব কেরামতিতে তারা এক নম্বর। আজ চার বছর হল সে কলকাতার মাঠে রাজা। শুধু লিগ নয়—গত বছর মহামেডান শিল্ডও নিয়েছে। মহামেডান এসেই যেন কলকাতার মাঠ থেকে ইউরোপিযদের মাতব্বরি একেবারে শেষ করে দিয়েছে। কয়েক বছর আগেও এমন হবে কল্পনা করা যেত না।

আজকাল ট্রামে বাসে, কোর্ট কাছারিতে প্রায়ই শোনা যায় এই সব নাম। সামাদ, রশিদ, রহমত, রহিম, আব্বাস, নাসিম, সাবু, মাসুম। জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খাঁ, বড় নুর মহম্মদ, ছোট নুর মহম্মদ, সালিমের নাম তো পাড়ায় পাড়ায়, খেলুড়ে ছেলেদের মুখে মুখে ফেরে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসিম। বুঝতে পেরেছেন মোহম্মদীর সম্পাদক মৌলনা মহম্মদ আক্রম খাঁ। আক্রম খাঁ একসময দেশবন্ধুব সঙ্গে একসঙ্গে কংগ্রেস করেছেন। কোরান শরিফ বাঙলায় আনুবাদও করেছেন। কংগ্রেস থেকে তিনি সরে এসেছেন প্রায় দশ বছর হল। যেমন কি না আবুল হাসিমের বাবা ছিলেন ঘোর জাতীয়তাবাদী—স্যার সুরেন্দ্রনাথের অনুগত সঙ্গী। এই দুজন স্পষ্টই বুঝতে পারছেন মহামেডানের এই জয়ে সারা বাঙলায় মুসলমানরা মনে করছেন— এটা তাদের নিজেদের জয়। নজরুল ইসলাম কবিতা লিখেছেন মোহম্মদীতে। আব্বাসউদ্দিনের গলায় মহামেডানের জয়গান গেযে রেকর্ড এসে গেছে বাজারে। গানটি লিখেছেন কবি গোলাম মোস্তাফা। সুরে গেয়েছেন আব্বাসউদ্দিন। লিগ বিজয়—না দিগ্বিজয়!

আবুল হাসিম এবং মৌলানা আক্রম খাঁ-- দুজন দুভাবে এই জয়ের হাওয়া ধরে রাখতে চাইছেন। সাধারণ মুসলমান জনসাধারণের মন পাওয়াই তাঁদের লক্ষ। আবুল হাসিম মুসলিম লিগকে নবাব, নবাবজাদাদের হাত থেকে বের করে আনতে চান। ঢাকার আহসান মঞ্জিল নবাবাদের বহুদিনের--সেই উনিশশো ছয় সনে মুসলিম লিগের গোড়াপত্তন থেকে-- ক্ষমতার বিন্দু। সেখানে থেকে মুসলিম লিগকে বের করে এনে আবুল হাসিম মুসলিম লিগকে সাধারণ মুসলমানের পার্টি করে তুলতে চান। আর এই টানাপোড়েনে সম্পাদক আক্রম খাঁ, লেখক আক্রম খাঁ, ইসলাম বিশেষজ্ঞ আক্রম খাঁ মুসলমানদের মানসিক জগৎ-- চিন্তার জগতে পথ দেখাতে চান। তাঁর বিশ্বাস মতো।

কংগ্রেস থেকে সরে এসে মৌলানা আক্রম খাঁ ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিতে ছিলেন। গত বছর থেকে তিনি পুরোপুরি মুললিম লিগে চলে এসেছেন। সারা বাঙলার সাধারণ মুসলমান--যাঁরা কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নার একমেব স্লোগান --সব মুসলমান লিগের পতাকার নীচে কাতারবন্দি হও--মুক্তির পথে--স্বাধীনতার পথ বলে মনে করেন--তাঁদের চোখে লিগের সাধারণ সম্পাদক আশার আলো--আশার আলো মৌলানা আক্রম খাঁ, যিনি একজন সম্পাদক--যিনি হজরত মহম্মদের জীবন নিয়ে লিখেছেন মোস্তাফা -চরিতের মতো বই।

মৌলানা আক্রম খাঁ এখন প্রায় সত্তর। তাঁর নামটি হিন্দু মুসলমান--সবার কাছেই পরিচিত। দীর্ঘদিন কংগ্রেস করে তাঁর মনে হয়েছে--কংগ্রেসের রাজনীতিতে মুসলমানদের ক্ষমতায় আসার সুযোগ কম--মুসলমানদের বিকাশের পথ কম। প্রায় পাঁচশো বছর আগে খুলনার বাগেরহাটের শাসনকর্তা ছিলেন খান জাহান আলি। খান জাহান আলির সময় এক পীরালি ব্রাহ্মণ পরিবারের একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরই বংশধর মৌলানা আক্রম খাঁ। ওঁরা গোড়ায় ছিলেন বাগেরহাটে। তারপর চলে আসেন খুলনা-যশোর সীমান্তে কসবা গাঁয়ে। সেখান থেকে এই পরিবারে সরে আসে বসিরহাটে। সেখানেই আক্রম খাঁয়ের জন্ম। তিনি বাঙলার রাজনীতির সবরকম কেষ্টবিষ্টুকেই চেনেন।

প্রায় পনেরো বছর আগে আক্রম খাঁ 'সেবক' আর 'দৈনিক মোহম্মদী' বের করে খুব লোকসানে পড়েন। সেই থেকে ওঁরা খুব সাবধানী। মোহম্মদী এখন মাসিক--আবার সাপ্তাহিকও। ভালই চলে দুটি কাগজ। চারদিক থেকে চাপ আসছে--মুসলমান সমাজের একটি দৈনিক কাগজ দরকার। কিছুদিন ধরেই মাসিক মোহম্মদীর সম্পাদকীয় বিভাগের আবুল কালাম সামসুদ্দিন লক্ষ করেছেন--মৌলানা আক্রম খাঁ আর তাঁর বড় ছেলে মোহম্মদ খয়রুল আনম খাঁ একখানি বাঙলা ডেইলি বের করার তোড়জোড় করছেন।

আবুল কালাম সামসুদ্দিন,আবুল মনসুর আহমেদ --এ রকম আরও অনেকে প্রথম যৌবনে গান্ধীজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা একসময় কাঁধে করে খদ্দর বিক্রি করেছেন ওঁদের জেলা মৈমনসিংহের মফস্বলে--গাঁয়ে । সে সব পনেরো ষোলো বছর আগের কথা । এখন কলকাতার নানা কাগজে কাজ করে আবুল কালাম

সামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমেদের মতো সাহিত্যপ্রেমিক, খবরের কাগজপাগল মানুষজন কোনওরকমে টিকে আছেন। ওঁরা এখন প্রায় মধ্যবয়সে। এর ভেতর আবুল মনসুর আহমেদ কৃষক প্রজা পার্টির একজন মাথা। কাজকর্ম হারিয়ে সংসার অচল হলেই তিনি কাগজের কাজ জুটিয়ে নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করে থাকেন। এ রকম অবস্থা অনেকেরই। আগে কলকাতা থেকে 'খাদেম' 'মোসলেম ভারত' বেরোত। সে সব বন্ধ হয়ে গিয়ে এখন চলছে 'মোহম্মদী' আর 'সওগাত'।

একদিন দুপুরে মৌলানা আক্রম খাঁ আর তাঁর বড় ছেলে খায়রুল আনাম খাঁ যখন ৯২ আপার সার্কুলার রোডে মোহম্মদীর দোতলার অফিসে বসে এই সব নিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছেন—তখন মাসিক মোহম্মদীর কপি এডিট করতে করতে বাবা আর ছেলের কথা থেকে 'রোটারি মেশিন' কথাটি আবুল কালাম সামসুদ্দিনের কানে এল। তিনি বললেন, রোটারি মেশিন দরকার আপনাদের ?

বাবা আর ছেলে কথা থামিয়ে সামসুদ্দিনের মুখে তাকালেন। আক্রম খাঁ বললেন, হ্যাঁ। একটা রোটারি মেশিন তো দরকার। নইলে ডেইলি নতুন মেশিনের খবর আপনারা আমার চেয়ে ভাল জানেন।

সামসুদ্দিনের এ কথায় আক্রম খাঁ বললেন, তুমিও খেপেছো সামসুদ্দিন ! নতুন মেশিন কেনার পয়সা পাব কোথায় ?

আমি একটা পুরনো রোটারি মেশিনের খবর জানি।

কোথায় ?

অমৃতবাজার পত্রিকা নতুন রোটারি মেশিন এনেছে। তুষারকান্তি ঘোষেরা পুরনো রোটারি মেশিনটা বেচে দেবেন শুনেছি।

তাই নাকি !—বলেই সত্তর বছরের যুবক আক্রম খাঁ উঠে দাঁড়িলেন।

কোথায় চললেন ? এখুনি তুষারবাবুর কাছে যাবেন নাকি ?

না হে সামসুদ্দিন। তুষারকান্তির কাছে যেতে হলে যাঁর কাছে আগে যেতে হয়—তার কাছেই যাচ্ছি। তাঁর কথা তুষারবাবু ফেলবেন না।

খায়রুল !

জি আব্বা—

ক'টা বাজল ?

আক্রম খাঁ হাতে ঘড়ি পরেন না। মোহম্মদী অফিসের দেওয়াল ঘড়িটি বন্ধ হয়ে আছে। খায়রুল হাতঘড়ি দেখে বললেন, পৌনে তিনটে। আবুল কালাম সামসুদ্দিন দোতলার জানলা দিয়ে দেখলেন, আক্রম খাঁয়ের টি ফোর্ড মোটর গাড়িটি অফিস কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে আপার সার্কুলার রোডে পড়ল।

আশ্বিন শুরু হয়ে গেছে। নীল পরিষ্কার আকাশ। নীচে লালদিঘির এক পারে রাইটার্স বিল্ডিং। তার ঠিক উল্টোদিকে লালাদিঘির এপারে হংকং ব্যাঙ্কের পাশেই ইম্পিরিয়াল রেস্তরাঁ। এই রেস্তেরাঁয় আসেন পাটকেল সাহেব মালিকরা। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের তাবড় তাবড় মেম্বার। আসেন হাইকোর্ট থেকে ব্যারিস্টাররা । আসেন পলিটিক্সের লোকজন। মুসলিম লিগের সঙ্গে হক সাহেবের কোয়ালিশন সরকারের অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার। তিনিও আজ এসেছেন ইম্পিরিয়াল রেস্তরাঁয়। মন্ত্রী হবার অনেক আগে থেকেই তিনি এখান এসে থাকেন। পরনে কাচি ধুতি। গায়ে ফাইন আদ্দির পাঞ্জাবি। গোলাগাল ফর্সা চেহারা। তার মুখোমুখি কে যেন বসে আছেন। কলকাতার খবরের কাগজ মহলের লোক হলে বলে বসতেন—নিশ্চয় নির্মলচন্দ্র চন্দ্র—নয়তো তুলসি গোঁসাই। এঁরা সব কংগ্রেসের চাঁই চাঁই লোক।

দু জনের সামনে দুটি বড় প্লেটে একটি করে অতি বৃহৎ কাটলেট। এই কাটলেট খেতেই কলকাতার কেষ্টবিষ্টুরা ইম্পিরিয়ালে এসে থাকেন। রেস্তরাঁটি এই শতাব্দী শুরু থেকেই বিখ্যাত। তখন আনাগোনা ছিল হাইকোর্টের উকিল ব্যারিস্টারদের। তারপর আস্তে আস্তে এখানে পলিটিক্স,ইন্ডাস্ট্রির লোকজনের আসা বেড়ে গেছে।

নলিনীরঞ্জন আর তাঁর সঙ্গীর আলাপটা অনেকটা এরকম।

সঙ্গী : তুমি নলিনী সবার কাছেই অ্যাকসেপটেবল।

নলিনী : কী রকম ?

সঙ্গী : হকসাহেবের সঙ্গে আছো। শোনা যায় তাঁর পার্টির ফাইনানসিয়ার তুমিই। অথচ তুমি অপোজিশান পার্টি কংগ্রেসের লোক।

নলিনী : ঠিকই বলেছ।

সঙ্গী : আবার তোমার বাড়িতে বসেই হকসাহেবের সঙ্গে মুসলিম লিগের নাজিমুদ্দিনের কোয়ালিশন সরকার হয়। নাজিমুদ্দিন—সোহরাওয়ার্দির কাছেও তুমি অ্যাকসেপ্টেড।

নলিনী : হ্যাঁ। এটাও ঠিক বলেছো।

সঙ্গী : তুমিই আবার গভর্নর জেনারেলের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার।

নলিনী : হ্যাঁ।

সঙ্গী : সেই তুমিই বিড়লাদের কাছে অ্যাকসেপটেবল। গান্ধীজির কাছে তোমার গতায়াত আছে। মৌলানা আজাদ বাঙলায় কেমন সরকার হবে তা নিয়ে তোমারই সঙ্গে কথা বলেন।

নলিনী : হ্যাঁ। এটাও ঠিক বলেছ।

সঙ্গী : তা হলে তুমি আসলে কী ?

নলিনী : সেও আমিও জানি না।

সঙ্গী : তুমি শুধু শরৎবাবু সুভাষবাবুর কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হলে না কেন ?

নলিনীরঞ্জন সরকারের মুখখানি লাল হয়ে উঠল। তিনি কাঁটা দিয়ে কাটলেটটি

কাটতে কাটতে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, পুজো দিতে হলে কালীঘাটে পুজো দেব সেবাইত হালদারদের দিতে যাব কেন ?

সঙ্গী ভদ্রলোকটিও কম কিছু নন। তাঁর চোখে রিমলেস। গায়ে ফিনফিনে আদ্দি ঢোলা হাতা। পরনের ধুতিটি চুনোট করা। কোঁচার ডগা কারপেটে লুটোচ্ছে। তিনিও কাঁটার ডগায় সুস্বাদু কাটলেটের খানিকটা মুখে দিয়ে বললেন, সেবাইত হালদার তে বুঝলাম—বোস ব্রাদার্স। আর কালীঘাট মানে তো গান্ধীজি। তাই না ?

নলিনী · সে তুমি বুঝে নাও ভাই।

সঙ্গী . বাঙালি পাবলিক কিন্তু কাগজ পড়ে বুঝতে পারে না—তুমি কোন দিকে কংগ্রেসে ? হকসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টিতে ? ইন্ডাস্ট্রিতে বিড়ালের দিকে ? সেন্ট্রাল কংগ্রেসে গান্ধীজির লোক তুমি, না এগজিকিউটিভ কাউন্সিলার হিসেবে তুমি বড়লাটের লোক ?

কাঁটায় কাটলেটের আরেকটি টুকরো মুখে দিয়ে নলিনীরঞ্জন বললেন, যাতে বাঙলার ভাল হয—বাঙালির ভাল হয—আমি সবসময় সেই দিকে।

সঙ্গী পাবলিক কিন্তু তোমরা রোল দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। বুঝতেই পারে না—তুমি কোন দিকে ? সত্যিই তুমি কী ?

পরনে ঢোলা পাজামা, তার ওপর ঘিয়ে রঙের শেরওয়ানি। মাথায় ফেজ মানুষ মৌলানা আক্রম খাঁ। রেস্তরাঁয় ঢুকেই নলিনীরঞ্জনকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, এই যে নলিনীবাবু। তুলসিবাবুও আছেন দেখছি।

তুলসি গোঁসাই আক্রম খাঁকে দেখেই চাপা গলায় বললেন—দেখলে নলিনী। য বলেছি। মুসলিম লিগের স্পোকসম্যান আক্রম খাঁয়ের কাছেও তুমি কী সুন্দর অ্যাকসেপ্টেবল

নলিনীরঞ্জন আরও চাপা গলায় বললেন, কী হচ্ছে ! আমরা তো একসময়ে কংগ্রেস করেছি একসঙ্গে।

তুলসি গোঁসাই উঠে যেতে আক্রম খাঁ এসে বসলেন। বসেই বললেন, নলিনীবাবু একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে। আপনি আমাদের লিগ কোয়ালিশন সরকারের ফিনান্স মিনিস্টার। আপনার কাছে একজন মুসলিম লিগার হিসেবে আমি এটুকু আশা করতে পারি।

মিনিস্টার ফিনিস্টার ছাড়ুন। আপনি আমি পুরনো বন্ধু। আগে আরাম করে বসুন তো। কিছু খাবেন ?

না।

নলিনীরঞ্জন কাটলেটের শেষটুকু শেষ করে আক্রম খাঁয়ের মুখে তাকালেন। পরিশ্রমী মানুষ। সেই কবেথেকে পলিটিক্সে আছেন। শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার

আপনার চোখে তো সবই পড়ে নলিনীবাবু। সারা বাঙলায় কোয়ালিশন সরকারে মুসলিম লিগ আসায় মুসলমানদের মনে কী জোয়ার এসেছে—

সে তো বটেই।

কায়েদে আজমের ডাকে মুসলমানরা সাড়া দিয়ে লিগের পতাকার নীচে কাতারবন্দি হচ্ছে।

ঠিক কথা।

কিন্তু আমাদের কোনও ডেইলি কাগজ নেই।

ইস্পাহানিদের বলুন। আদমজির মতো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের বলুন। ওঁরা তো জিন্না-সাহেবের কাছের মানুষ।

অতদূর আমাদের গলা পৌঁছবে না। আপনি বরং তুষারবাবুকে একবার বলুন। অমৃতবাজারের তুষারকান্তি ঘোষ।

কী ভাবলেন একবার নলিনীরঞ্জন। —তুষারদের কী বলব ?

তুষারবাবুরা নতুন রোটারি মেশিন এনেছেন। ওঁদের পুরনো রোটারিটা যদি আমাদের কাছে কিছু কমে বিক্রি করেন তো বাঙলার মুসলমানদের নিজেদের একখানি ডেইলি কাগজ বেরুতে পারে।

নলিনীরঞ্জন আক্রম খাঁয়ের মুখে তাকালেন। শেষ বললেন, আমি বললে—তুষার শুনবে—এ কথা জানলেন কী করে ?

হেসে ফেললেন আক্রম খাঁ। জানি নলিনীবাবু । আপনাকে মানবেন তুষারবাবু। আপনার কথা বিড়লারা শোনেন। তুষারবাবুদের বাঙলা কাগজে বিড়লাদের শেয়ার আছে।

আপনি তো অনেকদূর চলে গেছেন খাঁ সাহেব। আপনি মানী সম্পাদক। কিন্তু একটা কথা বলি—কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডের ওপর ইলেকশন করে বাঙলায় কোয়ালিশন সরকার হয়েছে। এখনও আপনাদের কোনও ডেইলি নেই। তবু লক্ষ করেছেন—কী পরিমাণে কম্যুনাল টেনশন বেড়েছে। যে কোনও ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা এসে যাচ্ছে। অবিশ্বাসের বিষ বাতাসে। এমনটি তো আগে ছিল না।

ছিল না-ইতো !

তাহলে ? এখুনি শহরে-গাঁয়ে মিটিং করে যে সব কথা বলা হচ্ছে—তাতে দমবন্ধ হয়ে আসছে। কোথাও যেন একটু আলো নেই। আমি তো ভাবছি—আর কিছুদিন দেখে তবে রিজাইন করব।

ছিঃ ! ও কথা বলবেন না। বাঙলার মানুষ এই সরকারের কাছে অনেক কিছু আশা করে। চলুন। দুজনে তুষারবাবুর কাছে যাই। আপনি বিয়ে-থা করেননি। আপনার তো হারাবার কিছু নেই।

বলেছেন !—বলে নলিনীরঞ্জন তাঁর গাড়িতে মৌলানা আক্রম খাঁকে নিলেন। এ গাড়ির পেছন পেছন আক্রম খাঁয়ের সাবেক টি ফোর্ড মাথা নাড়তে নাড়তে কলকাতার বুকের ওপর দিয়ে ফলো করে চলতে লাগল।

লোকে বলে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। রিকশাওয়ালারা বলে নয়া সড়ক। সেই রাস্তা

ধরে গাড়ি দুটি বাগবাজারে এসে ডাইনে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে ঢুকল। এই রাস্তাতেই সার দেশের বোধহয় সবচেয়ে পুরনো কাগজের অফিস। অমৃতবাজার পত্রিকা। নিউজপ্রিন্টের গন্ধ। রোটারি মেশিন চলছে শব্দ করে। তাতে পুরনো বাড়িটি না ভেঙে পড়ে। তাই মনে হল আক্রম খাঁয়ের। তিনি বললেন, দিনের বেলায় এখন রোটারি চলছে ?

তুষাররা ভারত সরকারের মানি অর্ডার ফর্ম ছাপার অর্ডার পেয়েছে। চলুন ওপরে যাই।

ডান হাতে দোতলা পুরনো বাড়ি। বাঁ হাতে খোলা মাঠ। সেটি দেখিয়ে নলিনীরঞ্জন বললেন, এখানে তুষাররা নতুন বাড়ি করে উঠে আসবে।

তুষারকান্তি ঘোষের চেহারটি খুব সুন্দর। টিকোলো নাক। মাথাভর্তি কালো চুল মাঝখান থেকে সিঁথি। ছিমছাম। লম্বা একহারা শরীর। বছর দশেক হল তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে তিনি সম্পাদক হয়েছিলেন। এমন দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে তুষারকান্তি উঠে দাঁড়ালেন। -আসুন আসুন।

বিশেষ করে আক্রম খাঁকে তুষারকান্তি বললেন, আপনি তো কোনওদিন আসেন নি

আসতে হল। আপনার কাছেই যখন আমার কাজ।

কী ব্যাপার বলুন।

বলছি। তার আগে বলি—আমি আর অমৃতবাজার পত্রিকা কিন্তু এক বয়সী আমাদের একই বছরে জন্ম।

নলিনীরঞ্জন হেসে ফেললেন, তাই নাকি ! তা হলে তো তুষার এটা একটা বড় যোগাযোগ।

তুষারকান্তি নলিনীরঞ্জনের চেয়ে পনেরো যোলো বছরের ছোট। আবার নলিনীরঞ্জন মৌলানা আক্রম খাঁয়ের চেয়ে চোদ্দ পনেরো বছরের ছোট। তিন জন—তিন যুগের মানুষ। কিন্তু রাজনীতি, ভাষা, ইতিহাস, খবরের কাগজ—তিন জনকেই একই সুতোয় বেঁধে রেখেছে।

তুষারকান্তি বললেন, আমাদের এই অফিসে একসময় আমার বাবা কাকাদের আমলে অনেক বড় বড় মানুষ এসেছেন। আমার ছোটবেলায়—মনে আছে—সিস্টার নিবেদিতা আসতেন। তখন বিবেকানন্দ বেঁচে নেই।

কাজের কথায় আসি—বলে নলিনীরঞ্জন শুরু করলেন।

কয়েক কথায় সব ঠিক হয়ে গেল। তুষারকান্তি বললেন, একটু আধটু যা গোলমাল আছে রোটারিটার—তা আমি মানিক মিস্ত্রিকে পাঠিয়ে দেব। ও সব ঠিক করে দেবে। ওই কথাই রইল। আপনি মোট আঠারো হাজার টাকা দেবেন।

প্রায় ঠিক একই সময়ে খুলনায় ট্রেন থেকে নামলেন আবুল হাসিম। হালকা ছিপছিপে মানুষ। মাত্র চল্লিশ বিয়াল্লিশ। আলিগড়ি পাজামার ওপর পাঞ্জাবি। এই বয়েসেই চোখের কি এক অসুখ হয়েছে। বাইরে বেরোলে কালো চশমা চোখে দিয়ে থাকেন। কাঁধে

কাপড়ের ব্যাগ।

ভেতরকার জিনিসের ভারে ব্যাগটি ঝুলে পড়েছে। আবদুস সবুর খাঁ, দেলোয়ার হোসেন, রূপসার ওপারের স্টুডেন্ট লিডার আমিনুদ্দিন ফার্স্ট ক্লাস কামরার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে প্রদেশ মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদককে নামতে না দেখে রীতিমত হতাশ হলেন। তা হলে হয়তো ট্রেনটা ধরতেই পারেননি।

ঠিক এই সময় আমিনুদ্দিন দেখলেন, ফার্স্ট ক্লাস কামরার লাগোয়ায় থার্ড ক্লাশ কামরা থেকে কালো চশমা চোখে ব্যাগ কাঁধে একজন নেমে আসছেন। দেখেই আমিনুদ্দিন চেঁচিয়ে উঠলেন, সবুর সাহেব—ওই তো লিগের জেনারেল সেক্রেটারি আবুল হাসিম।

তাই তো। কিন্তু তিনি কি থার্ড ক্লাসে ট্রাভেল করবেন !

ওদের দেখেই চিনতে পেরেছেন আবুল হাসিম। কাছাকাছি এসে তিনি আদাব জানাতেই সবুর খাঁ বললেন, ভেবেছি আপনি বুঝি এলেন না।

কেন ! এই তো এসেছি।

দেলোয়ার হোসেন খুলনা বারের তরুণ উকিল। তিনি বললেন, ফার্স্ট ক্লাসের সামনে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে আমরা মন খারাপ করে ফিরে যাচ্ছিলাম।

তোমরা ফার্স্ট ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়েছিলে কেন ? মুসলিম লিগের এখনও তো সেই অবস্থা হয়নি যে আমরা ফার্স্ট ক্লাসে ট্রাভেল করব। এখনও সামনে অনেক লড়াই আছে।

স্টেশনের গেট দিয়ে বেরোতে গুটি তিরিশ চল্লিশ কিশোর লিগের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে। সবুজ জমিতে সাদা চাঁদ তারা। আবুল হাসিম পাশ দিয়ে যেতে প্রথমেই যে-ছেলেটি দাঁড়িয়ে তার মুখখানি বড় কচি লাগল তাঁর। জানতে চাইলেন, তোমার নাম কি ?

ফিরদৌস রহমান।

কোথায় থাকো ?

এখানেই, শ্রীশনগরে—

স্টেশনের বাইরে এলাহি কাণ্ড। সবুর খাঁ সারা খুলনা শহরের একত্রিশটি ঘোড়ার গাড়ির সব ক'টি ভাড়া করেছেন। এক এক গাড়ির ছাদে তিন-চার জন করে বসে। কারো কোলে বিগ ড্রাম। কারও কাছে কেটেল। কারও হাতে বা বিউগিল। ঘোড়ার গাড়িগুলোর হাড় জিরজিরে চেহারা। ঘোড়াগুলোও তাই। কিন্তু তাদের মাথায় একটি করে লিগের পতাকা। সাদা আর সবুজ কাগজ দিয়ে বানানো। রেল স্টেশনের সামনেটায় লোকে লোকারণ্য। পর পর এত ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এর আগে কখনও কোনও মিছিল হয়নি। ঘোড়ার গাড়িগুলোর সামনে সবুজ রঙের সালোয়ার কামিজ গায়ে জনা পঞ্চাশের যুবক।

আবুল হাসিম জানতে চাইলেন, ওরা কারা ?

সালোয়ার কামিজ গায়ে ছেলেদের দেখিয়ে সবুর খাঁ বললেন, ওরা ছাত্র লিগের।

অ্যাতো পোশাক বানাতে তো অনেক টাকা লেগেছে।

'তা লেগেছে।—বলে হেসে ফেললেন সবুর খাঁ। —চলুন। আপনি একদম প্রথম

ঘোড়ার গাড়িতে উঠবেন।

এতগুলো গাড়ি ভাড়া করেছেন নাকি?

হ্যাঁ। আপনি আসবেন—মিছিল হবে না?

সবুর ভাই। আমি তো চিঠিতে জানিয়েছিলাম--

ড্রাম বেজে উঠল। বিউগিলও থেমে নেই। জিন্দাবাদে জিন্দাবাদে ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে পড়েছে। তারা পা ঠুকছে। সাইকেল রিকশার প্যাক প্যাঁক। আশ্বিন মাসের বিকেলবেলা। স্টেশন চত্বরে বিশাল কাঠ চাঁপা গাছের সুগন্ধি চাঁপার একটা পাপড়ি খসে পড়ল। আবুল হাসিম বললেন, আমি তো চিঠিতে লিখেছিলাম—পর পর চারদিন ছোট ছোট ঘরোয়া মিটিং করব। কোনও রকম হইচই করার দরকার নেই। শুধু কর্মীদের সঙ্গে ভাল করে মিশব।

সবুর খাঁ বললেন, আপনি আসবেন আর মিছিল মিটিং হবে না—তা হয় নাকি?

হ্যাঁ হয়। আমি পাবলিক মিটিং করতে আসিনি। এসেছি জেলার সদর আর মহকুমার ওয়ার্কারদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে কথা বলতে।

সবুর খাঁ কোনও কথা বলতে পারলেন না। স্কুলের ছেলেরা লিগের পতাকা হাতে স্টেশনের বাইরে সুন্দর কুচকাওয়াজ করছে। পরিষ্কার আকাশ। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি আসবেন বলে তিনি বেশ ক'দিন ধরে আজকের বিকেলটির জন্যে তৈরি হয়েছেন।

রাতে আমি থাকছি কোথায়?

ভাল জায়গায় ব্যবস্থা করেছি। স্টিমার কোম্পানির এজেন্ট আমিন সাহেবের বাংলোয়। একদম নদীর ওপর। কাঠের বাড়ি। হুহু করছে হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে যাবে

কেন? আর জায়গা পেলেন না।

তাহলে নবাববাড়িতে থাকুন। কোনও অসুবিধে হবে না আপনার।

থামুন। এই নবাব, নাইট করেই মুসলিম লিগ পার্টিটার সর্বনাশ ডেকে আনছেন আপনারা।

সবুর খাঁ ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি তা হলে কি চান?

আবুল হাসিম বললেন, কোনও সাধারণ কর্মী কি নেই পার্টিতে?

সাধারণ?

হ্যাঁ। সাধারণ মানুষ। এই ধরুন স্কুলে পড়ান। কিংবা রেলে কাজ করেন। নয়তো খুলনা কোর্টে মুহুরি কিংবা উকিল।

হ্যাঁ—বলতে বলতে মুখে হাসি ফুটে উঠল সবুর খাঁয়ের। অনেক--অনেক আছে এমন লোক। সাধারণ গরিব মুসলমানদের নিয়েই তো আমাদের মুসলিম লিগ।

তেমন কারও বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা করুন। আর এতসব টাকাই বা পেলেন

কোত্থেকে ? ওই সবুজ রঙের সালোয়ার কামিজ অতগুলো—এতগুলো ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া—ব্যান্ডপার্টির বাজনদারদের টাকা—

আমিনসাহেব দিয়েছেন। অন্য ব্যবসাদাররাও দিয়েছেন।

আমার এই ব্যাগটা ধরুন।

সবুর খাঁ আবুল হাসিমের হাত থেকে তাঁর কাপড়ের ঝোলাটি ধরলেন ভাল করে।

ওর ভেতরে বিল বই আছে পার্টির। মেম্বারদের কাছ থেকে মাসে দু আনা করে চাঁদা তুলবেন। মোট পঞ্চাশ হাজারের বিল আছে। বইগুলো সাবধানে পার্টি অফিসে রাখবেন। দেখবেন চুরি যেন না যায়।

সবুর খাঁকে খুলনা শহরে অনেকেই ডরায়। কিন্তু এই ছোটখাটো মানুষটির সামনে এত গোলমালের ভেতরেও সে যে ভড়কে গিয়ে কেঁচোর দশা এখন—তা বাইরে থেকে দেখেও বোঝা যায়। মাস গেলে কলকাতার অফিসে হিসেব পাঠাবেন। পার্টির লেভি দেবেন।

সবুর মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, চলুন।

নিমরাজি ঢঙে আবুল হাসিম গিয়ে একদম সামনের ঘোড়ার গাড়িতে বসলেন। তার বসার সুবিধার জন্যে ছ্যাকরা গাড়ির সিটে নরম আসন বিছানো। উল্টোদিকে বসলেন সবুর খাঁ।

মিছিল রেল স্টেশন থেকে শহরের দিকে চলল। আবুল হাসিম বর্ধমানের মানুষ। তিনি বাঙলাদেশের এদিকটায় কম এসেছেন। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হওয়া চারটিখানি কথা নয়। বিশেষ করে বাঙলার মুসলিম লিগের জেনারেল সেক্রেটারির পদটি ব্রিটিশ ভারতে খুব ইম্পর্টান্ট। বাঙলায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। একসঙ্গে এত মুসলমান সারা ভাবতে আর কোথাও নেই। এমনকি সৌদি আরব, মিশর মিলিয়েও আরব জাঁহানে এক জায়গায় এত মুসলমান নেই। কায়েদে আজম জিন্না সাহেবের চোখও বাঙলার দিকে। তাঁর সবচেয়ে বেশি সাপোর্টার এই বাঙলাতেই। মুসলিম লিগের দাবিদাওয়া বাঙলার মুসলমানরা গলা ফুলিয়ে না বললে কায়েদে আজমের চেয়ারখানিও নড়বড়ে হয়ে যাবে। আর এই নিয়ে কৃষক প্রজা পার্টির নেতা হকসাহেবের মন কষাকষি কায়েদে আজমের সঙ্গে। হকসাহেব মনে করেন, কায়েদে আজম দূরে বসে বাঙালি মুসলমানদের মাথায় লাঠি ঘুরিয়ে একমাত্র নেতা হতে চাইছেন—ইসলামের নামে জিগির তুলে। সেই পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি আমি। এই পার্টিকে জনসাধারণের ভেতর দাঁড় করাতে হলে নবাবজাদা, নাইটদের হাত থেকে পার্টিকে বের করে আনতে হবে।

গত চল্লিশদিন ধরে আবুল হাসিম জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারা কর্মী তা জানা দরকার। চেনা দরকার। টাকার জন্যে ইস্পাহানি, আদমজিদের হাতে ধরা হয়ে থাকতে চান না তিনি।

সবুর খাঁকে বললেন, এখানে পার্টি অফিসে চেয়ার কখানি ?

সবুর একটু ভেবে বললেন, তা সাতখানা তো হবে।

টেবিল কটি ?

টেবিল নেই।

বিল দিয়ে চাঁদা উঠলে প্রথমেই একটি বড় টেবিল কিনবেন। আর চেয়ার কিনবেন নখানি।

অফিসে ঘর কখানা ?

দুটো ঘর। ভাড়াবাড়ি।

আমরা এখন কোয়ালিশন সরকারে আছি। কতদিন কোয়ালিশন টিকবে কেউ বলতে পারছেন না। এইবেলা একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিন। মহকুমা থেকে ওয়ার্কাররা এসে যাতে দরকারে থেকে যেতে পারেন—তার ব্যবস্থা তো থাকা চাই।

কথাগুলো সবুর খাঁয়ের ভাল লাগছে।

ডাকবাংলোর মোড় দিয়ে মিছিল চলেছে পার্টি অফিসের দিকে। রাস্তার দু পাশে শহরের লোক দাঁড়িয়ে গেছে। কালীবাড়ি পাড়ার দিক থেকে একঝাঁক সাইকেল রিকশা কোনও পথ না পেয়ে রাস্তা জ্যাম করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রিকশায় যারা বসে তাঁদের ভ্রূ কুঁচকে উঠছে।

আবুল হাসিম বললেন, যা বিল বই দিয়েছি—ঠিকমত চাঁদা আদায় হলে আপনাদেব কোনও কাজই আটকাবে না।

ওসব বিলে আমরা দু' দিনেই সব চাঁদা তুলে ফেলব। মোটে দু' আনা করে তো।

দু' আনা মোটে নয়। কোনও আমিনসাহেবকে বা ব্যবসাদারকে সব বিল দিয়ে একবারে থোক টাকা নেওয়া চলবে না। সাধারণ মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা নেবেন মাসে মাসে। নাম ঠিকানা তুলে রাখবেন।

সবুর খাঁ কোনও কথা বলতে পারলেন না। রাস্তায় দাঁড়ানো অনন্ত ঘোষাল দেখতে পেলেন—তাঁর চেনা সবুর খাঁ ঘোড়ার গাড়ির ভেতরে বসে।

আলো নেই

রোজ সকালে খুলনা একটি নতুন শহর। ভরা ভৈরব নদীতে স্টিমার ঘাটায় নানা রঙের লঞ্চ, স্টিমার। পাটের নৌকো। মাছমারাদের ডিঙি। খেয়া নৌকোর এপার ওপার পারাপার। সাইকেল রিকশাগুলো রাজহাঁসের কায়দায় সওয়ারি নিয়ে প্যাঁক প্যাঁক করে এদিক ওদিক যায়। শেয়ালদা থেকে রাতের ট্রেন ভোর ভোর খুলনা স্টেশনে এসে দাঁড়ায়। পাড়ায় পাড়ায় গেরস্থবাড়ির ছেলেমেয়েরা গলা ফুলিয়ে পড়া মুখস্ত করে। তার ভেতর জলের ভারীরা বাড়ি বাড়ি জল দিচ্ছে। ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রূপসার জলে ভাসানো তাঁর লঞ্চ থেকে হাফপ্যান্ট পরে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বাংলোয় উঠে এলেন এইমাত্র। ডি আই. বি ইন্সপেক্টর অমূল্য ঘোষ আর কাকা মিঞা যে যার সাইকেলে সারা শহর টহল দিয়ে বেড়িয়েছেন। যদি কিছু চোখে পড়ে যায়—সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের রাজত্বে কোথায় কোথায় ষড়যন্ত্র ঘটতে পারে তাই খুঁজে দেখা ওঁদের কাজ।

এর ভেতর শহরের এক এক জায়গা এক এক রকম। শ্রীশনগরের ভেতর দিয়ে যে রাস্তাটি গিয়ে পড়েছে, তার ডানহাতে পর পর কয়েকখানি একতলা বাড়ি। প্রথমেই অনন্ত ঘোষালের দুই কলিগ পর পর বাড়ি করেছেন। উপেন পেশকার। শশী পেশকার। বাড়ির সামনে ফুলবাগান। বারান্দায় টালির ছাদ। তারপর ঘরগুলোর মাথায় পেটাই ছাদ। এই দুখানি বাড়ির পরেই নলিনী ঘোষ থাকেন। বাড়িটি ইনকমপ্লিট। যাকে বলে আধখেঁচড়া। অতি ছোট বাড়ি। সামনের বারান্দাটিও ছোট। বউ মারা গেছেন। থাকার লোক বলতে নলিনী ঘোষ আর তাঁর মেয়ে অঞ্জলি। ওঁদের বাড়ির সামনে বিরাট একটি পোড়ো মাঠ। তাতে ভেঙে পড়া একটি সুরকি কলের লোহার বিশাল জাঁতা মাটিতে গেদে বসে গেছে। পাশেই ডাল ভর্তি ফল নিয়ে বাতাবিলেবু গাছ। আর পোড়ো মাঠটির মাঝখানে তিনটি বিশাল বকুলগাছ। সবাই বলে বকুলতলা।

এখন দেখা যাচ্ছে সেই বকুলতলায় নলিনী ঘোষ—বয়স হওয়ার আগেই মাথাটি

কাঁচাপাকা—ফ্রকপরা একটি টানটান মেয়েকে বললেন, ফটোটা টাঙিয়ে দে মা—

কোথায় টাঙাব ?

কেন অঞ্জু—গাছের গায়ে গতবার যেখানে টাঙানো হয়েছিল—খুঁজে দ্যাখ—একটা পেরেক পোঁতা আছে।

পাচ্ছি না বাবা—

ভালো করে খুঁজে দ্যাখো মা। নিশ্চয় আছে।

খুঁজে পেয়ে অঞ্জলি একটি ফটো টাঙিয়ে দিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবি। ছবির নীচে গাছটির মোটা গুঁড়ির পায়ে থালাভর্তি বাতাসা আর কাটা ফল সাজিয়ে দিলেন নলিনী ঘোষ।

অঞ্জলি প্রসাদী থালার পাশে মাটিতে দু' ধারে দুটি করে ধূপকাঠি বসিয়ে তাতে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিল। গাছতলাটি পরিষ্কার। ঝরে পড়া বকুলফুলের গন্ধ বাতাসে। বাবা আর মেয়ে মিলে একটি শতরঞ্চি ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিল। তারপর দুজনে দড়ি দিয়ে একটি লাল সালু দুই গাছে বেঁধে টানালো। এবার দেখা গেল—তাতে সাদা কাগজের বাংলা হরফে লেখা—রামকৃষ্ণ মেলা। কাল সন্ধেরাতে হেরিকেনের আলো জ্বেলে অনেকক্ষণ ধরে কাগজ কেটে কেটে এই হরফগুলো প্রথম বানিয়েছে অঞ্জলি। তারপর সেগুলো জিওলের আঠা দিয়ে লাল সালুতে সেঁটে লাগাতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল অঞ্জলির।

সব রেডি বাবা। তোমার লোকজন কখন আসবেন ?

আসবে রে মা আসবে। খবর চলে গেছে। তুই আজ গান করবি মা।

অঞ্জলি দেখল তিনটে কাক জায়গা বদলে বদলে প্রসাদী থালার দিকে আসছে। হুস ! হুস ! করে তাদের তাড়িয়ে অঞ্জলি বলল, আজ কিন্তু বাবা তোমার সেই দেশবন্ধু দেশবন্ধু—আর গান্ধীজি গান্ধীজি—নামগুলো তুলে কোনও তর্ক বাঁধাবে না।

দূর পাগলি ! আজ তো রামকৃষ্ণ মেলা। তুই রবি ঠাকুরের সেই গানটা গাইবি—

কোনটা ?

তোমার পথের পানে চেয়ে চেয়ে—বলতে বলতে নলিনী ঘোষ বাড়ির দিকে চললেন, আরেকখানা শতরঞ্চি আনিগে—

নলিনী ঘোষ ধুতি পরেছেন। খালি পা। গায়ে একটি খাদির হাফশার্ট। দেশবন্ধুর ডাকে কাজের জায়গায় ধর্মঘট করে চাকরিতে কোনও উন্নতি করতে পারেননি। কয়েক বছর হল অল্প কটা টাকার পেনশন নিয়ে এখানে এসে বাড়ি তুলতে তুলতে অঞ্জলির মা মারা যান। বাড়ি শেষ হয়নি আর। মাঝে মাঝে দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমানের ভেতর চাকরি ভাগাভাগির বেঙ্গল প্যাক্ট নিয়ে কথা বলেন। বলতে শুরু করলে তাঁকে থামানো কঠিন হয়ে পড়ে। যে প্যাক্ট শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে গেছে—তাও প্রায় দশ বছর হল—সেই প্যাক্টের ভালমন্দ নিয়ে কথা বলতে ভালবাসেন মানুষটি। বাবার একটা কথা প্রায়ই অঞ্জলির মনের ভেতর বেজে ওঠে। রামকৃষ্ণের ভক্তরা মাঝে মাঝে এদিক ওদিক থেকে বিকেলের দিকে তাদের বারান্দায় জড়ো হন। তিন-চারজন করে। তাদের কাছে নলিনী ঘোষ বসে থাকেন—দেশবন্ধু বেঁচে

থাকলে প্যাক্ট হতই—আর প্যাক্ট হলে দেশের এই দশা হত না।

কি দশা—তা ভাল করে জানে না অঞ্জলি। সে পড়ে ক্লাস সেভেনে। বেঙ্গল প্যাক্ট কি জিনিস তাও তার জানা নেই। বাবার কথাবার্তায় যা শুনেছে—তা হল চাকরিবাকরি ভাগাভাগি করে করা—যার মানে সে কিছুই বোঝে না। তবে ক'দিন আগে সে মুসলিম লিগের ঘোড়ার গাড়ির মিছিল যেতে দেখেছে স্কুল থেকে ফেরার পথে। কোন বড় নেতা এসেছিলেন কলকাতা থেকে। সবুজ রঙের সালোয়ার-কোর্তা পরা ছেলের দল। ঘোড়ার গাড়ির ছাদে ড্রাম বাজছে। ঘোড়ার মাথায় কাগজ দিয়ে বানানো মুসলিম লিগের পতাকা।

বেনেখামারের দিক থেকে সাইকেল চালিয়ে পাজামা শার্ট পরা একটি ছেলে এসে একদম অঞ্জলির গা ঘেঁষে ব্রেক কষে দাঁড়াল। আজ কিসের পুজো অঞ্জু ?

পুজো না। মেলা—রামকৃষ্ণ মেলা। কথকতা হবে। গান হবে। এসো না ফেরদৌস। বকুল গাছের গায়ে টাঙানো ফটোটি দেখে ফেরদৌস বলল, রামকৃষ্ণ মেলা। আমি তো আসতে পারি না।

সবাই আসতে পারে।

উঁহু। তোমরা ছবির নীচে ধূপকাঠি জ্বেলেছ। আমি আসি কি করে ? ওসব আমাদের বারণ। আমি ওঁর ছবি দেখেছি ক্যালেন্ডারে—কাপড়ের দোকানে। রামকৃষ্ণ পরমহংস। তোমাদের নবী। গান হবে নিশ্চয ?

হুঁ। বলে চুপ করে গেল অঞ্জলি।

রবি ঠাকুরের গান শুনতে আমার ভাল লাগে।

আমি গাইব।

তাহলে তো আমি দূরে দাঁড়িয়ে শুনব।

দূরে কেন ? সাইকেলটা বাড়িতে রেখে চলে এসো। এখানে সবার সঙ্গে বসে শুনবে।

না। তা আমি পারি না। আজ তো স্কুল নেই। সাইকেল রেখে আসছি। তোমার গলার গান আমার খুব ভাল লাগে।

অঞ্জলি ঘোষ কোনও কথা বলল না। রোজ বিকেলে ফেরদৌস শ্রীশনগরের অন্য ছেলেদের সঙ্গে এই পথ দিয়ে যতীন সিংঘির মাঠে ফুটবল খেলতে যায়। তখন অঞ্জলির বাবা নলিনী ঘোষ ওদের ডেকে ডেকে গল্প করেন। সেই থেকে ফেরদৌস ওদের বাড়ি আসে। একদিন তো অঞ্জলির পড়ার বই উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বলেছিল—তোমাদের চেয়ে আমাদের ক্লাস সেভেনের পড়াশুনো অনেক কঠিন ছিল। যেন কত বড় ! এই তো গত বছর তুমি সেভেন থেকে এইটে উঠেছ ফেরদৌস !

সাইকেলে উঠে চলে যাচ্ছে ফেরদৌস। বাঁই বাঁই করে। অঞ্জলি দেখেছে—তার বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় ফেরদৌসের মুখখানি এক একটা কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। মোটা ভ্রূ। তার নীচে কালো চোখ দুটি স্থির হয়ে আসে। হঠাৎ হঠাৎ সে জানতে চায়—তাহলে কংগ্রেসের কৃষ্ণনগর কনফারেন্সে দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল হয়ে গেল কেন ? আপনি

বলছেন এই প্যাক্টই ছিল দুপক্ষের ভেতর একটা মিটমাটের চেষ্টা।

হ্যাঁ বাবা। অঞ্জলির কানে তার বাবার কথাগুলো বাজে। নলিনী ঘোষ বলেন, এই প্যাক্ট করে পড়াশুনো করা- বি. এ, এম. এ পাশ চাকরিপ্রার্থী হিন্দু মুসলমানের ভেতর একটা শান্তি আনার চেষ্টা করেছিলেন দেশবন্ধু আর স্যার আবদার রহিম। ইস্কুল ইন্সপেক্টর আবদুল করিম সাহেব এই প্যাক্টের খসড়া তৈরি করেছিলেন। দুপক্ষই সমান সমান চাকরি পাবে। চাকরিতে দু' তরফ যতদিন সমান সমান না হচ্ছে—ততদিন মুসলমানদের বেশি বেশি চাকরি দিয়ে হিন্দুদের সমান করা হবে।

ভালই তো।

কিন্তু বাবা এতো যারা খবরের কাগজ পড়ে—বি. এ পাশ করে—চাকরি খোঁজে—না পেলে চিৎকার করে—এ গেল তাদের প্যাক্ট। সারা দেশের সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের—যারা মাঠে হাল দেয়—নদীতে মাছ ধরে—যারাই দেশের বেশিরভাগ মানুষ—তাদের সঙ্গে এই প্যাক্টের কোনও যোগ ছিল না ফেরদৌস। তবে হ্যাঁ পাশটাশ করা ভদ্দরলোকদের পক্ষে প্যাক্টটা মন্দের ভাল ছিল।

তা হলে সে প্যাক্ট বাতিল হল কেন ?

আমাদের দুর্ভাগ্য ! অনেকেই সেদিন মনে করেননি—এভাবে একজনের মাথা ছেঁটে আরেকজনের সমান করে দেশের ভাল করা যায়। এসব তোমার জন্মের আগের ব্যাপার। তোমার আব্বা এক্রামুদ্দিন আহমেদ সব জানেন। তিনি সব বলতে পারবেন।

এরকম নানা ব্যাপারে কথা হয়। এক একদিন সবাই খেলতে চলে যায়। ফেরদৌস অঞ্জলির বাবার সামনে বসে থাকে। তার বাবার মুখের কথা গিলতে থাকে ফেরদৌস। আবার কোনওদিন বা খুব মুরুব্বিয়ানার চালে অঞ্জলির স্কুলের ভূগোল বই দেখে। অঙ্কের খাতা নাড়েচাড়ে।

আজ যেন কিসের ছুটি। যতীন সিংঘির মাঠ ভেঙে হাঁটুর ওপর ধুতি তুলে দুজনে এসে শতরঞ্চিতে বসলেন। এদের অঞ্জলি দেখেছে আগেও। ওরা বেনেখামারের ওপারের লোক। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ওরা বলেন—ঠাকুর। টুনুদা পানুদার মা এসে বসলেন—কোলে একটা হাতে একটা ছেলে তাঁর।

সকালের রোদ বকুলতলার ছায়ার বাইরে। শতরঞ্চি একটু একটু করে ভরে উঠল। এবার উপেন পেশকারের ফুলের বাগান থেকে দেখলে মনে হবে—বকুলতলায় কোনও মিটিং হচ্ছে। উপেন পেশকার খালি গায়ে লুঙ্গি পরে খুরপি দিয়ে বেলফুলের গোড়া খোঁচাতে খোঁচাতে গলা তুলে পাশের বাড়ির দিকে তাকিয়ে গলা তুললেন—শশী আছ নাকি ! শশী !

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শশী পেশকার। ডাকছেন দাদা ?

ওই দ্যাখো বকুলতলায় আবার নচ্ছাল্লা শুরু হয়ে গেছে নলিনী ঘোষের।

শশী পেশকার মুখ তুলে ভিড়টা দেখলেন। দেখে বললেন, একটা জিনিস লক্ষ

করেছেন দাদা—ক' বছর হল—সিনেমা এসে রবিঠাকুরের গান চালাচ্ছে—বাড়ি বাড়ি এখন এই গান ঢুকে পড়েছে। পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল—সবাই এ-গান গাইছেন।

খুরপি হাতে উপেন পেশকার উঠে দাঁড়ালেন। তিনি শশীর চেয়ে বয়সে কিছু বড়। বললেন, আজও এখানে রবি ঠাকুরের গান হবে নিশ্চয়। ক' বছরে রামকৃষ্ণর নামগানও খুব বেড়েছে। বুঝলে ভায়া আমার বার্থ ইয়ার এইট্টিন নাইন্টিন সেভেন। আমি বড় হতে হতে চোখের সামনে দেখলাম—রামকৃষ্ণ পরমহংস দিনে দিনে অবতার হয়ে উঠলেন।

শশী পেশকার বললেন, সেই সঙ্গে বাড়বাড়ন্ত মুসলিম লিগের। হবে না কেন! কংগ্রেস যে ভেড়ুয়া। হকসাহেবের সঙ্গে কোয়ালিশন করলে মুসলিম লিগ তো পিকচারেই আসে না।

বাড়ি গিয়ে ফেরদৌস পায়জামার ওপর একটি কাচা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছে। বকুল গাছতলায় নানা বয়সের মানুষজন বসে। কয়েকজন মহিলার সঙ্গে টুনুদা পানুদার মা। মাসিমা খোকনকে সামলাতে পারছেন। কিন্তু গৌর কিছুতেই কোলে থাকতে চাইছে না। সে বেঁকে বেঁকে ঠেলে উঠতে চাইছে। ঠিক এইসময় অঞ্জলি গেয়ে উঠল। রিনরিনে গলা। রবি ঠাকুরের গান। বকুলগাছের গায়ে ঝোলানো ফটো থেকে অঞ্জলিদের নবী যেন তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। তাই মনে হচ্ছে ফেরদৌসের।

তার কেমন অপরাধও লাগছে। সে ছাত্র লিগের একজন ভলান্টিয়ার। কলকাতা থেকে ট্রেনে করে নতুন একখানা বাংলা দৈনিক কাগজ এখন রোজ খুলনায় আসে। দৈনিক আজাদ। সম্পাদক মৌলানা মহম্মদ আক্রম খাঁ। আজাদের সাপ্তাহিক ছোটদের পাতার জন্য সে একটি কবিতা পাঠিয়েছে। কবিতাটির নাম—শহীদের সম্মান। আজাদের রবিবারের পাতায় ইসলামের গৌরবের দিনের কাহিনী ছাপা হয়। ছাপা হয়—মুসলমানদের জন্যে আলাদা হোমল্যান্ডের কথা। এসব কথা সেদিন মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসিম সাহেব খুলনায় এসে ছাত্রদের সামনে—মুরুব্বিদের সামনে বুঝিয়ে বলেছেন। জলের মতো করে। দরকারে শহীদ হতে হবে। তাই নিয়েই কবিতাটি লিখেছে ফেরদৌস। শহীদের সম্মান। নিজেদের জন্যে আলাদা একটা দেশ করতে হলে অনেককেই তো শহীদ হতে হবে।

ফেরদৌস অবাক হয়ে লক্ষ করল, অঞ্জলির গানে সারা বকুলতলা ভরে গেছে। তিনটে ঝাঁকড়া বকুল গাছের ছায়ায় গাছতলাটা যেন বাকি পৃথিবী থেকে আলাদা। ছায়ার বাইরেই আশ্বিনের চড়া সাদা রোদ।

শহর খুলনায় বড় বড় মোড়ের ভেতর ডাকবাঙলোর মোড় একটা বড় জায়গা। এখানে চার রাস্তার ক্রসিং। বাজার, আদালত, কালীবাড়ি, বড় মসজিদ, পুলিশ লাইন, হাসপাতাল—কোনোটা না কোনোটা এইসব রাস্তার কোন একটিতে পড়বেই। এই মোড়ের কাছাকাছি খুলনা কোর্টের উকিল আব্দুল হাকিমের বাড়ি। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতেই চোখে পড়ে দোতলা বাড়ির একতলায় বসবার ঘর—ঘরের কোণে একটি অরগান। দেওয়ালের গায়ে

আলমাবিতে বইযেব পব বই।

আব্দুল হাকিমেব বযস এখনো পঞ্চাশ হযনি। কোর্টে তাঁকে দেখেই চেনা যায। ঘু
ঘুম চোখ। মাথায চুল অগোছালো। ডানহাতে মামলাব নথি। বাঁ হাতে আইনেব বই
আদালতেব চওডা বাবান্দা দিযে যখন হেঁটে যান—তাঁর কালো গাউনেব খানিকটা নদী
বাতাসে উডে ওঠে—তখন মনে হয বুঝিবাও কোন দববেশ—নযতো কোনও ঈগল পা
ডানা মেলে—গাযেব গাউন বা আলখাল্লা বাতাসে উডিযে দিযে শযতানেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে
চলেছেন। অথচ এই মানুষটিই হাসলে মনে হবে কি নবম।

এখন সকালবেলা। পাজামা পাঞ্জাবি পবা আব্দুল হাকিম একটু বেশি বযসে বি
কবেছেন। ঠিকই কবেছিলেন বিযে কববেন না। প্রায চল্লিশে গিযে তিনি বিযে কবেন
কযেকবছব হল তাব একটি ছেলে হযেছে। এই চাব পাঁচ বছবেব ছেলে। তাব না
বেখেছেন—আলো।

স্ত্রী দোতলায নিজেব কাজে বযেছেন। একতলায লাইব্রেবি ঘবে আলো মেঝেতে ব
খুটখাট কবে চলেছে। আব্দুল হাকিমেব বাবাও ওকালতি কবে গেছেন এই শহবে। তাঁ
একমাত্র ছেলে তিনি। বাবাব কাছ থেকে পেযেছেন এই বাডিটি। আব পেযেছেন কিছু বই
সেই সব বইযেব ভেতব থেকে তিনি বাঁধানো আগেকাব পত্রপত্রিকা নাডাচাডা কবছেন
যেমন 'মোসলেম ভাবত'। বছবেব পব বছব বাঁধানো। যেমন—'বঙ্গদর্শন।' তাব পাশে
বযেছে আব্দুল হাকিম সাহেবেব কেনা 'প্রবাসী।' বছবওযাবি বাঁধানো। এইসব কাগজ খুলে
যেখান থেকে ইচ্ছে পডতে শুরু কবা যায। পডতে পডতে তাব ভেতব ডুবে যাওযা যায
বিশেষ কবে তাঁব ভাল লাগে—পডতে পডতে তিনি অবাক হন—বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র বি
যুক্তি দিযে বিদ্যাসাগব মশাযেব বিধবাবিবাহ প্রস্তাবেব সমালোচনা কবেছেন। কিংবা মী
মোশাবফেব জমিদাব দর্পণ। আব হালেব প্রবাসীতে সম্পাদক বামানন্দবাবুব লেখা। একটি
লেখাতে বামানন্দবাবু দেখিযেছেন—কিভাবে ব্রিটিশ সবকাব পৌনে দুশো বছবে ভাবতবর্ষকে
ভিখিবি কবে ছেডেছে। হিন্দু মুসলমান প্রসঙ্গেও বামানন্দবাবুব লেখাগুলো তথ্যে ভবা
গত শতাব্দী থেকে কিভাবে বাংলায মুসলমানবা সংখ্যাগবিষ্ঠ হযে উঠছে—তাব আদমসুমাবি
হিসাব। প্রবাসীব শুরুতেই থাকে ববীন্দ্রনাথেব কবিতা। নযতো কোনও অভিভাষণ। কিংবা
প্রবন্ধ।

দবজায কাব ছাযা দেখে ঘুবে তাকালেন আব্দুল হাকিম। আবে। অনন্তবাবু যে—কি
মনে কবে ? আসুন—বলে আব্দুল হাকিম তাকেব বই পাডাব ছোট মই থেকে মেঝেতে নেমে
এলেন। —বসুন।

অনন্ত ঘোষাল কিন্তু কিন্তু কবে বললেন, আপনি এই সমযটায পডাশুনো কবেন। তা
অনেকদিন আসব আসব কবে আসতে পাবিনি। আজ সাহস কবে চলে এলাম।

বলুন তো। আপনি হলেন গিযে সেসন জজ ডবসন সাহেবেব ফার্স্ট পেশকাব। খুল
কোর্টে প্র্যাকটিস কবতে গেলে অনন্ত ঘোষালকে চিনতে হবেই।

ছিঃ! ছিঃ! এভাবে বলবেন না। আপনাকে আমরা একজন বিদ্বান মানুষ বলেই জানি।

কি ব্যাপার বলুন ? কি খাবেন ?

এখন কিছুই খাব না। বাড়িতে বাজারটা দিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আব্দুল হাকিম একটু অবাকই হয়েছেন। সাধারণত কোনও পেশকার কোর্টের কোনও উকিলের বাড়ি যান না। উকিলরাও কোনও পেশকারের বাড়ি যান না। অবশ্য পথেঘাটে দেখা হলে ভদ্রতা করে অনন্ত ঘোষাল তাঁকে নমস্কার করেন। খেয়াল থাকলে আব্দুল হাকিমও সবাইকে আদাব জানান।

আমি বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। এই শহরে আপনি এমন একজন মানুষ যাঁর কাছে বিপদে পড়লে আসা যায়—

কি বিপদ ? হঠাৎ কোনও টাকা পয়সার দায় এসে পড়েছে ?

না হাকিমসাহেব। আপনি আমার চার পাঁচ বছরের বড়ই হবেন। আপনাকে খুলে বলি।

বলুন।—বলেও আব্দুল হাকিম লক্ষ করলেন, অনন্ত ঘোষালের মুখখানি এই সকালবেলাতেই কেমন কাঁচুমাচু হয়ে উঠেছে। অনেক আশা করে এই শহরে দুটি ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে চাকরি করতে আসি।

সে তো জানি। দশ বারো বছর হয়ে গেছে আপনি এসেছেন। তারপরে এই শহরেই আমার আরও তিনটি ছেলে হয়েছে। বড়টি কলেজে ঢুকেছে।

তাকে যেন দেখেছি। তার নাম টুনু।

হ্যাঁ। ভাল নাম ঋতবান ঘোষাল। মেজোটি ক্লাশ নাইনে পড়ে। সেজো ক্লাশ থ্রিতে। বাকি দু'জনের এখনো স্কুলে যাবার সময় হয়নি।

এখন তো তাহলে আপনার ভরা সংসার অনন্তবাবু।

তা বলতে পারেন। কিন্তু আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি।

কিসের ভয় ?

যে আশা করে বাড়ি ভাড়া করে সংসার পেতেছিলাম—তা বোধহয় হবার নয়।

খুব অবাক হলেন আব্দুল হাকিম। তিনি বুঝতে পারছেন না কিসের আশা। তিনি অবাক হয়ে ধুতির ওপর টুইলের শার্ট গায়ে সেসন জজের ফার্স্ট পেশকারের মুখে তাকিয়ে রইলেন।

অনন্ত ঘোষাল বলতে লাগলেন, ভেবেছিলাম ছেলেদের বড় করে মানুষের মতো মানুষ করব।

তা করবেন। আটকাচ্ছে কিসে ?

ভেবেছিলাম, আমার ছেলেরা পড়াশুনো করে বড় হয়ে আপনার মতো মানুষ হবে। বিদ্বান হবে। সৎ হবে। শিক্ষিত হবে।

খুব অবাক হলেন আব্দুল হাকিম। বললেন, আমার মতো ?

হ্যাঁ, হাকিমসাহেব। হ্যাঁ। কিন্তু তা হবার নয়। সারা শহরের আবহাওয়া দেখেছেন ? হোমল্যান্ডের দাবিতে মুসলিম লিগ—লিগের সবুরসাহেব—ভলান্টিয়ারবা মিটিংয়ের পর মিটিং করছে। কি শ্লোগান তাদের। বক্তৃতার ভাষায় আমাদের সবাইকে এমন বলা হচ্ছে—যেন আমরা সবাই গরুচোর। কংগ্রেস যে বেঁচে আছে তার কোনও প্রমাণ নেই।

প্রমাণ পাবেন কোত্থেকে ? বেশির ভাগ ওয়ার্কার তো জেলে। আর হকসাহেবের প্রজাপার্টি তো কোনও মিটিং-ই করতে পারছে না। সব মুসলমান লিগের পতাকা তলে জড়ো হচ্ছে।

বাতাস বিষিয়ে গেছে। কংগ্রেস এতদিনকার পার্টি। সে বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি। স্পিকার আজিজুল হক তো দুঃখ করে বলেইছেন—কংগ্রেস হকসাহেবের সঙ্গে থাকলে ছবি অন্যরকম হত। খোলা মন নিয়ে দশ বছর আগে হকসাহেব প্রজা পার্টির ডাক দেন। আজ তাঁর পার্টি মুসলিম লিগে বিলীন।

আমাদের মতো ছাপোষা গেরস্থদের কি হবে বলতে পারেন ? আমরা যারা আশা করি—পড়েশুনে আমাদের ছেলেরা মানুষ হবে—তাদের তো সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই। খুলনার রাস্তায় মানুষজন। রিকশা সাইকেল। দূরে নদীর ঘাটে স্টিমারের ভোঁ। আসাম-বেঙ্গল স্টিমার সার্ভিসের বড় বড় স্টিমার এই সময় মাল নিয়ে খুলনা ছাড়ে। অনন্ত ঘোষাল বললেন, আপনি তো জানেন আমি কি মাইনে পাই। আমার মতো অনেকেরই সামনে আপনি একজন আদর্শ পুরুষ।

আমি ? হাসালেন অনন্তবাবু। আমি কত ব্যাপারে ব্যর্থ জানেন। এখনো আইনের পয়েন্টস ঠিকমতো মাস্টার করতে পারি না—সওয়াল করার সময়।

আপনি একজন বিদ্বান—ভাল লোক, শহরসুদ্ধু সবাই জানে। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম—আমার বড় ছেলেটি পাশটাশ করে আপনার মতো মানুষ হবার চেষ্টা করবে। দরকার হলে আইন পাশ করতে পারলে আপনার জুনিয়ার হয়ে জীবন শুরু করতে চেষ্টা করবে।

এখন তো পড়ছে। পড়াশুনো শেষ হোক। তখন দেখা যাবে। জানেন অনন্তবাবু আমার ইচ্ছে ছিল—ভাল করে গান শিখি। তা আল্লা আমার গলায় সুর দেননি।

আল্লা আপনাকে কিছু কম দেননি। এমন সহবত পেয়েছেন বাপদাদার কাছ থেকে চেহারা পেয়েছেন। ভাল মন পেয়েছেন। নিচু দিকে কখনো তাকান না। শিক্ষা পেয়েছেন আর আমার দিকে তাকান। আমি সামান্য মাইনে পেয়ে ছেলেদের পড়াচ্ছি। এই দমবন্ধ করা আবহাওয়ায় পড়াশুনো হবে না ওদের। পাশটাশ করে ওরা চাকরিবাকরিও পাবে না

অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন অনন্তবাবু ! দেশের কত পরিবর্তন হবে—তার কি কিছু আমরা আগাম আন্দাজ করতে পারি ?

ভাবছি—একবার কলকাতায় গিয়ে হকসাহেবের সঙ্গে দেখা করব। সোজাসুজি তাঁর কাছে জানতে চাইব—আমাদের মতো লোকের কি হবে ? আমরা এই ইলেকশনে আপনার

জন্যে খেটেছি। আপনার প্রজা পার্টি আমাদের ভোট পেয়েছে।

আব্দুল হাকিম তখন তখনই কোনও কথা বলতে পারলেন না। ঘরের ভেতর একমাত্র শব্দ যা হচ্ছে তা আলোর জন্যে। আলো টেবিলের নীচে বসে আপন মনে দু'হাত দিয়ে তার ছবির বই রাখার সুটকেসের ওপর হাত বাজিয়ে শব্দ করছে।

আজ আসি।

উঠবেন ?

হ্যাঁ হাকিমসাহেব।

টুনুকে একটা ছুটির দিন দেখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

আমি আপনার নাম করে বলি তো ওকে। যা একবার দেখা করে আয়।

আসে না কেন ?

লজ্জা পায়। বলে ওরে বাবা ! কত বড় উকিল।

টুনুকে বলবেন অনন্তবাবু—ও এসে গল্প করলে আমি সুখী হব। এখনকার উঠতি যুবকদের মন জানি না একদম। টুনুর সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারব।

অনন্ত ঘোষাল চলে গেলেন। আব্দুল হাকিম দেখে বুঝলেন, মানুষটি তাঁর চেয়ে চার পাঁচ বছরের ছোটোই হবেন। পিঠটা কিছু ঝুঁকে পড়েছে। মাস মাইনে পঞ্চান্ন টাকায় পাঁচটি ছেলে নিয়ে সংসার—যার ভেতর শেষের দুটি এখনো স্কুলে যায় না।

হাতের কাছেই বাঁধানো প্রবাসী। এক বছরের। বারো মাসের। রামানন্দবাবুর লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গে' তার চোখ আটকে গেল। বিষয় আদমসুমারি। বাংলায় হিন্দু মুসলমান।

বছর আর সংখ্যা দিয়ে লোকগণনার হিসেব তুলে ধরেছেন সম্পাদক রামানন্দবাবু। গত সত্তর আশি বছরে একটু একটু করে মুসলমানরা সংখ্যায় হিন্দুদের ছাড়িয়ে গেছে।

কিন্তু আমরা হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় তো এমন কিছু বেশি নয়। এই সামান্য ফারাকের জন্যে এত রাজনীতি। এত মিটিং মিছিল। গণতন্ত্র ! ভোট ! হোমল্যান্ড ! বিলেত থেকে কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা। পৃথক নির্বাচন।

তাহলে আকবর যখন বাদশা ছিলেন—এদেশে হিন্দুর তুলনায় মুসলমান কতজন ছিলেন ? সেই বিরাট ফারাক তো আকবর বাদশাকে রামায়ণ মহাভারত ফারসিতে অনুবাদ করাব কাজ থেকে আটকে রাখতে পারেনি।

এখন সেই তুলনায় আজকের কোয়ালিশন সরকার কোন মহৎ কাজটা করছেন ? সকালবেলাতেই মনটা ভারি হয়ে উঠল। তিনি আর কোনও বইতেই মন বসাতে পারছেন না। কয়েক কোটি হিন্দুর পাশে আকবরের হিন্দুস্থানে মুসলমান ছিলেন মাত্র পঁচিশ লক্ষ। এই বিরাট ফারাক সত্ত্বেও কত বড় বড় কাজ হয়েছে। অনুবাদ। নতুন মুক্ত চিন্তার জন্ম। গুণীর স্বীকৃতি।

আর আজ ? মাত্র কয়েক লক্ষ বেশি বলে ক্ষমতা চাই-ই চাই ? সেজন্যে এত বিষ ? অনন্ত ঘোষালের মতো মানুষ জীবন নিয়ে বিপদে পড়েছেন। তাঁর স্বপ্ন খান খান। গণতন্ত্র

একটা বিশ্বাস ? না শুধুই একটি সংখ্যার খেলা।

খেয়াল হল, আলো অনেকক্ষণ কোনও শব্দ করছে না। কাছে গিয়ে দেখলেন তাঁব একমাত্র ছেলে টেবিলের নীচে নিজের ছবির বইপত্তরের সুটকেসটি মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব সাবধানে তাকে ওখান থেকে বের করে কোলে নিলেন আব্দুল হাকিম। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে দোতলায় উঠলেন। পাছে ছেলে জেগে যায়।

রোকেয়া। এই নাও তোমার ছেলেকে—

ও মা ! ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালের নাস্তা খায়নি তো।

এখন ঘুমোক। ঘুম ভাঙলে খাওযাবে।

কোথায় পেলেন আলোকে ?

আবার আমাকে আপনি বলছ ? বলেছি না--ওরকমভাবে কথা বললে পর পর লাগে। আলো আমার সঙ্গেই একতলায় ছিল।

আব্দুল হাকিম দোতলার বাবান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সারা খুলনা তাঁব দিকে তাকিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। সামনেই ডাকবাংলোর মোড়। সেখানে একদম জ্যান্ত খুলনা। ডাবওযালা ডাবের মুখ কেটে খদ্দেরকে দিচ্ছে। জলমেশানো বলে কলসি কলসি দুধ রাস্তায় ঢেলে দিয়েছে পুলিশ। রাস্তার ওপারেই রেল কলোনির কোয়ার্টার। মাঠ। মাঠে গরু ছাগল। বড় বড় ঘাস। যে যার মতো চলছে। বড় হচ্ছে। বাড়ছে। বদলাচ্ছে। আমিই বা শুধু শুধু মন খারাপ করে বসে থাকি কেন ? আমার ওপর তো জগতের ভার দেযনি কেউ।

রোকেয়া—রোকেয়া—

জি ' বলেন ?

ফের আপনি ? বারান্দায় এসো। তাড়াতাড়ি এসো। একটা জিনিস দেখাবো তোমাকে—

যাই।

আলো নেই

সকাল দশটা দশে দৌলতপুর কলেজে যাওয়ার শাটেল ট্রেন খুলনা ছেড়ে যায়। টুনু নটা বাজতেই শ্রীশনগরে ধীরেনবাবুদের পুকুরে ঝুপ করে দুটো ডুব দিয়ে এসে মাথা আঁচড়েই খেতে বসে। প্রায় একই সময়ে খেতে বসে যান অনন্ত ঘোষাল। পানু খেতে বসে তার বাবা আর দাদা খেয়ে গেলে তবে।

ঋতবান ঘোষাল ওরফে টুনু—এই সেদিনকার টুনু—খালি গায়ে খেতে বসেছে। রান্নাঘরের বারান্দায়। ভাত বাড়তে বাড়তে রত্না ছেলেকে দেখেই নিজেকে সামলে নেন। নিজের জিনিসকে সুন্দর দেখতে নেই। তাতে অমঙ্গল হয়।

টুনুর চোখে পড়ল—কাঠের আঁচে কড়াইতে কি চাপিয়ে তার মা এই আশ্বিনের গরমে ভাত বাড়তে বাড়তে ঘেমে উঠেছে। সে জানে—মা ঘুম থেকে উঠেছে সেই ভোর রাতে। তখন বাড়ির পিছনের আতাবাগানে শুধু পাখিরা জেগে ওঠে। দিনের প্রথম আলোর সঙ্গে। গরম গরম ডাল ভাত বেড়ে দিয়ে রত্না বললেন, আস্তে আস্তে খাবি কিন্তু। কড়াইতে তোর পছন্দের জিনিস।

টুনু খুশি খুশি মুখে তার মাকে রান্নাঘরে ঢুকে যেতে দেখে খেযাল করে—আরে! মায়ের তো তেমন কিছু বয়স নয়। যাদের টাকা পয়সার চিন্তা নেই কোনও, সেই সব বাড়িতে মায়ের মতো মেয়েরা কলের গানে রেকর্ড চাপিয়ে গান শোনে—উল্লাসিনী সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে যায়। আমি তো মায়ের খুব কম বয়সের প্রথম ছেলে।

নে। খেয়ে দ্যাখতো।

চিংড়ি মাছ আর ফুলবড়ি দিয়ে ঢেঁকিশাক। সঙ্গে কাঁচালঙ্কা। খুব প্রিয় জিনিস টুনুর। কিন্তু দেখেই সে রাগে চেঁচিয়ে উঠল। বারণ করেছি না তোমাকে—

ওরে আর যাবো না। আজ খেয়ে নে—

কতবার তোমায় বারণ করেছি মা—পুকুর পাড়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে ঢেঁকিশাক

তুলতে যাবে না।

এবারটি খেয়ে নে। আর যাব না। তুই খেতে ভালবাসিস—তাই—

তাই বলে ওইভাবে ঘাসের ভেতর থেকে খুঁজে পেতে ঢেঁকিশাক তুলে আনতে হবে ?

কেউ দেখতে পায়নি টুনু। ঘুম থেকে উঠেই অন্ধকার থাকতে পুকুর পাড়ে গেছি বাবা—

সাপখোপের বাসা ওখানে।

আমায় কামড়াবে না। তুই খেয়ে নে—

খেতে ভালই লাগছে টুনুর। বড়িগুলো ঝোল শুষে নিয়ে টুপটুপ করছে। সেই সঙ্গে তাজা ঢেঁকি শাকের কচি শুঁড়। দাঁতে পড়ে ভাতের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে সে থেমে পড়ল। একটা ছবি তার চোখে সামনে ভেসে উঠছে। আকাশের চাঁদ মুছে যায়নি একেবারে। আলো ফুটি ফুটি। তার মা মাথায় ঘোমটা দিয়ে শ্রীশনগরের পুকুরের ওপারে ঘন ঘাস জঙ্গলের ভেতর ঝুঁকে নিচু হয়ে আবছা অন্ধকারে—ঢেঁকিশাকের শুঁড় খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাছে কেউ চিনে ফেলে তাই মাথায় বড় করে ঘোমটা। এই অন্ধকারে সাপের লেজেও পা পড়তে পারে মায়ের।

তুমি আর কখনো যাবে না।

বেশ যাব না। তোদের বাবা কাল চিংড়ি মাছ কটা এনেছিলেন। ভেজে রাখা ছিল। তাই—বাবা কখন শুধু কিছু চিংড়ি নিয়ে বাজার থেকে ফেরেন—তা জানে টুনু। হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেলে অনন্ত ঘোষাল দু দশ পয়সার চিংড়ি নিয়ে ফেরেন। তখন পানু টুনু পেছনের আতাবাগানে কচুর লতির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। অনন্ত ঘোষাল এসে খেতে বসার আগেই টুনু তার এঁটো কুড়িয়ে থালা নিয়ে উঠতে গেল। পারল না।

রত্না তার হাত থেকে থালা কেড়ে নিয়ে বললেন, উঁহু—এঁটো থালা মাজতে দেব না বাবা।

তাই বলে এঁটো বাসন নিয়ে তুমি এখন মাজতে বসবে ?

এখন নয়। চানের আগে মেজে নেব থালা বাসন। তোমার কলেজ আছে। ট্রেন ধরতে হবে না তোমাকে ?

না। আমরা এখন বড় হচ্ছি। আমি আর পানু আমাদের থালা ধুয়ে নেব।

তা তো হবে না টুনু। তোমরা থালা ধুলে দারিদ্র হবে।

ধুতি শার্ট পরেই ছুটতে হবে ট্রেন ধরতে। নয়তো দেরি হয়ে যাবে। টুনুর মনে হল—তার মা গম্ভীর শান্ত গলায় দারিদ্র কথাটি এমন করেই বলল—যেন ছেলেরা যার যার থালা ধুলেই বাঘ এসে তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

একদিকে ভৈরব। তার বুকে পাল তোলা নৌকো। লঞ্চ।

আরেক দিকে যশোর রোড। কলকাতা চলে গেছে। মাঝখান দিয়ে কলেজ শাটেল চলেছে ঝিক ঝিক করে। সুপুরি বাগান। নারকেল বাগান। ঘর গেঁবস্থালির পাশ দিয়ে।

গোলপাতার চালে বীজ রাখার হলদে হয়ে আসা বিরাট লাউ। ঋতবান ঘোষাল জানলার পাশে বসে। সে দেখতে পাচ্ছে শাটেল ট্রেনের ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় গেরস্থবাড়ির পুকুরে ভেসে থাকা পাতিহাঁসের দল মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। একবার তার মনে হল—আমি কি পারি না—মাকে তার ছোটবেলা ফিরিয়ে দিতে ? যখন আমরা হইনি। যখন মা স্কুলে পড়ে। সেই তখন। যখন মা একেবারে বালিকা ছিল। তার বাবা কলেজে পড়ান। মা স্কুল থেকে ফেরার পথে অনেক স্বপ্ন দেখে। তাকে এখনকার মতো লম্বা ঘোমটা টেনে পুকুরপাড়ের জঙ্গলের ভেতর থেকে অন্ধকারে ঢেঁকিশাক তুলতে হয় না। আজ ঋতবান কিছুতেই ভুলতে পারছে না--তার জন্যে ঢেঁকিশাক রান্না করতে পেরে মায়ের সারা মুখ জুড়ে সে কি খুশির হাসি।

ফুলতলা স্টেশনে গাড়ি থামতে অনেকে ভিড় করে উঠলেন। সব খদ্দরের ধুতি। পাঞ্জাবি। গালে দাড়ি। একজনকে সবাই চেনে। খুলনার গোবিন্দলাল ব্যানার্জি। জেল খাটা কংগ্রেসি। প্রায়ই জেলে যান। বেরিয়ে আসেন কিছুদিন পরে। বাকিদের চেনে না টুনু। গোবিন্দবাবুর বাড়ির সামনে একটা হরিতকি গাছ আছে।

ওরা ট্রেনে বসেই নিজেদের ভেতর যেসব কথা বলতে লাগলেন—তা থেকে এইসব কথা উঠে আসতে লাগল। যেমন—

দৌলতপুরে নেমে সবাই মিলে ভৈরব দিয়ে নৌকো করে মাগুরা যাবেন। তারপর সেখানকার লোকজন নিয়ে ফের যশোর থেকে কলকাতার ট্রেন ধরা হবে। গান্ধীজি আসছেন কলকাতায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। এবার কংগ্রেস নিশ্চয় রাষ্ট্রপতি করবে সুভাষবাবুকে। সুভাষচন্দ্র বসুকে।

জেলখাটা, খদ্দর গায়ে লোকজন টুনু খুলনার পাড়ায় পাড়ায় দেখেছে। এঁরা প্রভাতফেরি করেন। বন্দেমাতরম বলে স্লোগান দেন রাস্তায়। অনেকে দাড়ি রাখেন। কেউ কেউ কোনওদিন আর বিয়েও করেন না। শুধু শহর খুলনা কেন ? দৌলতপুর, ফুলতলা, খালিশপুর—এমন কি রেলস্টেশন, স্টিমারঘাটেও এদের দেখা যায়।

দৌলতপুর কলেজ স্টেশনের গায়েই। একদিকে কলকাতা যাবার রেললাইন। আরেক দিকে ভৈরব নদী। মাঝে অনেক গাছপালার ভেতর কলেজ। মাঠ। প্রফেসারদের থাকবার ঘরবাড়ি। সিমেন্টের মেঝে। দরমার দেওয়াল। ওপরে গোলপাতার চাল। কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি। ঋতবান ঘোষাল কলেজে ঢুকতেই নদীর দিক থেকে উঠে আসা বাতাসে অশ্বত্থ গাছের সব পাতা একসঙ্গে দুলে উঠল।

শ্রীশনগরের বাসাবাড়ি আর এই কলেজ--যেন দুই পৃথিবী। এখানকার লাইব্রেরি ঘরে বসে ভিনসেন্ট স্মিথ পড়ার সময় ঋতবানের মনে হয়—সমুদ্র গুপ্ত ? তিনি কত দূরে ? কত আগের লোক ! তাঁর সাম্রাজ্যের ভেতর কি এই ভৈরব নদী ছিল ? ছিল কি এই দৌলতপুর ?

দৌলতপুর কলেজের লাইব্রেরির রিডিং রুমটি রীতিমত বড়। একদম হলঘর। সারা দেওয়াল জুড়ে বইয়ের পর বই। লম্বা টেবিলের দু'পাশে সারি সারি চেয়ার। এখনো ক্লাসে

যাবার সময় আছে দেখে ঋতবান লাইব্রেরিতে ঢুকে বই দেখছে। তার একবার মনে হল—কত বই পড়া হয়নি। ছাত্র ইউনিযনের ইলেকশন সামনে। লাইব্রেরির সামনে বট গাছের গায়ে—কৃষকপ্রজা পার্টির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছে থার্ড ইয়ারের মোজাম্মেল হক। তার নামে বড় করে লেখা কাগজের পোস্টার—আঠা দিয়ে সাঁটলেও বাতাসে খুলে গেছে। দূরে ফিজিক্স ল্যাবরেটারির গায়ে চুন দিয়ে লেখা আলিজানের নাম। আলিজান দেখতে খুব সুন্দর। সে দাঁড়িয়েছে গেম সেক্রেটারি পদের জন্যে তার নামের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা—এম এল। মানে মুসলিম লিগ। কংগ্রেস ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট পোস্ট-এ ক্যান্ডিডেট দিয়েছে—খালিশপুরের দত্তবাড়ির ছেলে হৃষীকেশ দত্তকে। বি এসসি কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়েন হৃষীকেশদা। ঋতবান চেনে তাঁকে। তার একবার মনে হল—একটা নদীর পাড়ে এমন এক কলেজে ইউনিয়ন ইলেকশন নিয়ে মিটিং, পোস্টার, স্লোগান—কেমন যেন মানায় না। নদীটা তো সমুদ্রগুপ্তেরও আগের। খুলনার জেলখাটা গোবিন্দলালবাবুদের ট্রেনে উঠে অমন জোরে জোরে কথা বলাও যেন কেমন বেমানান। ইতিহাস পড়তে বসলে ঋতবানের মনে হয়—কে গান্ধী ! কে সুভাষ ! কে-ই বা ব্রিটিশ ! সে পরিষ্কার টের পায়—কিন্তু দেখতে পায় না—একই সময়ে একই সঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। পরের দিন সেসব ঘটনার কয়েকটি মাত্র খবরের কাগজের পাতায় আসে। বাকি সব ঘটনা—তাদের গোলমাল—তাদের রাগ, দুঃখ, আহ্লাদ নিয়ে বাতাসের ভেতর মিশে যায়। বিকেলের আকাশে সেসব ঘটনার রাগ, দুঃখ, আহ্লাদ কেমন ধোঁয়ার দাগ ফেলে রাখে। কলেজ ফেরত ঋতবান তা দেখতে পায়।

কলকাতায় এখন তিন জায়গা থেকে তিনখানি বাঙলা খবরের কাগজ বেরোয়। আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, আজাদ—আনন্দবাজার পত্রিকা বাকি দু'টি কাগজের চেয়ে বয়সে বছর পনেরোর বড়। বেরোয় বর্মণ স্ট্রিট থেকে। ইংরাজি অমৃতবাজারের সঙ্গে সঙ্গে তুষারকান্তি ঘোষেরা বের করছেন বাঙলায় যুগান্তর। ভ্যান্সিটার্ট রো থেকে। শোনা যাচ্ছে—যুগান্তর শীগগির চলে যাবে অমৃতবাজারের কাছে—বাগবাজারে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে।

আর আজাদ বের করে মুশকিলেই পড়েছেন সম্পাদক আবার মালিকও বটে—মওলানা মহম্মদ আক্রম খাঁ। তিনি ভাবতেই পারেননি এত অল্প সময়ে আজাদের চাহিদা এত বেড়ে যাবে। এতদিন তিনি মাসিক আর সাপ্তাহিক মোহম্মদী চালিয়ে আসছিলেন। এখন আজাদ বের করার পর এডিটোরিয়াল নিউজ, প্রুফ, বিজ্ঞাপন, ম্যানেজমেন্ট—সব মিলিয়ে কাজের লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে ৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে আর জায়গা হচ্ছিল না। এবছর বর্ষার পরই একটা বড় বাড়ি পেয়ে আজাদ সেখানে উঠে এসেছে। ৮৬এ লোয়ার সার্কুলার রোডে। ওখানেই আগে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের শুরু হয়েছিল। সেটা কলেজ হয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় উঠে গেল বলে বাড়িটি পেলেন মওলানা আক্রম খাঁ। বাড়িটি ঠিক এন্টালি বাজারের উল্টো দিকে—পশ্চিম পাশে।

এই কাগজেরই এডিটোরিয়ালের আড্ডায় পুরনো দুই বন্ধু আবার এক জায়গায় হলেন

আলো নেই

অনেকদিন পরে। তা পনেরো ষোলো বছর পরে। সেই ১৯২১ সনে গান্ধীজির ডাকে ওঁরা অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কলকাতায় স্টুডেন্ট লাইফে দুজনের বন্ধুত্বের শুরু। প্রথম যৌবনে দুজনেই খদ্দরের কাপড় কাঁধে করে বেচতে বেরিয়েছেন। কিন্তু সেই পনেরো ষোলো বছর আগে অসহযোগ আর খিলাফত আন্দোলন থিতিয়ে এলে আস্তে আস্তে দুই বন্ধুর ভেতর বিশ্বাস, মতামতের অনেক বদল হয়ে গেছে। তবু আজও দু' জনই সাহিত্যের টানে কাছাকাছি।

একজন হলেন আব্দুল মনসুর আহমেদ। তিনি হকসাহেবের কৃষক প্রজাপার্টির চাঁইদের একজন হলেও অবস্থা খুব কিছু ফেরাতে পারেননি। পেশায় উকিল হওয়ার কথা। কিন্তু ওকালতি করতে করতে পলিটিক্সে চলে আসেন। পলিটিক্সে থাকলেও সংসার তো চালাতে হবে। তাই কলকাতার কাগজে কাগজে কাজ করে বেড়ান। অন্যজন আবুল কালাম সামসুদ্দিন। তিনি রাজনীতি থেকে সরে এসে সাহিত্যের দিকেই বেশি ঝুঁকেছেন। কখনো সওগাত—কখনো খাদেম—কখনো বা মোহম্মদীতে কাজ করেই তার সংসার চলে। চলে মানে কোনওমতে চলে যায়। দু জনেরই বয়স প্রায় চল্লিশ। আবুল কালাম সামসুদ্দিন দৈনিক আজাদ বেরোনোয় তার এডিটোরিয়ালে যোগ দিয়েছেন। ছিলেন ওদেরই মোহম্মদীতে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে আসেন পুরনো বন্ধু আবুল মনসুর আহমেদ।

মাসিক মোহম্মদীর কাজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আবুল কালাম সামসুদ্দিন আজাদেও কাজ করছেন। তাই মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে বেড়ে গেল। মোহম্মদীতে তিনি পাচ্ছিলেন চল্লিশ টাকা। তিনি যোগ দিয়ে দেখলেন—তাহলে মাসে আয় দাঁড়াল নব্বই টাকা।

বিকেলবেলা। আবুল কালাম সামসুদ্দিন মাসিক মোহম্মদীর একটি প্রবন্ধ কেটে ছেঁটে সযুত করছিলেন। টেলিপ্রিন্টারের আওয়াজ আজাদের নিউজরুম থেকে ভেসে আসছে। একটু বাদেই ওখানে গিয়ে তিনি কাজে বসবেন। ঠিক এই সময় তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন পুরনো বন্ধু আবুল মনসুর আহমেদ।

সামসুদ্দিন : কি খবর কিং মেকার ?

আহমেদ : ঠাট্টা কোরো না ভাই। হকসাহেবের প্রজাপার্টির ইলেকশনের প্রচার সচিব ছিলাম ঠিকই। কিন্তু হকসাহেব তোমাদের মুসলিম লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়ে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর মন বোঝা মুশকিল। দেবা ন জানন্তি—তো কুতঃ মনুষ্য।

এখানে বলা দরকার—আবুল মনসুর আহমেদ আর আবুল কালাম সামসুদ্দিন যে যুগে পড়াশুনো করেছেন—তখন অনেক হিন্দু ছেলেই স্কুলে আরবি বা ফারসি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে পড়েছে। আবার অনেক মুসলমান ছেলেই সংস্কৃত সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে পড়েছে। সাহিত্য প্রেমিক এই দুই বন্ধু চলতি রাগ, বিদ্বেষ, অবিশ্বাসের আগের যুগের কিশোর—আগের যুগের যুবক। এরা আগে পিছনে অনেকদূর অবধি দেখতে পান। যদিও আবুল মনসুর কৃষক প্রজা পার্টির সাপোর্টার। আবুল কালাম মুসলিম লিগের।

সম্পাদক আক্রম খাঁ ক্যান্টিন থেকে ঘন ঘন চায়ের ব্যবস্থা ফ্রি রেখেছেন। সেই চা এল। আবুল মনসুর চায়ের কাপ নিয়ে আবুল কালামের মুখোমুখি বসলেন।

আবুল কালাম সামসুদ্দিন বললেন, আবুল মনসুর। তোমার একটা পরামর্শ চাই ভাই। এখন তো দু'জায়গায় কাজ করে মাসে নব্বুই টাকা পাই। এখন কি দেশ থেকে ফ্যামিলি আনিয়ে কলকাতায় থাকতে পারি ?

স্বামী স্ত্রী দুজন মিলে তো তোমার ফ্যামিলি। নব্বুই টাকায় নিশ্চয় মাস চলে যাবে।

আচ্ছা মোহম্মদীর জবেদ আলি ভাইকে ডাকি। উনি বলছিলেন—ওঁর খোঁজে একখানি ঘর আছে।

জবেদ আলি এলেন। মোহম্মদী সাপ্তাহিক আব মাসিকের চিঠিপত্র দেখেশুনে সাজিয়ে দিয়ে থাকেন। থাকেন 'দি মুসলমান' অফিসের কাছাকাছি একই রাস্তায়। বলতেই জবেদ আলি বললেন, আমার তো ভাড়াবাড়ি। নিয়ে আসুন আপনার ফ্যামিলি। একখানা কামরা খালি আছে। মাসে দশ টাকা দিলেই চলবে।

নব্বুই টাকায় মাস চালাতে পারব ?

জবেদ আমি বললেন, খুব পারবেন। চাল তো এখন চার টাকা মণ। মাছের সের চার আনা। খাসির গোস্ত সের সাত আট আনা। গরুর গোস্তর সের চার আনা। চিনি পাঁচ আনা। সর্ষের তেলের সের ছয় আনা। তরিতরকারি দিনে চার পয়সার কিনলেই দিব্যি চলে যাবে আপনাদের দুজনের। আমি যেদিন এক টাকা নিয়ে বাজার করতে বেরোই—দু চার আনা ফিরে আসে।

জবেদ আলি উঠে যেতে দুই বন্ধুতে খানিকক্ষণ একথা সেকথা বলতে বলতে গান্ধীজির কথা এসে পড়লো। সেই সময় আবুল কালাম সামসুদ্দিন বললেন, আজই তো গান্ধীজির কলকাতায় আসার কথা।

হ্যাঁ। শরৎবাবুর উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এসে উঠবেন। ওখানেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক।

তোমার তো শরৎ বসুর সঙ্গে ভাল আলাপ আছে। চল না যাই আবুল মনসুর। গান্ধীজিকে কাছের থেকে দেখে আজাদে একটা ভাল নিউজ করা যাবে।

আবুল মনসুর আহমেদ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর একটু থেমে থেমে বললেন, ভাল আলাপ ? রীতিমত আলাপ আছে সামসুদ্দিন ! রীতিমত আলাপ !

বলতে বলতে আবুল মনসুর পলকে একদম অন্য জগতে চলে গেলেন। সে জগতে আজাদের নিউজরুম থেকে টেলিপ্রিন্টারের অবিরাম আওযাজ পৌঁছয় না। পর পর কয়েকটি ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

গভীর রাত। আবুল মনসুর দেখতে পাচ্ছেন—তিনি আর কয়েকজন মিলে হাঁটুজল নদী পার হচ্ছেন। কৃষক প্রজা পার্টির হয়ে ইলেকশন মিটিং করতে চলেছেন। ভোরের আগেই নেত্রকোণা পৌঁছতে হবে। আবার মাইলের পর মাইল বালি এলাকা ভাঙতে হচ্ছে

পায়ে হেঁটে। কাঁধে সাইকেল। চালাতে গেলে চাকা বসে যাবে।

এসব ছবি পলকে আবুল মনসুরের মাথার ভেতর গেঁজে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

যেদিন ভোটাভুটি শেষ হল— সেদিন আমরা জিতছি ধরেই নিয়ে সন্ধের কিছু আগে বাড়ি ফিরলাম। দাড়ি কামিয়ে গোসল করে পেট ভরে ভাত খেলাম। সন্ধে সাতটা হবে। দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে যাবার আগে বললাম—আমার ঘুম না ভাঙলে কেউ যেন আমায় না ডাকে।

পরদিন রাত ন'টায় আমার ঘুম ভাঙল। এক ঘুমে ছাব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। অত ঘুমোচ্ছি দেখে বাড়িতে প্রথম দুশ্চিন্তা—পরে কান্নাকাটি শুরু হয়েছিল। মহল্লায় জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুবান্ধবরা ভিড় করে জানলায় এসে দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে ওরা যখন দেখল—আমার পেট ওঠানামা করছে—তখন ওরা নিশ্চিন্ত হল—আবুল মনসুর মরে যায়নি। আমার স্ত্রী বলেছিলেন, তিনি জানলায় লক্ষ রেখেছিলেন—এই ছাব্বিশ ঘণ্টায় আমি তিনবারের বেশি পাশ ফিরিনি।

এত সাধের ইলেকশন। এত খাটাখাটুনি। রেজাল্ট বেরোলে সব গোলমাল হয়ে গেল। মুসলিম লিগ টেনে টুনে ষাটজন। কৃষক প্রজা পার্টির আমরা টেনে টুনে আটান্নজন। পঁচিশজন ইউরোপিয়ান আর চারজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মিলে ঊনত্রিশজন লাট সাহেবের ইশারায় মুসলিম লিগকেই সার্পোট দেবে। তবু মুসলিম লিগ সরকার গড়তে পারে না। কিন্তু আমরা পারি। কংগ্রেস লিগের জায়গায় আমাদেরই আগে সাপোর্ট দেবে। কংগ্রেস ষাটের ওপর। ওরা কিছুতেই লিগকে সার্পোট করবে না। কংগ্রেসের সঙ্গে হকসাহেবের একবার বোঝাপড়া হয়ে গেলে ইউরোপিয়ানরাও আমাদের কোয়ালিশনকে সার্পোট করবে। কৃষক প্রজা পার্টি কম্যুনাল নয়। কংগ্রেসও কম্যুনাল নয়। হকসাহেব হিন্দুদের কাছেও খুব পপুলার মানুষ।

আবুল মনসুর আহমেদের চোখের সামনে পলকে কয়েক মাস আগের সব ঘটনা ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

কংগ্রেসের শরৎ বসু ঘোষণা করলেন, আমরা মন্ত্রিত্বে যাব না। কিন্তু সমর্থন দেব। মুসলিম লিগ বলল, হক সাহেব—আমাদের সঙ্গে আসুন—কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমাদের ভেতর থেকেই ঠিক করতে হবে।

আমরা তখন লিগকে পাত্তা না দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কথা চালালাম। আমার ময়মনসিংহে কাজ থাকায় চলে গেছি। কথা চালাবার ভার দিয়ে গেছি—নওশের আলি, আশরাফুদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের ওপর। হকসাহেবের টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। হকসাহেব বড় খুশি। তিনি খুশিতে তাঁর বেলচার মতো হাত দিয়ে আমার পিঠে চাপড় মারতে লাগলেন। কংগ্রেস আমাদের সব শর্ত মেনে নিয়েছে।

সেদিনই রাত আটটায় জে সি গুপ্তের বাড়িতে ডিনার। সেখানে দু পক্ষে সই হবে। দু তরফ মিলিয়ে প্রায় কুড়ি জনের ডিনার। আমরা হকসাহেবের সঙ্গে ডিনারে গেলাম। শরৎ

বসু, নলিনী সবকাব, বিধান বায, কিবণশঙ্কব বায—ওঁবা বযেছেন।

ডিনাব শেষ। খুব ভাল খাইযেছেন জে সি গুপ্ত। এবাব দু'পক্ষে সই হবে। আগেই সব কিছু টাইপ কবিযে বেডি। জে সি গুপ্ত কাগজ বেব কবলেন। তাবপব পড়ে শোনালেন। বাজনৈতিক বন্দিমুক্তি, প্রজা স্বত্ব আইন, মহাজনি আইন, কৃষি ঋণ, সালিশি বোর্ড—দুপক্ষেব ইলেকশনেব সমযকাব সব প্রতিশ্রুতিই টাইপ কবা কাগজে বযেছে। সবাই আমবা হাততালি দিলাম তাবপব উঠে দাঁডিযে আমি বললাম, আমাব সামান্য একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আছে।

আমাব একথায নেতাদেব মুখ অন্ধকাব হযে যাচ্ছে দেখে বললাম, এটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট বলা অন্যায হবে। শুধু প্রাযোবিটিব নম্বব একটু ওলোটপালট হবে। প্রজা স্বত্ব আইন শোধবানো আব মহাজনি আইন পাশেব প্রস্তাবেব পবেই বাজনৈতিক বন্দি মুক্তিব কথা বাখা হোক। কাবণ গোডাতেই বাজনৈতিক বন্দি মুক্তিব কথা থাকলে লাট সাহেব ভেটো দিলে সম্মান বাখতে মন্ত্রিসভাকে বিজাইন কবতে হতে পাবে। বিজাইন কবলে ফেব ভোট হলে লিগ জিতবে। কাবণ, ভোটেব আগে লিগ বলেছে—কৃষক প্রজা পার্টি কংগ্রেসেব লেজুড। তাই বলছি—আগে প্রজাস্বত্ব আইন শোধবানো হোক। মহাজনি আইন পাশ কবানো হোক। তাবপবেই বাজনৈতিক বন্দিমুক্তি। লাটসাহেব এতে বাধা দিলে আমবা সবাই বিজাইন দিযে ভোটে যাব। তাহলে আমবা সব সিটে জিতে ফিবে আসব। কংগ্রেস জিতবেই সব সিটে। কৃষক প্রজা পার্টিও সব সিটে জিতবে।

এই কথাগুলো বলাব সময নিজেব মুখেব চেহাবা কেমন হযেছিল তা যেন দেখতে পাচ্ছেন আবুল মনসুব আহমেদ। এই তো মাত্র মাস ছযেক আগেব ঘটনা এসব।

কংগ্রেসেব নেতাবা বললেন, বাজনৈতিক বন্দিমুক্তিব প্রশ্নটা জাতীয সম্মান অসম্মানেব প্রশ্ন। বিশেষ কবে শযে শযে বাঙালি আন্দামানে জেলে পচছে।

আমবাও বললাম, সবাব আগে প্রজাস্বত্ব আইন শোধবাতে হবে। কথা চলছে তো চলছেই বাত একটায সভা ভেঙে গেল। জে সি গুপ্তেব বাডি থেকে বেবিযে আসছি। মন ভেঙে গেছে

হুমাযুন কবিব আব আমবা কজন মিলে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতাদেব বলেছিলাম—বেশ ঠিক আছে - বাজনৈতিক বন্দিমুক্তিব কথা দু নম্ববে থাকুক।

কংগ্রেসিবা বাজি হলেন না। ওঁবা বললেন, না, বন্দিমুক্তিব কথা এক নম্ববে বাখতে হবে। দু তবফে চুক্তিব শর্তে এক নম্বব হবে বাজনৈতিক বন্দিমুক্তি।

হুমাযুন কবিব আব আমি ঠিক কবলাম, শবৎবাবু কংগ্রেস নেতাদেব এই ব্যবহাবে অসন্তুষ্ট হযেছেন। তিনি নিশ্চয এই ইস্যুতে আপস-বফা ভেঙে দিতে বাজি ছিলেন না। ঠিক কবলাম—শবৎবাবুব সঙ্গে দেখা কবতে হবে। এই বাতেই কবতে হবে। আমাদেব চোখে ঘুম নেই। এক বাতে কত কি হযে যেতে পাবে।

যেমন কথা তেমনি কাজ। আমবা গেলাম হকসাহেবেব বাডি ঝাউতলায। তাঁকে

অনেক বুঝিয়ে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে গেলাম শরৎবাবুর বাড়ি। উডবার্ন পার্কে। ঘড়িতে তখন রাত তিনটে। অনেক ডাকাডাকি করে দারোয়ানকে জাগালাম। তার খুব আপত্তি। ভেতরে যেতে দেবে না। ঠেলে ভেতরে গেলাম—আমি আর হুমায়ুন কবির হক সাহেবের নাম বলাতে দারোয়ান খুব অনিচ্ছায় ওপরে গেল। আমরা নীচে দাঁড়িয়ে আছি। প্রায় বিশ মিনিট পরে শরৎবাবুর স্ত্রী নীচে নেমে এলেন। বললেন, খুবই দুঃখিত। ওঁর খুব মাথা ধরেছে। ব্যথায় ছটফট করে এইমাত্র একটু ঘুমিয়েছেন। কিছুতেই ওঁর ঘুম ভাঙাতে পারব না

অগত্যা নিরাশ হয়ে ফিরে আসি। গাড়ির ভেতর হকসাহেব বসে।

শরৎবাবুর ওপর তিনি খুব রেগেছেন। তার সবটা আমাদের ওপর তিনি ঝাড়লেন। কোনও কথা না বলে তাঁকে ঝাউতলায় তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিলাম। হকসাহেব তাঁর বসার ঘরে বসে। রাত প্রায় ফুরিয়ে এল। আমরা বলাবলি করছি—কংগ্রেস নেতাদের দোষে আজ বাঙলার কপাল পুড়লো।

ঠিক এই সময় লিগের এক দূত এসে হাজির। বুঝতে পারছি— ওঁরা সব খবর রাখেন। ওৎ পেতেই ছিলেন। ওঁদের প্রস্তাব—হকসাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করতে বাধা নেই। কৃষক প্রজা পার্টির সমস্ত প্রস্তাব মানা হবে। আসুন—কোয়ালিশন সরকার গড়ি। রাত তখন সওয়া চারটে।

তখন যা মনের অবস্থা—হকসাহেব হেসে ওঁদের কথা মেনে নিলেন। আমরাও অগত্যা—

যেন চিত্রায় বসে সিনেমা দেখছেন আবুল মনসুর আহমেদ। মাত্র ছ মাস আগের সিনেমা। তাঁর মুখে 'রীতিমত আলাপ' কথা দুটি ওভাবে দুবার ফুটে ওঠায় আবুল কালাম সামসুদ্দিন জানতে চাইলেন, কেমন মানুষ শরৎ বসু ?

চমৎকার মানুষ। খুব অল্প বয়সেই সফল ব্যারিস্টার। কাছেই এলগিন রোডে পৈতৃক বাড়ি থেকে উঠে এসে ক বছর হল উডবার্ন পার্কে বাড়ি করেছেন। আইনসভায় কংগ্রেসের নেতা হিসেবে ওঁকে হকসাহেব অনেক সময়েই কনফিডেন্সে নিয়ে থাকেন। সে তো জানোই—

আবুল কালাম সামসুদ্দিন বন্ধু আবুল মনসুর আহমদের এই জবাবে যেন সবটা পেলেন না। তিনি চুপ করে তাকিয়ে রইলেন বন্ধুর মুখে। দুজনেই প্রথম যৌবনে কলকাতায় পড়তে এসে— সেই উনিশশো কুড়ি একুশ সনে অসহযোগে মেতে গিয়ে দেশের বাড়ি ফিরে জাতীয় বিদ্যালয় করেছেন।

ওঁর ইলাস্ট্রিয়াস ভাই সুভাষবাবু কি ওঁর সঙ্গেই থাকেন ?

ভাইয়ে ভাইয়ে খুব ভালবাসা। ছোট ভাই সুভাষকে খুবই ভালবাসেন। একথা তো দেশসুদ্ধ লোক জানে। সুভাষবাবু হয়তো দাদার বাড়িতে থাকলেন। আবার পৈতৃক বাড়িতেও গিয়ে থাকলেন। যখন যেমন। ঠিক বলতে পারব না সামসুদ্দিন।

ঠিক এই সময় উডবার্ন পার্কের এক নম্বর বাড়িতে অবস্থা অনেকটা এই রকম। বাড়ির

সামনেব বাস্তায উল্টো ফুটপাথে মানুষের ভিড়। বাড়ছেই। মাঝে মাঝে শ্লোগান উঠছে—বন্দেমাতরম—ওই ফুটপাথেই চারতলা বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ি। সে-বাড়ির বারান্দায বারান্দায মহা বিরক্ত সব মুখ ভেসে উঠছে। দেখলেই বোঝা যায—ওরা না সাহেব—না এদেশি। অ্যাংলো ইন্ডিযান।

এক নম্বর উডবার্ন পার্কেব বাডিব সামনে খুব যত্ন করে তৈরি বাগান। গাঢ সবুজ লনের ভেতর লাল গোলাপ ফুটে আছে। তিন ধাপ সিঁডি ভেঙে উঠলেই সদর দরজা।

ভেতবে গেলে সোজা সিঁডি উঠে গেছে দোতলায। সিঁড়িব দুপাশে ঘর। বোঝাই যায পিছনেও ঘব আছে। ঘবেব পরেও আবাব বাগান। তার আভাস পাওযা যায।

একতলাব সিঁডি দিযে একজন বীতিমত সুদর্শন—বযস এই সাতচল্লিশ আটচল্লিশ—ফাইন খদ্দরের ধুতির ওপব দুধ সাদা খদ্দরের ফতুযা গাযে ওপরে উঠে এলেন। তাঁর পিছন পিছন ধুতি পাঞ্জাবি পবা বেশ বেঁটে এক ভদ্রলোক। বাঙালি। চল্লিশের নীচে মনে হয।

দুজনে দোতলায উঠে ডানদিকেব বড় ঘরখানিতে ঢুকলেন। সুদর্শন ভদ্রলোক ঘরখানি ভাল কবে দেখলেন। বেশ বড় ঘর। নিচু বড খাটে দুধ সাদা বিছানা। খুব পাতলা একটি মাথার বালিশ। রাস্তাব দিকেব দরজা খোলা। দেওযালে কোনও ছবি নেই। বেশ বেঁটে মানুষটিকে ফতুযা গাযে সুশ্রী ভদ্রলোক বললেন, সব ঠিক আছে নীবদবাবু। মনে হয এ ঘর গান্ধীজির অপছন্দ হবে না।

নীবদবাবু সুশ্রী ভদ্রলোকেব মুখে একটু চোখ তুলে তাকালেন। মাথাব চুল বেশ পিছিযে গিযে টাক পডেছে। নীবদবাবু ঘব থেকে বেরিযে এসে বললেন, এই খোলা জাযগায জাজিম পেতে দেওযা হবে।

জাজিম দেবেন কেন ?

বাঃ ! আপনার প্ল্যান মতো এখানেই তো ওযার্কিং কমিটিব বৈঠক বসবে। গান্ধীজিকে বৈঠকের জন্যে সিঁড়ি ভেঙে তেতলা বা একতলায যেতে হবে না।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঠিকই। চলুন যাই একতলায জওহরলালের জন্যে ঘবখানা কেমন ঠিকঠাক হল কিনা দেখে আসি নীবদবাবু।

খানিক আগেই তো দেখে এলেন।

সব ঠিকঠাক আছে তো ?

হ্যাঁ। সব ঠিকঠাক।

টযলেটে জলেব পাইপ দিযে জল আসছে তো ?

আপনাব কন্ট্রাক্ট কবা কোম্পানিব লোক তো ফি হপ্তায সারা বাড়িব প্লাম্বিং, জলেব লাইন চেক করে দিযে যায।

সব ঠিক থাকলেই ঠিক।

এই চিন্তিত মানুষটিই দুপুরবেলা কলকাতা হাইকোর্টে দামি ব্যাবিস্টাব মিস্টার শবৎ বোস।

আলো নেই

র্তিকেব শুরু। কদিন আগে লক্ষ্মী পুজো গেছে। তবু ভবদুপুবে শ্যামবাজাব পাঁচমাথাব
াড যেন বোদে পুড়ে যাচ্ছে। ধুতি পাঞ্জাবি পবা বোগা চেহাবাব এক বছব চল্লিশেকেব
ক বাঙালি শ্যামবাজাবমুখো ট্রামেব সেকেন্ড ক্লাস থেকে নামলেন। পায়ে স্যান্ডেল।
াখে শেলেব চশমা। মানুষটি টাউন স্কুলেব সামনে নেমে ট্রাম লাইন পেবিয়ে
টোদিকেব মোহনবাগান লেনে এসে পড়লেন। তাবপব বাঁয়ে এগিয়ে সরু মতো
াহনবাগান বো-এ ঢুকলেন। এখানে বাস্তা চওড়া নয়।

দুর্গাপুজোব পব সাবা কলকাতা যেন কেমন মিইয়ে যায়। সাবা পাড়া ঘুমোচ্ছে। এক-
কটা বাড়িব ছায়াব ভেতব পড়লে বোঝা যায়—সামনে শীত। বেলা পড়লে দুপুবেব বোদ
ম হয়ে যায় ইদানীং।

একটি ছোট্ট দোতলাব একতলাব সামনে এসে মানুষটি থামলেন। বাড়িব গায়ে নম্বব
লখা—সাত। সাধাবণ পুবনো বাড়ি। ছোট্ট টিনেব সাইনবোর্ডে লেখা—'শনিবাবেব চিঠি'।
বিলেব কাগজপত্র দেখে বোঝাই যায় কাগজেব অফিস।

একতলা একদম সুনশান। দেওয়াল ঘড়িতে সওয়া দুটো। মানুষটি ভেতবে ঢুকে
বদিকে তাকালেন। পাশেব ঘবটিতে উঁকি দিলেন। নাঃ। কেউ নেই। দেওয়ালে একটি
ম্বা পেবেক থেকে কাটা প্রুফেব কাগজেব গ্যালি ঝুলছে। দোতলায় ওঠাব সিঁড়িব মুখে
ায়ে একবাব চাপা গলায় ডাকলেন, সজনী—ও সজনী? বাড়ি আছো নাকি?

কোনও সাড়া মিলল না। মানুষটি তখন গায়েব খদ্দবেব পাঞ্জাবিটি আলগোছে খুলে
ফ ঝোলানো দেওয়ালেব উল্টোদিকেব দেওয়ালে একটি পেবেকে ঝুলিয়ে দিলেন। দিয়ে
াত পুবনো এক সিলিং ফ্যানেব বেগুলেটব সামান্য ঘোবালেন।

অমনি পাখাটি শ্বাসকষ্টেব ঢঙে নিয়মিত তালে শব্দ কবে ঢিমে তালে ঘুবতে লাগল।
াব গেঞ্জি গায়ে শীর্ণ মানুষটি পব পব চাবখানি চেয়াব পাশাপাশি জুড়লেন। তাবপব বড

টেবিলের বাঁদিকে রাখা 'শনিবারের চিঠি'র দড়ি-সেলাই ফাইল কপির গোটাটি বালিশ ম
করে তাতে রুমাল ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ফাঁকা মোহনবাগান রো-এ এই ভরদুপুরে অল্প মানুষেরই যাতায়াত। দেখতে দেখ
চেয়ার জুড়ে শুয়ে পড়া মানুষটির নাক ডাকতে লাগল। চাপা আওয়াজে।

পৃথিবী থেমে নেই। দিব্যি ট্রামের ঘন্টির আওয়াজ এ দিকে ভেসে আসে। মাঝে শঙ্খ
কাকের ডাক। কে ঝুপ্পুস করে ডাস্টবিনে অনেকটা ময়লা ফেলল। মানুষটির ঘুমের তা
কোনও ব্যাঘাত হল না।

তিনি তখন ছবির মতো স্বপ্ন দেখে চলেছেন। স্বপ্নে সব কিছু ময়দার মতো নব
মিহি। দিন কি রাত বোঝা যায় না।

ওয়েলিংটন লেনে 'উপাসনা' কাগজের অফিস। দেখেই চিনতে পারলেন মানুষটি
সম্পাদক কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ওই তো গায়ে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি তাঁ
কাগজের অফিস ঘরের সঙ্গেই পাশের ঘরটি তাঁর বাসা। মানুষটি স্বপ্নে দেখতে পেলেন
তিনি নিজে ওই বাসায় খাটে বসে বসে জলচৌকির ওপর খাতা রেখে কি লিখে চলেছে
গায়ে গেঞ্জি। দেওয়ালে গান্ধীজি।

সাবিত্রীপ্রসন্ন এগিয়ে এলেন। এই যে তারাশঙ্কর। একবার যে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়
কংগ্রেস কমিটির অফিসে তোমায় যেতে হবে।

আমাকে যেতে হবে কেন ? আমি এখন গল্প লেখা ফেলে কোথাও যাব না সাবিত্রী

আরে বি পি সি সি-র অফিস এই তো ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোণে। কিরণশঙ্কর রা
একবার তোমায় ডেকেছেন।

তারাশঙ্কর বললেন, না। তিনি যা বলবেন সে আমি পারব না। মিথ্যা বলব না

তা হলে চল এক জায়গায় বেড়িয়ে আসি।

তারাশঙ্কর জানতে চাইছেন, কোথায় ?

চল না। গায়ে পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে নাও। বললে চিনবে না হয়তো। কলকাতার রাস্ত
দিয়ে হেঁটে তারাশঙ্কর আর সাবিত্রীপ্রসন্ন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড় থেকে ধর্মতলার ট্রামে
উঠলেন। তারপর ধর্মতলায় ট্রাম বদলে ওরা দুজন টালিগঞ্জের ট্রাম ধরলেন। নামলেন এ
এলগিন রোডের মোড়ে।

কোথায় যাচ্ছি সাবিত্রী ? বলে বেঁকে দাঁড়ালেন তারাশঙ্কর।

চলই না ভাই।

তারাশঙ্কর দেখলেন, ওঁরা এসে শরৎ বোস সুভাষ বোসের বাড়ির সামনে এ
পড়েছেন।

এ কোথায় চলেছি সাবিত্রী ?

চলই না।

সামনের ঘরে আট দশজন ভিজিটর। ভেতরে বোধহয় দশ পনেরোটা টাইপরাইটার-

কি তারও বেশি খট খট শব্দে অবিরাম চলেছে। ডান পাশের ঘরে সুভাষচন্দ্রের মাথা দেখা গেল। তিনি কয়েকজনের সঙ্গে বসে কথা বলছেন। একটি অল্পবয়সী কিশোর যেন বা আগুনের শিখা। ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় সুভাষচন্দ্রের ভাইপো—শরৎ বসুর ছেলে।

কে ঠিক বুঝতে পারছেন না তারাশঙ্কর।

সাবিত্রী খবর পাঠালো।

মিনিট কয়েক পরেই সুভাষচন্দ্র বেরিয়ে এলেন। আপনিই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনার সঙ্গে কথা বলা আমার যে কি দরকার। আমি আসছি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন—বলে সেই কিশোরটিকে ডাকলেন, ওঁদের চা দাও।

ঠিক এই সময়—একজন কংগ্রেস ওয়ার্কার—দাড়ি গোঁফে মুখ ঢাকা—কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—একটু যেন ব্যঙ্গ করেই বলে উঠলেন, ওই! হল—! সাহিত্যিক নিয়ে এইবার জল খাওয়ানো মজলিস—। বাকি কথা মুখেই রইল তাঁর। সুভাষচন্দ্র চলে যাচ্ছিলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন বাঘের মতো। আর বাঘের মতোই গর্জে উঠলেন, হোয়াট?

কংগ্রেস ওয়ার্কার মানুষটি পলকে ধপ করে বসে পড়লেন চেয়ারে। আমার অতিথি—বলেই সুভাষচন্দ্র ভেতরে ঢুকে গেলেন।

তারাশঙ্কর ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন খানিকটা। শক্ত করে মন বাঁধলেন। সাবিত্রীকে বললেন, তুমি অন্যায় করেছ। আমাকে এমনভাবে এখানে আনা তোমার উচিত হয়নি।

বেরিয়ে এলেন সুভাষবাবু। তিনিই কথা শুরু করলেন, আপনি কেন সাক্ষ্য দেবেন?

তারাশঙ্কর নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, আমি তো মিথ্যা বলব না। একটা কথা—। বলেই তারাশঙ্কর সুভাষচন্দ্রের মুখে তাকালেন। সুভাষচন্দ্র শান্ত মুখেই বললেন. বলুন।

আমরা যারা কংগ্রেসের কর্মী হয়ে কাজ করি—তারা দেশের সেবা করতেই আসি। আমরা তো সুভাষচন্দ্র বা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর সেবা করতে আসি না। আমি দেশের সেবা করতে চেয়েছি—তাই সত্য বলতে সাক্ষ্য দেব আমি।

পলকে তারাশঙ্কর বাঁদিক থেকে আঙুলের টিপনি খেলেন। সাবিত্রী টিপছে। তারাশঙ্কর এই টিপুনির মানে বুঝতে পারছেন না। তিনি বুঝতে চাইলেনও না। তখন তিনি ঠিকই করে ফেলেছেন—সত্যি কথাই বলব। সাবিত্রী ভয় পাচ্ছিল—সুভাষচন্দ্র রেগে গিয়ে আবার না গর্জে ওঠেন।

তারাশঙ্কর সুভাষচন্দ্রের মুখের দিকেই তাকিয়ে। সুভাষবাবুর সুন্দর মুখখানি কঠিন হয়ে উঠল। পলকের জন্য। টকটকে রং লাল হয়ে উঠল। কিন্তু তখনি তিনি হাসলেন। শান্ত হাসি। বললেন, নিশ্চয়। মানুষকে দেবতা হিসেবে সেবা করলে সাধনাই পণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সত্য কথাটাই জানতে চাই। বলুন আপনি। সত্যি কি ঘটেছিল? পিছনে ঘরের ভেতরের দিকে তাকালেন তিনি। একান্তে কথা বলার সুযোগ খুঁজলেন। দেখলেন—

নেই। বললেন, চলুন—লনে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

তাবাশঙ্কর ভাবলেন, পলকে আমি বাঙলার কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র আর যতীন্দ্রমোহনের ঝগড়ার কথা—কোঁদলের কথা—খোদ সুভাষচন্দ্রকেই বলে দিয়েছি। ভাল করেছি। বেশ করেছি। সত্যি কথাই বলেছি। দুজনে লনে বেড়াতে বেড়াতে কথা বলছি। স্বপ্নের আলোতে নীল ময়দা মাখানো থাকে। সেখানে গরম থাকে না। শীতও থাকে না। তারাশঙ্কর—যা ঘটেছিল—তাই বলে যাচ্ছেন। সুভাষচন্দ্র মাঝে মাঝে দু-একটি কোশ্চেন করছেন। শেষে বললেন, তারাশঙ্করবাবু। আপনার কথা আমি সবটাই বিশ্বাস করলাম। আপনি সত্যি বলেছেন। আমি দুঃখিত। লজ্জিত। ওখানকার নরেনবাবুই এই সব করেছেন। আমাকে ছোট করেছেন। কলঙ্কর বোঝা আমার মাথায় চাপলো। আপনি বিশ্বাস করুন—এ আমি চাইনি। এ আমি চাই না। আপনি বীরভূমে গিয়ে এই ঝগড়া মিটিয়ে দিন।

চারটি চেয়ার জুড়ে ঘুমিয়ে থাকা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুমের ভেতরেই একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আরেকটি স্বপ্ন এসে তারাশঙ্করকে দখল করল।

দুপুরবেলার শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন। খোয়াইয়ের দিক থেকে বাতাস উঠে সব গাছপালার ভেতর দিয়ে এমনভাবেই বয়ে চলেছে—যেন সব গাছ একসঙ্গে দুলে দুলে গান ধরল। যে-গানেও কোনও শব্দ নেই। আছে শুধু দোলা। দুটি গাছের মাঝখানে সালু টাঙানো হয়েছে। তাতে সাদা হরফে লেখা—পল্লী-কর্মী সম্মেলন।

কালীমোহন ঘোষ মশায় একাই একশো। তিনি ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন। তারাশঙ্কর মনে করতে পারলেন—তাঁর জীবনের গোড়া থেকেই কালীমোহনবাবুর সঙ্গে একটা যোগ রয়েছে। কালীমোহন ঘোষের গায়ের ফতুয়াটি ঘামে ভিজে একেবারে সপসপে। এই মানুষটিকে তারাশঙ্কর ভাল করে জানেন। কলেরার সেবা করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে তারাশঙ্করের আলাপ। তারাশঙ্করদের সেবা-সঙ্ঘের কাজ কালীমোহনবাবু অনেকবার দেখে গেছেন। খুশি হয়েছেন। তিনি তারাশঙ্করকে ভালবাসেন। স্নেহ করেন। তাঁর চিঠি পেয়েই এই পল্লী-কর্মী সম্মেলনে তারাশঙ্করের আসা। ভালবাসার ডাক তারাশঙ্কর ঠেলতে পারেননি।

কালীমোহনবাবু পল্লী-কর্মীদের ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে গলা তুলে বললেন, কবি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন। আপনারা বসুন—

সন্ধে হয় হয়। উদয়নের বড় ঘরখানিতে মেঝের ওপর শতরঞ্চি। অনেকের সঙ্গে তারাশঙ্করও বসলেন। পুবমুখো হয়ে। সামনেই ছোট চৌকির ওপর কবির আসন। বড় বড় দুটি দীপদানে আলো জ্বলছে। লাভপুরের দলটি তাদের হয়ে তারাশঙ্করকে এগিয়ে দিল। কথা বলার ভার তারাশঙ্করের ওপরেই পড়ল। তাঁর বুক এখন টিপ টিপ করছে।

কি বলবেন কবিকে ? কিছুই জানেন না তারাশঙ্কর।

কবি এসে বসলেন।

কালীমোহনবাবু তারাশঙ্করকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, সাহিত্যিকও বটেন।

রবীন্দ্রনাথ সামান্য হাসলেন। হ্যাঁ। লাভপুরে সাহিত্যের চর্চা আছে। ভাল অভিনয়ও হয় সেখানে।

তারাশঙ্কর অন্য সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কবি আশীর্বাদ করলেন। বললেন, গ্রামকে গড়ে তোল। নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না।—কথা বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করের মুখে তাকালেন। তারপর বললেন, শান্তিনিকেতন জায়গাটি তো আমার খারাপ বলে মনে হয় না। যাঁরা আসেন তাঁদেরও ভাল লাগে। তোমার কেমন লাগে?

গলার স্বর শুনে—কথা বলার ভঙ্গি দেখে ভয় পেলেন তারাশঙ্কর।

বললেন, আমারও ভাল লাগে।

গম্ভীর গলায় রবীন্দ্রনাথ এবার বললেন, তা হলে তুমি শান্তিনিকেতনের নিন্দা করে বেড়াও কেন?

ভয়ে অবাক হয়ে তারাশঙ্কর কথা বন্ধ হয়ে গেল। তবুও তিনি বলার চেষ্টা করলেন, কই না তো। আমি তো কখনও কারও কাছে শান্তিনিকেতনের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি।

তবে? তবে তুমি শান্তিনিকেতনে আস না কেন? তোমার বাড়ি তো এই কাছেই। নিত্য আসা-যাওয়া করা চলে।—বলতে বলতে বরীন্দ্রনাথের গলা নরম হয়ে এল। তারাশঙ্করের ভয় পাওয়া মুখ দেখে মিষ্টি হাসিতে ভরে উঠল তাঁর মুখ। বললেন, বসো।

তারাশঙ্কর বসলেন।

আমি আশা করেছিলাম—এখানকার একটা কোণ আগলে তুমি বসবে। কিন্তু সে তুমি এলে না? এখানে আসাও তোমার অনেকদিন পরে পরে। কেন বল তো?

এমনই কাজে জড়িয়ে থাকি—সময় করতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ সামনের দিকে চাইলেন। মুখখানি বিষাদে ভরে গেছে। কি এত কাজ? কাজ করতে হলে তো বোলপুরে আসতে হয় গো তোমাকে? তোমাদের মুনসেফি কোর্ট। বিষয় কাজ করবে আর কোর্টে আসতে হবে না—এ তো হয় না। তোমাকে যে টেনে আনবে। তুমি তো নিশ্চয় বোলপুরে আসো তারাশঙ্কর।

না। ও-পথ আমি মাড়াই না।

বল কি? তবে বিষয়কর্ম চলে কি করে? যন্ত্র বেগড়ালে কারখানায় পাঠাতেই হবে। বিষয় থাকলে গণ্ডগোল বাধবেই। সে গণ্ডগোলের মীমাংসার জন্যে আদালতে হাঁটতেই হবে।

তারাশঙ্কর বললেন, বিষযকর্ম আমি দেখি না। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কই রাখিনি। ও যা করবার করে আমার ছোট ভাই। আমি কিছু গ্রামের কাজ করি। কালীমোহনবাবু জানেন।

তবে শ্রীনিকেতনে আসছ না কেন কালীমোহনের কাছে?

তারাশঙ্কর একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আছে একটু যোগাযোগ। তবে

গাঁয়ে না থাকলে তো গাঁয়ের কাজ হয় না। রবীন্দ্রনাথ চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, তা হলে তোমাকে টানা অন্যায় হবে। তোমার ইচ্ছা নেই।—একটু হেসে বললেন, এ জেলার লোকের কাছে এ জায়গাটা বিদেশ হয়েই রইল। কোথায় যে রয়েছে—মাঝখানের খাতটা।

উঃ! পড়ে যাবে যে তারাশঙ্কর—!

একদম অন্যরকম গলার স্বর তারাশঙ্করের স্বপ্নের ভেতর ঢুকে গেল। মিহি ময়দা মাখানো নীল আলোয় আবছা স্বপ্নের ভেতর। গলার এই আওয়াজটি রীতিমত রূঢ়। এ আওয়াজ চেনা তারাশঙ্করের। তিনি চেয়ারগুলো সামলে সুমলে ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

মোটা নাক। ভারী শরীর। সজনীকান্ত দাঁড়িয়ে। পড়ে যাচ্ছিলে যে—

তাই ?—বলে তারাশঙ্কর চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শনিবারের চিঠির সম্পাদক দাঁড়িয়ে। তার অফিসঘরের জানলার বাইরে মোহনবাগান রো-এ শীতের আগাম নোটিশ দেওয়া পড়তি রোদ। সজনীকান্ত নিজের চেয়ারে বসলেন। তারাশঙ্কর গেঞ্জি গায়েই বসলেন মুখোমুখি।

আজ একটা বড় খবর আছে তারাশঙ্কর। বিধান রায়ের দলের হার হল।

তারাশঙ্কর কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি তখনও সদ্য দেখা স্বপ্নে কয়েক বছর আগের সব ঘটনার ভেতর ভাসছেন।

কাগজের জন্য টেরিটিবাজারে গিয়েছিলাম। সেখানেই শুনলাম। সুভাষবাবু এবার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন।

সত্যি ?

হ্যাঁ। অনেক সাফার করেছেন মানুষটি। তাব রেকগনিশন ডিউ ছিল। আজই শরৎবাবুর বাড়িতে ওয়ার্কিং কমিটিতে ডিসিশন হয়েছে। কিন্তু তোমার খবর কি তারাশঙ্কর ?

কিসের খবব ?

আজ দুপুরে খাওয়া হয়েছে ? না, হয়নি ?

খাবো না কেন ? দিব্যি পাইস হোটেলে খেয়ে তোমার এখানে এসে দেখি কেউ নেই। তাই চারখানা চেয়ার জুড়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম।

সেই মনোহরপুকুর সেকেন্ড লেনের ডেরাতেই আছ ?

দিব্যি আছি ভাই। লাভপুরে থাকতে আই বি-র লোক পেছনে লেগে থাকত। কলকাতায় যেখানেই থাকি—বাড়ির দরজায় টিকটিকি বসে থাকে। তাই আত্মীয় বাড়ি ছেড়ে মনোহরপুকুর সেকেন্ড লেনে ঘরভাড়া নিয়ে থিতু হলাম সজনী।

ভাড়া কত ?

পাঁচ টাকা। লাইট চার্জ এক টাকা। চা জলখাবার সারা মাসে সাত আট টাকা। খাবার খরচ আট টাকা। এ বেলা দু আনা। ও বেলা দু আনা। ট্রাম বাস অন্য খরচ মাসে আট টাকা

মিলিয়ে মাস গেলে তিরিশটি টাকা লাগে। কিন্তু ভাই একটি বিপদে পড়ে তোমার সাহায্য
।

সজনীকান্ত চোখে চশমাটি খুলে টেবিলে রাখলেন। তারপর তারাশঙ্করের মুখে
লেন।

লাভপুর থেকে খবর এসেছে—ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সামসুদ্দোহা সাহেব আমার গাঁয়ে
য় তদন্ত করছেন—কোন আয়ে আমি কলকাতায় থাকি। কি আমার জীবিকা ? গল্প লিখে
রশ টাকা আয় করি—এ প্রমাণ করা সহজ নয়। অনেক ভেবে শেষে তোমার কাছে এলাম
নী। পরিমল গোস্বামীর নাম 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক হিসেবে আছে। ওর নামের
চ সহসম্পাদক হিসেবে আমার নামটা তুলে তিরিশ টাকা হিসেবে খরচ লিখতে হবে।
নে অবশ্য আমি নেব না। তবে মাইনে তুলতে এক আনার যে রেভিনিউ টিকিট লাগে—
া আমি দেব।

সজনীকান্ত হো হো করে হাসতে লাগলেন। সে হাসি আর থামে না। মোহনবাগান
দিয়ে যাও বা দু-একজন এই সময় যাচ্ছেন—তারা অবাক হয়ে চেয়ারে বসা সজনীকান্তর
 শুনতে শুনতে চলে গেলেন।

শেষে সজনীকান্ত বললেন, তাই হবে। তা তোমার ডেরাটি কেমন তারাশঙ্কর ?

চমৎকার ! পাকা দেওয়াল। ওপরে টিনের ছাউনি। কল-চৌবাচ্চা তো নেই। টিনের
টা গোল জালা কিনেছি। ভোরবেলা কলে জল এলেই বালতি করে রাস্তার কল থেকে
 এনে জালাটা ভর্তি করে রাখি। তার আগেই অবশ্য ঘর পরিষ্কার, জল দিয়ে মোছা শেষ
। মেঝের ওপর শতরঞ্চি পেতে সুটকেস রাখি। সেটাই আমার লেখার ডেস্ক।
লপুরের আদালতের কাছে পুরনো ফার্নিচারের দোকান থেকে একটা কুশন মোড়া হাফ-
ফা আব একটা ফোল্ডিং চেয়ার কিনেছি। বিকেলবেলা ফোল্ডিং চেয়ারটা বের করে
রে গলি রাস্তায় পেতে বসে মাঝেমধ্যে আরাম করি সজনী। তখন একটা বিড়ি ধরাই।

খাও কোথায় ?

রাসবিহারির মোড়ে চা খেতে যাই। তা সে যতবারই ইচ্ছে হোক না কেন। দুপুর আর
তর খাবার প্রথম মাসটা খেয়েছি আমাদেরই দেশের কয়েকটি ছেলের সঙ্গে। ওরা
নির্বাণ রোড, অশ্বিনী দত্ত রোড আর মনোহরপুকুর সেকেন্ড লেনের ক্রসিংয়ে কয়লার
পো খুলেছিল। তার সঙ্গে ছিল ওদের ব্যবসা, মুদিখানা। এখন যাই পাইস হোটেলে।
লবেলা ঘরের কাজ সেরে লিখতে বসি। বেলা বারোটা নাগাদ স্নান সেরে লেখা বগলে
রিয়ে যে-কোনও পাইস হোটেলে খেয়ে নিই। তারপর কাগজের অফিসে হাজির হই।
ন্দবাজার, দেশ, ভারতবর্ষ। তারপর তোমার এখানে শনিবারের চিঠিতে এসে চার খানা
ার পাশাপাশি জুড়ে ঘুমোই কোনওদিন। আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট। তুমি প্রেস থেকে
বা কাগজের বাজার থেকে ফিরলে উঠে বসি। পাঁচটা ছটা অব্দি আড্ডা দিয়ে বাসায়
রি। যেদিন ফিরতে রাত হয়—সেদিন পথেই রাতের খাওয়া সারি। তোমার এই ভাই'

সজনী। তবে এই ডেরায় বসেই তো অনেকগুলো গল্প লিখলাম।

তা লিখেছ তারাশঙ্কর। আমারই তো মনে পড়ছে—শ্মশানবৈরাগ্য, ছলনাময়ী মধুমাস্টার, ঘাসের ফুল, ব্যাধি, রঙীন চশমা, জলসাঘর, রায়বাড়ি, আখড়াইয়ের দীঘি তারিণী মাঝি—

'নারী ও নাগিনী' গল্পটার কথা বললে না?

ও হ্যাঁ। শারদীয় দেশ-এ বেরিয়েছিল।

একটা ভুল হল সজনী। ও গল্পটা লাভপুবে বসে লেখা। একটা ঘটনা ঘটেছে তোমায় বলা দরকার। সকালে সেদিন জল ধরা হয়নি। স্নান করে এলাম কালীঘাটে গঙ্গায়। সেখানে ঘাটে দেখা হল আমাদের ওখানকার ষষ্ঠী দাসের সঙ্গে। সেও গে গঙ্গাস্নানে। স্নান সেরে মনিববাড়ির জন্যে গঙ্গাজল নিয়ে যাবে। সে আমায় গঙ্গাস্নান কর দেখে অবাক। ষষ্ঠী চাকরের কাজ করে আমাদের কলকাতার আত্মীয়বাড়িতে। সেখা যখন দু মাস এক মাস অন্তর এসে কদিন থাকতাম—তখন সে আমায় দেখেছে। গঙ্গাস্না পুণ্য করার ইচ্ছে আমার নেই সে তা জানে। তাই দুপুর রোদে আমাকে গঙ্গাস্নানে আস দেখে ষষ্ঠী তো খুব অবাক। সেদিন বিকেলেই ষষ্ঠীচরণ আমার ডেরায এল। বলল, দি একবার এসে যখন হোক—আপনার সব কাজ করে দিয়ে যাব।

ষষ্ঠী আসে?

হ্যাঁ। আসে। সারাদিন ধরে আমাকে লিখতে দেখে ষষ্ঠী একদিন বলেছে—এ আপ কি করছেন বাবু? চাকরি বাকরি কি ব্যবসা বাণিজ্য কিছু যদি করতেন—তা হলে—

এবারও সেই হো হো হাসি শব্দ করে হেসে উঠলেন সজনীকান্ত। তার সঙ্গে তারাশং বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু হাসতে পারলেন না। তার মনের ভেতর কি যেন খচ খচ করছে বিকেল হয়ে আসছে। তারাশঙ্করের মনে একটা জিজ্ঞাসা জেগে উঠছে। কে ঠিক? আমি না ষষ্ঠীচরণ দাস? কে ঠিক?

হঠাৎ সজনীকান্ত গম্ভীর গলায বললেন, আসলে এটা গান্ধীজির জয়।

তারাশঙ্কর কিছু বুঝতে না পেরে বন্ধুর মুখে তাকিয়ে রইলেন।

সজনীকান্ত বললেন, মনে আছে তোমার টোয়েন্টিনাইনের কথা—থার্টির কথা।

তারাশঙ্কর কিছুই বুঝতে পারছেন না।

টোয়েন্টিএইটে কলকাতা কংগ্রেসে তরুণদের নেতা সুভাষচন্দ্র আর জওহরলাল কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিলেন। জওহরলালকে গান্ধীজি পরের বছর লাহোর কংগ্রে সভাপতি করে সরিয়ে নিলেন।

হুঁ। তারপরেও তো গত দু বছর জওহরলাল পর পর কংগ্রেস সভাপতি হয়েছে

হ্যাঁ তারাশঙ্কর। কংগ্রেস সোসালিস্টরা জোরদার হয়ে উঠেছে। কমিউনিস্ট কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মে ঢুকেছেন। যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা অনেকেই এখন কংগ্রেসে। ও পাল থেকে হাওয়া সরিয়ে নিতেই গান্ধীজি এবার সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি করছে

কিন্তু ?

কিন্তু কি তারাশঙ্কর ?

সুভাষচন্দ্র জেল থেকে বেরিয়েই প্রথম কথা বলেছেন, গান্ধী ইজ এ স্পেন্ট আপ ফোর্স। তিনি বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। এখন তিনি আর গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন না। এখনই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে যাওয়া দরকার।

গান্ধীজি কেন আন্দোলনে যেতে চাইছেন না ?

হয়তো সজনী—তাঁর মনে হচ্ছে এখনই সময় হয়নি। সারা দেশে একমাত্র তিনিই তো গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন।

আবার তিনিই গণ আন্দোলনের মাঝখান থেকে পিছিয়েও আসেন তারাশঙ্কর !

তারাশঙ্কর কোনও কথা বললেন না। প্রায় বছর খানেক আগে সাতটি প্রদেশে ভোটে জিতেও কংগ্রেস এখনও সরকারে যায়নি। কিন্তু কংগ্রেসের ভেতরকার লোকজনকে নেতারা আর আটকে রাখতে পারছেন না। হয়তো তারা সরকারে যাবার জন্যে কংগ্রেসের ভেতরেই আলাদা দল গড়তে পারে। বাতাসে কান পাতলে শোনা যায়—কংগ্রেস ইউনিটি বজায় রাখতে সরকারে যাবে। সরকারে না গেলে যে দল ভেঙে যায় যায়। আর বাঙলাদেশে !

এখানে কংগ্রেস হকসাহেবের এগিয়ে দেওয়া হাত ফিরিয়ে দেওয়ায় হকসাহেব লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়েছেন। এই সরকার এখন বাঙলা ভাষার ভেতর আরবি ফারসির বহর বাড়াতে চাইছেন।

বিকেল হয়ে গেল। তারাশঙ্করের মনে হল—আমি যে ভাষায় লিখি—সেই বাঙলা ভাষা কি থাকবে ?

কলকাতার আরেকদিকে উডবার্ন পার্কে শরৎ বসুর বাড়িতে ঢুকে একতলায় ডানদিকে বড় ঘরে জওহরলাল নেহরু টেবিলে বসে কি লিখছেন। পরনে খদ্দরের ধুতি। ওপরে খদ্দরের পাঞ্জাবি।

পাঞ্জাবির ওপর খদ্দরেরই হাতকাটা কোট—পকেটওয়ালা—যাকে বাঙালি মাত্রেই বলে থাকেন—জওহর কোট।

এখন কলকাতায় বিকেল। জওহরলাল নেহরুর বয়স আটচল্লিশ। যে বাড়িতে তিনি উঠেছেন—তার মালিক সফল ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসু জওহরলালেরই বয়সী। দুজন দুজনকে নাম ধরেই ডাকেন।

দেশসুদ্ধ মানুষ জানেন—প্রায় দু'বছর হল জওহরলালের স্ত্রী কমলা নেহরু আর নেই। কাপড়ের দোকানে হালখাতার ক্যালেন্ডারে কিংবা খবরের কাগজে তাদের প্রিয়নেতার যে মুখখানি ছাপা হয়ে থাকে—তা রীতিমত বিষাদে ছাওয়া। জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময়

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে জওহরলাল আজকাল তাঁর বাঁ হাতখানি কোমরে রেখে ডান হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে কথা বলেন। তিনি যা-ই করেন—পাবলিক তা-ই ভালবাসে।

সকালে দোতলায় একপ্রস্থ মিটিং হয়ে গেছে ওয়ার্কিং কমিটির। রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, রাজাগোপালাচারী, ভুলাভাই দেশাই, আচার্য কৃপালনী, সরোজিনী নাইডু ছিলেন।

জওহরলাল তো ছিলেনই। আর ছিলেন সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র।

বিষয় নির্বাচনী কমিটির প্রস্তাবগুলোর একটি খসড়া দেখছিলেন জওহরলাল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মন দিয়ে। গত ভোটে ব্রিটিশ সরকার রাজ্যে রাজ্যে নামমাত্র স্বশাসন দিয়েছে। তা নিয়েই কংগ্রেসের বেশিরভাগ লোক হন্যে হয়ে উঠেছে। কখন ক্ষমতায় যাব—এই তাদের ধ্যানজ্ঞান এখন। ইংরেজ গভর্নরদের হাতে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু আছে। তবু এইটুকু ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে সারা দেশের কংগ্রেস এখন অস্থির। জওহরলাল ক্ষমতায় যেতে চান না। কিন্তু দল রাখতে হলে যেতেই হবে। তাই তিনি প্রচণ্ড বিরক্ত। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে যে সব শর্ত রয়েছে—তা মানা যায় না। সশস্ত্র বাহিনী, পররাষ্ট্রনীতি—সবই ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের হাতে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া—দেশীয় রাজাদের জন্যে কেন্দ্রে বেশি বেশি প্রতিনিধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নিয়ে কংগ্রেসের ভেতর মতের ফারাক ওপরে ভেসে উঠতে শুরু করেছে। সুভাষচন্দ্র গণ-আন্দোলনে যেতে চান। তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি বলছেন, সশস্ত্র বাহিনী, পররাষ্ট্রনীতি যদি হাতেই না থাকল তো কেন্দ্রে গিয়ে কি হবে ? আর অন্যদিকে মুসলিম লিগের মহম্মদ আলি জিন্না বলে রেখেছেন—কেন্দ্রে মুসলমানদের প্রতিনিধি সংখ্যা বাকিদের সমান সমান হওয়া চাই-ই চাই। কিন্তু তা কি করে সম্ভব ?

বিকেল পড়ে আসায় জওহরলাল কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে পড়ার চেষ্টা করছিলেন। ঘরে আলো জ্বালানো দরকার। কিন্তু উঠে গিয়ে সুইচ টিপতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, কে যেন পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে।

হঠাৎ জওহরলাল এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে দেখেন, মাঝবয়সী একজন লোক—শার্টের নীচে ধুতি—মন দিয়ে পিছন থেকে তার কাজকর্ম দেখছে।

জওহরলাল ছুটে গিয়ে তার শার্টের কলার ধরলেন, হোয়াই ইউ হ্যাড বিন অ্যাট মি ?

সব কিছু ঘটে গেল পলকে। জওহরলাল তাকে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এসেছেন। লোকটি রীতিমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। একটা গোলমাল হওযায় আশপাশের ঘর থেকে অনেকেই বেরিয়ে এসেছেন।

চেঁচামেচি শুনে শরৎ বসুও বেরিয়ে এলেন, হোযাটস আপ দেযার জওহর ?—বলতে বলতে জওহরলালের হাত থেকে তিনি লোকটিকে ছাড়ালেন। একে চেনেন শরৎ বসু। নদীয়া জেলা কংগ্রেসের একজিকিউটিভে আছে। নামও জানেন।

শরৎ বসু জানতে চাইলেন, কি হয়েছে অনিল ?

অনিল সমাদ্দার রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। বয়স এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। সে রীতিমত হাঁফাচ্ছে। লজ্জাও পেয়েছে খুব। সে কোনওমতে বলতে পারল, এত কাছ থেকে কোনওদিন তো জওহরলালজিকে দেখিনি। তাই—

তাই উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়েছিলে! যাও—

অনিল সমাদ্দার প্রায় ছুটে পালাল। সামনের গেট দিয়ে। একদম রাস্তায়।

জওহরলাল জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার শরৎ ?

কিছুই নয় জওহর। সারা দেশ জুড়ে তোমার অগুন্তি আাড্মায়ারার। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। খাইবার থেকে—

তাই বলে একেবারে পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়বে ?

তোমাকে কাছের থেকে সবাই দেখতে চায়। জানতে চায়—তুমি তাদেরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষ কি না।

জওহরলাল নেহরু খানিকক্ষণ কোনও কথা বললেন না। বলতে পারলেন না। সারাদিন মানুষের ভিড় বাড়ির সামনে। তাদের কলরোলে—বন্দেমাতরম স্লোগান শুনতে শুনতে চিন্তার সুতো বারবার কেটে যায়। কিন্তু কিছু করার নেই। কদিন জনতার এই কলরোল না শুনতে পেলে জওহরলালের মনে হয়—তিনি নিজে কি নিঃসঙ্গ। যেন বা কোনও পাহাড়ের গুহায় একা পড়ে আছেন।

আচ্ছা শরৎ, একটা কথার জবাব দেবে ?

বল, কি কথা ?

আমরা নেতারা বলি বলেই কি ভারতের সব মানুষ আমাদের কথা শুনে এক হয়ে আন্দোলন করে ? আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। না, সারা ভারতের মানুষের মনের ইচ্ছাকে ভাষা দিয়ে আমরা ওদের মুভমেন্টে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলি ?

তার মানে ? আবার বল তো কথাটা—

আমি বলতে চাইছি শরৎ—জনতার ভেতরে সংঘর্ষে যাওয়ার ইচ্ছে আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। সেই ইচ্ছার চাপ টের পেয়ে আমরা ওদের ইচ্ছাকে, স্বপ্নকে রূপ দিই আন্দোলনের ডাক দিয়ে ?

শরৎ বসু ঝানু ব্যারিস্টার। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধী দলের নেতা। সুভাষচন্দ্র বসুর মেজদা। অতি অল্প বয়সেই আইন ব্যবসায় সফল হয়ে এই বাড়িটি করেছেন। তাঁকে তাঁর বিখ্যাত ছোটভাইয়ের রাজনীতিতে স্রেফ ফাইনানসিয়ার ভাবলে তাঁকে ছোট করেই দেখা হবে। তবু তিনি তখন তখনই জওহরলালের এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারলেন না। শরৎ বসু শুধু বললেন, কথাটা চল গান্ধীজির কাছে পেড়ে দেখি।

উরি বাপ! এখন বাপুর কাছে যাওয়া নয়। তিনি এখন প্রার্থনা সভায় যাবেন।

একটা ব্যাপার জওহর। তুমি একবার গান্ধীজির সেক্রেটারি মহাদেব দেশাইকে একটা কথা বলবে ?

কি কথা ?

কলকাতায় যে-ই ফোন করে জানতে চাইছে—সে কি মহাত্মাজির প্রেয়ারে জয়েন করতে পারে ? তাকেই মহাদেব দেশাই বলে দিচ্ছেন—অফকোর্স।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। বল তো অ্যাতো লোকের হ্যাপা পোহাই কি করে ?

আচ্ছা। আমি এখুনি গিয়ে বলছি।

জওহরলাল দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে এক পা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর পথ আটকালেন শরৎ বসু। কর কি ? এখন নয়। একটু বাদেই মহাত্মাজি প্রার্থনা সভায় যাবেন। এখন প্রেয়ার মিটিংয়ের ভিড় স্ক্রিনিং করা সম্ভব নয় জওহর।

জওহরলাল নেহরু শরৎ বসুর কথায় থামলেন। তাঁর মুখখানি যেন বিষাদে আরও ছেয়ে গেল।

উডবার্ন পার্কে ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসুর এই বাড়িটি বছর দশেকও হয়নি তৈরি হয়েছে শরৎবাবুর নিজেরই এখনও পঞ্চাশ হয়নি। তিনি মনের মতো করে বাড়িটি বানিয়েছেন যখন বাড়িটি তৈরি হচ্ছিল—তখন তিনি চল্লিশ বছর বয়সী দাপুটে ব্যারিস্টার। তিনি নিজে জাপান থেকে বরাত দিয়ে আনিয়েছেন ডাইনিং টেবিলের সেট। প্রতিটি সেটে শরৎবাবুর নামের শুরুর হরফটি—'এস' খোদাই করা।

রাস্তা থেকেই দেখা যায়—বেশ উঁচু তেতলার সামনে ঘাসে ভর্তি সবুজ লন। অন্য সময় শেষ আশ্বিনের এই সকালবেলায় বাড়িটির দক্ষিণের বারান্দায় মক্কেল, সলিসিটর, জুনিয়র ব্যারিস্টাররা শরৎবাবুকে ঘিরে বসে থাকেন। আজ এখন বাড়ির ভেতর দিককার একতলা থেকে খাঁচার ভেতর কাকাতুয়া একটানা কথা বলে চলেছে। কি কথা বলছে কাকাতুয়া তা বুঝতে পারলেন না গান্ধীজি। কদিন হল এই বাড়িতেই তাঁকে নিয়ে কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসছে। রয়েছেন সারা দেশের বড় বড় কংগ্রেসিরা সবাই। সারা ভারত জুড়ে এসব মানুষের নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে।

রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু, আচার্য কৃপালনী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রাজাগোপালাচারী। আর আছেন সুভাষচন্দ্র। আছেন তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্র।

ঘরে ঘরে দেওয়াল ঘড়িগুলো ঠিক আটটায় বেজে উঠল। গান্ধীজি সাদা কালো মার্বেল পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে একখানি ফটো দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। টপ হ্যাট মাথায় স্যুট গায়ে ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসুর ছবি। সেই ছবিখানি দেখে গান্ধীজি মধুর হাসি হেসে শরৎচন্দ্রের মুখে তাকালেন। শরৎচন্দ্রর গায়ে এখন খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি।

গান্ধীজির পেছন পেছন শরৎচন্দ্র সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলেন। গান্ধীজি এই কদিন হল আটষট্টি পেরিয়ে উনসত্তরে পা দিয়েছেন। চওড়া বুক। সিধে হয়ে সিঁড়ি ভাঙছেন। পাশে পাশে রয়েছেন তাঁর সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই। গুরুগম্ভীর। বছর পঞ্চাশেকের মানুষ। মুখে একটুও হাসি নেই।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে শরৎবাবু একবার পেছনে তাকালেন। সিঁড়ির গোড়ায় ধুতি পাঞ্জাবি পরা তাঁর সেক্রেটারি নীরদবাবু দাঁড়িয়ে। তাঁকে চোখের ইশারায় শরৎবাবু কি যেন বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো মানুষটি একতলার পেছন দিকটায় লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন। ওদিকটায় এ বাড়ির জোড়া রান্নাঘর। গ্যাসের রান্নাঘরে মুসলমান বাবুর্চি ইংরেজি খানা তৈরি করে। আর কয়লার রান্নাঘরে বামুন ঠাকুর বাঙালি খানা—ভাত, মাছ, ডাল, তরকারি রান্না করে।

শরৎবাবুর সেক্রেটারির পুরো নাম নীরদচন্দ্র চৌধুরী। ইনি শরৎবাবুর পক্ষে একজন খুব দরকারি লোক। মানুষটির সাহিত্যপ্রীতি পত্রপত্রিকা পড়া বাঙালি খোঁজ রাখে। সজনীকান্ত দাসের শনিবারের চিঠিতে নীরদচন্দ্র এই সেদিনও লিখেছেন। শুধু সাহিত্য নয়—সাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়েও তাঁর লেখা শনিবারের চিঠিতে ছাপা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও তিনি বছর দুই আগে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদনা করেছেন কিছুকাল। বছরখানেক হল তিনি শরৎচন্দ্র বসুর সেক্রেটারির কাজ করছেন। ব্যারিস্টার শরৎবাবু, পলিটিক্যাল লিডার শরৎবাবু, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অপোজিশন লিডার শরৎবাবু—একই মানুষকে এই তিনটি ভূমিকায় নানারকম বক্তৃতা দিতে হয়—চিঠি লিখতে হয়—লোকজন এলে বসাতে হয়—তাদের সঙ্গে কথাও বলতে হয়। বড় কোনও মানুষ মারা গেলে কাগজে কাগজে শোকবার্তা পাঠাতে হয়। এসব কাজই নীরদবাবুকে দেখতে হয়। কথা বলতে হয়। লিখতে হয়। তবে ব্যারিস্টারির ব্যাপারে সলিসিটররা কনসালটেশনে এলে শরৎবাবু নিজেই তা করেন। বাকি সব কাজকর্মে নীরদবাবু না হলে হয় না শরৎচন্দ্র বসুর।

নীরদবাবু বাড়ির একতলার ভেতর দিকটায় এগিয়ে দেখলেন, বাঙালী রান্নার খাবার বামুন ঠাকুরের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসুর স্ত্রী বিভাবতী দেবী কি নিয়ে যেন কথা বলছেন। হাতে একখানি লম্বা কাগজ। ফর্দ মতো। মুখখানি বেশ চিন্তিত।

নীরদবাবুকে এগিয়ে আসতে দেখে বামুন ঠাকুর বললেন, সেক্রেটারিবাবুকেই বলুন না মা—

এ বাড়ির কাজের লোকজন সবাই নীরদবাবুকে সেক্রেটারিবাবু বলেই ডেকে থাকে। তিনি এগিয়ে যেতে সুভাষচন্দ্রের মেজবউদি বললেন, দেখুন তো সবজির তালিকাটা। মুলো থেকে পালং শাক সবই লেখা আছে। কিন্তু গান্ধীজি আজ কি খাবেন ?

বিভাবতী দেবীর হাত থেকে তালিকাটি নিলেন নীরদবাবু। একদিকে হিন্দিতে লেখা সব সবজির নাম। তার পাশে দাঁড়ি টেনে সেই সবজির নাম লেখা। যেমন—

ঝিঙে

পটল

মুলো

বরবটি

লম্বা এক তালিকা। পরের পর সবজির নাম লেখা। অন্তত তিরিশরকম সবজির তালিকা। সবটা দেখে নীরদবাবু বিভাবতী দেবীর মুখে তাকালেন।

বিভাবতী বললেন, আজ গান্ধীজি মুলো খাবেন ? না, বরবটি ? না, পটল আর ঝিঙে—দুইই খাবেন ? তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অসুবিধের কি ? সব সবজি আনিয়ে রাখলেই হয়।

তা তো চলবে না নীরদবাবু। টাটকা সবজি চাই যে—

তাহলে আজই সব সবজি কিনে আনা হোক।

তা হবে না নীরদবাবু। গান্ধীজি আজ কি সবজি খাবেন—তা তাঁর সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই বলে দেবেন—সেই বেলা দশটায়। আর গান্ধীজি খেতে বসবেন ঠিক স'বারোটায়। এই সময়ের ভেতর চাহিদা মতো সবজি আনিয়ে রান্না কমপ্লিট করতে হবে। বুঝুন—

তাই তো ! ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে যাবে এখুনি। তার ভেতর মহাদেব দেশাইকে ধরতে হবে। বলেও নীরদবাবু কোনও পথ দেখতে পেলেন না। একতলায় শোবার ঘরখানিতে ঘুম থেকে উঠে চানটান সেরে এতক্ষণে জওহরলাল নেহরু ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছেন। জওহরলালকে নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই। তিনি ধুতি কুর্তা পরে একটু বাদেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় গান্ধীজির ঘরের সামনে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ফরাসে গিয়ে বসবেন। তেতলায় রয়েছেন বল্লভভাই প্যাটেল। সঙ্গে আছে তাঁর বিধবা মেয়ে মনি বেন। মনি বেনই তার বাবার সব কিছু খুঁটিনাটি দরকার লক্ষ করে থাকেন।

রাজেন্দ্র প্রসাদ আছেন বল্লভভাইয়ের মুখোমুখি ঘরে। নিপাট ভদ্রলোক। কলকাতায় তাঁর ছাত্রজীবন—প্রথম যৌবন কেটেছে। এতক্ষণে একে একে ওয়ার্কিং কমিটির অন্য

.মেম্বাররা—আচার্য কৃপালনী, সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রাজাগোপালাচারী—যে যার ঘরে ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। ঘরে ঘরে নীরদবাবু আজকের সব খবরের কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাও ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল।

কিন্তু গান্ধীজি আজ দুপুরে কোন কোন সবজি খাবেন—তা জানাই তো কঠিন হয়ে পড়ল। ওয়ার্কিং কমিটির সকালের বৈঠক আর একটু পরেই বসে যাবে। এর ভেতর ঠিক বেলা দশটায় মহাদেব দেশাইকে ধরে জেনে নিতে হবে—গান্ধীজির আজকের দুপুরের পছন্দের সবজি। আর তা জেনেই সঙ্গে সঙ্গে হগ মার্কেটে লোক পাঠাতে হবে। সেখানে বাজারের সুপার শরৎবাবুদেরই এক আত্মীয়। তিনি সবজিওয়ালাদের টাটকা জিনিসের কথা বলে রেখেছেন। লিস্টি মতো সবজি এসে যাবে মোটরে। তারপর তা রেঁধে বেড়ে ঠিক স'বারোটায় গান্ধীজির খাবার সময় পরিবেশন করবেন সুভাষচন্দ্রের মেজবউদি।

কদিনই বাড়িতে একটা সুখের হাওয়া বইছে। সুভাষচন্দ্র জেল থেকে নিঃশর্তে ছাড়া পেয়েছেন ছ-সাত মাস আগে। জেল থেকে বেরিয়েই তিনি বলেছিলেন, গান্ধী ইজ আ স্পেন্ট আপ ফোর্স। সেই গান্ধীজি আর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মিলে ঠিক করেছেন, এবার সুভাষই হবেন কংগ্রেসের সভাপতি। যাকে বলা হয়ে থাকে— রাষ্ট্রপতি। গান্ধীজির সময়ে ওয়ার্কিং কমিটির ডিসিশন সারা দেশের কাগজে কাগজে বেরিয়ে গেছে। বাংলা কংগ্রেসে বিধানবাবুরা মুখে কিছু বলেননি। এই ডিসিশনের আনন্দে তাঁরা খোলাখুলি যোগও দেননি। নীরদবাবু বুঝতে পারছেন বসু ব্রাদার্স—বসুবাড়ি কেন ডবল খুশি। একে তো সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হচ্ছেন। তারওপর গান্ধীজি সমেত পুরো ওয়ার্কিং কমিটি এখন বসুবাড়ির অতিথি। এটা কম বড় কথা নয়।

মুশকিল যত নীরদবাবুর। গান্ধীজির সেক্রেটারি মহাদেব দেশাইয়ের কাছে যেতে তাঁর মন চায় না। গান্ধীজির চোখ দুটি যেমন নম্র—মুখখানি তেমনি এই পৃথিবীর সব গোলমাল থেকে যেন অনেক দূরে। আর মহাদেব দেশাই ? সদা গম্ভীর। মুখে একটু হাসি নেই। মহাত্মাজির পছন্দের সবজি লিস্টি থেকে বেছে দেবেন—তাতেও এমন গুরুগম্ভীর—কঠিন ভাব—যেন সারা পৃথিবীর এই বিশাল ভার মহাদেব দেশাইকে একা নিজের পিঠে বইতে হচ্ছে। সর্বদাই কেমন একটা কর্কশ ভাব ছেয়ে আছে মহাদেবের সারা মুখে।

নীরদচন্দ্রের আরও খারাপ লাগে মহাত্মাজির কাছাকাছি যেতে। আসলে তাঁর কাছে ঠিক যাওয়া যায় না। তিনজন সবসময়ের কাজের লোক তাঁর আশেপাশে পথ আগলে আছে। তারা ভীষণ উদ্ধত। কোনও কথার জবাব দেয় না। জবাব দিলেও মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না তারা। মুখে কঠিন ভাঁজ। তারা গান্ধীজির সব সময়ের অনুচর। এরা জওহরলাল এলে কথার জবাব দেয়। কিংবা ঘনশ্যামদাস বিড়লা এলে মুখ তুলে নরম করে কথা বলে। কিন্তু নীরদবাবু বা তাঁর মতো কেউ—যারা জগৎসংসারের বিচারে ক্ষমতা বা টাকার মালিক নয়—তাদের মুখেও তাকায় না। বড়ই মুশকিলে পড়লেন নীরদচন্দ্র।

গান্ধীজি উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এলেও পৃথিবী থেমে থাকে না। সূর্য বিকেল হলে

পশ্চিমে ঠিকই ঢলে পড়ে : বাড়ির বাইরে গান্ধীজিকে দেখার জন্য ফুটপাথ জুড়ে সব সময়েই সাধারণ মানুষের ভিড়। সুভাষচন্দ্রের মেজোবউদি বিভাবতী বিরাট ফ্রেজিডিয়ার থেকে বেগুন আর ঝিঙে খুব সাবধানে বের করলেন। যেখানটায় বরফ জমে সেখানে কলাপাতায় মুড়ে অনেকখানি গঙ্গার মাটি রাখা আছে। চানের আগে গান্ধীজির ওই মাটি চাই। খানিকটা তাঁর নাইকুণ্ডুলিতে মাখিয়ে দেবে ওই অনুচররা। আর খানিকটা মাখানো হবে তাঁর কপালে, মাথায়। এভাবে তিনি প্রায় ঘণ্টাখানেক পড়ে থাকবেন। দিশি চিকিৎসা। এরপর চান করার সময় সব মাটি ধুয়ে ফেলা হবে।

নীরদচন্দ্র দোতলায় উঠেছিলেন। তাকিয়াতে ঠেসান দিয়ে গান্ধীজি বসে। ফরাসের ওপর। তাঁর শোবার ঘরের মুখোমুখি গান্ধীজির উল্টোদিকে বসেছিলেন জওহরলাল আর বল্লভভাই—পাশাপাশি। নীরদচন্দ্র সবজির লিস্টি হাতে দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখে মহাদেব দেশাই খুব বিরক্ত মুখে তাকালেন। ভাবখানা—এখানে আবার কেন ? এটা ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক।

নীরদবাবু দাঁড়িয়েই আছেন দেখে খুব ব্যস্তসমস্তভাবে মহাদেব দেশাই এগিয়ে এলেন। তালিকাটি তার চোখের সামনে মেলে ধরলেন নীরদবাবু। মহাদেব দেশাই তাঁর হাতের লাল পেনসিলটি দিয়ে বেগুন আর ঝিঙের পাশে টিক দিলেন। দিয়েই হাতের কি একখানা কাগজ গান্ধীজির চোখের সামনে মেলে ধরলেন। নীরদবাবু তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

লিস্টে বেগুন আর ঝিঙের পাশে দাগ দেখে বিভাবতীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। যাক ! কাউকে আর আজ হগ মার্কেটে যেতে হবে না। ঝিঙে, বেগুন দুই-ই ফ্রিজে তোলা আছে।

নীরদচন্দ্র বেশ সম্ভ্রমের গলায় জানতে চাইলেন, টাটকা তো ?

বিভাবতী বেশ রাগ রাগ গলায় বললেন, গাছ থেকে ছিঁড়ে আনতে হবে নাকি ? কালই এসেছে হগ মার্কেট থেকে। ফ্রিজ কি জন্যে ? টাটকা রাখতেই তো।

এক তলায় সিঁড়ির মুখে পরপর অন্তত দেড় দুশো খাতা একখানি টেবিলের ওপর জমা পড়েছে। আরও কেউ কেউ এসে ওখানে খাতা রাখছেন। এসব খাতাই সন্ধের পর মহাদেব দেশাই গান্ধীজির সামনে হাজির করবেন। গান্ধীজি একখানি একখানি করে খাতা নিয়ে তাতে নিজের নাম সই করবেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। আগামীকাল ভোরে খাতার মালিকরা এসে সার দিয়ে দাঁড়াবেন। খাতা নেবার সময় সবাইকে পাঁচ টাকা করে দিতে হবে। গান্ধীজি তাঁর নাম সইয়ের দাম ধরেছেন পাঁচ টাকা। এই টাকা জমা পড়বে দেশের কাজে।

নীরদবাবু, তাঁর অফিসঘরে বসে দেখতে পাচ্ছেন—গান্ধীজির অটোগ্রাফ চেয়ে যেসব খাতা জমা পড়েছে—তা রীতিমতো ডাঁই হয়ে উঠল। এই সব খাতা সারাদিন পরে মহাদেব দেশাইয়ের কাছে যাবে। তিনি সব নিয়ে ধরবেন মহাত্মাজির সামনে।

শরৎচন্দ্র বসুর সেক্রেটারির কাজ নেওয়ার পর শরৎবাবু নিজেই বলেছেন, নীরদবাবু

মাপনাব খাওযাদাওযা আমাব বাডিতেই শবৎবাবু চান তাঁব সেক্রেটাবি তাঁব সঙ্গে বসেই খাওযাদাওযা করুন। কি সে খাওযাদাওযা নীবদচন্দ্রব সহ্য হযনি।

শবৎবাবু, সকালে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট সাবেন। কডা টোস্টেব সঙ্গে বেশ ফোলা ফোলা ফিবাট এক ওমলেট। হাইকোর্ট যাবাব সময তিনি পাঁচ পদেব বাঙালিখানা খেযে থাকেন। বেলা দেডটা নাগাদ পুবোপুবি ইংলিশ লাঞ্চ তাঁব জন্য যায কোর্টে। সন্ধেব মুখে শবৎবাবু চা সিঙাডাব সঙ্গে কিছু মিষ্টিও খেযে থাকেন। বাতে ইংলিশ ডিনাব খান তিনি। পুবো চাব কোর্সেব। তাব সঙ্গে ভালমতো পুডিং ডিনাব খান তিনি একা একা। এই বেদম খাওযা কদিন খেযে নীবদচন্দ্র কাহিল তাব অনুবোধে এখন নীবদবাবুব জন্যে ভাত, মাছেব ঝোল, ডাল, তবকাবি আসে বামুন ঠাকুবেব হেঁসেল থেকে।

আজই সকালে বিডলা বাডিব মেযেবা গান্ধীজিকে প্রণাম কবতে এসেছিলেন।

গান্ধীজি তখন ওঁদেব বলেছিলেন, বেটিযা—আমাব জন্যে তোমবা কি এনেছ?

নীবদবাবু লক্ষ কবেছিলেন বিডলাবাডিব মেযেবা যেন খুব লজ্জা পেযে গেলেন। প্রায ছ সাতজন এসেছিলেন।

বিকেল পডতে বিডলাবাডিব সেই মহিলাবা ফেব এলেন। গান্ধীজি হাসি মুখে বললেন, আবাব কেন? কি হল?

মেযেবা মুখে কিছু বললেন না। তাঁবা একে একে মাথা নিচু কবলেন। গান্ধীজিব পাযেব কাছে মাথা তোলাব সময এক একজন মহিলা পাঁচশোটি কবে টাকা গান্ধীজিব পাযেব কাছে বাখলেন। টাকাগুলো গুনে মহাদেব দেশাই তুলে বাখলেন।

নীবদবাবু কদিন ধবেই লক্ষ কবছেন—একজন এই বছব পঁযত্রিশ ছত্রিশেব মহিলা চুপচাপ একতলাব সিঁডিতে এসে বসে থাকেন। বোজ। কোনও কথা বলেন না। পাযে স্যান্ডেল। শাডিব পাডে চোবকাঁটা। কোত্থেকে আসেন? কেন আসেন? কিছুই বোঝা যায না।

নীবদচন্দ্র জানতে চান, কি জন্যে এসেছেন?

গান্ধীজিব দর্শন পাব বলে আসি।

উনি তো ক্লান্ত হযে ঘুমোচ্ছেন এখন।

আমি শুধু একবাব চোখেব দেখা দেখব তাঁকে। যদি—

আপনি তো বোজ এসে বসে থাকেন দেখি।

হ্যাঁ। আজ নিযে এই তিনদিন হল। ওঁকে না দেখলে আমি অন্নজল স্পর্শ কবব না।

নীবদবাবু মনে মনে বললেন, আচ্ছা পাগল তো! শেষে উপোস দিযে না মাবা যান। মুখে তিনি বললেন, চলুন দেখবেন

সত্যি। বলে একগাল হেসে মহিলা উঠে দাঁডালেন? তাঁব যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না।

নীবদচন্দ্র সিঁডি দিযে উঠতে উঠতে বললেন, আমি কিন্তু ওপবে যাচ্ছি না। গান্ধীজি দবজা খোলা বেখে এখন ঘুমিযে থাকেন। আপনি যাবেন আব আসবেন। শুধু চোখেব দেখা

দেখে নেমে আসবেন। মহিলা তাতেই খুশি।

নীরদচন্দ্র নিচে নেমে এসে নিজের অফিসঘরে চেয়ারে বসলেন। একটু বাদেই মহিলা নেমে এলেন। নীরদচন্দ্র দেখলেন, মহিলার মুখে কোনও হাসি নেই। কি হল ? দেখলেন মহাত্মাজিকে ?

হ্যাঁ

সাধ মিটল ?

না।

কেন ?

গান্ধীজি ঘুমোচ্ছেন। ওঁর চোখ দুটোই তো আসল। তাই-ই দেখা হল না।

নীরদবাবু আর কি করবেন। তিনি তো আর ওপরে গিয়ে ঘুমন্ত গান্ধীজির বোজানো চোখ খুলে ধরতে পারেন না--এই সব মহিলার জন্যে !

বেলা পড়ে এল। সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, শরৎচন্দ্র, রাজেন্দ্রপ্রসাদ—কে এখন কার ঘরে কোন শলাপরামর্শে ব্যস্ত তা বলা কঠিন। নিজের মনে নীরদচন্দ্র হিসেব কষে দেখলেন। আমি আর সুভাষচন্দ্র একই বছর জন্মেছি। আমার চেয়ে সুভাষ মাস দশেকের বড়। আমি কোথায় ? আর সুভাষচন্দ্রই বা কোথায় ? সেই ১৯২১ সাল থেকে সুভাষচন্দ্রকে সারা দেশ লক্ষ করে আসছে। আই সি এস-এর কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে সঁপে দিলেন সুভাষ। দেখতে দেখতে তিনি আজ সারা ভারতে পয়লা সারির নেতাদের ভেতর একজন। আমি সুভাষের মেজদাদার সেক্রেটারি।

বিকেল পড়তেই গান্ধীজিকে দেখার জন্য রাস্তায় দাঁড়ানো মানুষজন যেন আরও উতলা হয়ে উঠল। মাঝে মাঝেই বন্দেমাতরম। আবার গান্ধীজি কি জয়। গেট দিয়ে কিন্তু কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। অন্তত দেওয়ার কথা নয়।

অফিসঘরে খোলা দরজা দিয়ে অবাক হয়ে নীরদচন্দ্র দেখলেন, কি আশ্চর্য ! এ যে লীলা দেশাই ? সঙ্গের মানুষটি তো কুন্দনলাল সায়গল। এ চেহারা তো ভুল হওয়ার নয়। যদিও নীরদচন্দ্র সিনেমা দেখার সময় পেয়ে ওঠেন না--কিন্তু এটা তাঁর অজানা নয়—লীলা দেশাই সায়গলের 'দিদি' ছবিখানি বাজারে পড়তেই খুব নাম করেছে। দেশসুদ্ধ লোকের মুখে সায়গলের গান। সেদিন মির্জাপুর স্ট্রিটে প্যারাডাইস লজে মেসের ঘরে বিভূতি বাঁড়ুজ্যের মুখে গুন গুন করে গাওয়া একখানি গান শুনতে পেয়ে নীরদচন্দ্র জানতে চেয়েছিলেন—কার গান ? এত গুন গুন করে গাইছেন ? লেখক বিভূতি বাঁড়ুজ্যের ভাল লেগে গেল—এমন কোন সে গান ?

বিভূতিবাবু বলেছিলেন, শোন নীরদ শোন। সায়গলের গান শুনলে তোমার ভাল লাগবে। নিউ থিয়েটার্সের দিদি ছবিতে গেয়েছেন—বলে গুন গুন করে এক কলি গেয়ে উঠলেন বিভূতিবাবু। তাঁর গলায় গান নেই। কিন্তু বড় আবেগ দিয়ে গাইছিলেন বিভূতিবাবু। সায়গলের গান।

সেই সাযগল– বাঙালিব মুখে মুখে যিনি কে এল সাযগল– লীলা দেশাইকে নিযে সেই গল দিব্যি সিঁড়ি দিযে ওপবে উঠে গেলেন। তবতব কবে।

নীবদচন্দ্র দক্ষিণেব বাবান্দায বেবিযে এলেন। গেটে যে দুজন দবোযান দাঁড়িযে দব কি বলবেন—তা তিনি বুঝে উঠতে পাবছেন না। গেটেব বাইবে মানুষেব ›ল। তাবা ত্বে ঢুকতে বাধা পাচ্ছে। আব লীলা দেশাই-সাযগল বিনা বাধায দিব্যি ওপবে উঠে লন। নীবদচন্দ্র নিজেকে বোঝালেন—এব পেছনে বযেছে খববেব কাগজেব ছবি আব ঃ ছাপিযে তৈবি কবা মাযা। এই মাযা তৈবি না হলে কি ওঁবা দুজন বিনা বাধায ওপবে ত পাবতেন ? দবোযান ওঁদেব দেখেও পথ ছেড়ে দেয ? সঙ্গে সঙ্গে নীবদবাবুব আব টি মন বলল তুমি লীলা দেশাইযেব মতো নাচতে পাবো ?

না।

কুন্দনলাল সাযগলেব মতো গাইতে পাবো ?

না।

তোমাব ভেতবে কি আছে যা নিযে খববেব কাগজ তোমাব ছবি ছাপতে পাবে ? মাকে নিযে খবব লিখতে পাবে ? যাকে কি না তোমাকে নিযে একটা মাযা তৈবি হতে ব ?

যে পুলিশকে দেখলে লোকে পালায—তাদেব পবোযা না কবে মহাত্মা গান্ধী একসময হযোগ আন্দোলনেব ডাক দিযেছেন। লবণ সত্যাগ্রহ কবেছেন। অনশন কবে দিনেব দিন না খেযে থেকেছেন।

ব্রিটিশকে ভয পাননি। ববং তুচ্ছ কবেছেন সত্যেব সামনে দাঁড়িযে। ইংবেজকে লাখুলি একদম ভয না পেযে সুভাষচন্দ্র গেছেন জেলে। জেলেব পব জেলে। হবলালও তাই। কে নন ? তাই ওঁবা সবাই খববেব কাগজেব ছবি—খবব হযেছেন। তাই য ওঁদেব ঘিবে এত মাযা। ওঁদেব দেখে পাবলিকেব এত বন্দেমাতবম।

এদিনই সন্ধেবেলা বাস্তায দাঁড়িযে থাকা মানুষেব ঢেউ একদম অশান্ত হযে উঠল। নও মাযাই ধোপে টিকল না। গেট ভেঙে মানুষেব ভিড় সিঁড়ি ভেঙে একদম তেতলাব দ উঠে গেল।

কোথায গান্ধীজি ? গান্ধীজি কোথায ? লোকেব মুখ দেখে দেখে ভেতবে ঢুকতে ওযা ? ওসব চলবে না।

গান্ধীজি এসে দোতলাব ঝুলবাবান্দায দাঁড়ালেন।

পাবলিক আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল। নীবদবাবু দেখলেন– এই সব নাম না জানা কেব দল– যাদেব ঘিবে কোনও মাযা তৈবি হযনি—যাদেব সবাই এক কথায বলে লিক—তাদেব কেউই চলে যাবাব সময শবৎবাবুব বাড়িব একটি জিনিসেও হাত দেযনি।

এখন বাত পড়লে শীত শীত কবে। শেষ বাতে বিছানায পাযেব কাছে একটা চাদব ন নিলে ঘুমোতে আবাম লাগে। কলকাতাব বাইবে মাঠেঘাটে ধান খেতে সাবা বাত

শিশির পড়ে। গ্রাম বাঙলার চাষিদের সামনে আমন ধানের স্বপ্ন। আর মাসখানেক বাদে
ধান পাকতে শুরু করবে। শেষ রাতে টিয়ার ঝাঁক বাতাসে সাঁ সাঁ শব্দ তুলে দূরের খে
চলে যাবে।

পরদিন সকাল থেকেই—শরৎ সুভাষ—দুই ভাইয়েরই মুখ কিছু গম্ভীর। ভোরবে
কাজে এসেই ব্যাপারটা সেক্রেটারিবাবু—মানে নীরদচন্দ্র চৌধুরী টের পেলেন। গান্ধীজি
কলকাতায় এল ঘনশ্যামদাস বিড়লা তাঁকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলেন
এবার ঘনশ্যামদাস তা করতে পারেননি।

একদল মনে করছেন—গান্ধীজিকে যেন চুরি করে উডবার্ন পার্কের বসুবাড়িতে নি
আসা হয়েছে। আর একদল মনে করছেন—গান্ধীজি ঠিক জায়গাতেই এসে উঠেছেন। আ
এজন্য বসুবাড়ির লোকজনও যেন কিছুটা গর্বিত। যেন বা একটি যুদ্ধে তাঁরা জিতে ব
আছেন। বাংলার কংগ্রেসে সুভাষ শরতের বিরুদ্ধে বিধানচন্দ্র রায় তো আছেনই। আছে
নলিনীরঞ্জন সরকার। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। আরও অনেকে। তাঁরা গান্ধীজিকে সরাসা
বিড়লাবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলার পক্ষপাতী না হলেও—তাঁরা কেউই চাননি গান্ধীজি
শরৎবাবুর বাড়িতে উঠুন। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক উডবার্ন পার্কের বাড়িতে হোক। এ যে
সারা দেশের কংগ্রেস বসুবাড়ির সম্পত্তি হয়ে গেল কদিনে। তাদের মনের ভাবটা এরকমই
ঘনশ্যামদাস বিড়লা একদম অন্যদিক থেকে কলকাঠি নাড়াচ্ছেন গত কদিন ধরে। মহাত্ম
গান্ধীর ছেলে দেবদাস গান্ধী বিড়লাদের ওখানে কাজ করেন। বিকেলের দিকে দেবদাসকে
দিয়ে বলানো হল—বাবার উডবার্ন পার্কে অসুবিধে হচ্ছে।

সে কথার পোঁ ধরলেন মহাত্মাজির সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই। নীরদবাবু দেখলেন
শরৎবাবুর তিরের মতো একতলায় জওহরলালের ঘরে ঢুকে গেলেন। একটু পরে দেখ
গেল, দুজনই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছেন। জওহরলালের মুখে সব সময়েই বিষা
যেন থাবা দিয়ে বসে আছে। প্রায় দু বছর হতে চলল, কমলা নেহরু নেই। জওহরলাল
রীতিমতো চাপা রাগে বলে উঠলেন, নো শরৎ—বাপু উইল স্টে হিয়ার—

দুজনে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছেন। একতলায় দাঁড়িয়ে
নীরদচন্দ্র একবার শরৎবাবুর গলা শুনতে পেলেন—'বাট জওহর—'।

সিঁড়ির মাঝামাঝি জওহরলাল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, আই সে শরৎ হি উইল স্টে
হিয়ার। দ্য হোল ওয়ার্কিং কমিটি ক্যান নট গো টু দ্য বিড়লা হাউস।

সন্ধেবেলায় গান্ধীজির প্রার্থনা সভা বসল তেতলায়। সভার পর শরৎচন্দ্র একবা
একতলায় তাঁর অফিসঘরে এলেন। সেখানে নীরদচন্দ্রকে দেখে বললেন, যাক, বাঁচা গেল

নীরদচন্দ্র ঠিক বুঝতে না পেরে শরৎবাবুর মুখে তাকালেন।

শরৎবাবু নিজে নিজেই বলে উঠলেন, জওহরের জেদেরই জয় হল। তবুও নীরদচন্দ্র
তাকিয়ে আছেন দেখে শরৎবাবু বললেন, ঘনশ্যামদাস চাইছিলেন—গান্ধীজি ওঁর বাড়িতে
গিয়ে উঠুন।

সকাল থেকেই ব্যাপারটার আঁচ পেয়েছেন নীরদচন্দ্র। একটা চাপা—অথচ গোপন টানাটানি চলছে গান্ধীজিকে নিয়ে। সারাদিন ধরে।

শরৎবাবু বললেন, মহাদেব দেশাই—দেবদাসের বকলমে ঘনশ্যামদাস বলছিলেন—গান্ধীজির এখানে অসুবিধে হচ্ছে। তাঁর দেখাশুনো আরও ভাল হওয়া দরকার। তা জওহরকে বললাম সব। শুনেই তো জওহর জেদ ধরে বসল—নেভার। কখনওই নয় শরৎ।

নীরদচন্দ্র দেখলেন, শরৎবাবুর মুখে একটা তৃপ্তির হাসি।

বুঝলেন নীরদবাবু—গান্ধীজি ঝুলেছিলেন। কোনদিকে যাবেন বুঝতে পারছিলেন না। একদিকে ছেলে দেবদাস আর সেক্রেটারি মহাদেব। আর অন্যদিকে আমি আর সুভাষ। যেই জওহর বলল, না বাপু। আপনি এখানেই থাকবেন—অমনই তো মেনে নিলেন গান্ধীজি। আর ঘনশ্যামদাস যে কি ক্যাড তা আর কি বলব। আজ দুপুরে গান্ধীজি যখন খেতে বসেছেন—তখন বেগুনের ভর্তা দেখে ঘনশ্যামদাস বলেন কি জানেন ?

নীরদচন্দ্র দেখলেন, তখনও শরৎবাবুর মুখে সেই তৃপ্তির হাসিটুকু রয়েছে। তিনি জানেন, জওহরলাল আর শরৎবাবু সমবয়সী—দুজন একই বছরে জন্মেছেন। মুখে নীরদচন্দ্র বললেন, কি ?

বেগুনের ভর্তা দেখে ঘনশ্যামদাস বললেন, বেগুনগুলো কি টাটকা ছিল ? বুঝুন ! কতটা ক্যাড হতে পারে একজন লোক ! আমার স্ত্রী তখন গান্ধীজিকে পরিবেশন করছেন। আজই দুপুরে—খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই। জানলার বাইরে অক্টোবরের শেষদিককার সন্ধেবেলা। এই সন্ধে থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কত দূরে কেউ তা জানে না। উনিশশো সঁইত্রিশের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টে বছর দুই হল প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের কিছু ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ গভর্নরের হাতে ভিটো দেওয়ার ক্ষমতা অনেকটাই। তবু প্রদেশে প্রদেশে সরকার গড়তে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসে প্রায় কামড়াকামড়ি পড়ে গেছে। কংগ্রেসে জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, গান্ধীজি—সবাই গভর্নরদের ভিটো দেওয়ার ক্ষমতার প্রশ্নে সরকার গড়তে চাইছিলেন না। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেসিরা প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিসভা গড়ার জন্য ক্ষেপে উঠেছে। ফলে দল যেন আর রাখা যাচ্ছে না। কংগ্রেসের ভেতরেই আর এক কংগ্রেস গড়ে উঠেছে—যারা এখুনি সরকার গড়তে চান। তাই ওয়ার্কিং কমিটি একরকম নিরুপায় হয়েই যেসব প্রদেশে কংগ্রেস জিতেছে—সেখানে সরকার গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। না নিয়েও উপায় নেই। সামান্য ক্ষমতার ভেতরেও জনসাধারণকে যদি কিছুটা উপকার করা যায়—তার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ? বিশেষ করে বাংলায় এখন হকসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে লিগের কোয়ালিশন সরকার মাঠেমাঠে ঘাটে মুসলমান চাষি, খেতমজুরদের ভেতর আশার আলো জাগিয়ে তুলেছে। সেখানে বাংলার কংগ্রেসিদের যেন কিছুই করার নেই। শুধুই অন্ধকার। তাদের সামনে যেন শুধুই অন্ধকার। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বসছে নতুন বাড়িতে। সে বাড়ির সামনে ইডেন গার্ডেন। বাঁয়ে গভর্নর হাউস। কংগ্রেস সেখানে অপোজিশন। তার লিডার

হিসেবে শরৎবাবু শুধুই যেন বিরোধিতা করে চলেছেন। তাঁর চোখের সামনেও যেন কো
আলো নেই। তাই মনে হল নীরদচন্দ্রের।

শরৎচন্দ্র বসু ঝানু ব্যারিস্টার। তিনি সওয়াল মজুত করতে অল্প সময়ের ভেতর
খুঁটিনাটি একত্র করে ব্রিফ জোরালো করে তোলেন।

নিজের সেক্রেটারিকে তিনি বললেন, কদিন ধরে ওয়ার্কিং কমিটির সভায়
থাকছি। যে কথা দশ মিনিটে বলে শেষ করা যায় তাই নিয়ে দু ঘণ্টা জুড়ে বক্তৃতা!
ভাল লাগে না নীরদবাবু। নীরদচন্দ্র বুঝতে পারছেন, আজ কেন জানি শরৎবাবুকে খুব
বলার ইচ্ছেয় পেয়েছে। এই কথার তোড়ের সামনে তিনি নীরদচন্দ্র চৌধুরী উপলক্ষ ম
সেক্রেটারি না হয়ে অন্য কেউ থাকলেও শরৎবাবু এ সব কথাই বলতেন।

পরদিন খুব সকালে কাজে এসে নীরদবাবু চমকে উঠলেন। উডবার্ন পার্কের বা
একসঙ্গে অত ছাগলের ডাক? এখানে ছাগল এল কোত্থেকে? জানা ছিল--গান্ধীজির
ছাগলের দুধের ব্যবস্থা করা হয়ে ওঠেনি।

নীরদচন্দ্র বাড়ির পেছন দিকটায় এসে দেখলেন—সাত আটটি ছাগল গলা
চেঁচাচ্ছে। তাদের মালিকরা পাশে দাঁড়িয়ে। ছাগলের চিৎকারে রেগে গিয়ে কাকাতুয়া
চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। বারান্দায় শরৎবাবুর পাশে মহাদেব দেশাই দাঁড়িয়ে।

নীরদচন্দ্র বুঝলেন, গান্ধীজিকে বিড়লাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলতে না পেরে
রাউন্ডে মহাদেব দেশাই শরৎবাবুর কাছে হেরে বসে আছেন। তারই প্রতিশোধ নিতে
না--তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কোনও ছাগলকেই গান্ধীজির দুধের জন্য মহাদেব দেশাই
পছন্দ হচ্ছে না। শরৎবাবু সবই দেখছেন—আর মিটি মিটি হাসছেন। মুখের ভেতর
এই সকালেই। মদ বা সিগারেট— কোনওটাই তিনি খান না। কিন্তু সকাল থেকেই শরৎ
পান চাই।

শেষে একটি ছাগলের চোখে চোখ রেখে মহাদেব দেশাই দুধের জন্য তাকেই প
করলেন। করেই তিনি কাঁচা চামড়ার স্যান্ডেলে মচমচ শব্দ তুলে ভারী পায়ে ভেতরে
গেলেন। শরৎচন্দ্র চোখের কোণে হেসে তাঁর সেক্রেটারি নীরদচন্দ্রের মুখে তাকালে

এক নম্বর উডবার্ন পার্কের বসুবাড়িতে এমন চাপা হাসি—বা চোরা হাসির দু
মানুষের ভেতর দেওয়া নেওয়া অনেক কাল হয়নি। সেই দুজনের একজন হলেনই বা
একজনের সেক্রেটারি। এ বাড়িতে এতদিন যা হয়ে এসেছে—তা হল--সুভাষচন্দ্র
যাবেন। কখনও মান্দালয়ে কখনও বা মাদ্রাজের কাছে সিওই জেলে বা আরও দূরে।
গিয়ে তাঁর শরীর খারাপ হবে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু মু
পর সুভাষের স্বদেশে থাকা চলবে না। তাঁকে পাড়ি দিতে হবে ইউরোপে। সেখান
দেশে ফেরা মাত্র আবার তিনি অ্যারেস্ট হবেন। এভাবে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকা বাব
দেখতে এসেছিলেন তিনি তিন বছর আগে। তখন তাঁর দেশে ফেরায় ব্রিটিশ সরকার নি
জারি করেছিল। ফেরা মাত্র ফের তিনি গ্রেফতার হন। বাবার মৃত্যুর সময় তাঁকে সেখ

যেতে দেওয়া হয়নি। তখন জওহরলাল জেলে। জেল থেকেই তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে এজন্যে সারা দেশে সুভাষ দিবস পালনের ডাক দিয়েছিলেন।

সুভাষকে নিয়ে গত দশটি বছর ধরে ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেকটা এইরকম। গ্রেফতার। জেলে শরীর খারাপ। মুক্তি। জাহাজে সুভাষকে ইউরোপের জন্যে তুলে দেওয়া। কিছুদিন বাদে নিষেধ না শুনে সুভাষের দেশে ফেরা। আবার গ্রেফতার। জেলে থাকতে থাকতে সুভাষের শরীর এতটাই খারাপ হল যে—এ বছরই ১৭ই মার্চ সুভাষকে একদম বিনা শর্তে ব্রিটিশ সরকার মুক্তি দিয়েছে। তারপর থেকেই যেন হাওয়া ঘুরে গেছে। এ বাড়িতে এখন হাসিঠাট্টা হয়। অনেকদিন পর সুভাষ প্রায় সাত আট মাস হল আর গ্রেফতার হননি। বড় কাণ্ডের ভেতর এ বাড়িতেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসছে: আর সুভাষচন্দ্র আগামী বছরের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি হচ্ছেন। এ বড় সুখের সময়। এমন সময় কখনও আসেনি এ বাড়িতে।

বিকেলে তেতলায় প্রার্থনা সভায় গেলেন গান্ধীজি। কিন্তু প্রার্থনার পর দোতলায় নেমে আসার সময় গান্ধীজির হার্ট অ্যাটাক হল।

শীতের দুপুরের ভৈরব—শীতের রূপসা নদী সারাদিন রুপোর পাতের মতো পড়ে থেকে রোদ খায়। দুই নদী এক জায়গায় ছুঁয়ে গিয়ে ভৈরব চলে গেছে তেরখেদার দিকে। ওই পথে ঢাকা, বরিশাল, চাঁদপুরের স্টিমার পাড়ি দেয়। আর রূপসা খুলনা শহরের কিনারা ধরে ধরে শ্মশান, দেশলাই কারখানা, স্টিমার মেরামতির শেডের গা দিয়ে সিপসায় গিয়ে পড়েছে। সিপসা বঙ্গোপসাগরে।

শ্মশান, দেশলাই কারখানার দিকটা বড় নির্জন। দিনের বেলার চিতার আগুন রোদের ভেতর চোখে পড়ে না। বিরাট খোলা আকাশের নীচে দেশলাই কারখানার লোক- জনের কথাবার্তার আওয়াজের চেয়ে এদিকটায় চিলের চিৎকারই বেশি কানে আসে।

আলো নেই

ফেরদৌস এই ঘণ্টাখানেকের ভেতর আকাশ থেকে চিলদের কেমন কান্না কান্না ডাক অন্তত সাত আটবার শুনতে পেয়েছে।

এখন ভাটার শুরু : নদীর জল ডাঙা থেকে বেশ অনেকটা দূরে। ফেরদৌস দেখল, পানুদা তাকে ছাড়িয়ে হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়াও। দাঁড়াও পানুদা—

ছুটে আয়—বলতে বলতে পানু হাঁটার বেগ আরও বাড়িয়ে দিল। বিরাট বিরাট তিনখানা নৌকো নদীর চড়ায় উল্টো করে খোলের বাইরে ক'জনায় মিলে কী লাগাচ্ছে। এক এক নৌকোর পিঠে দুজন-তিনজন লোক। খালি গা। লুঙ্গি। একজন হাতে মালসায় কী ধরে আছে। আরেকজন সেই মালসায় পোঁচড়া মতো ডুবিয়েই তুলে নিয়ে নৌকোর উল্টো পিঠে লাগিয়ে চলেছে। সেখানে দুপুরের রোদের আলো পড়ে চিক চিক করে উঠল।

ফেরদৌসকে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল পানু। সে ফেরদৌসের চেয়ে মাথায় কিছু লম্বা। দুজনে মিলে ওদের কাজ দেখতে লাগল।

নৌকোর পেছনে যতদূর দেখা যায় নদীর সাদা বুক। মাছের আশায় আশায় কিছু মাছখোর পাখি জলের ওপর দিয়ে একদম ঘুড়ি হয়ে ভাসছে। মাঝে মাঝে এক একটা পাখি ঝুপ করে জলে পড়ে গিয়েই ঠোঁটে মাছ ধরে ফের ওপরে ভেসে উঠছে। পানু দেখল—এই সব পাখির উড়ে ডাঙায় ফিরে যাওয়ার কী এক আহ্লাদ!

দ্যাখো কী? অ্যাঁ?—পোঁচড়া হাতে খালি গা একজন ফেরদৌসদের দিকে না তাকিয়েই জানতে চাইল।

কী মাখাচ্ছো?

কী আর মাখাবো। এক দফা আলকাতরা। শুকনো হলি তারপর এক দফা এই গাবের আঠা।

আশেপাশে কোনও মানুষ নেই আর। জল ভাঙার শব্দ শুধু। আর নদীর চড়ায় ওল্টানো তিনখানা নৌকো ঘিরে কিছু লোক মাত্র।

এই আঠা দিয়ে পানি আটকানো যায়? ফেরদৌসের একথায় কেউ জবাব দিল না।

পানু বলল, আলকাতরার ওপর মাখাচ্ছে তো। জল ঢুকবে কী করে—

তবু নৌকোর কেউ কোনও কথা বলল না। তারা যে যার কাজ করে যাচ্ছে।

ফেরদৌস অবাক হয়ে পানুকে বলল, এ সব নৌকো নিশ্চয় দূরে দূরে যায় পানুদা

তা তো যায়ই।

অনেক মালপত্তর নিয়ে যায়?

তা তো যাবেই।

ভাবো তো পানুদা—নোনা পানির ঘষায় যদি আলকাতারা—গাবের আঠা ক্ষয়ে যায়—কাঠের জোড় দিয়ে মাঝনদীতে যদি পানি ঢুকে যায়।

দাড়িওয়ালা, শক্তসমর্থ খালি গা একজন হাতের পোঁচড়া থামিয়ে বলল, বাবারা এট্টু

দ্যাখেন তো—ও পাশের টিনে আলকাতরা ফোটলো কিনা ?

পানু বা ফেরদৌস এতক্ষণ আলকাতরার টিন দেখতে পায়নি । কিন্তু নদীর বাতাসে আলকাতরার গন্ধ। আশেপাশেই কোথাও ফুটছে। অনেকটা জায়গা নিয়ে এক একখানা নৌকো ওল্টানো। দুখানা পেরিয়ে তবে দেখা গেল—বড় বড় টিনে পরপর পাঁচ জায়গায় কাঠের আগুনে আলকাতরা বসানো। টিনের ভেতর থেকে ভুগ্ ভুগ্ আওয়াজ।

খানিক বাদে দেখা গেল—পানু আর ফেরদৌস যেন এই নৌকোওয়ালাদেরই লোক হয়ে গেছে। দুজনে লম্বা বাঁশের ডাণ্ডায় গরম গরম আলকাতরার টিন খুব সাবধানে ঝুলিয়ে বয়ে এনে এগিয়ে দিচ্ছে এক এক নৌকোর কাছাকাছি।

কোনও নৌকোয় আধখানা আলকাতরার কাজ বাকি। কোনও নৌকোয় আধখানা গাবের আঠা মাখানো বাকি। পৃথিবী থেকে বহুদূরে যেন সারাজীবন ধরে ফেরদৌস আর পানু এই নৌকো মেরামতির কাজ করে আসছে।

এক বুড়ো মিস্ত্রি মুখের ভেতর দাঁত কম—ফোকলা হাসি হেসে বলল, বাবারা—এবার আপনারা আমাদের সঙ্গে দুটো ভাত খেয়ে ন্যান—

পানু বা ফেরদৌস কোনও কথা বলল না।

আরেকজন হাতের পোঁচড়া মালসায় ডুবিয়ে রেখে নৌকোর খোল থেকে চড়ায় নেমে পড়ল। কখন ভাত খাওয়া হল আপনাগো ?

পানু বলল, সকালে ফেনাভাত খেয়ে বেরিয়েছি। ফেরদৌস বলল, আমি গুড় দিয়ে চিতোই পিঠে খেয়েছি সকালে।

একে একে সবাই নৌকো থেকে নেমে পড়ছে। একেবারে শেষের নৌকোর পেছন থেকে একজন কাঠের ডালের কাঁটা হাতে এগিয়ে এসে বলল, এখন কত বেলা খেয়াল আছে বাবারা ? আপনারা আমাগো সঙ্গে দুটো খাইয়ে ন্যান—

পানুর এবার খেয়াল হল—এখানে তো ঘড়ি নেই। ক'টা বাজে তাও বোঝা যায় না এখানে। সে জানতে চাইল, ক'টা বাজে ?

একজন মাটির সানকিতে গরম ভাত ঢালতে লাগল। আলাদা আলাদা করে। তার মানে একেবারে শেষের নৌকোর পেছনে এতক্ষণ ভাত হচ্ছিল। পোড়া মাটির লাল সানকিতে ধোঁয়া ওঠা সাদা গরম ভাত। পানু-ফেরদৌস দুজনই যেন টের পেল—তাদের খিদে পেয়েছে—আলাদা আলাদা করে।

আরেকজন কাঠের হাতায় গরম গরম ডাল ভাতের ওপর দিয়ে বলল, অনেক বাজে বাবারা। দুটো তিনটে হবে—আপনারা খেতি বসেন।

তোমরা বসবে না ?

এই বসলাম বলে—

সেই ফোকলা মেরামতি মিস্ত্রি ভাত ভেঙে বলল, আপনাদের কী করা হয় ? পড়েন ?

ফেরদৌস বলল, অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ।

কোন কেলাস সেইটে বলেন দিনি ।

ফেবদৌস বলল, আমি নাইনে উঠব। পানুদা টেনে।

একজন একখানা বড টাটকা ফ্যাশা মাছ ভাজা ফেবদৌসেব ভাতে দিয়ে হো হো কবে হেসে উঠল। এইট, নাইন, টেন সব সমান আমাদেব।

একটু জল দাও ভাই—হাত ধোবো

যে মাছ দিচ্ছিল পানুব এ কথায় সে চমকে উঠলো। বাবা আপনি তো হিঁদু। আমাদেব ভাত খাবেন ? আমবা মোসলমান।

ফেবদৌস হেসে উঠল। দাও তো পানুদাব আমাদেব বাড়ি ঈদেব ফালুদা খায়।

কিছুক্ষণেব ভেতব দেখা গেল সাত-আটজন মেবামতি মিস্ত্রি, মাঝি-মাল্লাব সঙ্গে পানু ওবফে সত্যবান ঘোষাল আব ফেবদৌস বহমান দিব্যি খাচ্ছে। ওবা দুজন কখনও এমন আকাশেব নীচে বসে ভাত খাযনি। পৃথিবীতে জানাব কত কী আছে—তা ওবা মিস্ত্রি মাল্লাদেব প্রায় কথাতেই জানতে পাবছে। এবকম একটা দিন যে তাদেব জীবনে আসবে তা গতকালও পানু বা ফেবদৌস জানত না।

অ্যানুযাল পবীক্ষা শেষ। এক একদিন ওবা এক একদিকে বেবিযে পড়ে। যেন ন নতুন নতুন জাযগা খুঁজে পায। বেনেখামাবেব শেষে একবাব ধানখেত ভেঙে দুজনে অনেকদূবে একটা নদীব পাড়ে গিয়ে পড়েছিল একবাব। চব জায়গা। সেখানে মাটি নবম জোযাবে গোডালি ডুবে যায। ভাটায ডাঙা জাগে। সেখানে সুন্দববনেব ওদিককাব অভাবি মানুষেব খাবাব নিযে—সামান্য মাছ নিয়ে কামড়াকামড়ি, দুঃখ দেখে পানু আব ফেবদৌস কেঁদে ফেলেছিল। ফেবাব পথে কালা ফোতোব সঙ্গে দেখা হলে ওবা দুভাই কাঁদতে থাকে। পানু আব ফেবদৌসেব বুকে, গাযে হাত বুলিযে দিয়েছিল। এই তো সেদিন

ফেবদৌস দেখল, আজ কত কী জানা যাচ্ছে। রূপসাব বুক কতটা গভীব বাগে বডনদী দিযে যাবাব সময তীব ঘেঁষে যেন নৌকো এগোয। হাওযা বুঝে বোঝাই নৌকোয কখন পাল তুলে দেওযা হয।

কোন কাঠে নৌকো বানায ?

প্রশ্নেব আব শেষ নেই দুজনেব। পানু একসময জানতে চাইল, মাঝনদীতে নৌকোব খোলে জল ঢুকে যায ?

তা যায। বাবাব আপনাবা আগে ভাত খান। ঠাণ্ডা কবে ফেললেন যে ভাত।

জল ঢুকলে কী কব তোমবা ?

ফোকলা মিস্ত্রি হেসে ফেলল ছেঁচে ফেলি। হাতে হাতে ছেঁচে ফেলি

ফেবদৌস বলল, যদি ভুস ভুস কবে জল ঢুকতে থাকে ?

তা কি আব ঢোকে। তাহলি কিসেব মিস্তিবি হলাম গিযে ?

তবু যেন জবাবেব শেষটা ফেবদৌস বা পানুকে খুশি কবতে পাবে না। আবও কত যে জানাব আছে। কিন্তু মাঝিমাল্লাবা নদীব পোকা হযেও সবটা কেন জানি বলে না—জানায

না—তাই মনে হচ্ছে দুজনের।

কোত্থেকে কটা কাক এসে গুরুগম্ভীর চালে জায়গা বদলে বদলে বসছে। হাঁক দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিতে দিতে ফোকলা মিস্ত্রি জানতে চাইল, ঠিক করে বলেন তো বাবারা—গান্ধী মহারাজের নাকি শরীলডা ভাল নেই।

যে ভাত দিচ্ছিল—সে সবার শেষে খেতে বসেছে। ভাত মুখে দিয়ে সে বলল, শরীলের আর দোষ কী! অত উপোস দে পড়ে থাকলি শরীলডা তো খারাপ হবেই।

ফোকলা মিস্ত্রি তাকে ধমকে উঠল। চুপ যা। —তারপর পানুর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা বাবার তো শহরে থাকেন। কিছু শুনিছেন?

পানু তেমন কিছু শোনেনি। সে শুধু জানে গান্ধীজি এই ভারতবর্ষে থাকেন। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যান। কোনও সময় একই জায়গায় থাকেন না তিনি। ট্রেনে থার্ড ক্লাসে যাতায়াত করেন। তাঁকে নিয়ে রাস্তায় লোকে তর্ক করে। পানু জানতে চাইল, তোমরা কোথায় শুনলে?

দেখেন বাপরা—নৌকোয় অনেক জায়গায় যাই। সারাটা শীতকাল মেরামতির কাজ ধরি। ক্যানিং, হাসনাবাদ, বসিরহাট, মাগুরার চুনের নৌকোয় নানা দেশের লোক যাতায়াত করে। তাদের মুখি শোনলাম—গান্ধী মহারাজ এবার বিশেষ কাবু হযি পড়িছেন।

ফেরদৌস মালসায় রাখা জলে হাত ধুতে ধুতে নিজেকেই বলল, শরীরের আর দোষ কী! মাছ মাংস ছোঁবেন না। কায়েদে আজমকে দ্যাখো। খেযেদেয়ে তিনি খারাপ হতে দেন না কিছুতেই।

এখন কলকাতায় শীতের বিকেল ঠিক একরকম। এক নম্বর উডবার্ন পার্কের বাড়ির দোতলায় ডানদিকের ঘরে আজ তিন সপ্তাহের ওপর গান্ধীজি শুয়ে আছেন। ঘরের ভেতর দিযে তাড়াতাড়ি হেঁটে একদম ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্র বসু। ধুতি পাঞ্জাবি। মাথার চুল খানিক পিছিয়ে। কপাল আগের চেয়ে কিছু বড়। তিনি নীচে রাস্তায় জড়ো হওয়া মানুষের ভিড়ে তাকালেন। তারপর দু হাত জোড় মতো করে বলতে থাকলেন, আপনারা ভিড় করবেন না দয়া করে। ভিড় করবেন না। কোনও বন্দেমাতরম নয় এখন। দয়া করে বাড়ি চলে যান সবাই—

তবু পাবলিকের নড়ার নাম নেই।

মহাত্মাজির শরীর ভাল নেই। আপনারা ভিড় করে বন্দেমাতরম দিলে ওঁর ঘুম ভেঙে যাবে—দয়া করে আপনারা শব্দ না করে চলে যান।

একজন দাঁড়িয়ে পড়ে ভিড় থেকে জানতে চাইল, গান্ধীজির কী হয়েছে?

সুভাষচন্দ্র বললেন, চিন্তার কিছু নেই। ডাক্তাররা দেখেছেন।

আরেকজন ওপরদিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, এখন মহাত্মাজি কেমন আছেন?

সুভাষচন্দ্র ঝুলবারান্দায় থেকে ঝুঁকে বললেন, এখন ভালর দিকে। সেরে উঠছেন আস্তে আস্তে—

দোতলার ঘরের বাইরে যেখানটায় কয়েকদিন আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসেছে—সেখানে দশ বারোজনের ভিড়ের ভেতর সবার ওপরে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের কালো মাথা। তার পাশে দাঁড়িয়ে জওহরলাল নেহরু। ধুতির ওপর পাঞ্জাবি। গায়ে চাদর। সারোজিনী নাইডু। শরৎচন্দ্র বসু। তাঁর পাশে তার ভাই সুনীল চন্দ্র বসু দাঁড়িয়ে। তিনিও ডাক্তার। কার্ডিওলজিস্ট। এর ভেতর ঘনশ্যামদাস বিড়লাও রয়েছেন। তিনিও চল্লিশ পেরিয়েছেন। বেশ চিন্তিত মুখে ঘনশ্যামদাস বললেন, মহাত্মাজিকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাই ? কী বলেন বিধানবাবু ?

ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় ডক্টর সুনীলচন্দ্র বসুর মুখে তাকলেন। কী সুনীলবাবু। আপনি কী মনে করেন ? সবাই এবার সুনীলচন্দ্রের মুখে তাকালেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বড়। শরৎচন্দ্র বসুর চেয়ে ছোট। তাঁরও মাথার চুল কপাল থেকে খানিক পিছিয়ে। কী ভাবলেন তিনি এক পলক। তারপর বললেন, আমি তো মনে করি—মহাত্মাজিকে এখন এখান থেকে নড়াচড়া করানো ঠিক হবে না।

ডক্টর বিধানচন্দ্রের ডান হাতে স্টেথো। সেটিসুদ্ধ লম্বা শার্টের ঝুলপকেটে হাত গুঁজে দিয়ে তিনি বললেন, আমিও তাই মনে করি।

জওহরলাল নেহরুর পায়ে জুতো স্ট্র্যাপ বাঁধা। গায়ের মোরাদাবাদি চাদরখানি পিঠের দিক থেকে ডান বুকের ওপর। তিনি অল্প একটু এগিয়ে ঘরের ভেতরে তাকালেন। বাপু ডান হাতখানি কপালের ওপর ফেলে চোখে ঢাকা দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে না—চোখ খোলা কিনা। পরনের ধুতির খুঁট টেনে তিনি বুকের কাছে নিয়েছেন। জওহরলাল দেখলেন, সুভাষচন্দ্র ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে। সেক্রেটারি মহাদেব দেশাইয়ের কানের কাছ মুখ নিয়ে সুভাষ যেন কী বলল।

মহাদেব দেশাই পাতলা গরম চাদরখানি পায়ের কাছ থেকে টেনে গান্ধীজির কোমর অব্দি ঢেকে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাপু সেই চাদর বাঁ হাত দিয়ে হাঁটুর কাছে নামিয়ে দিলেন।

এখনও সেভাবে শীত পড়েনি কলকাতায়। শরৎবাবুর সেক্রেটারি নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর অফিসঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে দক্ষিণের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অফিসঘরে তাঁর চেয়ার আর টেলিফোনটি একজন বিদেশি রিপোর্টার অনেকক্ষণ হল দখল করে আছেন। তিনি টেলিফোনে ইংরেজিতে কথা বলছেন। রয়টারের করেসপনডেন্ট।

নীরদবাবু বাইরে বেরোবার সিঁড়ি থেকে একটু সরে দাঁড়ালেন। সন্ধে হয় হয়। আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বারান্দা পেরোলেন বিধানচন্দ্র রায়। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন ঘনশ্যামদাস বিড়লা। একেবারে পেছনে শরৎবাবু। তিনি সবাইকে দরজা অব্দি এগিয়ে দিচ্ছেন।

হঠাৎ নীরদচন্দ্র টের পেলেন—কে যেন পেছন থেকে তাঁকে টান দিলেন। চমকে ফিরে তাকিয়ে নীরদচন্দ্র অবাক। সরোজিনী নাইডু। কেন পেছন থেকে টান লাগল তা এবার বুঝতে পারলেন শরৎবাবুর সেক্রেটারি। সরোজিনী নাইডু তাঁর পাঞ্জাবির ঝুলের দিকটা হাত

দিয়ে ধরে আছেন।

নীরদচন্দ্র কিছুই বলতে পারছেন না। অবাকই হয়েছেন। মহিলা জওহরলালদের চেয়ে বছর দশেকের বড়ই হবেন। গান্ধীজির চেয়ে বছর দশেকের ছোট। বিধানচন্দ্র সরোজিনী কাছাকাছি বয়সের মানুষ। তিনি তাঁর পাঞ্জাবির খুঁটটি ধরে আছেন।

সরোজিনী নাইডু জানতে চাইলেন, ভাগলপুরি সিল্ক ?

থতমত খেয়ে গেলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। সারা ভারতবর্ষ এই মহিলার নাম জানে। ওয়ার্কিং কমিটির মেমবার। ইংরেজিতে কবিতা লেখেন। লবণ সত্যাগ্রহে জেলে গেছেন। চমৎকার কথা বলেন। নীরদবাবু কোনওমতে বলতে পারলেন ,হ্যাঁ।

আমি হাত দিয়েই বুঝতে পেরেছি।

নীরদচন্দ্র ইতিহাস কাব্য উপন্যাস দর্শন পড়া মানুষ। সকাল হলে তিনি এবাড়ি চলে আসেন। ক'দিন হল দুপুরে তাঁর বাড়ি ফেরা হচ্ছে না। কারণ, একটানা ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক চলেছে। তারপরেই তিন সপ্তাহ হল হার্ট অ্যাটাক হয়ে গান্ধীজি এবাড়ির দোতলায় শুয়ে। সারা ভারতবর্ষ এখন সেই বাড়িটির দিকে তাকিয়ে। সাধারণ ভারতবাসী তো বটেই—ভারতের ইংরেজ গভর্নর জেনারেলও এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন। এত কাণ্ডের ভেতর আমার গায়ের পাঞ্জাবির কাপড় নিয়ে সরোজিনী নাইডু কথা বলছেন ! একথা বাইরে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। নীরদচন্দ্র ঠিক করলেন, গান্ধীজি সুস্থ হয়ে উঠলে কাজের চাপ কমবে। তখন একটা ছুটির দিন দেখে প্যারাডাইস লজে যেতে হবে। বিভূতিবাবু ঔপন্যাসিক। সব শুনে তিনি নিশ্চয় এর একটা মানে বলতে পারবেন। লেখক হিসেবে সরোজিনী নাইডুর মতো চরিত্রের মালমশলা নিশ্চয় বিভূতি বাঁড়ুজ্যেকে হন্ট করবে।

শীতের সন্ধেটা গাঢ় হয়ে উঠলে রবীন্দ্রনাথ এলেন। বলা যায় একদম আচমকাই এলেন। কোনওরকম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই। মাঝারি মাপের অন্য কেউ এভাবে কোনও রকম অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে এলে—শরৎবাবুর কথা মতো—নীরদচন্দ্র বিনীতভাবে তাঁকে জানাতেন—মিস্টার গান্ধী ইজ ইনডিসপোজড়। আপনি যে তাও খোঁজ নিতে এসেছেন তা জানলে গান্ধীজি খুশি হবেন। বিশ্রাম নিয়ে উঠে বসলে তাঁকে আপনার কথা আমরা জানাব।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ? তিনি আসতেই পারেন। কে তাঁকে ওইসব ইংরেজি কথা বলে দরজা থেকে ফিরিয়ে দেবে ! তিনি এলে চাই কি রোগী গান্ধীজি আরও তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথকে দেখে খুবই কষ্ট হয় নীরদচন্দ্রর। আগে যতবারই তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন—ততবারই তাঁকে তাঁর সিধে খাড়াই মানুষ মনে হয়েছে। কিন্তু এ কী হয়েছে কবির ?

লম্বা আলখাল্লার নীচে রবীন্দ্রনাথের পা দেখতে পেলেন না নীরদবাব। অতখানি লম্বা মানুষটি যেন কোমর থেকে আধখানা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। সেই সিধে হয়ে হেঁটে যাওয়ার তেজটুকু পর্যন্ত নেই। গান্ধীজির শরীর খারাপ হওয়ার পর থেকে এ বাড়িতে

সবাই চাপা গলায় কথা বলেন এখন। কোনও হইচই নেই। জোরে কোনও কথা শোনা যায় না।

চেনা বাড়ির মতোই রবীন্দ্রনাথ সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে এলেন। তাঁর পাশে অনিল চন্দ। দেখেই চিনতে পেরেছেন নীরদবাবু। একবার সজনীকান্ত কবিকে নিয়ে সাহিত্যের দলাদলির ওপর শনিবারের চিঠিতে কী লিখেছিল। শান্তিনিকেতন থেকে অনিলবাবুর চিঠি এসেছিল মোহনবাগান রো-এ শনিবারের চিঠি অফিসে—সজনীর নামে। চিঠির শেষে অনিলবাবুর সই। কবি সজনীকান্তর লেখাটি পড়তে চেয়েছিলেন।

শরৎবাবু একতলায় জওহরলালের ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। নীরদবাবুর মুখে খবর পেয়ে দুজনেই ছুটে এলেন। কবি ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ল্যান্ডিংযে উঠে পড়েছেন। তাঁর পাশে অনিল চন্দ। পেছনে শরৎবাবু আর জওহরলাল। সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় এখন দোতলায়।

নীরদবাবুর একটা কথা ভেবে খুবই কষ্ট হল ভেতরে ভেতরে। গান্ধীজি একজন আউট অ্যান্ড আউট পলিটিকাল লিডার। সাধারণ মানুষ থেকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী সবাই তাঁর নাম জানে। দেশবিদেশের মানুষ তাঁর নাম শুনেছে। কিন্তু সেই তুলনায় রবীন্দ্রনাথ তো অতটা পরিচিত নাম নয়। কিন্তু তাঁর চিন্তাভবনা এখনও অনেকদিন মানুষের মগজে কাজ করবে। বিশেষ করে আমরা ভারতবাসীর তাঁকে সেই কবে বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে দেশের কাজে—চিন্তার জগতে সঠিক রাস্তার দিগ্‌দর্শন যন্ত্র হিসেবে পেয়ে আসছি। তিনি স্পষ্টাস্পষ্টি গান্ধীজির চরকার রাজনীতি বাতিল করে দিয়েছিন। আর গান্ধীজি মনে করেন—ভবিষ্যতের ভারত —ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারত নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবে গাঁয়ে গাঁয়ে কুটির শিল্পের জোরে। আর সেই কুটিরশিল্পের কেন্দ্রে থাকবে আজকের এই চরকা।

ব্যাপারটা সুভাষচন্দ্র এক কথায় বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি আর জওহরলাল নেহরু স্বাধীন ভারতের বড় হয়ে ওঠার মূলে বড় বড় কলকারখানা বসানোর স্বপ্ন দেখেন। এইসব নিয়ে কংগ্রেস ছোট ছোট বইও বের করেছে।

রবীন্দ্রনাথকে নীরদচন্দ্রের অনেক আধুনিক লাগে। এসব কথা ভেবেই নীবদবাবুর খুব কষ্ট হল। বয়সে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির চেয়ে পাক্কা আটটি বছরের বড়। সেই রবীন্দ্রনাথকে এই ছিয়াত্তর বছর বয়সে গান্ধীজিকে দেখতে আসতে হল। আমাদের দেশে পলিটিক্যাল লিডার চিন্তাভাবনার জগতের মানুয—বয়সে, চিন্তাভাবনায় যত বড়ই হোন— তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট রাজনৈতিক নেতা অসুস্থ বলে তাঁকে দেখতে আসতে হয় তাঁব! এটাই এদেশের রীতি।

বারান্দা, সিঁড়িঘর, চাতাল, এমনি ঘর—যেখানে যত ঘড়ি ছিল—তারা সবাই মিলে একসঙ্গে বেজে উঠে রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানাল। গান্ধীজির ঘরে নিভু নিভু আলোয একটা ডুম জ্বলছিল। রবীন্দ্রনাথ গিযে দাঁড়াতেই সুভাষচন্দ্র একখানি বেতের চেয়ার গান্ধীজির পালঙ্কের পাশে রাখলেন। তিনি যেন কাছাকাছি ছিলেন। মহাদেব দেশাই তাঁর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে।

গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়েই সেই অদ্ভুত শান্ত দুটি চোখের আলো ফেলে প্রায় ফিস ফিস করে বললেন, গুরুদেব—। আর কোনও কথা এল না গান্ধীজির মুখে। খোলা চোখের দুটিতেই দুটি জলের বিন্দু এসে দাঁড়াল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, এখন কোনও কথা বলবেন না মহত্মাজি। আপনি শিগগির ভাল হয়ে উঠুন।

ঘরের ভেতর বিভিন্ন কোণ থেকে এখন বিভিন্ন রকমের মুখ দেখা যাচ্ছে। চিন্তিত হয়ে পড়লে জওহরলাল যেন ভেতর ভেতর টগবগ করে ফুটতে থাকেন। সুভাষচন্দ্রের মুখখানি—ইংরাজি উপন্যাস পড়া নীরদবাবুর মনে হল—ইংরেজিতে যাকে বলে রীতিমতো চবি—যাকে বলে ভার ভার —গোল গোল। শরৎবাবুর বাড়িতেই গান্ধীজির হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। গান্ধীজিকে নিজেদের বাড়িতে রাখতে পেরে যতটাই গর্বিত হয়েছিলেন বোস ব্রাদার্স—এখন ততটাই তাঁরা চিন্তিত—গান্ধীজি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন—এই তাঁরা চাইছেন। এ বাড়ির খুঁত ধরতে তৈরি হয়ে আছেন ঘনশ্যাম দাস বিড়লার মতো মানুষ। তার পোঁ ধরতে রেডি খোদ গান্ধীজির ছেলে দেবদাস। সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই।

খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই ঘরে। ডান হাতটি নিজের চোখের ওপর কপালে ফেলে রেখেছেন গান্ধীজি। ঘরের নিভু আলোয় এখন যেখানে কোনও খোঁচা নেই। সবকিছুই নরম আর স্মুদ।

নীরদবাবু দেখলেন, নিস্তব্ধ ঘরের চেয়েও স্তব্ধ হয়ে ববীন্দ্রনাথ বসে আছেন। একসময় গান্ধীজি তাঁর সেক্রেটারি মহাদেব দেশাইকে চোখের ইশারায় কাছে ডাকলেন। মহাদেব দেশাই গান্ধীজির কাছে গিয়ে নিজের মাথা নিচু করে কানটি গান্ধীজির ঠোঁটের কাছে রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপর টেবিলে রাখা কাগজে কয়েকটি কথা লিখে রবীন্দ্রনাথের চোখের নীচে ধরলেন মহাদেব। রবীন্দ্রনাথ ঠিক পড়ে উঠতে পারলেন না। তখন অনিল চন্দ তাঁর নিজের পকেট থেকে কবির চশমা বের করে কবির হাতে দিলেন। চশমা চোখে লাগিয়ে কাগজের লেখা পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের মুখখানি গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিছুই লিখলেন না। শেষে আস্তে আস্তে ইংরাজিতে বলতে শুরু করলেন, মহাত্মাজি—বন্দেমাতরম গানটির প্রথম চারটি লাইন রেখে বাকিটা বাদ দিতে পরামর্শ দিয়েছি—জওহরলাল জানেন সব কথা।

গান্ধীজি অস্ফুটে জানতে চাইলেন, প্রথম চারটি লাইনে ওদের কি আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে গুরুদেব— ?

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল গান্ধীজির। তিনি থেমে থেমে প্রায় ফিস ফিস করে কথাগুলো বললেন।

রবীন্দ্রনাথের চোখ স্থির হয়ে আছে। তিনিও থেমে থেমে বললেন,প্রথম চারটি লাইনকে দুর্গার বন্দনা হিসেবে না দেখে দেশমাতৃকার বন্দনা হিসেবে নেওয়া চলে। ওই চারটি লাইন জাতীয় সঙ্গীতের মর্যদা পেতে পারে।

খানিকক্ষণ আবার সারা ঘর স্তব্ধ। সেই নির্জনতা ভাঙলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সব কথাই হচ্ছিল ইংরেজিতে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সংখ্যালঘুকে কনসেশনের পর কনসেশনের দিতে দিতে এক সময় দেখা যাবে—এর কোনও শেষ নেই মহাত্মাজি। আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম—দেখা যাবে—আমরা সেখানেই পড়ে আছি।

গান্ধীজি কোনও কথাও বলতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ আলগোছে মহাত্মা গান্ধীর বুকে হাত রাখলেন। কিছুক্ষণ হাতখানি রেখে তুলে নিয়ে কবি ঘরের চারদিকে তাকালেন। সুভাষচন্দ্রের মুখখানি তাঁর চোখে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ চেনার ভাবটা সামান্য ফুটিয়ে তুললেন। এবার তার নিজের বাঁ দিকে চোখ গেল। দেখলেন, অনিল চন্দ আর শরৎ বসুর মাঝখানটিতে জওহরলাল দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখে কোনও হাসি নেই।

রবীন্দ্রনাথের যেন আরও কিছু কথা বলার ছিল। কিন্তু এখন সে সময় নয়। তিনি উঠতে যাবেন। দেখলেন, মহাত্মাজি চোখের ওপরের ডান হাতখানি নামিয়ে রবীন্দ্রনাথেব হাতখানি খুঁজছেন।

রবীন্দ্রনাথের ওঠা হল না। তিনি মহাত্মাজির হাতখানি এবার নিজের দু হাতের ভেতব নিলেন। দুজনের ভেতর কোনও কথা নেই। একদম চুপচাপ। ঘর থেকে একে একে সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল, মহাদেব দেশাই, শরৎচন্দ্র—সবাই বেরিয়ে এলেন। সবচেয়ে শেযে বেরিয়ে এল মহাত্মাজির সবসময়কার সেই তিন অনুচর। যাদের মুখে কোনও সময়েই কোনও হাসি নেই। ওরা কখনই কারও মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় না। নীরদচন্দ্র সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন—অনুচর তিনজন একতলায় নেমে যাচ্ছে।

নীরদচন্দ্র বুঝতে পারলেন, এই তিন অনুচর কখনও রবীন্দ্রনাথের মতো আজিব কোনও লোককে দেখেনি। বিশেষত মহাত্মাজির কাছে এমন অদ্ভুত লোক কখনও আসেন না। যিনি এলে খুব আগ্রহভরে মহাত্মাজিও তাঁর হাতখানি নিজের হাত দিয়ে ছুঁতে চান। ছুঁয়ে থাকতে চান।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী দেখলেন, ঘরের বাইরে সবাই কেউ কারও সঙ্গে একটিও কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। শরৎবাবু। সুভাষচন্দ্র। জওহরলাল। মহাদেব দেশাই। কারও মুখে কোনও কথা নেই। বাইরে শীতের সন্ধে রাত। উলটোদিকে চারতলা ফ্ল্যাটবাড়িতে ইংরাজি বাজনা বাজছে।

নীরদবাবুর মনে হচ্ছিল—আপত্তির জন্য বন্দেমাতরম গানটির প্রায় সবটাই বাদ দিতে হল। ও যেন একটি জ্যান্ত প্রাণীকে ধরে গলা কেটে দেওয়া। কতকাল ধরে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের এই গান ন্যাশনাল মুভমেন্টে গেয়ে এসেছে মানুষ। এই গান গেযে কত মানুষ জেলে গেছেন। অথচ অল্প দিন আগে ময়দানে মনুমেন্টের নীচে একদল লোক বঙ্কিমচন্দ্রেব আনন্দমঠ উপন্যাসের অনেক কপি একসঙ্গে করে তাতে আগুন দিয়েছে।

বেশ কিছুদিন ধরে বন্দেমাতরম গানটি নিয়ে তর্ক চলছে। ভাবখানা—যত নষ্টের গোড়া বঙ্কিমচন্দ্রের এই বন্দেমাতরম গানটি। এই গানটির জন্যেই অনেকে স্বাধীনতা

আন্দোলনে যোগ দিতে পারছেন না।

এ সব কথা নিয়ে ট্রামে বাসেও তর্ক হয়। নীরদবাবুর কানে এসেছে। তিনি খুব ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুটি ট্রাম বদলে তবে এলগিন রোডের মোড়ে এসে নামেন। বাকি রাস্তা হেঁটে তবে শরৎবাবুর বাড়ি। একদিন ট্রামে তিনি এক মাঝবয়সী লোককে বলতে শুনেছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকলে লেজকাটা বন্দেমাতরম গান শুনে খুব কষ্ট পেতেন।

বন্দেমাতরম গানটি প্রায় পঞ্চাশ বছরের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সারা দেশের হাটে মাঠে ঘাটে মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে--ফিরছে—নীরদচন্দ্রর বিশ্বাস আরও পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষ এ-গান গাইবে। স্লোগান দেবে—বন্দেমাতরম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নীরদচন্দ্রের নিজের কলেজ জীবনের সময়কার একটা কথা মনে পড়ে গেল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোর ফলোয়ার ছিলেন বিহারের লিয়াকৎ হোসেন। তিনি দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন স্বাধীনতার দাবিতে। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি কারও পেছনে ছিলেন না। তখন ওঁরা বন্দেমাতরম গান নিয়ে কোনও আপত্তিই তোলেননি। বরং হিন্দু মুসলমান সবাই খুব গর্ব করেই এ গান গাইতেন। বন্দেমাতরম স্লোগান দিতেন। সেই লিয়াকৎ হোসেন অনেকদিন জেল খেটে বেরোবার পর একদিন বিকেলে কলেজ স্কোয়ারে কয়েকজন যুবককে দেখে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলেন—বলো শালা! বন্দেমাতরম!

যুবকরাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলেন—বন্দেমাতরম!

শহর খুলনায় এক এক পাড়া এক এক রকম। যেখানেই নতুন বাড়িঘর—সেখানে জমি ছেড়ে—ফুলের বাগান করে লোকজন বসতি করছে। যেমন বেনেখামার, টুটপাড়া এইসব দিক। আর পুরনো বসতিগুলো যেন কিছু ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছে। তাই তো লাগে টুনুর চোখে। সে তার ছোটভাই পানুকে নিয়ে মাঘমাসের সকালে ভৈরবের কালীবাড়ি ঘাটে

এসেছে। হি হি করা ঠাণ্ডা। তার ভেতর দুই ভাই। পানু এখন ক্লাশ টেন। টুনু ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ার। কালীবাড়ি পাড়ার বাড়িগুলো বড্ড গায়ে গায়ে।

রোদ ওঠার আগেই খুব ভোরে পড়তে বসেছিল টুনু। সবে রোদের দু-একটা চৌকো এখানে ওখানে। মাদুর পেতে রাস্তায় দিকাকার বারান্দায় টুনু আসন করে বসে মোটা সুতির চাদর দিয়ে পিঠ পা ঢেকে নিয়েছে। রেটরিকের বইখানি খোলামাত্র পেছন থেকে একটি গলা ভেসে এল। —বড় দাদাবাবু ওঠেন। আমরা রাত থাকতি ঘাটে আইসে ভেড়লাম—

লাটুর এ-গলা বাড়িসুদ্ধ সবার জানা। তবু টুনু জানতে চাইল, বাবা কোথায় ?

তিনি নৌকোর ভিতর ঘুমোচ্ছেন। আপনারা বড় দুই ভাই গেলি উঠে বসবেন।

রত্না এসে বারান্দায় মুখে দাঁড়িয়েছেন। সবাই ভাল আছ তো ?

হ্যাঁ মা। এবার বস্তা, বালতি, ডালা—যা-কিছু আছে সব দিয়ে দাদাবাবুদের কালীবাড়ি ঘাটে পাঠায়ে দ্যান্। আমি এগোই—

লাটু বছর তিরিশেকের মাঝি। ওদের বড় নৌকো ভাড়া নিয়েই ফি বছর অনন্ত ঘোষাল মোরেলগঞ্জে আদায়ে যান।

লাটু কালীবাড়ি ঘাটে ফিরে যাচ্ছিল। রত্না গলা তুলে জানতে চাইলেন, কবে রওনা দিয়েছিলে ?

পরশুদিন ভোররাত্তিরে মা। দাদাবাবুরা গেলি বাবু বাড়ি আসবেন।

তনু ঘুম থেকে উঠেই জেদ ধরল, আমি যাব নদীর ঘাটে—টুনু বড় ভাইয়ের গলায় বলল, না। তুমি যাবে না। ধান, চাল, ডাল এখানে এলে রিকশা থেকে কে নামাবে ? মা পারবে একা ?

এই যুক্তিতে তনু কোনও কথা বলতে পারল না। তাকে একটা দিকের ভার দেওয়ায় সে খুব খুশি হল। বছরের এই সময়টায় সারা বাড়িতে একটা আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। টুনু ওরা শুনেছে—মোরেল নামে এক সাহেবের নাম দিয়ে একটি গঞ্জ গড়ে উঠেছে বড় নদীর গায়ে। সেই রূপসা ছাড়িয়ে সিপসার গায়ে। সেখানে টুনুদের ঠাকুরদা তাঁর শ্বশুরের কাছ থেকে জমি পান। টুনুদের ঠাকুরমাকে বিয়ে করে। এ সব কথা রত্না ওদের বলেছেন। টুনু ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে—মোরেলগঞ্জ থেকে বাবা এই সময় ধান-চাল নিয়ে ফেরেন। ক'দিনের জন্যে কোর্টে ছুটি নিয়ে বাবা বড় নৌকো ভাড়া করে মোরেলগঞ্জ চলে যান। ফেরেন দিন কুড়ি বাইশের মাথায়।

গোটা দশেক বস্তা, দুটি টিন , একটি মাটির কলসি নিয়ে দু ভাই রওনা হল রিকশা করে। যেতে যেতে টুনু দেখল—তাদের মা শোওয়ার বড় ঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘরখানায় ঝাঁটা হাতে ঢুকছে।

শীতের সকালের নদী ! ঘাট থেকে প্রায় মাঝনদী অব্দি নৌকোর পর নৌকো ভিড়ে আছে। নানা সাইজের। নানা রঙের। কোনও নৌকোর গলুইতে কালো রং দিয়ে মানুষের চোখ আঁকা। টুনু জানে, ভৈরবের এই ঘাটে রাস্তায় গা ধরে পাটের ব্যবসার মাড়োয়ারি গদি

ারি সারি—পরেপ্পর। এই নৌকোর জঙ্গলে অনেক নৌকোই পাটের নৌকো।

পানু বা টুনু কেউ বুঝতেই পারছে না—এর ভেতর কোন নৌকোয় তাদের বাবা মোচ্ছে। লাটু মাঝি শয়ে শয়ে নৌকোর লোকজনের ভেতর কোথায় হারিয়ে গেল। াঝনদীতে ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাদা রঙের বিরাট লঞ্চখানা নোঙর ফেলে াড়ানো।

টুনুর কানের কাছে মায়ের কথাগুলো বেজে উঠল। তোমাদের ঠাকুরদা তো াত্রাপালায় গেয়ে বেড়াতেন। পাছে তাঁর সংসার চালাতে অনটন হয়—তাই তাঁর শ্বশুরমশায় াকে মোরেলগঞ্জের সম্পত্তিটুকু যৌতুক দেন। ভাগ্যিস দিয়েছিলেন!

মা এই ভাগ্যিস কথাটা এমন করেই বলে—টুনু টের পায—মাযের মুখে একটা স্বস্তির াসি এসে দাঁড়ায়। পানু লম্বা হয়ে উঠেছে। সে জানতে চাইল কোন্ নৌকোটা দাদা? বাবা কাথায়?

লাটু মাঝি কোথায় গেল? তাকেও তো দেখছি না—

ঠিক এই সময কালীবাড়ি ঘাটের সামনে ঘণ্টি দিতে দিতে ধীরেন্দ্রনাথের ল্যান্ডো এসে গল। লাগাম হাতে কালাদা কোচোয়ানের বাক্সে। পেছনের পাদানি থেকে ফোতেদা মেই ছুটে এসে ল্যান্ডোর দরজা খুলে দাঁড়াল।

ধীরেন্দ্রনাথ ধুতির ওপর গরম পাঞ্জাবি গাযে দিযেছেন। বাঁ কাঁধে ভাঁজ করে রাখা ঘিরে ঙব শাল কালো সার্জের পাঞ্জাবির ওপর ভোরের রোদে ঝকঝক করে উঠল। টুনু পানু ার দেখতে পেল—কালীবাড়ি ঘাটের বাঁ দিকের কোণে ফাঁকায় ধীরেন্দ্রনাথের বোট ভিড়ে ছে। তার গায়ে বাংলায় লেখা—শ্রীশচন্দ্র।

ধীরেন্দ্রনাথ কাঠের ধাপ ভেঙে তরতর করে নেমে গিযে শ্রীশচন্দ্রে উঠতেই বোটের ঝিরা লগি ঠেলে ঠেলে নৌকোর ভিড় কাটিযে মাঝনদীর দিকে এগোতে লাগল।

শ্রীশচন্দ্রের গলুই সাদা রঙের। বাকি শরীরটা আকাশি নীল রঙের। ভেতর ঢুকে রেস্ট ওয়ার জায়গাটি গাঢ় ঘিয়ে রঙের। পালখাটানোর মাস্তুলটি আবার সাদা। ধীরেন্দ্রনাথ টাতনে একটি বেতের চেয়ারে বসেছেন। আগাগোড়া একখানি ছবি যেন। ছবিখানি— ় আর পানু দেখল—সিধে গিয়ে মাঝনদীতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সাদা লম্বাটে লঞ্চের গে ভিড়ছে।

ঠিক এইসময় পানু বলে উঠল, ওই তো বাবা—

টুনু এবার তার বাবাকে দেখতে পেল। সারা মুখ জুড়ে কাঁচাপাকা না-কাটা দাড়ি। য়ে একখানি ভালুকে কম্বল। কাদামাখা পায়ে তাদের বাবা একটা নেভানো হেরিকেন তে নৌকোর পর নৌকোর পাটাতন ধরে ঘাটের দিকে এগিযে আসছেন।

কাছাকাছি এসে অনন্ত ঘোষাল টুনু-পানুর দিকে তাকিযে বললেন, লাটু আছে— সিমুদ্দিন এসেছে মোরেলগঞ্জ থেকে—টুনু আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠল, হাসিমুদ্দিন চাচা সেছে—তবে তো!

অনন্ত ঘোষাল সে কথায় না গিয়ে বললেন, আমি বাড়ি গিয়ে চানটান করছি। তোমরা দুজন ডিমগুলো সাবধানে নামাবে কিন্তু—

পানু ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ বাবা।

অনন্ত ঘোষাল ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললেন, বজরার খোলে কতকগুলো কচ্ছপ আছে। দেখে নামাতে হবে কিন্তু।

টুনু বলল, খুব পারব বাবা। কোনও চিন্তা নেই।

বড় রাস্তায় উঠে অনন্ত ঘোষাল পরিষ্কার দিনের আলোয় হেরিকেনটি হাতে রিকশায় উঠে বসলেন। খুলনা শহরে তিনি প্রায় হপ্তাতিনেক পরে ফিরলেন। রিকশা সাইকেল তরতর করে খুলনার বাতাস কেটে এগোচ্ছে। রিকশাওয়ালা জানতে চাইল, কোনদিকে যাব বাবু?

শ্রীশনগর। কেন আমাকে চেনো না?

রিকশাওয়ালা সত্যিই চেনে না অনন্ত ঘোষালকে। সে শ্রীশনগরের রাস্তা নিতে নিতে বলল, অ্যাতোদিন হাতে টানা রিকশা টানতাম বাবু—

কোথায়? এই খুলনায়?

না বাবু। বাগেরহাটে। ছমাস হল সাইকেল রিকশা চালাচ্ছি এখানে।

অনন্ত ঘোষাল আর কোনও কথা বললেন না। শহরে এখনো বেশিরভাগই হাতেটানা রিকশা। বছর দুই হল সাইকেল রিকশা বেরিয়েছে। নদীর পর নদী দিয়ে বাংলাদেশটা কেটে কেটে গেছে। মোরেলগঞ্জ থেকে খুলনায় আসতে সিপসা -রূপসা ছাড়াও তিনটে নদী ভাঙতে হয়—তিনি নিজের জায়গায় ফিরে এলেন।

হাসিমুদ্দিন চাচা মাঝে মাঝে মোরেলগঞ্জ থেকে খুলনায় এসে টুনুদের শ্রীশনগরের বাড়িতে ওঠে। সাদাসিধে লম্বাচওড়া মানুষ। বলা ভাল—নদীর মানুষ। অনন্ত ঘোষালের চেয়ে বয়সে ছোট। খোলামেলা। অনন্ত ঘোষালের জমি-জায়গা ভাগে চাষ করে—আবার দেখাশুনোও করে। খুলনায় এলে উল্লাসিনী হলে গিয়ে হাসিমুদ্দিন চাচা সিনেমা দেখবে। টুনুর মাকে ডাকে—ঠাইরেন। বাবাকে—স্রেফ দাদাবাবু। আর কিছু না।

পর পর সাতখানা সাইকেল রিকশা দাঁড় করিয়ে লাটু মাঝি তার লোকজন দিয়ে আগে ধান চাল বস্তা ভর্তি করে রওনা করিয়ে দিল। একেবারে সামনের রিকশায় বসে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল পানু। মাটির কলসিতে হাসিমুদ্দিন চাচা সুগন্ধি চাল গাদিয়ে ভরে রিকশায় তুলে দিয়েছে। দেবার সময় পানুকে বলে দিল, ভাতিজা—জিনিসপত্তর নামায়ে দিয়েই চলে আসব কিন্তু— রিকশা সাইকেলের মিছিল করে পানু শ্রীশনগর রওনা দিল। বজরায় বসে এবার লাটু মাঝি আর হাসিমুদ্দিন চাচা মিলে খালি টিনে খড়ের থাকে থাকে ডিম সাজাতে লাগল। সারাটা রাস্তা শ-দেড়েক ডিম এসেছে ধানের থাকে থাকে। একটাও ফাটেনি।

টুনু সারাটা বজরা দেখে আর অবাক হয়। এ বজরা তার অজনা নয়। তবু তার নতুন লাগে। এত জিনিস নিয়ে এই কাঠের জিনিসটা কোত্থেকে কোথায় চলে এসেছে। নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে।

একেবারে শেষে দড়িতে বাঁধা কচ্ছপ রিকশায় পাদানিতে চিত করে বসানো হল। তারপর সেই রিকশায় বসল টুনু। খালি বস্তা দিয়ে কচ্ছপগুলো ঢেকে দিল লাটু মাঝি। শীতের বেলা পড়ে এসেছে। টুনুর আজ কলেজে যাওয়া হল না। মোরেলগঞ্জ থেকে বজরা আসে বছরে একবার। এই সময়টায়—টুনু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—মা ঘুরে ঘুরে ডাল রাখছেন—সর্ষের তেল আলাদা করে তাকে তুলে রাখলেন। মায়ের মুখে কী একটা তৃপ্তির হাসি। টুনুদের বাবা মোরেলগঞ্জ গিয়ে এসব নিয়ে আসাকে বলেন—আদায়ে যাওয়া—

এই আদায় কথাটার ভেতর টুনু কী একটা অসভ্যতা টের পায়। সে এখন ভাগে জমি দেওয়ার মানে জানে। এ সব কথা হাসিমুদ্দিন চাচাই তাকে কথায় কথায় বলেছে। সরল সিধে ভাব। আমরা আব্বাজান তোমার ঠাকুরদার কাছে ভাগে চাষ করতেন। আমি করি তোমার আব্বার কাছে। সেই ভাগে। জমি তোমাদের। গতর আমাদের। ধান হলি পর তোমরা পাও অর্ধেক। আমরাই গুছোয় তুলে দিই তোমাদের বস্তায় ভাতিজা।

এই ভাগের ধান—চাষের জমিতে ভাগচাষীর ভাগ্য—এইসব নিয়ে কলেজের ক্লাশে তাকে ইকনোমিক্স পড়তে হয়। রাস্তাঘাটে, সভা সমিতিতে কৃষক প্রজা পার্টি, মুসলিম লিগ, কংগ্রেস এ সব নিয়ে কথা বলে। কিন্তু তার কোনও ছাপই পড়েনি হাসিমুদ্দিন চাচার মুখে। টুনু জানে তার পেছনের রিকশায় বসে শহর দেখতে দেখতে হাসিমুদ্দিন চাচা শ্রীশনগর চলেছে। দাড়ি কামিয়ে চানটান করে ভাত খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন অনন্ত ঘোষাল। রত্নাই সব সামলাচ্ছেন। পানু আর তনুকে নিয়ে। সব এসে পড়ায় হাসিমুদ্দিন আর টুনু হাত লাগাল। হাসিমুদ্দিন রত্নাকে বলল, ঠাইরেন, এবার আপনি একটু বসেন। বসে বসে হুকুম করেন—কোনটা কোথায় রাখব—

তবু রত্না বসতে পারেন না। তিনি একটু বসেন মোড়টায়। আবার উঠে দাঁড়ান।

আজ ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর লঞ্চে খুলনা সদর শহরের কয়েকজন জমিদারকে ডেকেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ যেমন এসেছেন—তেমনই এসেছেন মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, টুটপাড়ার জমিদার আলতাফ হোসেন। পল্লীমঙ্গল পাড়া থেকে এসেছেন কুমুদ দত্ত। এঁরা থাকেন শহরে। কিন্তু জমিদারি দূরে—গাঁয়ের ভেতর। ধানখেত, পুকুর এ সব তো শহরে থাকে না।

ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বয়স বেশি নয়। ছটফটে—হাসিখুশি। সরকারি লঞ্চের ভেতরটা সাজানো গোছানো। ম্যাজিস্ট্রেটের পুরো নাম রিচার্ড লসন। খুলনার সবাই বলে লসন সাহেব। তিনি একটু আধটু বাংলা বলতে পারেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বসেছেন লসনের মুখোমুখি। তাঁর ডানদিকে আলতাফ হোসেন। আলতাফ ছোটবেলা থেকেই ধীরেন্দ্রনাথের স্কুলের বন্ধু। আলতাফের পরেই বসেছেন কুমুদবাবু। বয়স হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ভারিক্কি মানুষ। কয়েকবার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও হয়েছেন। তিনি ইংরেজিও বলেন বাংলার মতোই সহজে—স্বচ্ছন্দে। তিনি বসেছেন ধীরেন্দ্রনাথের ঠিক বাঁ দিকে।

শীতের বেলা। লঞ্চের বাবুর্চিরা ঘোরাঘুরি করছে। রান্নার গন্ধ। লঞ্চের ইঞ্জিন যেন ঘুমের ভেতর জেগে উঠছে মাঝে মাঝে। লসন জানতে চাইলেন, শহরে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নেই তো ?

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ বললেন, কী নিয়ে শান্তিভঙ্গ হবে ? চাষীদের কাছে প্রমিজ করেছেন হকসাহেব। আর তিনিই এখন বাংলার প্রাইম মিনিস্টার। তো শান্তিটা ভাঙবে কে ? আমরা সামান্য কয়েকজন জমিদার !

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লসন সাহেব কোনও কথা বলতে পারলেন না। তার সমনে ছোট্ট টেবিলে বেঙ্গল টেনান্সি নামে ছোট্ট ছাপানো একখানি বই। মুখোমুখি বসে আছেন শহরের চারজন জমিদার—যাঁরা তাঁদের যাঁর যাঁর বাবার মৃত্যুর পর জমিদারি পেয়েছেন। কিন্তু সময়টা যে বড় কঠিন হয়ে উঠেছে। বেঙ্গলের বাতাসে কান পাতলেই শোনা যায় জমিদারি উচ্ছেদের কথা। প্রজার অধিকার।

এই কোয়ালিশন সরকার কতদিন টিকবে মনে হয় ?

ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, যতদিন নলিনীবাবু মিনিস্ট্রিতে আছেন ততদিন।

এ কথা বলছেন কেন ?

খুব সিম্পিল মিস্টার লসন। হকসাহেব প্রাইম মিনিস্টার অব বেঙ্গল বটে। কিন্তু ক্যাবিনেটে নলিনীরঞ্জন বাদে আর কেউ তাঁর বন্ধু নেই ?

এতটাই বন্ধু দুজনে ?

আলতাফ হোসেন দেখতে পাচ্ছেন, ভৈরবঘাটে পর পর সাতখানি সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে। অনন্ত পেশকারের আদায়ের ধান বজরা থেকে রিকশায় বাড়ি যাচ্ছে। আলতাফ বললেন, হক সাহেবের পার্টি চালাতে তো টাকা লাগে। সে -টাকা দেন নলিনীরঞ্জন সরকার।

মহেন্দ্র ঘোষ বললেন, নলিনীবাবুর জন্যেই তো হকসাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন হল না।

লসন খুলনা থেকে বদলি হয়ে রাইটার্স বিল্ডিং যাবেন সামনের বছর। হোম ডিপার্টমেন্টে। হোম সেক্রেটারি মিস্টার প্রেন্টিসের অধীনে তাঁকে কাজ শিখতে হবে। সেখানে যাওয়ার আগে রির্চাড লসন চোখ কান খাড়া রেখে সবদিকে লক্ষ রাখছেন। তিনি মহেন্দ্র ঘোষের কথায় বললেন, কী রকম ?

শরৎ বসু ওঁরা চেয়েছিলেন. নলিনীবাবুকে ক্যাবিনেট থেকে বাদ দিতে হবে। কিন্তু হকসাহেব তাতে রাজি হননি।

মিস্টার এন আর সরকারকে বাদ দিতে চাইছে কেন কংগ্রেস ?

এ কথায় মহেন্দ্র ঘোষ কোনও জবাব দিলেন না। মিস্টার লসন কিন্তু জবাবের জন্যে তাকিয়ে।

তখন ধীরেন্দ্রনাথ বললেন, আমি বলছি। কংগ্রেস মনে করে মিস্টার সরকার একজন

সুবিধাবাদী—ইংরেজ-ঘেঁষা লোক। আসলে একজন অ্যাডভেঞ্চারার ছাড়া কিছুই নন নলিনীবাবু—

ভাঁড়ার ঘর গোছাতে গোছাতে রত্নার সন্ধে হয়ে এল। তিনটে হেরিকেন একসঙ্গে ধরিয়ে নিলেন রত্না। বড় শোওয়ার ঘরের পাশে কালো বিরাট টিনে চাল রাখা হয়েছে। বস্তা বোঝাই ধান খাটের নীচে থাক দিয়ে রাখা।

ডাল গুড় উঠেছে টিনে। রান্নাঘরের পাশে বড় বড় মাটির জালা থাকে। একসময় জল ধরে রাখা হত। এখন সেখানে কচ্ছপদের রাখা হয়েছে। হেরিকেনের আলো। তবু যেন রত্নার মনে হল—সারাটা বাড়ি হাসছে। শ্বশুরমশায় বিয়ে করে ভাগ্যিস জায়গাটা পেয়েছিলাম। রত্না বড় ছেলে টুনুকে বললেন, তোমাদের হাসিমুদ্দিন চাচাকে আজ সিনেমায় যেতে বারণ করো।

কেন মা ?

আজ সকাল সকাল রান্না করব। সবাই একসঙ্গে বসে খাবে। হ্যাঁরে পানু—

পানু রান্নাঘরে কাঠের আঁচে জল চাপিয়ে দিয়েছে। জল ফুটেও উঠেছে। এখন সে হেরিকেনের আলোয় সেই গরম জলে নতুন শেখা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে।

যাই মা—

কী করিস রান্নাঘরে ?

কিছু না।

কেমন সন্দেহ হল রত্নার। তিনি রান্নাঘরে ঢুকে দেখেন—হেরিকেনের সামনে মাদুর পেতে বসে আছে তনু। তনুর পাশে খোকন আর গৌর। কী হচ্ছে এখানে ?

কিছু না মা। একটা নতুন জিনিস শিখেছি তাই—

কী ? উনুনে জল চাপালি কখন ? কেন ? জল তো ফুটছে।

এই দ্যাখো মা—বলতে বলতে পানু একটা ডিম ফাটিয়ে সেই জলের ওপর ছেড়ে দিল। ওয়াটার পোচ মা—একখানা চামচ দাও। তুলে খাওয়াচ্ছি তোমাকে।

আমি খাব না। তুই খা।

পানু হাতা দিয়ে ডিমের পোচটা একখানা ছোট প্লেটে তুলে এগিয়ে দিল।

বললাম তো খাব না বাবা। তোমরা খাও। শিখলে কোত্থেকে ?

পানু কিছু অবাক হল। স্কুলে নানা জিনিস শেখাচ্ছে মা। আমায় তুমি তুমি করে কথা বলছ যে—

বাঃ ! বড় হয়ে গ্যাছো। ডিমের পোচ করতে শিখে গ্যাছো তুমি—বলতে বলতে ছেলের গর্বে—আনন্দে রত্না ঘোষালের দুই চোখে জল এসে গেল। মায়ের চোখে জল দেখতে পারে না খোকন। সে মাকে কাঁদতে দেখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

কী হল ? অ্যাঁ ? আমি কেঁদেছি নাকি ! চোখে জল এসে গেল তাই।—বলতে বলতে রত্না এসে মাদুরে বসলেন। খোকনকে কোলে তুলে নিলেন। দেখাদেখি গৌরও ডান পা বাড়িয়ে কোলে উঠতে চাইল।

খোকন এখন আর কোলে উঠতে চায় না। সে নেমে গিয়ে ছোট ভাই গৌরকে জায়গা করে দিল। তনু তার মায়ের গাঁ ঘেঁষে বলল, এখন একটা গল্প বলো না মা—

সারাদিন একটু শুতে পারিনি। তোরাও তো একটু জিরোসনি।

পানু কড়াইটা খুব সাবধানে চুলো থেকে নামল। তারপর সেই নর্দমার মুখে এনে জল ঢেলে দিল। দিয়ে সে চেঁচিয়ে ডাকল, দাদা রান্নাঘরে আয়। মা গল্প বলবে—

কী হচ্ছে শুনি। রান্না করতে হবে না তোদের সবার জন্যে—

টুনু হেরিকেনের মুখোমুখি দরজায় এসে দাঁড়াল। পাজামার লম্বা ওপর হাফ শার্ট। গায়ে একখানা সুতির চাদর। পায়ের পাতায় হেরিকেনের আলো পড়েছে। রত্না মনে মনে বললেন, টুনু বড় হয়ে গেল।

হাসিমুদ্দিন রান্নাঘরে ঢোকার মুখে দাঁড়ানো টুনুর পাশে একখানা পিঁড়ি পেতে বসে পড়ল। ঠাইরেন—আপনার শ্বশুরের সেই গল্পটা বলেন দিনি—

কোনটা ?—রত্না ঠিক মনে করতে পারছে না। ক'বছর ধরেই ভাগের ধান-চাল পৌঁছে দিতে আসে হাসিমুদ্দিন. ক'দিন থেকে আবার মোরেলগঞ্জে ফিরে যায়। কোন বারে কোন গল্প শুনেছে—তা মনে করতে পারলেন না রত্না।

তনু মনে করিয়ে দিল। বলল, ঠাকুরদার সেই গান গাওযার গল্প।

কোন গান ? সেই যে—কাক কোকিলের একই রং সুরে মেলে না—

মাথা নাড়ল তনু। না। না।

তবে কোন গানটা ? বলে গলা খুলে গেয়ে উঠলেন রত্না ঘোষাল—

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কে রে ?
কার মেয়েটি কালো ?

রত্নার গলায় সারা রান্নাঘর—ঘরের বাইরের অন্ধকার বারান্দা—সব গম গম করে উঠল। মা অ্যাতো সুন্দর গায় ? খোকন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। তাঁর ছেলেরা তো বটেই—রত্নার ছেলেদের বাবা অনন্ত ঘোষাল সারাদিন ঘুমিযে উঠে বিছানায় বসে ছিলেন—অনেকদিন পরে রত্নার গলা কানে যেতে তিনিও রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

শহর খুলনার দিকে দিকে তখন আনন্দ। নদীর বুকে নৌকোয় নৌকোয় কুপি জ্বলে উঠছে। বরিশাল যাওয়ার স্টিমার সার্চলাইট জ্বেলে উথাল-পাথাল ঢেউ তুলে তেরখেদাব দিকে মুখ ঘোরাল। নদীর ঘাটে খুলনা বাজারে কমলার বড় বড় চালান এসে পৌঁছেছে। কমলা ডাঁই করে বিক্রি হচ্ছে। ডাকবাংলোর মোড় নতুন ওঠা আলুর চপ ভাজার গন্ধ। নতুন ধান উঠেছে। সাইকেলের দোকানে ভিড়। ধান বেচে সেই টাকায় অনেকেই কিস্তিতে সাইকেল কিনতে আসছে। গোড়ার দিকে হবে পনেরো টাকা। তারপর মাসে মাসে সাত

টাকা করে দিয়ে চোদ্দো মাসে দাম শোধ।

সন্ধেরাতে বড় রাস্তায় ওপর বাড়িতে বাইরের ঢাকা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন কালীদাস ঘোষ। জন্ম সেই সিপাহি বিদ্রোহের অনেক অনেক আগে । আশি ছাড়িয়ে যাওয়া জমিদার কালীদাস ঘোষ বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছেন।

হিন্দু মহাসভার মিছিল। মাঝে মাঝে স্লোগান। এই দলের মিছিল আগে কোনওদিন খুলনা দেখেনি। বলা যায় এমন মিছিল এই প্রথম। কালীদাস ঘোষ এ মিছিলেব কথা জানতেন। কারণ ওরা চাঁদা নিয়ে গেছে তাঁর কাছ থেকে। শহরের বড় মাঠে আগামী রবিবার বড় করে মিটিং হবে। পুনা থেকে আসছেন বীর সাভারকর। সে জন্যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে গেট হবে। বাঁশ পোঁতা শুরু হয়েছে। আবার নাকি হিন্দুর গৌরব ফিরিয়ে আনা হবে।

কথাগুলো খুব চেনা লাগে কালীদাস ঘোষের। নিজের যৌবনে তিনি দেখেছেন—সিপাহি বিদ্রোহের বিশ বছর পরেও—চোরাগোপ্তা ছাপা বই হাতে এসে পড়ত—তাতে লেখা থাকত—ইংরাজদের তাড়িয়ে মুসলমানদের রাজত্বের হারানো গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

এখন যেমন আজাদ কাগজে মুসলিম শাসনের গৌরবের দিনগুলোর কথা ছাপা হয়। ইস্কুলের ইতিহাস বইতেও সে সব কথা থাকে। খলিফা হারুন-অল-রসিদের রাজত্ব।

কালীদাস ঘোষ চোখ বুজেও হিন্দু রাজত্বের গৌরবের দিন মনে করতে পারেন না। সে সব এতকাল আগের কথা ! কে মনে করে রেখেছে ? পাওযা যায় শুধু ইতিহাস বইতে। তাও ঝাপসা ছবি আর কথায় বোঝাই।

নিজের ঘরে ফিরে এলেন কালীদাস ঘোষ। মিছিল দেখবেন বলে জরির কাজ কবা মেরজাই গায়ে দিয়েছেন। মাথায় পরেছেন পাগড়ি। পায়ে নাগরা। ঘরে ফিরতে ফিরতে তিনি নিজেকেই বললেন, গৌরবের স্মৃতি না থাকলে তো বাঁচা যায় না। জীবন যে আলুনি লাগে ।

বিরাট বসার ঘরে তিনি এখন একা। দেখলেন, তাঁর পালঙ্কের পাশে টেবিলে পাথরের গ্লাসে বার্লির শরবত দিতে বলেছিলেন। শরবতটা এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে মনে হল মাথাটা একটু বুঝি ঘুরল। একটা বয়েসে তিনি জমিদারির অংশ পাননি। সে সময়টাকে তিনি বলে থাকেন—জীবনের বিত্তহীন সময়। সেই সময়টাকে তিনি তাঁর নিজের জীবনে অস্বীকার করে এসেছেন। তারপর একসময় যখন তিনি জমিদারির অংশ পেলেন—এল বিত্তশালী জীবনের দিনগুলো। তখনকার গৌরবের স্মৃতিই তাঁকে আয়ু দিয়েছে। তৃপ্তি দিয়েছে।

বালিশে মাথা রেখে রাস্তার দিকের খোলা জানলায় তাকালেন কালীদাস ঘোষ। এই শতাব্দীর গোড়ার দিককাব একটা দিনের ছবি ভেসে আসছে। সে ছবি যেন আলো। সে ছবি যেন শব্দ। তাই ভেসে আসে। বাংলার ছোটলাট বাহাদুরকে নিয়ে খুলনার কয়েকজন জমিদার মিলে সুন্দরবনে শিকারে গেছেন। ওই যে বন্দুক হাতে সুন্দর মতো ছোকরাকে দেখা যাচ্ছে—উনিই হলেন কালীদাস। চোখ বুজে তিনি নিজেকে দেখতে লাগলেন।

এক একদিন রাত থাকতে ঘুম ভেঙে যায় আব্দুল হাকিমের। এই সময়টায আলো ফোঁটার

মুখে তিনি হাঁটতে বেরিয়ে পড়েন। এই ভোর রাতে বেরিয়ে তিনি রেল স্টেশন পেরিয়ে ভৈরবের গা ধরে এগোতে লাগলেন। এই রাস্তা তৈরি হয়েছে রেল ইঞ্জিনের পোড়া কয়লার ছাই দিয়ে। ইঞ্জিনের গায়ে—কাঠের কামরায় গায়ে বড় করে লেখা ই বি রেলওয়ে। যশোর যাও, দৌলতপুর যাও, ঝিকরগাছা যাও—সব জায়গায় স্টেশনের গায়ের রাস্তাটা ওই পোড়া কয়লার ছাই দিয়ে তৈরি।

এই রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মনে হবেই পা বুঝি বসে গেল। কিন্তু আসলে তা যায় না। ভোর ভোর অনেকটা হেঁটে বাড়ি ফিরলে সারাদিনের মতো আর ঘুম পায় না আব্দুল হাকিমের ভৈরবের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আব্দুল হাকিম দেখলেন, ভৈরবের জল এবার দেখা যাচ্ছে। নয়তো এতক্ষণ নদীর বুকটা ছিল অন্ধকার।

হাঁটার স্পিড় বাড়িয়ে দিলেন তিনি। এবার নদীর সামনে পড়বে শিববাড়ি। এখানে বছরে একবার বড় করে পুজো হয়। শিববাড়ির সামনে ফুলের বাগান আছে। একদিন রাস্তা থেকেই তিনি ওই বাগানের কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ পান। আজও পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, খুব চেনা এক মেয়ে বাগানে ঢুকে ফুল তুলছে।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আব্দুল হাকিম ডাকলেন, ভবানী না ?

মেয়েটি ফুলের সাজি নামিয়ে ফিকে হয়ে আসা অন্ধকারে ভাল করে রাস্তায় তাকিয়ে আব্দুল হাকিমকে চিনতে পারল। —হ্যাঁ কাকাবাবু। আজ আপনি বড় আগে বেরিয়ে পড়েছেন।

আব্দুল হাকিম এ কথায় খুশি হতে পারলেন না। বললেন, তুমি আমারও আগে বেরিয়ে পড়েছ। কেন ?

ভোরের দিকে আমি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি না।

ভোর কোথায় ? এখনো তো রাত রয়েছে ভবানী। না এ ভাল না। তুমি এরকম বেরোবে না।—বলতে বলতে আব্দুল হাকিম হাঁটতে হাঁটতে এগোতে লাগলেন। সামনেই খালিশপুর জঙ্গল মতো। জঙ্গলের গা দিয়ে ভৈরব বয়ে গেছে। আব্দুল হাকিম যখন জঙ্গলের কাছাকাছি হলেন—তখন তাঁর হাতঘড়িতে ভোর সওয়া পাঁচটা। হন হন করে ফেরার পথে তিনি আর ভবানীকে দেখতে পেলেন না।

আজ হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি না ফিরে তিনি ডাকবাংলোর মোড় থেকে ডাইনে ধর্মসভার দিকে চললেন। এই ধর্মসভা পাড়ার আমগাছওয়ালা মাঠের ভেতর নগেন সেনের বাড়ি। একসময় ওকালতিতে জোর পসার ছিল নগেন সেনের। বেশ কিছুকাল আর কোর্টে যান না। জেলা কংগ্রেসের জেলখাটা নেতা। তাঁর বাড়ির সামনে সব সময় দলের লোকজনের ভিড় থাকে। আজও রয়েছে। তবে অল্প। এখনও দিন জমে ওঠেনি।

একদম দরজায় দাঁড়িয়ে আব্দুল হাকিম দেখলেন, নগেন সেন খুব মন দিয়ে কী লিখছেন। খদ্দরের ধুতির ওপর খদ্দরের ফতুয়া। —আসতে পারি নগেনদা ?

নগেন সেন দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়ালেন, আরে আসুন আসুন। বসুন—

না। আমি বসতে আসিনি। একটা কথা বলেই চলে যাব।

বেশ তো। ঘরে তো ঢুকবেন।

আব্দুল হাকিম চেয়ারে বসলেন। বসে বললেন, কংগ্রেস তো করছেন। এ দিকে মেয়েটা কোথায় যায়—কখন যায় খেয়াল আছে ?

ভবানী তো ? কী করব বলুন !

দেখুন নগেনদা। ভবানী এখন বড হয়েছে। শেষ রাতে উঠে ফুল তুলতে গেছে সেই শিববাড়িতে।

নগেন সেন চুপ করে থেকে শেষে বললেন, বিয়ে দিয়েছিলেন অল্প বয়সে— তা স্বামী সাধু হয়ে গেল। আপনাদের বুদ্ধিতে ভবানীকে পড়ালাম। গ্র্যাজুয়েট হল। জোর ছাত্র কংগ্রেস করে। সাইকেল চালিয়ে এ দিক ও দিক যায়। কিন্তু রাত থাকতে ফুল তুলতে বেরোল কেন ? এ তো আমি বুঝতে পারছি না।

আপনি বুঝে ওঠার আগে যদি কোনও বিপদ হয়ে যায় নগেনদা ?আমি অন্য কিছু বলছি না। আমি বলছি—শেষ রাতে শিববাড়িব রাস্তা নির্জন—অন্ধকার থাকে। যদি কোনও বিপদ হয়।

সাইকেল দেখলেন ?

না। অন্ধকারে তা খেয়াল হয়নি নগেনদা। বিপদ এলে সাইকেল তো আর বাঁচাবে না।

খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই। শেষে আব্দুল হাকিম বললেন, দিলীপের কোনও খোঁজ পেলেন ?

না। আট বছর হয়ে গেল সাধু হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সাধু হলে তো উবে যাবে না। কোথাও তো থাকবে দিলীপ।

হাকিমসাহেব, এত বড় দেশ। পাহাড়, নদী বাজার, কত কত আশ্রম। এর [illegible] দিলীপ কোথায় আছে—কী করে জানব ? কী করে খুঁজে পাব ?

কংগ্রেসের ছেলেদের তো খুঁজতে বলতে পারেন।

কোথায় খুঁজবে তারা ? কংগ্রেসের কাজ করবে ?না,আমাব জামাইকে খুঁজে বের করবে ! তবে একবার শুনেছিলাম—আসামে নাগাদেব ওখানে সাধু হয়ে চলে গেছে দিলীপ।

রেলের চাকরি ছেড়ে দিল। নিজের বাপ মা ভাইবোন—কচি বউকে ছেড়ে চলে গেল।

সাধুরা তো এইভাবেই চলে যায় হাকিমসাহেব।

আব্দুল হাকিম লক্ষ করলেন নগেন সেনকে। সিভিল সাইডে ভাল পসার হয়েছিল নগেনবাবুর। সব ছেড়েছুড়ে বছর পনেরো আগে একদম কংগ্রেস ডুব দিলেন। ফর্সা মানুষ মাথাটি দশআনা সাদা। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। গায়ে খদ্দরের ফতুয়ার ওপর খদ্দরের চাদর। এক সময়কার খুব স্টাইলিস্ট উকিল—এখন সব রকমের বাড়াবাড়ি ছেঁটে ফেলে আম গাছতলায় বাড়িতে বসে জেলা কংগ্রেসের কাজ করেন। মিটিং হলে নগেনবাবুকে দেখা যায়। আব্দুল হাকিম জানেন, নগেন সেনেব মতো এমন লোক সারা বাংলাদেশের শহরে

গাঁয়ে ছড়িয়ে আছেন। তবু তাঁর রাগ হল নগেন সেনের ওপর। তিনি বললেন, সাধুরা তো এইভাবে চলে যায় বলে আপনি হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন ?

আমি কী করতে পারি ? ধরুন, যদি দিলীপকে খুঁজেও পাই—আমি বললেই সে ফের ভবানীর সঙ্গে সংসার পাতবে ?

আব্দুল হাকিম সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারলেন না। শেষে বললেন, ভবানীর এখন বয়স কম। সামনে লম্বা জীবন পড়ে আছে। আপনি দেখেশুনে ফের ওর বিয়ে দিন।

কী করে দেব ? সবটাই নির্ভর করছে ভবানীর ওপর। আমার মনে হয়—ও আর বিয়ে করবে না।

কী দেখে বললেন এ কথা ?

দেখুন হাকিমসাহেব। যেমন তেড়েফুঁড়ে কংগ্রেস করছে মেয়েটা —আজ এখানে মিটিংয়ে যাচ্ছে—কাল ওখানে জনসভার সব ব্যবস্থা করছে—

হ্যাঁ জানি। রীতিমতো পিকেটিং করছে। টুলের ওপর দাঁড়িয়ে লেকচার দেয়।

তা হলে বলুন—আমি নিজে কংগ্রেস করছি দীর্ঘদিন। আমি কি করে নিজের মেয়েকে বলব—এ সব ছেড়েছুড়ে বিয়ে কর মা। তারপর আরও একটা অসুবিধে আছে।

আব্দুল হাকিম নগেন সেনের মুখে তাকালেন।

দিলাম মেয়ের বিয়ে। তারপর হঠাৎ একদিন যদি দিলীপ ফিরে আসে ?

সে তার দাযিত্ব পালন করেনি। ভবানীরও তার জন্যে কোনও দাযিত্ব নেই।

সে তো শুধু ভবানীই ঠিক করতে পারে।

আব্দুল হাকিম দেখলেন, কথা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল—দুজনে ঠিক সে জায়গাতেই ফিরে এসেছেন। তিনি নগেন সেনের চোখের সামনে টেবিলে কাগজপত্র দেখে জানতে চাইলেন, কিছু লিখছিলেন ?

না ! হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষ চন্দ্রের সভাপতিব ভাষণটি বাংলায় আনুবাদ করছিলাম। ছোট করে সাবস্ট্যান্সটুকু বাংলায ছাপিয়ে জেলার সব মণ্ডল কংগ্রেসে পাঠাব।

আলো নেই

অনন্ত ঘোষালের বাড়ির তিনখানি বাড়ি পরেই থাকেন ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর রায়। শক্তসমর্থ মানুষ। এই শীতের সকালে তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অবস্থাতেই প্যাডেল করতে করতে নিজের সাইকেলে উঠে পড়লেন। এখন যাবেন ভৈরবের কালীবাড়ি ঘাটের কাছাকাছি। ওখানেই তাঁর ডাক্তারখানা। কালীবাড়ি রোডে রাস্তায় ওপরেই একখানি চালাঘরের কপালে টিনের সাইনবোর্ডে সাদা রঙের ওপর কালো রঙে ফণা তোলা একটি সাপ আঁকা। তার পাশে বড় বড় হরফে বাংলায় লেখা—বিনা অস্ত্রে চাঁদসীর চিকিৎসা।

শ্রীশনগরের একতলা ভাড়া বাড়ির গায়েও ছোট্ট একখানি টিনের প্লেটের ওপর বাংলায় লেখা—ডাঃ যজ্ঞেশ্বর রায়। বাড়িটির সামনের বারান্দার ওপর টালির ছাদ। পাশাপাশি দুখানি ঘর। ভেতরেও টালির ছাদ দেওয়া একটি বারান্দা। উঠোনের কোণে রান্নাঘর। রান্নাঘরের পাশেই একটি চালাঘর।

সেই চালাঘর থেকে অল্পবয়সী একটি বউ খোকনকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এল। খোকন মাগুন মাছের মতোই খলবল করে বউটির কোল থেকে ঝাঁপ দিয়ে উঠোনে পড়ল।
—আমি বড় হয়ে গেছি। আমি আর কোলে উঠব না—

খোকন রীতিমতো বেঁকে দাঁড়াল। —ওরে দুষ্ট! বলে বউটি খোকনকে কোলে তুলে নিতে গেল। পারল না। খোকন দৌড়ে উঠোন থেকে বারান্দায় গিয়ে উঠল। সেখান একজন লোক গায়ে চাদর জড়িয়ে মাদুরে বসে কাচের ওপর কী লিখছে।

খোকন সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। —কী লিখছি?

কাচ থেকে মুখ না তুলে লোকটি বলল, বড় হয়ে পড়তে শেখো। তখন জানতে পারবে। লোকটি কথা বলছে। হাতে তুলি। চোখ কাচে। বউটি এসে আলগোছে খোকনকে তুলে নিয়ে গেল। যাবার সময় বলল, কাজে বসেছেন তোমার কাকা। এখন ওঁকে বিরক্ত কোরো না।

খোকন ফের বউটির কোল থেকে বেঁকে নেমে পড়তে গেল। কাজ করতে করতে লোকটি বলল, বড় হয়ে গেছে খোকন। এখন কী আর ও কোলে থাকতে চাইবে ! নামিয়ে দাও—

ছাই বড় হয়েছে ! বলে খোকনকে কোলে নিয়ে উঠোনের চালাঘরে বউটি ঢুকল। এই দ্যাখো খোকন। তোমার জন্যে কী বানিয়েছি।

খোকনের চোখের সামনে বউটি একটি বালিশের ওয়াড় মেলে ধরল। ছোট বালিশের ওয়াড় । বোঝাই যায় এটি খোকনের মতো কোনও ছোট ছেলের মাথার বালিশের মাপসই ওয়াড়।

খোকন তাকিয়ে আছে দেখে বউটি তাকে একটি চুমু খেয়ে বলল, এটা তোমার জন্যে—

একেবারে আমার ?

হ্যাঁ। তোমার জন্যে।

খোকন তার ছোট ছোট চোখ দিয়ে দেখল—ওয়াড়ের পাশে একটা শাড়ির পাড় পড়ে আছে। তার সুতো বড় ছুঁচে বালিশের ওযাড়ে টেনে বসানো। ওযাড়ের যেখানটায় ছুঁচ—সেখানে সুতো গেঁথে বউটি একটি বাচ্চা ছেলের মুখ তুলেছে। সুতোয় গাঁথা মুখটি দেখিয়ে বউটি খুব গাঢ় গলায় জানতে চাইল, তোমার মুখ হযেছে বাবু ?

এরকম গলার স্বরে খোকন ভযে পেযে যায। বউটি তাকে ফের কোলে টেনে চেপে ধরে বলে—তোর কাকিমা তোকে আঁকতে পারেনি। পারবে কোত্থেকে !

আঃ ! ছেড়ে দাও বলছি কাকিমা—বলে ছাড়ান পেয়ে খোকন ফের উঠোনে। সেখান থেকে দাপাতে দাপাতে আবার সে বারান্দায় উঠে পড়ল। উঠে সে জানতে চাইল, কী লিখছ অজিত কাকা ?

অজিত কোনও জবাব দিল না। বউটি বারান্দায় উঠে এসে দেখল, তার চেনা কথাগুলোই তার স্বামী কাচের ওপর উলটো করে লিখছে—

অদ্য শেষ রজনী।

সর্বপ্রকার ফ্রি পাশ বন্ধ

বউটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। সারাজীবন তো ওইসব কথা কাচের ওপর লিখে আসছে। একবারটি খোকনকে কোলে নাও না—

এবার অজিত খোকনের দিকে ফিরে তাকাল। এঃ ! করেছ কি ? আবার চুল ঝুঁটি করে বেঁধে দিয়েছ ? চোখে কাজল ! কপালে টিপ !

বউটি হেসে বলল, তুমি উল্লাসিনী সিনেমার স্লাইড লেখো বসে বসে।

তার কথা থামিয়ে দিয়ে অজিত বলল, আজই ম্যাটিনি শোয়ে এই স্লাইড দেখানো হবে। তাড়া রয়েছে।

তোমার তাড়া নিয়ে তুমি থাকো। খোকনকে সাজাতে আমার ভাল লাগে।

তাও যদি আমাদের নিজেদের হত !—বলে ফের কাচের ওপর তুলি হাতে অজিত—অজিত রায় ঝুঁকে বসল। আজই ম্যাটিনি শোতে এই কাচের ওপরের লেখা সিধে হয়ে পরদায় পড়বে। আগে থেকে না দেখালে হাঙ্গামা বেঁধে যায়। কে কোত্থেকে ফ্রি পাশ ইসু করে বসে আছে তার তো কোনও ঠিক নেই।

বারান্দায় বসে পড়ে বউটি বলল, তুমি এই তুলি -কালি ছাড়ান দাও তো। ভাসুর ঠাকুরের ডাক্তারখানায় গিয়ে বরং কম্পাউন্ডারি করো। তাতে দুটো পয়সা আসবে।

ঠিক এই সময় রান্নাঘর থেকে একটি ভারী মেয়েলি গলা ভেসে এল। —ও ছোটো। ইদিকে আয়। ডালে কাঁটা দিসনি ?

এই যাঃ ! ভুলে মেরেছি—বলে বউটি এক ছুটে উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে মোটাসোটা ভারভারিক্কি এক গিন্নি উনুনের সামনে।

বড় কড়াইতে ডাল ফুটছে।

ঠিক এইসময় খিড়কির খোলা দরজা দিয়ে রত্না এসে ঢুকলেন, আমাদের খোকন এসেছে ?

মা খোঁজ করায় খোকন লজ্জায় অজিত কাকার চালাঘরে গিয়ে ঢুকল। রত্নার গলা পেয়ে যজ্ঞেশ্বর ডাক্তারের বউ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন, সে আসবে না ! তা কি হয় ? আপনারা খোকনের মন আমাদের ছোটোর এখানে পড়ে থাকে !

রত্না অন্য কথায় গেলেন। ছোটো তো রান্নাঘরে দেখতে পাচ্ছি। আপনি রয়েছেন। মেজবউ কোথায় ?

মেজোবউ যজ্ঞেশ্বর ডাক্তারের পরের ভাই রত্নেশ্বরের বউ। তিন ভাইয়ের সংসার।

যজ্ঞেশ্বর ডাক্তারের বউ বললেন, মেজোবউ বাড়ির ছেলেদের সবাইকে নিয়ে তার র্তার সঙ্গে আলু তুলতে গেছে।

রত্না ঘোষাল জানেন, চাঁদসীর ডাক্তারেব যজ্ঞেশ্বরবাবুরা এই শহরের কাছাকাছি গাঁয়ের ানুষ। সেখানে ওঁদের চাষবাস আছে কিছু। বাড়ির ধান উঠলে— আলু উঠলে সবাই মিলে তে হাতে অনেকটা কাজ তুলে দেয।

হ্যাঁরে ছোটো, খোকন কোথায় ?

নিজের মাকে দেখে লজ্জায় আমাদের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। দাঁড়ান দিদি। ছেলেকে নে দিচ্ছি।

একটু পরে রাযবাড়িব ছোটবউয়ের কোলে খোকন ঘর থেকে বেরিযে এল। তার মুখে জ্জা লজ্জা ভাব।

এখানে আদর খাওয়া হচ্ছে। আর বারান্দায় তোর হাতের লেখার খাতা গরু জিভ দিয়ে টেনে নিয়ে গেল ? চল বাড়ি—

অজিতের স্ত্রী বলল, ওমা ! খোকন হাতের লেখা লিখছে ? জানি না তো।

বড হচ্ছে না ? গত বছব খোকনেব হাতেখডি হয়ে গেছে। সামনেব বছব তনুব সঙ্গে স্কুলে যাবে যে—

ছোটো আনন্দে, গর্বে ফেব খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে একটি চুমু খেল।

যজ্ঞেশ্বব ডাক্তাবেব বউ হেসে বললেন,আপনি ববং আপনাব খোকনকে এ বাডি বেখে যান। এই বাডিই ওব বাডি। ছোটোই ওব মা—

আঃ।— বলে এক ছুটে ছোটো ফেব বান্নাঘবে ঢুকে গেল।

অনন্ত ঘোষাল বাবান্দায মাদুবে বসে কোর্টেব কাগজ দেখছেন। এই সময়টায তিনি চোখে চশমা দেন। তাঁকে ঘিবে তিনজন মক্কেল বসে। ধীবেন্দ্রনাথেব বাডিব সামনে তাঁব ল্যান্ডো দাঁডিযে। ঘোড়া পা ঠুকছে। সাবা শ্রীশনগব একটি আস্ত দিনেব জন্য তৈবি হচ্ছে জমি জাযগাব মামলা। হাল খতিযান। সাবেক খতিযান। তসিল। সব দেখতে হচ্ছে অনন্তকে। এই সব কাজ মানে কোর্টেব মাইনেব বাইবে দুটো পযসা।

খোকনেব হাত ধবে বত্নাকে আসতে দেখে অনন্ত চোখ তুললেন, কোথায গিযেছিল ?

আব কোথায। যজ্ঞেশ্বব ডাক্তাবেব বাডি।

তুমি ভেতবে যাও। আমি আসছি।

এইসব সময অনন্ত ঘোষাল বাডিব ভেতব আসেন দুটো কাবণে। এক বাইবে নদীব ওপাব থেকে আসা মক্কেলদেব জন্যে তিনি বত্নাকে বাটি ভবে মুডি দিতে বলেন। নযতো লাল-নীল পেন্সিলেব শিস তুলতে তিনি চাকু খুঁজতে আসেন ভেতবে।

আজ বাডিব ভেতবে এসে অনন্ত ঘোষাল বত্নাকে গম্ভীব গলায ডাকলেন,শোনো

বত্না এগিযে এলেন। কী ?

আমাব এ সব মোটেই ভাল লাগে না।

কী ভাল লাগে না ?

কোন আঁটকুডোব ছেলে হযনি—তাব মনেব সাধ মেটাতে আমাব ছেলেকে নিয়ে টানাটানি কেন ?

ছিঃ। ওবা তো খোকনকে খুব আদব কবে।

ও আদবে আমাদেব দবকাব নেই।

আমাদেব তো ছেলেব অভাব নেই। মনটা একটু বড কবতে শেখো।

অনন্ত ঘোষাল প্রায গর্জে উঠলেন, চুপ কবো বত্না। ছেলেবা আবাব কম বেশি কী ? আমাদেব ছেলে আমাদেবই ছেলে। বলতে বলতে অনন্ত ঘোষাল ফেব বাবান্দায চলে গেলেন।

খোকন কিছু বুঝতে না পেবে একবাব মাযেব মুখে তাকাল। আবেকবাব তাব বাবাব মুখে। হঠাৎ অনন্ত ঘোষাল ঘবে ফিবে এলেন। চাপা গলায বললেন, অজিত তো বউকে হাসপাতালে দেখালে পাবে—

বত্না আমতা কবে বললেন, বমা তো নীলষষ্ঠীব ব্রত কবে।

আলো নেই

ব্রত ফ্রোতোয় কিচ্ছু হবে না।

শীতে আলাদা একটা আহ্লাদ বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকে। দিনের আলোয়—
ন্ধেবেলার ইলেকট্রিক বা হেরিকেনের আলোয় একটা কেমন খুশি ছড়িয়ে পড়ে—আলোর
ায়ে ফেনার মতো। এত কিছু খোকন বোঝে না। ভোরে ঘুম থেকে উঠে খুব আনন্দ হয়।
তদিন সে ইচ্ছে হলেই পাশের বাড়ি বজলুরের কাছে চলে যেত। এখন ঘুম থেকে উঠলে
খাকনকে তার মা পড়তে বসিয়ে দেয়। এখানে তার জন্ম। এই শ্রীশনগরই তার জানা
একমাত্র পৃথিবী। এখানে অজিত কাকার বউ তাকে পেলে খুব আদর করে। এই আলাদা
াদরের সে কোনও মানে বোঝে না। কিন্তু এক একদিন এই আদর তার খুব ভাল লাগে।
াবার এক একদিন আদরে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। সে নিজে ঠিক করে উঠতে পারে
া। মায়ের কাছে থাকবে ? না, রমা কাকিমার কাছে চলে যাবে একদিন। কী এক না-জানা
ভাবনায় সে এক একদিন চুপ করে কচুবন, ভ্যারেণ্ডার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে
থাকে। সেখানে বোঁ বোঁ করে ভিমরুল ওড়ে—গাছের পাতায় পাখনা ঘষে--ভাঙা ডালের
কষে পা ভিজিয়ে। সব দেখতে পায় খোকন। সব মনে থেকে যায় তার। কিছু ভোলে না।

সরস্বতী পুজো এসে চলে গেল। যাবার সময় বাতাস থেকে শীত নিয়ে চলে গেল তবু ভোর
াতে শীত করে টুনুর। এক একদিন তার খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। এক একদিন সে ঘুম
ভেঙে গিয়ে বুঝতে পারে না শরীরটাকে নিয়ে কী করবে। বাড়িব একমাত্র আয়নাটি হাত-
আয়না। একখানা চিরুনি সমেত তা দেওয়ালে একটি পেরেকে টাঙানো থাকে। আয়নায়
নিজের মুখ খুব উজ্জ্বল লাগে টুনুর। সে দৌলতপুর কলেজে ঋতবান ঘোষাল। মালকোঁচা
মেরে ধুতির ওপর হাতা গোটানো ফুলশার্ট। এই তার পোশাক। টুনু সিঁথি কেটে মাথা
আচঁড়ায়। নিজেকে যেন সে আজকাল দেখতে পায়। দেখে তার নিজেকে আগের চেয়ে
সুন্দর লাগে। শ্রীশনগরে অন্যের চোখে সে যে সুন্দর হয়ে উঠেছে—তা লোকজনের মুখ
দেখেই বুঝতে পারে। বুঝতে পারে কলেজের ক্লাশেও। বাইবেল পড়াচ্ছিলেন প্রফেসর
ঘোষ। তিনি হঠাৎ একদিন ক্লাশের ভেতর টুনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ইউ ! ইউ ইয়ং
ম্যান—

গোড়ায় বুঝতে পারেনি টুনু—কার কথা বলছেন প্রফেসর ঘোষ। সে এদিক ওদিক
তাকাচ্ছিল। প্রফেসর ঘোষ ফের বললেন, ইয়েস। মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেন্ড। আই আস্ক ইউ।
হোয়াট ইজ ক্রিশ্চিয়ান কমপ্যাশন ?

বাংলা করলে দাঁড়ায় খ্রিস্টিয় করুণা বলতে কী বোঝ। চোখ বুজলে ঋতবান পরিষ্কার
দেখতে পায়--যুবক যিশু নিষ্পাপ মুখশ্রী নিয়ে দৌলতপুর-খুলনা রেল লাইনের পাশে
গাছপালার ভেতর লম্বাটে শরীরটা নিয়ে শুয়ে আছেন। বাইবেল ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে
সবাইকে পড়তে হয়। যিশুর পিঠের নীচে আশ শ্যাওড়ার জঙ্গল। খালি গা যিশু। তাঁর

শরীরে ঘাস, গাছের ডাল—সব ফুটছে। জঙ্গলের কাচপোকা, ভিমরুল, মৌমাছি তার খোলা দু চোখের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। চোখের এই দৃষ্টি, চিবুকের দাড়ি—নিজেকে নিয়ে কী করবেন তা যেন বুঝতে পারছেন না যিশু। এর ভেতরেই তার করুণা। এত সব বোঝে ঋতবান—কিন্তু কিছুই সে বলতে পারে না।

গাছপালা, বসতবাড়ি, খিড়কির পুকুর, ভ্যারেণ্ডার বনের পাশ দিয়ে কলেজ ছুটির পর শাটেল ট্রেন খুলনায় ফিরছে। টুনুর উল্টোদিকে বি এসসি ক্লাশের একজন স্টুডেন্টের হাত-ঘড়িতে বেলা পৌনে পাঁচটা। ট্রেনের জানলার বাইরের গাছপালা চৈত্র মাসের পাগলা বাতাস যেন আন্দাজে দুলছে। সবকিছুর ভেতর কী যেন একটা মানে আছে মনে হয় টুনুর। হঠাৎ সে দেখতে পেল—তার উল্টোদিকে কোণের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ভবানীদি। বাতাসে তার মাথায একপাশে একগুচ্ছ কোঁকড়া চুল বাগ না মেনে খুব উড়ছে।

এই ভবানীদি, ভবানীদি !

উঁ—বলে ফিরে তাকাল ভবানী।

টুনু বুঝতে পারে ভবানীদি এতক্ষণ এ-পৃথিবীতে ছিল না।

আরে ! আমাদের টুনু যে ! কত লম্বা হয়ে গেছিস।

বাঃ ! আমি এখন কলেজে পড়ি। তুমি এমনভাবে কথা বলছ—যেন তুমি আমার চেয়ে কত বড় ভবানীদি !

পাকা হয়েছিস খুব। আমি তো সত্যিই তোর চেয়ে অনেক বড় টুনু। তোরা আর কতদিন দূরে দূরে থাকবি বলতে পারিস ?

টুনু সারা খুলনায় এমন একটি খোলামেলা মানুষ আর দেখেনি। সে জানতে চাইল, কিসের থেকে দূরে ভবানীদি ?

আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে। তোরাই যদি দূরে গা বাঁচিয়ে থাকিস তো স্বাধীনতা কবে আসবে বলতে পারিস ?

তোমার কুপন তো। দিয়ো কিছু। আমি ঠিক বিক্রি করে দেব।

শুধু কুপন ? গান্ধিজি বলেছেন, তিনি অস্পৃশ্যতা দূর করার কাজে পুরোপুরি নামবেন।

আর হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশনে নতুন সভাপতি সুভাষচন্দ্র এখনই গণ-আন্দোলনের ডাক দিতে চান ভবানীদি।

সে কথায় না গিয়ে ভবানী বলল, দৌলতপুরের কাছে আজাগোড়া গাঁয়ে গিয়েছিলাম। ওখানে বুনোদের গাঁয়ে গেলাম সকালে। এই ফিরছি। আমাদেরই মানুষের একটা অংশ এই বুনোরা। ওরা এক সময়—ধরো প্রায় দুশো বছর আগে কোম্পানির আমলের শুরুতে এ দেশে আসে ছোটনাগপুর থেকে। জঙ্গল কেটে ওরাই এদিকটায় মানুষের বসতি করে। এই কাজেই ওদের এনেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারপর কত বছর কেটে গেছে। রেললাইন বসেছে। কলেজ হয়েছে। ইলেকট্রিক এসেছে জায়গায় জায়গায়। কিন্তু বুনোরা যেমন

এসেছিল ঠিক তেমনই আছে। ওদের কোনও উন্নতি হয়নি। এই বিশাল ভারতবর্ষের কথা যখন ভাবি তখন আমার মাথা ঘুরে যায়। কত ভাষা । কত লোক। কী পরিমাণ সব অন্যায় আমরা চাপা দিয়ে রেখেছি। বুনোদের কোনও উন্নতি হয়নি। অথচ ওরাই জঙ্গল হাসিল করে জায়গায় জায়গায় বসতি গড়ে দেওয়ার কাজ করেছে।

ট্রেন দৌড়চ্ছে। কামরাগুলো লাইন পালটাচ্ছে। তার খটাখট শব্দ। ভবানীর কথাগুলো টুনুর মাথায় ভেতর চেপে বসছে। মানচিত্র দেখে দেশ বোঝা যায় না—তা বোঝে ভবান। জায়গায় জায়গায় দেশটা যে কী হয়ে আছে। তার ওপর আছে নানা চেহারার দলাদলি।

ভবানী বলল, আমার মনে হয়—আমরা স্বাধীনতা থেকে খুব দূরে নেই। সবাই মিলে হাত দিলে আরেক ধাক্কা মাত্র। কিন্তু—

কিন্তু কী ভবানীদি ?

আমরা সবাই মিলতে পারছি কোথায় ?

খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই। ট্রেনটা দুলতে দুলতে চলছে। ভবানীদি ফর্সা নয়। সাদা শাড়ির সবুজ পাড়। পায়ে দুই স্ট্র্যাপের স্যান্ডেল। কাঁধে খদ্দরের ব্যাগ। ভবানীদিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

খুলনা স্টেশনে নেমে ভবানী বলল, টুনু চল, আমার সঙ্গে। সাইকেল রয়েছে। তুই পেছনে ক্যারিয়ারে বসে আমার সঙ্গে যাবি।

তুমি প্যাডেল করবে—আর আমি পেছনে আরাম করে বসে যাব। তা হয় না ভবানীদি।

পুরনো আইডিয়াগুলো ছাড় তো। আমি একজন মেয়ে বলে কি মানুষ নই ? সময় বাঁচবে। দিব্যি ক্যারিযারে বসবি।

না। তুমি যাও। আমি ঠিক হেঁটে ফিরে যাব।

কলেজের ছেলেদের ভিড় ছাড়াও দৌলতপুরের দিককার ব্যাপারিরা এই ট্রেনে খুলনায় গস্ত করতে আসে। ডালা হাতে তাদেরও ভিড়। সেই ভিড়ে মিশে গিয়ে টুনু প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে পড়ল। স্টেশন থেকে এই রাস্তাটা যশোর রোডে এসে পড়েছে। বাঁয়ে এগিয়ে ফেরিঘাট রোড। সেই রাস্তা ধরে এগোলে সিধে গিয়ে শ্রীশনগরের গেট।

আকাশে ঝিমানো সূর্য, বিকেল শেষ হয়ে এল। কতরকমের লোকজন। টুনুর মনে হল—ভবানীদি কী করে বলল—স্বাধীনতা আর বেশি দূরে নয় ? তার মানে ইংরেজ চলে যাওয়ার সময় এসে গেছে ? সারা খুলনায় খোঁজ করলে দেখা যাবে—কোনও না কোনও বাড়িতে—কেউ না কেউ গত কুড়ি বছরে জেলে গেছে। কাউকে কাউকে বছরের পর বছর জেলায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ জেলে যায়—কিছুদিন বাইরে থাকে—আবার জেলে যায়। আমাদের বাড়িতেই কেউ কোনওদিন জেলে যায়নি। বাবা একা চাকরি করে সংসার চালান। আমরা কেউ জেলে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি না। আমাদের মতো

ফ্যামিলিও অনেক আছে। লবণ সত্যাগ্রহের সময় আমি ক্লাশ ফোরে পড়তাম। তখন রূপসার ওদিকটায় নদীর জল জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি করা হয়েছিল। বড় বড় মাটির জালায়। গোরা সোলজার এসে সব ভেঙে দিয়েছিল। নন্ কো-অপারেশনের সময় সে নেহাত শিশু ছিল। বিকেলটা যেন ব্যথায় থর থর করে কাঁপছে। নন্ কো-অপারেশনের সময়ের কথা পরে সে লোকের মুখে শুনেছে।

বাড়ি ফিরে এসে টুনু অবাক হল। সামনের দরজা খোলা। শোয়ার ঘরের দিকটায় বড় বারান্দায় খোকন আর পাশের বাড়ির বজলুর খেলছে। তনু বাড়ির সামনের মাঠে দাড়িয়াবাঁধায় মেতে আছে। পানু ফেরেনি। বাবা কোর্টে। মা কোথায় ? গৌর ?

টুনু সারা বাড়ি খুঁজে ছাদে গেল। না। সেখানেও মা নেই। নিশ্চয় গৌরকে নিয়ে কোথাও গেছে মা। কিন্তু কোথায় গেল !

হঠাৎ টুনু দেখল—পুকুরঘাটে উঁচু ধাপে গৌরের মাথা দেখা যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে টুনু দেখল—চৈত্র মাসে পুকুরের জল অনেকটা নেমে যাওয়ার মাকে খুব ছোট দেখাচ্ছে একেবারে শেষ ধাপে বসে মা। বিরাট দুই মশারি নিয়ে কাচতে বসেছে। একটা মশারি ঢিবি করে ধাপে রাখা। আরেকটা মা ঝুপঝুপ করে কাচছে। বিকেলের রোদ একদম সরে যাওয়ায় পুকুরের জলের গা ধরে আগাগোড়া কেমন অন্ধকার।

মা—

কে ! টুনু !

আবার তুমি কাচতে বসেছ ?

এই তো বিকেলে নিযে বসেছি। খুব ছারপোকা হয়েছিল। তোদের কামড়ায় গৌরকে নিয়ে যা তো।

তুমি উঠে এসো মা। আমি কেচে নিয়ে যাব।

তুই কলেজ থেকে এসেছিল। তুই কাচবি কি ? পাগল !

হাতের বইগুলো ধাপে রেখে টুনু তরতর করে জলের কাছে নেমে গেল।—ওঠো মা

একটা তো কাচাই হয়ে গেছে। আরেকটা—

টুনু কোনও কথা বলল না। দুটো মশারিই দলা করে হাতে নিল। জলে ভিজে ভাবী স্যাতো ওজন হয়ে গেছে জলে ভিজে। আর তাই তুমি কাচছ। নির্ঘাত বুকে ব্যথা হবে মা-

টুনু—

ওঠো তো।

সারা পৃথিবীতে যেভাবে সন্ধ্যা নামে ঠিক সেইভাবেই শ্রীশনগরে ঝুপ করে সন্ধ্যা নামল। গৌরকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে যেতে রত্না বললেন, তোর সবটাতে বাড়াবাড়ি।

টুনু বলল, রান্নাঘরের চাতালে বসে কেচে দিচ্ছি।

এমন করবি জানলে আমি আগেভাগেই মশারি দুটো সাজোওয়ালাকে দিয়ে দিতাম কোনও ল্যাঠা থাকতে না।

আলো নেই

মায়ের কথা শুনতে শুনতে খিড়কির দোর দিয়ে উঠোনে ঢুকে টুনু দেখল—পানু হেরিকেন ধরাচ্ছে। হেরিকেন জ্বলে উঠতেই সারা উঠোনের অনেকটাই আলোয় ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে বসে আজই ভবানীদি যা বলেছে—তার একটা কথা টুনুর মনে ভেসে উঠল। আমরা স্বাধীনতা থেকে খুব দূরে নেই। কথাটা যেন টুনুর মনের ভেতর বিরাট ঘূর্ণি হয়ে ঘুরছে। মশারি দুটো চাতালে রেখে টুনু ডাকল, পানু আয় তো। জল ঢালবি—

জল এই উঠোনেই আছে। কোণের দিকে। কুয়োর ভেতর। বালতি ফেলে তুলতে হবে। স্বাধীনতা থেকে খুব দূরে নেই আমরা। আশ্চর্য ! এই কথাটা তো আগে এভাবে কেউ টুনুকে বলেনি কোনওদিন । এই তো বছর দেড়েক আগে ভোট হয়ে গেল। তাই নিয়ে সারা দেশ জুড়ে কী মাতামাতি। সেদিন পলিটিকাল সায়ান্সের ক্লাশে স্যার বলেছিলেন,এই ভোট একটা ফার্স মাত্র। সারা দেশে বড়জোর দশ থেকে বারো পার্সেন্ট লোক ভোট দিয়েছে। ভোটের এমনই শর্ত ছিল—যাতে কিনা সাবালক মানুষজনের ভেতর দশ বারো পার্সেন্টের বেশি ভোটই দেবার অধিকার পাযনি। ভবানীদির হিসেব মতো যদি তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা আসে তো একদিন আজাগোড়া গাঁয়ের বুনোরাও অবাধে ভোট দিতে পারবে।

রত্না দেখলেন, পানু জল ঢালছে। আর টুনু থুপ থুপ করে মশারি কাচছে। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, এই তোর মশারি কাচা হচ্ছে ? নে—সর—

ফেরদৌস আর অঞ্জলি বিকেল থেকেই এ-জঙ্গল সে-জঙ্গল করে বেড়াচ্ছিল। প্রথমে অঞ্জলি বলল, দ্যাখো ফিরু—চালতা ফুল একদম গাছের মাথায় থাকে। ঝড়ে ঝরে না পড়লে পাওয়া যায় না।

বেলা তখন চারটে। শ্রীশনগরের বাইরে চাটুজ্যেদের জমিতে জোড়া চালতা গাছের মাঠ। ফেরদৌস ক্লাশ নাইনে উঠেছে। অঞ্জলি এইটে। শ্রীশনগর থেকে বেরিয়ে যতীন সিংঘির মাঠে যাবার পথে ভাঙা সুরকি কলের সামনে বকুলতলায় অঞ্জলির সঙ্গে দেখা ফেরদৌসের। ফেরদৌস সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

অঞ্জলি রীতিমতো বাযনা ধরে বলল, একদিনও নদীর ধারে যাইনে আমরা। একদিনও রেনেখামার ছাড়িয়ে আমরা পল্লীমঙ্গল পেরিয়ে খুলনার বাইরে যাইনি ফিরু।

ফেরদৌস অনেকটা লম্বা। বিস্কুট রঙের ট্রাউজারের ওপর কলারতোলা সাদা গেঞ্জি। ধ্যাড়ধেড়ে লম্বা হয়েছে ফেরদৌস ! অঞ্জলিকে সে ইদানীং ছোটো করে ডাকে—অলি। এই অলির কথা বলার ঢঙে সে রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। এভাবে তো অলি বড় একটা কথা বলে না। সে একটু ঘাবড়ে গিয়ে অলির মুখে তাকাল। চোত মাসের গরমে অঞ্জলি ঘেমে উঠেছে। শাড়ি ধরেছে অল্পদিন। আজ আবার এলো করে ছোট্ট খোঁপা পিঠে ফেলে রেখেছে অলি। অবিশ্যি স্কুলে যায় ফ্রক পরেই। সামনের বছর নাইনে উঠলে শাড়ি পরেই যেতে হবে স্কুলে। ফেরদৌস কোনও কথা বলল না।

অঞ্জলি তখন বলল, বেশ। যদি কোথাও না নিয়ে যেতে পারো তো জোড়া চালতা গাছের মগডাল থেকে আমায় ওই সাদা ফুলে পেড়ে দিতে হবে। ঝড়ে ঝরে না পড়লে তো চালতা ফুল পাওয়া যায় না।

এ তল্লাটে সবচেয়ে উঁচু ওই একজোড়া চালতা গাছ। মগডালে বেশ কয়েক জায়গায় থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটে আছে। অঞ্জলি আর ফেরদৌস দেখা হলে এক একদিন এক এক দিকে যায়। অলির এ কথায় চালতা গাছের মগডালে তাকিয়ে ফেরদৌস বলল, যেগুলোকে তুমি ফুল ভাবছ—ওগুলো অনেক সময় কিন্তু ফুল নয় অলি।

তবে ?

আমি লক্ষ করে দেখেছি ফুলগুলো এক একদিন ডানা মেলে উড়ে যায়।

কী যা তা বলছ। আমি কি বাচ্চা মেয়ে নাকি ?

ঠিকই বলছি অলি। নীচে দাঁড়িয়ে দেখলে ফুল মনে হয়। অনেক সময় বক মগডালে বসে থাকে। ঢিল মারলে ডানা মেলে জায়গা বদলে বসে ওরা।

সব ফুলেই তো আর বক নয়। আমাকে পেড়ে দিতেই হবে আজ। আমি খোঁপা করেছি—ফুল বসাব বলে।

দুজনে হাটতে হাটতে চালতা গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল। বেনেখামারে যাবার লাল সুরকির রাস্তার পাশেই চাটুজ্যেদের ভিটেবাড়ি। বাগান। চারদিক সবুজ হয়ে আছে। তার ভেতর দুই ডানায় সবুজে মাখামাখি হয়ে ছোট ছোট লালচে পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। জলের ভারীরা কাঁধের বাঁকে টিন ঝুলিয়ে বাড়ি বাড়ি মাসকাবারি খাবার জল পৌছে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে রিকশা সাইকেল। গাবগাছতলায় ঝরা ফলের আশায় মুখ তুলে গরু দাঁড়িয়ে। বিকেল পড়ে আসছে।

সাইকেলটা ধরো।—বলে ফেরদৌস এগিয়ে গেল। গাছতলায় ছায়ার ভেতর শুঁড়তোলা দূর্বাঘাসের ডগায় ডগায় নালশে পিঁপড়ে। অঞ্জলি পায়ের স্যান্ডেল দিয়ে গোটা কয়েক পিঁপড়ে মাড়িয়ে দিল।মাড়াতে গিয়ে দেখল—তার শাড়ির পাড়ে চোরকাঁটা বিঁধে গেছে অনেক। এই শাড়িখানি অনেক দিনের। মা বেঁচে থাকতে কয়েকদিন মাত্র পরে তুলে রেখে গিয়েছিলেন।

গাছ বাইতে ওস্তাদ ফেরদৌস। সে তরতর করে ওপরে উঠে যেতে লাগল। উঁচুতে তাকিয়ে একবার ভয়ও হল অঞ্জলির। ফুল পাড়তে গিয়ে যদি পড়ে যায় ফেরদৌস ! অঞ্জলি দেখল, সত্যি সত্যিই দুটো বক মগডাল থেকে আরও উঁচুতে উঠে জায়গা পাল্টাল।

খানিকবাদে ফেরদৌস দুই থোকা চালতা ফুল পেড়ে নিয়ে নেমে এল।—ধরো। য পিঁপড়ে সারা গাছে।

ফুল হাতে নিল না অঞ্জলি। পিঠ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, খোঁপায় বসিয়ে দাও।

হাত কেঁপে গেল ফেরদৌসের । —আজ তোমার কী হয়েছে অলি ?

ফিরে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, কোথায় ! কিছু হয়নি তো। খুলনার

শ্রীশনগরে—যতীন সিংঘির মাঠের ধারাধারি—উপেন পেশকার—শশী পেশকারের মেয়েরা অনেকেই কাচ পোকার পিঠ কাঁচি দিয়ে কেটে দুই ভ্রূর মাঝখানে টিপ করে বসায়। খোঁপায় ফুল দেয়। এমনকি কানের পাশে কলকে ফুলও গুঁজে থাকে।

ফেরদৌসের হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল। সে আজ কিছু গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সেই তুলনায় অঞ্জলি হাসিখুশি। সে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে জানতে চাইল, কেমন দেখাচ্ছে আমাকে ?

ফেরদৌস চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সে কেমন বোকা হয়ে যাচ্ছে। তবু চাপা গলায় বলল, খুব সুন্দর লাগছে তোমায় অলি।

ওরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে যতীন সিংঘির মাঠের ধারে যতীন সিংঘির পুকুর পাড়ে গিয়ে বসল। শান বাঁধানো ঘাট। এই ঘাটে সকাল দুপুর আশপাশের মানুষজন নাইতে নামে। কোনও কথা নেই কারও মুখে। ফেরদৌস একটা ঢিল ছুড়ল জলে। গুব্ করে আওয়াজ হল। শেষে ফেরদৌস বলল, বাড়ি যাবে না ? অন্ধকার হয়ে এল—

অঞ্জলি উঠে দাঁড়াল।

বাড়ির সামনের বারান্দায় অঞ্জলির বাবা নলিনী ঘোষ তখন হেরিকেনের আলোয় কাগজ খুলে বসেছেন। কলকাতায় কাগজ খুলনায় পৌঁছতে বিকেল পড়ে যায়।

বাবা। কাকে সঙ্গে এনেছি দ্যাখো।

মুখ তুলে তাকালেন নলিনী ঘোষ। —ওঃ ! ফেরদৌস ? ভাল হল তুমি এসেছ। অনেকদিন গল্প করা হয় না।

ফেরদৌস এখন বাড়ি গিয়ে পড়তে বসবে বাবা। ও কি তোমার সমবয়সী বন্ধু নাকি বাবা !

তবু তো ওরই সঙ্গে দু-চারটে কথা হয় ।

ফেরদৌস হেসে বলল, আমি আর কী কথা বলব ! কথা যা তা আপনার মুখ থেকেই শুনি।

এই দ্যাখো—কাগজে লিখেছে—হকসাহেবের মন্ত্রিসভা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শ্রী' মনোগ্রাম বদলে দেবে।

হ্যাঁ। ওটা পাল্টানো দরকার। শ্রী তো সরস্বতীর চিহ্ন।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে অন্ধকারে অঞ্জলি দাঁড়িয়ে পড়ল।

নলিনী ঘোষ কিন্তু একটুও দমে গেলেন না। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, ইতিহাসের চাকা এইভাবেই ঘোরে বাবা।

ফেরদৌস কোনও কথা না বলে চুপ করে তাকিয়ে রইল। এই মানুষটি কথা বললে ইতিহাসের অনেক কথা বেরিয়ে আসে। হাতের কাগজখানি ভাঁজ করে রাখলেন নলিনী ঘোষ। অন্ধকার ঘরে হেরিকেনের আলো যতটুকু এসে পড়েছে—তাতে আয়নায় নিজের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল না অঞ্জলি। মাথা এক পাশ করে কালো খোঁপার ওপর সাদা চালতা ফুলটা

দেখার চেষ্টা করল। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে লোকজনের চলাফেরা। কথাবার্তা। ফুলটা
এত কম আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

নলিনী ঘোষ বলতে লাগলেন। ইতিহাস ফিরে আসে ফেরদৌস। যে সরকারি
বাঁটোয়ারায় ক' বছর হল বাঙালি হিন্দুকে মাইনরিটিতে ঠেলে দেওয়া হল—তা গোলমেলে।

এ কথা বলছেন কেন ? বাংলায় তো আমরাই মেজরিটি।

ছ-সাত বছর আগের শেষ আদমসুমারিতে বাঙালি জাতিকে চিরকালের মতো দু ভাগ
করে ফেলা হয়েছে ফেরদৌস। মেজরিটি—মাইনরিটির ফারাক অতি সামান্য। কিন্তু এটা
এড়াবার উপায় ছিল না। তিরিশ বছর আগে আমরা যখন স্কুলের ছাত্র—তখন হিন্দু
জমিদারদের ভেতর থেকই বেশির ভাগ কাউন্সিলর নেওয়া হয়েছিল। সেবারই প্রথম হিন্দু
মুসলমানের আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা হল। আজ যেমন বাঙালি হিন্দু অপমানিত, তাকে
ঠেলে মাইনরিটি করা হয়েছে। তিরিশ বছর আগে তেমনই বাঙালি মুসলমান অপমানিত
হয়েছিলেন। ইতিহাসের চাকা তো ফিরে আসবেই।

ফেরদৌস কোনও কথা বলল না। অঞ্জলি এসে অন্ধকার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছে
নলিনী ঘোষ বললেন,কলকাতা করপোরেশনেও আইন বদলাবে। সেখানেও আলাদা
ইলেকশনের ব্যবস্থা হতে চলেছে। আসলে সবাই তার নিজস্ব অস্তিত্ব স্পষ্ট করে তুলতে
চায়। এটাই নিয়ম ফেরদৌস। অ্যারিস্টটলের নাম শুনেছ ?

না।

তিনি একটি পরিষ্কার কথা বলে গেছেন কতকাল আগে। সব সমাজই তার নিজের
অস্তিত্ব বজায় রাখতে তার মনোমত এডুকেশন সিস্টেম চালু করে থাকে। যাতে এই পৃথিবীর
মাটির ওপর তার নিজের সত্তা উঠে দাঁড়াতে পারে। আমি তো মনে করি এটাই স্বাভাবিক
তিরিশ বছর আগের অপমান এবার অন্যভাবে ফিরিয়ে দেবে এক সমাজ—আরেক
সমাজকে।

ফেরদৌস বেশিরভাগ কথাই বুঝতে পারল না। অন্ধকার শূন্যের দিকে নলিনী ঘোষ
তাকিয়ে আছেন। অঞ্জলি তার বাবার কথা এক বর্ণও বুঝতে পারেনি ।

আলো নেই

লাটু মাঝির নৌকো গিয়ে শেষরাতে মোরেলগঞ্জে ভিড়ল। মোরেলগঞ্জের ঘাট বলে আলাদা কিছু নেই। কাঠের পাটাতন পাতা। ডাঙায় একটি কাঠের ঘর। তাতে মোটা করে সাদা রং লাগানো। সামনে নদী বলতে যতদূর দেখা যায় জল। আর কিছু এগোলেই সমুদ্র।

লাটু মাঝি বলল, আমরা আসি পড়িছি কর্তা। অনন্ত ঘোষাল বজরার বড় ছইয়ের ভেতর মোটা করে পাতা বিছানায় মোটা কম্বল নাক অব্দি টেনে ঘুমোচ্ছিলেন। মুখটা বের করে বললেন, আলো ফুটুক। তারপর ডাঙায় পা দেব লাটু।

কিন্তু একটু পরে যে ডাকের লঞ্চ আসি ভেড়বে। তাদের জায়গা ছাড়ি দিতি হবে কর্তা।

লঞ্চ অ্যাতো ভোরে আসবে না লাটু।

অনেক সময় আসি যায় কর্তা। এটা তো লঞ্চ কোম্পানির ঘাট।

সবই জানেন অনন্ত ঘোষাল। তিনি বিরক্ত হয়ে সুখের বিছানার ভেতর থেকে বেরোলেন। ডাকের লঞ্চ কালীগঞ্জ, বাগেরহাট হয়ে সারারাত জল ভেঙে তবে ভোর ভোর মোরেলগঞ্জ এসে হাজির হয়। ঘাটে নেমেই দু-তিনখানা গোলাদারি দোকান। এই লঞ্চে গোলদারিদের মালপত্তর আসে। কেরোসিন তেল, সর্ষের তেল, গুড়, মশল্লাপাতি, তামাক এমনকি ডি গুপ্তের ম্যালেরিয়ার পাঁচন—বোতল বোতল।

গলায় রোঁয়া ওঠা চাদরখানা ভাল করে পেঁচিয়ে অনন্ত ঘোষাল খুব সাবধানে লঞ্চঘাটার পাটাতনে পা রাখলেন। আকাশ সবে ফর্সা হচ্ছে। গোলাদারি দোকানগুলোর ঝাঁপ এখনও খোলেনি; দরমার বেড়া। ওপরে ঢেউ টিন। চালের মগে টিন কেটে চাঁদ তারা। পর পর আমিরুদ্দিন, তোফাজ্জল আর নৌশেরের দোকান। সাবাইকে চেনেন। এখানে প্রায় সবাই মুসলমান।

ডাঙায় উঠে পায়ে চলার লিকের পাশে দূর্বাঘাসের ডগায় শিশির। রাস্তা সবই চেনা

অনন্তর। তিনি বহুবার এসেছন। গোলদারি দোকান পেরিয়ে বড় নদীর সমানে সমানে কাটাখালের ওপর কাঠের সাঁকো পেরোতেই কয়েকটি মুরগি তাঁকে কোঁকোর কোঁ-ও করে স্বাগত জানাল।

মোরেলগঞ্জ বলতে এই লঞ্চ ঘাটটুকুই। আর লঞ্চ কোম্পানির ওই সাদা রঙের কাঠের ঘরটুকুই। গোলাদারি দোকান তিনখানির পেছনেই ধু ধু মাঠে। এখানে সেখানে খোড়ো ঘর। নয়তো গোলপাতার চাল। অনেক দূরে স্টিমার কোম্পানির বাতিঘর। জঙ্গলের ভেতর থেকে গেঁথে তোলা ইটের গোলঘরের ডগায় আগে রাত হলে বাতি দেখা যেত। এখন নাকি সে সব খাঁ খাঁ পড়ে আছে। স্টিমার কোম্পানি তাদের রুট বদলে ফেলেছে।

গোবর নিকোনো এক তকতকে উঠোনে ঢুকে পড়লেন অনন্ত ঘোষাল। নদীর সাদা বুক এখানে দাঁড়িয়েও পরিষ্কার চোখে পড়ল। নদীর আকাশে এখনও দু' একটা তারা মুছে যায়নি।

হাসিমুদ্দিন-- ও হাসিমুদ্দিন--

কেউ সাড়া দিল না। গোয়াল থেকে গরু ডেকে উঠল। কড়া, ভারী গলায়--

আবার ডাকলেন অনন্ত ঘোষাল। হাসিমুদ্দিন আছ নাকি ?

ঝাঁপটানা ঘরের ভেতর থেকে এবার সাড়া এল, কেডা ?

বাইরে বেরিয়ে এসে দ্যাখো।

বেশ খানিকটা দাঁড়াতে হল অনন্তকে । ঝাঁপ খুলে কাঁথায় মোড়া একটি মাথা বেরিয়ে এল আগে। তারপর শরীরটা। টকটকে ফর্সা হাসিমুদ্দিন। বয়স বড়জোর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ।

আরে কর্তা যে ! বলতে বলতে লম্বা শরীরের হাসিমুদ্দিন এক ঝটকায় কাঁথা খুলে ফেলে মাটির ধাপ ডিঙিয়ে একদম উঠোনে। —কতক্ষণ দাদাবাবু ?

এই তো ঘাটে নৌকো থেকে নামলেন। —বলতে বলতে অনন্ত ঘোষাল দেখে বুঝলেন, ধানঝাড়া সারা। তড়পা বেঁধে খুব সাজানো। হাসিমুদ্দিনের কাজ খুব পরিষ্কার। একাই সেই অনন্ত ঘোষালের জমি ভাগে করে না। তবে অন্যদের ভেতর সে-ই সবচেয়ে বড় চাষি।

ঘোমটা টানা একটি বউ বেরিয়ে এসে বাঁ হাতে বড় একখানা পিঁড়ি মাটির বারান্দায় পেতে দিয়ে অনন্ত আর হাসিমুদ্দিনকে পাশ কাটিয়ে উঠোনে নামল। তারপর বারান্দায় খোঁদলের ঝাঁপ খুলে হাঁস-মুরগিদের বের করে দিল। তারা এই উৎফুল্ল সকালকে নিজের নিজের গলায় ডাক তুলে ভরভরাট করে ফেলল পলকে।

বসেন। বসেন আপনি। সুরাইয়া--চা আছে তো। ভাল করে কর দাদাবাবুর জন্যি।

চা লাগবে না এখন। বরং একটা দাঁতন যদি দাও--

সুরাইয়া উঠোনের আগল সরিয়ে মাঠে নেমে গেল। অনন্ত দেখলেন, দাঁতন গাছের বেঁটে ডাল মুচড়ে ভাঙছে হাসিমুদ্দিনের বউ। সকাল ফুটে উঠছে।

চিঠি পেয়েছ ?

না তো। হয়তো আজকের লঞ্চে এসে পৌছবেনে। বসেন দিনি আপনি আগে। নীকোয় ঘুম হইছিল ?

টেরই পাইনি কোথার থেকে রাতটা কেটে গেল।

দাঁতন করতে করতে অনন্ত ঘোষাল হাঁটতে লাগলেন। এদিকে ওদিক। এ জায়গা ঠিক লনার মতো নয়। মানুষের চেয়ে মাঠ বেশি।

আমি খবর করিগে সবাইরে—

এবার ধান হল কেমন ?

হইছিল তো ভাল। শেষ দিকি মাজরা পোকা এসে—

হাসিমুদ্দিন বেরিয়ে গেল। যাওয়ার রাস্তা বেশি নয়। আশপাশেই কয়েক ঘর ভাগচাষি। কালটার ভেতরে শীতের জোর বাতাস। নদীর বুক ছুঁয়ে ছুটে আসছে। মুখ ধোওয়ার জন্যে রাইয়া বদনা ভর্তি জল এগিয়ে দিল। এখানে পুকুরের জলেও কিছু নুন থাকে।

চায়ের বদলে বড় একটি খেরো ভর্তি করে টাটকা খেজুর রস এগিযে দিল সুরাইয়া।

খেতে খেতে অনন্ত জানতে চাইলেন, গাছ থেকে পাড়ল কে ?

আপনারা ভাইস্থা রাত থাকতি উঠে পাইড়ে রাখে।

কত রাতে ?

আমাদের এখানে তো কোনও ঘড়ি নেই। ত্যাখন আকাশে চাঁদ ছিল।

দেখতে দেখতে ঝমঝম করে সকাল এসে গেল। হাসিমুদ্দিনের বাবা বেঁচে নেই। াকা কলিমুদ্দিন আছেন। তাঁর বয়স হয়েছে। তিনি হাসিমুদ্দিনের ঘরের উল্টোদিকে কুঁজি তো ঘরে থেকে বেরিয়ে এলেন যখন—তখন চারদিক রোদে হাসছে।

কলিমুদ্দিন বললেন, এ কী কর্তা—আপনি তো আপনার আব্বাজানের মতো গায়ের ং পাননি। গান গাইতি পারেন ?

হাসিমুদ্দিনের সঙ্গে খবর পেয়ে এসেছে জালাল সর্দার, আনোযার, ইলিয়াস। াসিমুদ্দিন বলে উঠল, কী হচ্ছে চাচা ? সবাই কি গাইতে পারে ? কর্তা আদালতে বড় াকরি করেন। আপনি তো খুলনা গেলেন না কোনওদিন। শহরের আদবকায়দা কিছুই ানলেন না।

কলিমুদ্দিন ঘাবড়াবার লোক নন। তিনি পরিষ্কার বললেন, আমি কর্তার আব্বাজানের ান শুনছি। কী গলা ছেল। লম্বা মানুষ ছেলেন। দেখতিও খুব সুন্দর।

জায়গাটা যেন বড় নিজের লাগল অনন্তর। এরা সবাই কতদিনকার আত্মীয়। সইভাবেই কথা হচ্ছিল। কলিমুদ্দিন তাঁর ভাইপোকে বললেন, একবার খুলনে ঘুরোয়ে ানলি পারিস আমারে—

আপনি এই মোরেলগঞ্জের বাইরে কোনওদিন পা দেলেন না।

কলিমুদ্দিন বললেন,সারা বছর কাশতি কাশতি গেলাম। এই বুকের ব্যায়রামটা ামারে ছাড়ল না।

ডাক্তার দেখালে পারেন।

অনন্তর এ কথায় ডান হাত তুলে দেখালেন কলিমুদ্দিন। মোটা কাপড়ের ফতুয়ার বাইরে ডান হাতে তিন চারখানা তাবিজ। হাত নামিয়ে কলিমুদ্দিন বললেন, আপনি তো শহরে বন্দরের লোক। একটা কথা বলতি পারেন ?

কী ?

এ কথা কি সত্যি ?

কী কথা ?

আমরা মোসলমানরা নাকি ফের আবার দেশের রাজা হব ?

অনন্ত ঘোষাল কথাটা ধরতে পারল না।

ভাগে চাষ করে আনোয়ার। তিন বিঘের দুটো দাগ। সে বলল, চাচা বুঝোয়ে বলতি পারতিছেন না। আমি বলি কর্তা।

অনন্ত ঘোষাল তার মুখে তাকালেন। আনোয়ার কার ছেলে তা আর মনে নেই অনন্তর। আনোয়ার বলল, আপনি জিন্নাসাহেবের নাম শুনিছেন ?

হ্যাঁ। মুসলিম লিগের—

কায়েদে আজমের কথাটা বলতিছেন চাচা। বাগেরহাট মসজিদের ইমামসাহেব এখানে আসি ছেলেন। তিনিই সব বললেন। মিটিং হল।

হাসিমুদ্দিন বলে উঠল,কথা পরে হবে নে। ধান মাপতি হবে না ? যার যার বস্তা এই উঠোনে আনি ঢালো।

জালাল সর্দার আনোয়ারের চেয়ে বয়সে ছোট। আনোয়ারের তিরিশ হলে জালালের বড়জোর পঁচিশ। চোখ একটু কটা। চ্যাটালো বুক। ঠোঁট পুরু। খালি গায়ের ওপর মোটা চাদর জড়ানো। সে হাসিমুদ্দিনের কথায় কান না দিয়ে বলল, কায়েদ আজম বলিছেন—বাগেরহাটের ইমামসাহেব যা আমাগো বললেন, —সারা দেশের মোসলমানদের কাতারবন্দি হতে হবে। এক পতাকার নিচি এক হতি হবে। তা হলিই মোসলমানের রাজত্ব কায়েম হবে। মুসলিম লিগির পতাকা পুঁতি ইমামসাহেব ডাক দেলেন—বললেন, এ দেশ তখন আমাগে হবে—

অনন্ত ঘোষাল সকালের সুন্দর রোদের ভেতর উঠোনে উঁচু একখানা জলচৌকিতে বসেছিলেন। তাঁর চারদিকে কেমন অন্ধকার লাগল। তিনি বললেন, এখনও তো এ দেশ আমাদের জালাল।

সেরকম না। আপনি বুঝতি পারতিছেন না কর্তা। আনোয়ার বুঝিয়ে বলল। যখন আমরা আমাদের মালেক হব।

এখন কি তা নও তোমরা ?

কোথায় ! মাথায় ওপরে বসে আছে ইংরেজ। তারপরেই আপনারা। আপনারাই উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, দারোগা,মাস্টার।

তা কেন ? এখন তো বাংলার প্রধানমন্ত্রী হকসাহেব।

হ্যাঁ শুনতিছি—একটু একটু বদলাচ্ছে।

হকসাহেব তো কথা দিয়েছেন—মহাজনের সুদ কমবে। খাতকদের জন্যে ঋণ-সালিশি বোর্ড হবে। প্রজাস্বত্ব আইন হবে।

কলিমুদ্দিন বললেন, এ সব হলি তো ভালই।

মুসলিম লিগ তো হকসাহেবের সব কথা মেনে নিয়ে সরকার গড়েছে।

জালাল সর্দার বলল, আমি বাগেরহাটে গেছি। সেখানে শুনি আলাম অন্য কথা।

সবাই তার মুখে তাকিয়ে পড়ল।

জালাল সর্দার বলল, হকসাহেবের ইচ্ছে ছিল হিঁদুদের সঙ্গে হাত মেলায়ে গদিতে বসেন।

অনন্ত ঘোষাল বললেন, হিন্দু নয় জালাল। কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার হতে পারত।

তা ওই একই কথা কর্তা।

এক নয়, জালাল। সবাইকে নিয়ে—তোমার আমার মতো সবাইকে নিয়েই কংগ্রেস।

আনোয়ার বলল, সেই দিন নাকি আসবে যখন হকসাহেবরাও কায়েদে আজমের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়াবেন—এক পতাকার নিচি ?

অনন্ত ঘোষালের অনেক কষ্টে বললেন, আমরা সবাই তো একই কাতারের লোক। একই দেশের মানুষ।

লাটু মাঝি নৌকোয় রান্নার ব্যবস্থা করেছিল। অনন্ত ঘোষাল বলে দিলেন, না লাটু। আমি ওদের সঙ্গে খাব। আজ আমার খাওয়া ওদের সঙ্গে।

গোড়াতেই হাসিমুদ্দিনের ছেলে মেয়ে বউ—সবাই মিলে—ধামায় করে—গামলায় করে—বস্তায় করে ধান এনে ঢালতে লাগল। উঠোনের শেষদিকে নারকেল গাছের গোড়ায় ধান ঢিবি হয়ে উঠেছে। হাসিমুদ্দিন পা দিয়ে—হাত দিয়ে—ধান ঠেলে ঠেলে এক জায়গায় করছে।

অনন্ত ঘোষাল কলিমুদ্দিনের মুখে তাকালেন। তাকালেন জালাল, ইলিয়াস, আনোয়ারের মুখে। সবাই ধানের ঢিবির দিকে তাকিয়ে। এখানে বর্ষাকালে রোয়ার সময় অনন্ত কোনও দিন আসেননি। সেইসময় এক এক বছর ঘোর বর্ষার চারদিক ভেসে যায়। আবার খরার সময় জমি তার জায়গায় পড়ে থাকে। আকাশের নীচে এদের একমাত্র বড় চাকরি এই জমি। যে-বছর বৃষ্টি কম হয়—জলের অভাবে ধানে থোড় হলেও দানাগুলো চিটে হয়ে যায়।

উঠোনের এক একদিকে এক এক চাষি তার ধান এনে ফেলতে লাগল। নিকোনো উঠোন। হাঁসের দল প্যাঁক প্যাঁক করে পেছন পুকুর থেকে ফিরে এল। আট দশটা পাতিহাঁস। সুরাইয়া তাঁদের লাউমাচার নীচে ছায়ায় মাটির খোঁদলে ভাতের ফ্যান ঢেলে

দিতেই ওরা চক চক করে খেতে লাগল। ছ-সাতটা মুরগি মোরগ আশেপাশে ছোঁক ছোঁক করছে। দুটো গাই—দুটো বলদকে গোহাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অনেকক্ষণ। উঠোনে বসেই অনন্ত দেখতে পাচ্ছেন—একটা বাছুরকে নিয়ে গাই দুটো মাথা নিচু করে ধানকাটা মাঠে নতুন গজানো পাতি ঘাসে মুখ নামিয়ে দিয়েছে।

সারা দেশটা ছবির মতো। তাই লাগছে অনন্তর। এর ভেতর জালাল সর্দার আর আনোয়ারের কথাগুলো তাঁর মনের ভেতরটা কালো করে দিচ্ছে। সে তো সত্যিই একটা কথারও কোনও জবাব দিতে পারেনি। উকিল, মোক্তার,ডাক্তার, মাস্টার—বেশিরভাগই তো হিন্দু। তিনি হকসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির ইলেকশন ম্যানিফেস্টো পড়ে দেখেছেন। শোনা যায় এই ইলেকশন ইস্তেহারের মুসাবিদা নরেশ সেনগুপ্তর। তিনি একজন বড় উকিল। আবার নামকরা সাহিত্যিক বটে। প্রজা পার্টির ময়মনসিংহ কনফারেন্সে এই ইস্তেহারটি বের করা হয়েছিল। বছর দেড়েক আগে। তাতে তো পরিষ্কার বলা হয়েছে—সারা বাংলাদেশে বেশিরভাগ জমিদার হিন্দু। মহাজনরাও তাই। নরেশ সেনগুপ্ত লিখেছিলেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারি যেমন দেওয়া হয়েছিল—তেমনই জমিদারদের কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রজাদের ভালর জন্যে সে সব দায়িত্ব জমিদাররা বিশেষ পালন করেননি। তাই আজ সময় এসেছে—স্বায়ত্তশাসন পেয়ে আজকের সরকার সাধারণ প্রজার জন্যে সেইসব দায়িত্ব পালন করবেন। আইন করে। প্রজার কিছু করার কথা মুসলিম লিগ কখনও বলেনি। কংগ্রেসও কিছু বলেনি। তার প্রোগ্রামে চাষির জন্যে কোনও কথা নেই। কংগ্রেসের মেরুদণ্ড বলতে তো জমিদাররাই। তারা চাষির জন্যে কী বলবেন ! গত ভোটের অনেক আগে থেকেই হকসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি চাষিদের জন্যে কিছু করার কথা বলে আসছে। ভোটের আগে সমঝোতার জন্যে কলকাতায় ক্যামাক স্ট্রিটে মুসলিম লিগের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির বৈঠকের কথা কাগজে পড়েছেন অনন্ত ঘোষাল । বৈঠকটি বসেছিল লিগের ট্রেজারার ইস্পাহানিসাহেবের বাড়িতে। হকসাহেব যখন লিগকে বললেন, চাষিকে প্রজাস্বত্ব দিতে হবে—ঋণের বোঝায় বাঙালি চাষির পিঠ বেঁকে গেছে—সেজন্যে ঋণ মুকুব—ঋণ সালিশি বোর্ড করতে হবে—তখন লিগের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠক ভেঙে গেল। আজ কে না জানে—ভোটে সুবিধা করতে না পেরে সরকারে যাওয়ার জন্যে লিগ হকসাহেবের সব কথা মেনে নিয়েছে। যাঁরা জানেন—তাঁদের সন্দেহ—লিগ মন থেকে হকসাহেবদের কথা কতটা মানবে ? কেননা—মুসলিম লিগ তো নবাবজাদা, নাইটদের পার্টি। সেদিক থেকে কংগ্রেসের সঙ্গেই যেন লিগের খুব মিল। বাংলায় চাষিদের জন্যে কংগ্রেস আজও কোনও প্রোগ্রাম দিতে পারেনি।

ধামা মাথায় করে হাসিমুদ্দিন আর সুরাইয়া ধান ঢালছে। দু-দিকে। সমান সমান করে। একদিককার ধান জালাল সর্দার আনোয়ার আর ইলিয়াস বস্তায় ভরে মুখ বাঁধছে বস্তার। সূর্য খানিকটা ঢলে পড়ল।

হাসিমুদ্দিনের বড়মেয়ে ঘরের বারান্দায় পিঁড়ি থেকে ডাক দিল, আব্বা—সবাইরে

খাতি আসতি বলেন—ভাত জুড়োয় যাবে—

মাথায় ধামার ধান। ঢেলে দিয়ে হাসিমুদ্দিন বলল, তা হলি কর্তা এই পর্যন্ত। হাত ধুয়ে ন্যান। কী বা খাওয়াব আপনারে।

অনন্ত ঘোষাল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সিধে জালাল ওদের কাছে গিয়ে বললেন, বস্তায় মুখ খোলো।

কেন ? আপনার ভাগের ধান বস্তায় ভরে তবে না মুখ বাঁধিছি। ঢালব কেন ?

ঢালো তো। আমি বলছি ঢালো।

হাসিমুদ্দিন ছুটে এসে বলল, কেন ?কী হল কর্তা ? সমান সমানই তো ভাগ করলাম আপনার চোখির সামনে। কোনও ভুল করিছি ?

হ্যাঁ। একটা ভুল হয়েছে।

ভুল ? —বলে নড়বড় করে উঠে দাঁড়ালেন কলিমুদ্দিন।

খুব বড় ভুল হযেছে হাসিমুদ্দিন। ঢালো সব ধান। ঢালো। আমি বলছি ঢালো। এর একটা দানাও আমার নয়। আজ থেকে সব ধান তোমাদের।

কেন ? আমরা কী করিছি কর্তা ? কোনও গুনাহ্ করলাম ?

তোমরা কোনও পাপ করনি। পাপ করেছি আমি। বছরের পর বছর ধান নিয়ে যাচ্ছি আমি। এথচ এ জমি আমার বাবা বিয়ে করে যৌতুক পান। আমার নানাসাহেব এ জমি পান তার আব্বাহুজুরের কাছ থেকে। নানাসাহেবের আব্বাহুজুর হয়তো জমিগুলো কিনেছিলেন। কী বা দাম ছিল তখন এ সব জমির ? —ধরো আজ থেকে একশো বছর আগে তাঁর কেনা।

ঢেলে দেওয়া ধান নিয়েই পা দিয়ে হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে অনন্ত ঘোষাল হাসিমুদ্দিনের ভাগের ধানের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে লাগলেন। সারা উঠোনে কারও মুখে একটি কথা নেই। বাড়া ভাত ঠাণ্ডা হচ্ছে বারান্দায়। কেউ খায়নি এখনও।

অনন্ত ঘোষালের ঘুম ভেঙে গেল।

কী হল ওগো ? ওঠো। উঠে বসো। বোবায় ধরেছে তোমাকে—

অনন্ত ঘোষাল অন্ধকারে টের পেলেন, রত্না তাঁর বুকে হাত বোলাচ্ছেন। তিনি আস্তে বললেন, এক গ্লাস জল দাও তো।

মশারির ভেতর উঠে বসে ঢক ঢক করে জল খেলেন অনন্ত ঘোষাল। তারপর গ্লাসটা রত্নাকে দিয়ে বললেন, একবার হেরিকেনটা ধরাতে পারবে ?

খাটের নীচেই আলো কমানো আছে—বলে হেরিকেনটা বাড়িয়ে রত্না তুলে ধরলেন হাতে।

মশারি খুলে অনন্ত ঘোষাল খাট থেকে নামতে নামতে দেখলেন, পর পর তাঁর তিন ছেলে মশারির ভেতর অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তনু, খোকা, গৌর। মুখে তিনি বললেন, একবার চলো তো আমার সঙ্গে।

কোথায় ?

পাশেই। ভাঁড়ারঘরে—

রীতিমতো অবাক হয়ে রত্না ঘোষাল হেরিকেন হাতে দরজা ঠেলে ভাঁড়ারঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুটো ইঁদুর শব্দ করে পালিয়ে গেল। আরশোলা ঘুরছে। সারা ঘরে গুড়, সর্ষের তেল, চাল,ডালের মিশে যাওয়া একটা গন্ধ।

আলোটা একটু নামাও তো।

কেন ?

চৌকির নীচেটা একটু দেখব রত্না।

কেন ? ওখানে তো চালের বস্তা পর পর ঠেসান দেওয়া।

ধান ? ধানের বস্তাগুলো কোথায় ?

ধানসুদ্ধ বস্তাগুলো রান্নাঘরের পাশের ঘরে রয়েছে। ভাঙানো হয়ে গেলে এ ঘরে নিয়ে আসা হবে।

চল তো একবার দেখে আসি।

এখন ? এত রাতে দেখব ? দেখার কী আছে ? সব তো ঠিকই আছে। শোবার আগেও দেখেছি।

চলো না তবু।

ভাঁড়ার ঘরের ভিতর দিয়ে বাড়ির ভেতরকার বারান্দায় এলেন দুজনে। সারা শ্রীশনগর ঘুমোচ্ছে। আঁচলের চাবির গোছা থেকে চাবি খুঁজে নিয়ে তালা খুলে রান্নাঘরের শেকল নামালেন রত্না। হেরিকেন হাত পাশের ঘরে ঢুকলেন।

মনে মনে কী ঠিক করতে করতে বস্তাগুলো দেখতে লাগলেন অনন্ত। ধানে বোঝাই। পর পর সাজানো। রত্না বুঝতে পারছেন, তাঁর স্বামী মনে মনে বস্তাগুলো গুনছেন। পর পর। এক দুই তিন করে। মোট ষোলোটা বস্তা আছে। ভাঁড়ারে চাল কমে এলে একটা করে বস্তায় ধান সেদ্ধ করা হবে। শুকিয়ে নিয়ে তারপর ভাঙিয়ে এনে ঝেড়ে বস্তায় ভরা হবে চাল।

রত্না কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি একটু ভয়ই পেয়েছেন। মুখে বললেন, চলো— শোবে চলো। কত রাত খেয়াল আছে ?

চলো।

শেকল তুলে তালা দিয়ে রত্না দেখলেন, তাঁর স্বামী তখনও দাঁড়িয়ে। বারান্দায়। অন্ধকার উঠোনের দিকে তাকিয়ে।

হাত ধরে তিনি স্বামীকে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকলেন। এর পরেই শোবার ঘর। হেরিকেনটা কমিয়ে খাটের নীচে রেখে রত্না বললেন, কী ? কোনও স্বপ্ন দেখেছ !

খুব ভোরে খোলা জানলা দিয়ে ছোট্ট একটা ঢিল এসে টুনুর গায়ে লাগাতেই তার ঘুম ভেঙে গেল।

পাশেই পানু ঘুমোচ্ছে। পাজামা পরে শুয়েছিল টুনু। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে ়াগল তার। একঘুমে রাত কাবার হয়ে গেছে। কিন্তু এই সময় ঢিল ছুঁড়ে কে ইয়ার্কি মারল! ়ঠে বসে ছোট্ট ঢিলটা কুড়িয়ে নিয়ে জানলায় তাকাতেই টুনু দেখতে পেল, হাসি হাসি মুখে ভবানীদি দাঁড়িয়ে। ডান হাত সাইকেলের হ্যান্ডেলে।

চাপা গলায় ভবানী বলল, যাচ্ছিলাম—দেখি তুই ঘুমিয়ে। সাইকেল থেকে নেমে ়াগিয়ে দিলাম। আয়—

কোথায়?

এমন ভোরে কেউ ঘুমিয়ে থাকে! আয় বলছি। একটা কথা আছে।

টুনু দেখল, ভবানীদি শাড়ির আঁচল টাইট করে কোমরে পেঁচিয়েছে। সেই একই রঙের ়াড়ি—যা সব সময় পরে থাকে। খালি পা, বাঁ হাতে কয়েকগাছা কালো কাচের চুড়ি। ডান ়াতে কিছু নেই। খদ্দরের ব্লাউজটাও খদ্দরের সাদা খোল শাড়ির মতোই ঝকঝকে ফর্সা। ়বে কোনও ইস্ত্রি নেই। মাথায় বড় করে খোঁপা। তাতে একথোকা সাদা ফুল। বোঝাই ়ায় পথে বেরিয়ে রাস্তায় কারও বাগান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ভবানীদি খোঁপায় গুঁজেছে। কী ়ল চেনা গেল না। ভোরের আলোর সঙ্গে অল্প অন্ধকার।

পাজামার ওপর হাফশার্ট। টুনুও খালি পায়ে বেরিয়ে এল। এক পা প্যাডেলে। ়ারেক পা মাটিতে। সেই অবস্থায় ভবানী চাইল, কোথায় বসবি? সামনে? না, ়্যারিয়ারে?

পেছনেই বসি।

টুনু বসতেই ভবানী পাকা সাইক্লিস্টের মতোই সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে নিল বেনে- ়ামারের দিকে।

কোথায় যাবে?

চল্ না।

উঁহু। কোথায় যাবে বলো। আমার তো কলেজ আছে।

সাইকেল চালাতে চালাতে ভবানী বলল, খালিশপুর যাব। একটা খবর আছে।

বেশ কিছুক্ষণ মাটির রাস্তা। যতীন সিংঘির মাঠের কাছে এসে সুরকির লাল রাস্তা। ়া দিকে গেলে বেনেখামার। ভবানী ডাইনে স্টেশনের পথ নিল।

ক্যারিয়ারে বসেই টুনুর চোখের সামনে ভবানীর ঘেমে যাওয়া পিঠ। খদ্দরের ব্লাউজ ভিজে উঠেছে। প্রায় ভেঙে পড়া খোঁপা। দুই পা প্যাডেলে নামছে। উঠছে।

খালিশপুর থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। শেষে কলেজে যাওয়া হবে না। তুমি ়ামাকে নামিয়ে দাও।

নামবি। নামবি। একটা খবর আছে। —বলতে বলতে ভবানী কিন্তু সাইকেল থামাল ়া। টুনু বুঝতে পারছে—তাকে পেছনে নিয়ে চালাতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তবু থামার নাম ়েই। সুরকির রাস্তা ছাড়িয়ে যশোর রোডের পিচরাস্তা। তারপর ঝামা বসানো স্টেশন

রোড। সেখান থেকে ভৈরবের গা ধরে এবার রেলের ইঞ্জিনের পোড়া কয়লার ঘেঁষ ফেল
রাস্তা। শিববাড়ির পথ। শিববাড়ি পেরিয়ে খানিক গেলে তবে খালিশপুরের জঙ্গল।

তোমার পা ব্যথা হয়ে যাবে—

হোক।

শেষে দুই উরু ব্যথায় টাটাবে কিন্তু।

একটু টাটাক। তুই ঠিক হয়ে বোস। আমার উরু টাটাতে দে টুনু—

ভাল করে আলো ফুটতে ফুটতে সাইকেল শিববাড়ি বাঁয়ে ফেলে এগিয়ে গেল। ডা
হাতে ভৈরব চলে গেছে দৌলতপুর কলেজের দিকে। ভোরের নদীতে ঠাণ্ডা বাতাস। এখানে
সেখানে কচুরিপানা ভেসে চলেছে। ভৈরব মানুষের ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে ফিরে যশো
গিয়ে হাজির হয়েছে। টুনুরা দৌলতপুর কলেজের ক্লাশঘরে বসেও ভৈরবের বুক দেখ
পায়। মাঝে মাঝে পালতোলা নৌকা। কখনও গাদা বোট টেনে নিয়ে স্টিমার চলে
রূপসার দিকে। এবার খালিশপুরের জঙ্গল এসে গেল।

জঙ্গল মানে বাঘভালুকের জঙ্গল নয়। পুরনো পুরনো গাছ । শিশু,আঁশফল গাছ
আম গাছও আছে। বেযাড়া সাইজের। সব গাছই ফল দেওয়ার বয়স পেরিয়ে গেছে
তাদের গায়ের বাকল খসে পড়ে পড়ে। কেননা—পিঁপড়ে আর পরগাছায় গাছগুলোর শরী
স্বাস্থ্যের আর কিছুই রাখেনি। মাঝে মাঝে কাঠকুড়োনির দল গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে যায়

তাদের ভেতরেই সাইকেল থেকে নেমে পড়ল ভবানী। তার সারা মুখে ঘাম। নিঃশ্বা
বড় বড় হয়ে পড়ছে। ডান হাত সাইকেলের হ্যান্ডেলে। এলো খোঁপাটি ভেঙে পড়লেও মা
ভর্তি কালো চুলের ভেতর সাদাটে ফুলের থোকাটি দিব্যি গেঁথে আছে।

কী খবর আছে বলছিলে ?

হ্যাঁ। তোদের দিলীপদা এই জঙ্গলে ক'দিন হল ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে।

ঠিক বুঝতে পারল না টুনু। কে দিলীপ ?

আঃ ! তাও ভুলে মেরেছিল। আমার স্বামী দিলীপ—যে সাধু হয়ে গেছে। নাগাদে
সঙ্গে থাকে নাকি।

চমকে উঠল টুনু। সন্ন্যেসি দিলীপদা ! তোমার স্বামী ! এই জঙ্গলে ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যা
করছে ?

ধ্যান না ছাই ?

ভোরবেলার পাখিরা নিজেদের ভেতর ঝগড়াঝাটি, খেলাধুলো সবই করে চলেছে
একটা বুড়ো জামরুল গাছ থেকে সড়াৎ করে একটা হনুমান নেমেই পাশের গাব গাছে দি
উঠে গেল।

ভয় পাসনে টুনু।

টুনু চমকে গিয়েছিল। আগে কখনও সে খালিশপুরের জঙ্গলে ঢোকেনি। দৌলতপু
থেকে কলেজের শাটেল ট্রেন খুলনার ফেরার পথে কামরার জানলায় বসে এই জঙ্গল

সে একপাশ থেকে রোজই দেখে। গাছপালা কমে এসেছে। তবে লতাপাতায় জায়গায় জায়গায় অন্ধকার। ভবানী সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে হাঁটছে। চাকা বুড়ো গাছের শেকড়ে পড়লে বাম্প করছে। সাইকেল চালানোর একটা খাটুনি আছে। তার ওপর পেছন একজনকে নিয়ে চালানো তো রীতিমতো ঝক্কি। ভবানীর হাতের ওপর বড় বড় ঘামের ফোঁটা।

এক জায়গায় এসে কাঁটাঝোপে আর এগোতে পারল না ভবানী। দাঁড়িয়ে পড়ল। টুনু জানতে চাইল, দিলীপদা কোথায় ? সঙ্গে কোনও নাগা সন্ন্যেসি নেই তো ?

পাই আগে। তারপর নাগা সন্ন্যেসি দেখাচ্ছি !

টুনু ওরফে ঋতবান ঘোষাল এবার পরিষ্কার টের পেল—তার পাশে পাশে হেঁটে যাওয়া—ডান হাত সাইকেলের হ্যান্ডেলে—ছাত্র কংগ্রেসের লিডার ভবানী নামে খুলনার এই মেয়েটি —তার চেয়ে কয়েক বছরের বড়—রীতিমতো সুন্দরী, সাহসী, ডাকাবুকো। একেবারে অন্যরকম। খুলনার আর কোনও মেয়ের সঙ্গে একটুও মিল নেই।

সাইকেলটা ধর তো—

টুনু দু'হাতে হ্যান্ডেল ধরল। ভবানী সাইকেলের ওপাশ থেকে ঘুরে এসে হাতজোড়া টুনুকে বলল, মুখটা ফেরা—

টুনুর হাত সাইকেলে। ঘাড় ঘুরিয়ে জানতে চাইল, কেন ?

তার কথা শেষ হল না। ভবানী তার ঘামে ভেজা দুই ঠোঁট টুনুর দুই ঠোঁটে জোরে চেপে ধরল।

এ কী ? কী হচ্ছে ? —বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়ানো টুনুর হাত থেকে সাইকেলটা কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সরাসরি টুনুকে জড়িয়ে ধরে রীতিমতো খেপে ওঠা ভবানী বেশি কথাই বলতে পারল না। কোনও মতে বলতে পারল, অ্যাতো সুন্দর হয়ে ওঠা কেন ? কেন ?

টুনু এবার টের পেল, সে আগের চেয়ে কেমন শক্ত হয়ে যাচ্ছে—আর ফুলেও উঠছে। দুটি নরম ঠোঁট তার ঠোঁটে।

বর্ষার দেখা নেই। কিন্তু বর্ষা নামার ভাব করে সারা খুলনা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। শ্রীশনগরে চাটুজ্জেদ্যের চালতাবাগানের ঝরে পড়া শুকনো পাতা বাতাসে উড়ে উড়ে বেনেখামারে যাবার সুরকির রাস্তায় গিয়ে জমা হচ্ছে। বৃষ্টির আশায় পল্লীমঙ্গলের দিককার মাঠে যাদের জমি আছে—তারা আকাশে তাকিয়ে থাকে। বৃষ্টি পড়লেই মাঠে একবার হাল দেওয়া হবে।

সারা দেশে নানা জায়গায় জেল থেকে অনেকে ছাড়া পেল। কেউ কেউ প্যারলে ছুটি নিয়ে অসুস্থ মাকে দেখতে এসেছে জেল থেকে। আবার ফিরে যাবে। স্টিমারগুলো যে যার নদী দিয়ে যাতাযাত করে। দূরপাল্লার ট্রেন নিশুতি রাতে অন্ধকার মাঠের ভেতর দিয়ে গলা কাটা ভূতের মতোই ছুটছে। ঢাকার লাইনে একঘেয়ে কী শব্দ হয় বোঝা যায় না। অনেকে বলে—ট্রেন বলছে—ব্রিটিশ তুই কবে যাবি ? আজ যাবি ? না, কাল যাবি ?

এরই ভেতর কয়েক মাস হল কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সরকার গড়েছে। ভোটে জিতেও দ্বিধায় ছিল কংগ্রেস। ইংরেজ গভর্নরদের হাতে এত ক্ষমতা। ১৯৩৫-এর আইনে ভারতীয়দের আছে সামান্য স্বায়ত্তশাসন। এই অবস্থায় সরকারে গিয়ে কী লাভ ! ভোটে জিতে সরকার গড়েও কাজের কাজ কিছু করা যাবে না। তাই জওহরলাল, আজাদ, প্যাটেল—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনেকেই প্রদেশে প্রদেশে সরকার গড়তে চাননি। কিন্তু কয়েক মাস আগে কলকাতায় শরৎ বসুর বাড়িতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে সবাই বুঝতে পেরেছেন—সরকারে না গেলে দল ভেঙে যাবে। কংগ্রেসের ভেতর দল গড়ে অনেকেই সরকারে যেতে মরিয়া হয়ে পড়েছেন।

সাত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের নতুন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সভা ডেকেছেন। সেখানে জওহরলাল থেকে সর্দার প্যাটেল—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সবাই থাকছেন। সুভাষচন্দ্র দেশের জন্য পরিকল্পনা কমিশন গঠন করতে চান। আগামীদিনে দেশের উন্নতি কোন পথে হবে—তাই নিয়ে সারা দেশে অনেকেই স্বপ্ন

দেখছেন। কথা বলছেন। তর্ক করছেন।

কলকাতায় নিউ সিনেমা,চিত্রা সিনেমা হলের সামনে বেজায় ভিড়। টিকিট পাওয়ার উপায় নেই। 'সাথী' নামে একটি নতুন ছবি খুব চলেছে। নায়ক সায়গল। নায়িকা কানন। দুজনের ডুয়েট গান লোকের মুখে মুখে। সুর দিয়েছেন রাইচাঁদ বড়াল। পরিচালক ফণী মজুমদার। প্রমথেশ বড়ুয়ার সহকারি ফণীবাবুর এটি প্রথম ছবি। নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে।

নিউ সিনেমা ছবিঘরটি নিউ থিয়েটার্সের। এখন বিকেল। হঠাৎ বর্ষা নামল। সন্ধের শোয়ের টিকিটের জন্যে সেই একই ভিড়। নিউ সিনেমার দোতলায় নিউ থিয়েটার্সের অফিসঘরে সবাই বসে। নিউ থিয়েটার্সের মালিক বি এন সরকার তো আছেনই। আছেন বন্ধু অমর মল্লিক। পি এন রায়। সাথী ছবির পরিচালাক ফণী মজুমদারও রয়েছেন।

বি এন সরকার হাসি হাসি মুখে বললেন, ফণীবাবু, ভাল খবর আছে।

ঘরের সবাই বি এন সরকারের মুখে তাকালেন।

সাথীর হিন্দি ভার্সন 'স্ট্রীট সিঙ্গার'-এর' রিপোর্টও খুব ভাল। করাচি, লাহোর, পেশোয়ার--- সব জায়গাতেই হাউসফুল। বোম্বাইয়ের প্লে হাউস সিনেমা হলে ভিড়ের চাপ সামলাতে বেলা দশটায় একটা শো দিতে হয়েছে পুলিশ কমিশনারের স্পেশাল পার্মিশন নিয়ে।

বোম্বাইয়ে এখনও বৃষ্টি নামেনি। দুপুরবেলা। দেড়টা হবে। একজন সুন্দর স্বাস্থ্যের যুবক প্লে হাউস সিনেমা হলে স্ট্রীট সিঙ্গার-এর টিকিট কাটার চেষ্টা করেও টিকিট পেল না। বেলা তিনটের শোয়ে বিরাট লাইন। ফোর্থ ক্লাশের টিকিটের জন্য লাইনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিন চারটি ছেলে একসঙ্গে ধাক্কা দিয়ে যুবকটিকে লাইন থেকে বের করে দিল। এই খান ! ইঁহা কিউ ? শালে—

যুবকটি পিছিয়ে আসার মানুষ নয়। তার পরনে সালোয়ার কুর্তা। পায়ে জরিদার কাবলি। সে একবার চারদিক জরিপ করে নিল। নাঃ। আরও অনেকে আছে ওদের সঙ্গে। সে এখানে একেবারে একা। তবু সে বিড় বিড় করে বলল, শালে কাংরেস লোগ !

তারপর একা একাই সে হাঁটতে লাগল। চওড়া কাঁধ। বড় বড় উজ্জ্বল দুটি চোখ। মাথা ভর্তি কালো চুল। কুর্তার গোটানো হাত দুটির বাইরে বেরিয়ে থাকা হাত দুখানি শাবলের মতো। সে সবসময় মনে করে—সামনে কেউ বাধা দিলে তাকে উপড়ে ফেলব। যদি কেউ সামনে না আসে তা হলে নিজে নিজেই দুশমন তৈরি করে নিয়ে তার সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করে দেবে। সে খুব গান ভালবাসে। একটু আধটু গাইতেও পারে। স্ট্রীট সিঙ্গার ছবির একটি গান সবার মুখে মুখে ঘুরছে। সায়গলের গলায় বাবুল মেবা গানটি এখন বাইকুল্লা, দাদারের গলিতে গলিতে লোকের গলায়---গুনগুনানিতে শোনা যাচ্ছে। সে নিজেও একবার গেয়ে উঠল গুনগুন করে।

বড্ড গরম পড়েছে বৃষ্টির দেখা নেই। যেতে হবে সেই ইম্পিরিয়াল ফিল্ম

কোম্পানি তে। একটা কথা ‥ ঘুরেফিরে তার মনে আসছে। সে আর গাইতে পারল না গুনগুনানি আপনা আপনি থেমে গেল।

আজকের সকালের উর্দু কাগজে সে দেখেছে—সাত প্রদেশের কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসু এই বোম্বাইয়ে মিটিং করছেন। এই বোম্বাইয়ে প্রদেশেও কংগ্রেস জিতেছে। এখানে ওদেরই সরকার। তার মন বলল, একটু আগে স্ট্রীট সিঙ্গাব-এর টিকিটের জন্যে লাইন দিয়ে যে ব্যবহার পেলাম—এই ব্যবহার তো ওরা প্লে হাউস, মোহম্মদ আলি রোড, ভেণ্ডি বাজার, কেনেডি ব্যারাজ, ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানি এলাকায় আমাদের সঙ্গে করেই থাকে। শালে কংরেসি—

সে মুসলিম লিগের সাপোর্টার। তার কাছে কায়েদে আজম জিন্নাহ স্বপ্নের মানুষ। কিন্তু কাযেদে আজমকে চোখের দেখা দেখে—প্রমথবার সে খুব ধাক্কা খেয়েছিল।

যুবকটির বাড়ি দিল্লির কাছাকাছি গাজিযাবাদে। কাযেদে আজম দিল্লি আসছেন বলে অনেকের সঙ্গে সেও গাজিয়াবাদ থেকে মিছিল করে ট্রেনে দিল্লি এসে নেমেছিল। দিল্লির জামে মসজিদ থেকে মিছিল শুরু হয়েছিল। চাঁদনি চক, লালকেল্লা, হাউস খাস, চাউডি বাজার হয়ে মিছিল মুসলিম লিগ অফিসে গিযে শেষ হয়েছিল। কাযেদে আজম বসেছিলেন ছয় ঘোড়ার গাড়িতে। মোটর, মোটর সাইকেল, সাইকেল আর উটের প্রচণ্ড ভিড়। এই মিছিল দফায় দফায় মোড় ঘোরার সময় কায়েদে আজমকে দেখে সে খুব ধাক্কা খেয়েছিল। আমার কায়েদ-এ আজম এত রোগা মানুষ!

সে বোম্বাই এসেছে অভিনয়ের দুনিয়ায় ভাগ্য ফেরাতে। গাজিয়াবাদে থাকতে সে অনেক নাটকে অভিনয় করেছে। ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানির সর্বত্র জয়জয়কার। এই দুনিযায় ঢোকা যে খুব কঠিন তা সে জানে। যে কোনও উপায়ে অনেক চেষ্টা অনেক তদবিরের পর ইম্পিরিযাল ফিল্ম কোম্পানিতে সে এখন দৈনিক আট আনা রোজে একস্ট্রা হিসেবে কাজ নিয়েছে। স্বপ্ন—কালে কালে ছায়াছবির জগতে সে একজন নামকরা আর্টিস্ট হবে।

উর্দু তার আপনি জুবান। ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানির কোনও আর্টিস্টের সঙ্গে তার আলাপ ছিল না। উর্দুতে কোনও চিঠি এলে সে পড়ে শোনায়। জবাব লেখার জন্য তার ডাক পড়ে। কিন্তু এই মুন্সিগিরিতে তার বিশেষ উপকার হয়নি। সে এক্সট্রাই থেকে গেছে।

ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানির মালিক শেঠ আরদেশি ইরানির খাস মোটর ড্রাইভারের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। ফাঁক পেলে ড্রাইভার তাকে মোটর চালানো শেখায়। অবিশ্যি ফাঁক পাওয়া যায় অল্পসময়ের জন্যে। শেঠজি জানতে পারলে মহা বিপদ হবে। ড্রাইভার বুদানের দৌলতে সে সহজ পথে এখন মোটর চালাতে পারে। তবে শেখানোর সময় বুদান খুব ভয়ে ভয়ে থাকে—পাছে শেঠজির কাছে ধরা পড়ে যায়। সে মোটর পার্টস আর তার মেরামতির কিছুই জানে না। সে জানে একস্ট্রাই রয়ে গেলাম! আর জানে এই শহরে আমার স্বপ্নের কায়েদ-এ আজম থাকেন। এখানে তিনি ব্যারিস্টারি করেন। আর মুসলিম লিগ চালান।

একদিকে তার মাথার ভেতর আর্টিস্ট হওয়ার ভূত দারুণভাবে চেপে বসেছে। আর একদিকে মাথার ভেতর রয়েছেন কায়েদে এ আজম—মুসলিম লিগ। মুম্বাইয়ের কয়েকটি এলাকায় কংগ্রেসিরা তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। এই আজ যেমন সিনেমার টিকিটের লাইনে করল। সেসব নিয়েও ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানির লনে বসে মাঝে মাঝে কথা হয়। ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানিতে সবাই জানে সে মুসলিম লিগের সাপোর্টার। সে খুব অবাক হয়—যখন দেখে—তার মুখে কায়েদে আজমের প্রশংসা শুনে ইম্পিরিয়ালের কর্মচরীরা কেউ কেউ মনে করে—কায়েদে আজম নিশ্চয় কোনও বড় আর্টিস্ট হবেন।

ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানিতে ঢুকতেই নামকরা অ্যাক্টর বিলমোরিয়া তাকে একখানা টাইমস অব ইন্ডিয়া এগিয়ে দিলে বললেন, এই যে হানিফ আজাদ। এসেছো। এই নাও তোমার জিন্নাসাহেব!

হানিফের মন বলল, নিশ্চয় তাঁর কোনও ছবি ছাপা হয়েছে। তাই কাগজখানি হাতে নিয়ে সে বলল, কই তাঁর ফটো?

বিলমোরিয়া বিলিতি অ্যাক্টর জোয়ান গিলবার্ট স্টাইলে গোঁফের আড়ালে সামান্য হেসে বললেন, ফটো টটো নয়। তাঁর একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছাপা হযেছ। মিস্টার জিন্নার একজন মোটর মেকানিক দরকার। গ্যারাজের সব কাজের ভার তাকে নিতে হবে।

বিলমোরিয়া উর্দু কিছুই জানেন না। হানিফ আজাদও ইংরাজি জানে না। তাই কাগজে এক নজর চোখ বুলিযে হানিফ আজাদ সায় দিল। যেন সব বুঝে ফেলেছে।

সোজা রাস্তায় গাড়ি চালানো ছাড়া মোটর মেকানিকের আলিফ বে পে জ্ঞানও হানিফের নেই। সেলফ দাবালে গাড়ি স্টার্ট নেয়। কিন্তু কেউ যদি জানতে চায় কেন স্টার্ট হয়—তাহলে জবাবে হানিফ আজাদ বলবে—এটাই গাড়ির নিয়ম। আবার সেলফ দাবানোর পরেও যদি গাড়ি স্টার্ট না নেয়—তার কারণ জানতে চাইলে হানিফ বলবে—ওটাই গাড়ির রীতি। এতে মানুষের বুদ্ধির কোনও জায়গা নেই! এই হল গিয়ে মোটর নিয়ে হানিফ আজাদের আসল দশা।

হানিফ বিলমোরিয়ার কাছ থেকে জিন্নাসাহেবের বাংলোর ঠিকানা নোট করে নিল। ঠিক করল, কালই গিয়ে দেখা করবে। আসলে তার চাকরি করার কোনও তাগিদ ছিল না। বরং তাঁর বাড়িতে থেকে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখাই হানিফের লক্ষ।

জায়গাটা খুঁজে বের করল হানিফ। বোম্বাই শহর সে ঘুরে ঘুরে হাতের পাঞ্জায় এনে ফেলেছে। বাবুল মেরা—গানের কলিটি গুনগুন করে গাইতে গাইতে হানিফ ওয়ালকেশ্বরে এসে হাজির হল। সামনেই মালাবার হিল। পাহাড় যেখানে সমুদ্রের কিনারে গিয়ে শেষ—সেখানেই বোম্বাইয়ের গর্ভনর হাউস।

মালাবার হিলে খানিক উঠে তিনবাত্তির মোড়। ওখান থেকে একদিকে বোম্বাই শহরের খাবার জলের ট্যাঙ্ক। তার ওপর সুন্দর বাগান। ঢালাই ছাদে মাটি ফেলে তৈরি। আর একদিকে কেম্পস কর্নার। খানিক দূরে কাম্বালা হিলে সুন্দর সুন্দর বাড়ি দেখা যাচ্ছে

এই সকালবেলাতেই। কাম্বালা হিলের উঁচু নিচু বাগানের ভেতর।

হানিফ পাহাড়ি রাস্তা ধরে মাউন্ট প্লেজান্ট রোডে জিন্নাসাহেবের সুন্দর সাদা রঙের দোতলা বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল। গেটে পাঠান গার্ড। তার পরনে ধপধপে সাদা সালোয়ার, মাথায় রেশমের পাগড়ি। তাকে দেখে হানিফের মনে সম্ভ্রম জেগে উঠল। নিজেকে হানিফ মনে মনে এই পাঠানের পাশাপাশি দাঁড় করাল। ফারাক খুব বেশি নয়। পাঠান তার চেয়ে বড়জোর এক আধ ইঞ্চি লম্বা হবে।

আরও অনেকেই চাকরির জন্য এসে জড়ো হয়েছে। সবার হাতেই সার্টিফিকেটের কাগজপত্তর। তাদের ভেতর হানিফ মিশে গেল। তার একটু ভয় ভয় করছে। প্রশংসাপত্র দূরের কথা! হানিফের কাছে যে ড্রাইভিং-এর মামুলি কাগজপত্রও নেই। সে মুখ তুলে বাংলোর বারান্দায় তাকাল। এখুনি হয়তো জিন্নাসাহেবকে দেখা যাবে।

কায়েদে আজম বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ছায়ার ভেতর। তাঁর পায়ের রঙিন জুতোর কাছে এসে রোদ থেমে গেছে। হানিফ ওরা সবাই তাঁকে দেখে সটান সোজা হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে লম্বা গড়নের হালকা পাতলা বোন। ওঁদের একসঙ্গে ছবি হানিফ বহু কাগজে দেখেছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভারী সুন্দর দেখতে এক ভদ্রলোক। ইনি নিশ্চয় জিন্নাসাহেবের সেক্রেটারি মতলুবসাহেব। দেশসুদ্ধ সবাই তাঁর নাম জানে।

জিন্নাসাহেব সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। হানিফের দিকে তাকাতেই সে জড়োসড়ো হয়ে পড়ল।

জিন্না সাহেব বলে উঠলেন, 'ইউ'—তার মানে জিন্নাসাহেব বললেন—তুমি।

হানিফ আজাদ পাশের লোকটিকে টোকা দিয়ে বলল, তোমাকে ডাকছে—

লোকটি জিন্নাসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, সাহেব আমি?

কায়েদ আজম গলা তুলে বললেন, নো। ইউ—হানিফ দেখল, জিন্নাসাহেব তার দিকে হাত দিয়ে দেখালেন। তখনই তার সারা শরীরে যেন কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। সে কোনওমতে বলতে পারল, জি। জি আমি?

ইয়েস—

ভয়ে হানিফের গলা শুকিয়ে গেছে। যেন এই মাত্র থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলি তার বুক ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। তার গলা থেকে কোনও আওয়াজই বেরোচ্ছে না।

কায়েদে আজম চোখ থেকে মনোকল নামিয়ে বললেন, অল রাইট!

হানিফের মনে হল জিন্না সাহেব তার বেগতিক অবস্থা আঁচ করতে পেরে আগেই 'অল রাইট' বলে দিলেন। পেছন ফিরে তিনি তাঁর খুব সুন্দর দেখতে সেই সেক্রেটারিকে কী জানি বলে দিয়ে ফতেমা বেগমসাহেবাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

হানিফ ওখান থেকে চলে আসবে বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সেক্রেটারি মতলুবসাহেব—বেশ শক্তপোক্ত গড়নের মানুষ—দেখতেও রীতিমতো সুন্দর—এগিয়ে এসে হানিফকে বললেন, সাহেব তোমাকে কাল দশটায় এখানে দেখা করতে বলেছেন—

হানিফ একবার বলতে চাইল, দেখুন আমি মোটর মেকানিকের কোনও কাজই জানি না। আমাকে মাফ করে দিন।

কিন্তু কোনও কথাই তার মুখে ফুটল না। কায়েদে আজম যে-কাজের লোক চেয়েছেন—সে কাজের সে যে কিছুই জানে না।

হানিফ বাড়ি ফিরে এসে পরদিন সকাল দশটায় জিন্নাসাহেবের বাংলোয় গিয়ে হাজির হল। খবর পেয়ে মতলুবসাহেব বাড়ির ভেতর থেকে এসে বললেন, কায়েদে আজম তোমাকেই চাকরিতে পছন্দ করেছেন। এখুনি গ্যারাজের ভার নিয়ে নাও।

হানিফ বলতে চাইল, দেখুন আমি মোটর মেকানিকের কোনও কাজ জানি না। কিন্তু এবারও কোনও কথাই সে বলতে পারল না।

মতলুবসাহেব তখনই গ্যারাজের চাবি দিয়ে দিলেন। হানিফ দেখল পর পর চারখানি গাড়ি দাঁড়িয়ে। দুটো নাম সে পড়তে পারল। গাড়ির বনেটে লেখা। বুইক। প্যাকার্ড।

বাড়ির ভেতর যাবার আগে মতলুবসাহেব বললেন, হানিফ। তোমাকে বুইক গাড়ি চালাতে হবে। হানিফ ঠিক করল, কায়েদে আজমকে সব কথা খুলে বলে মাফ চেয়ে সে চলে যাবে। এখান থেকে বাসায় গিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে গাজিয়াবাদে ফিরে যাবে। কাল সকালেই সে সব কবুল করবে জিন্নাসাহেবের সামনে।

পরদিন হানিফ ফের জিন্নাসাহেবের বাড়ি যেতেই তিনি তাঁকে বললেন, হানিফ বুইক গাড়িটা বের করো।

জিন্নাসাহেব বারান্দায়। সঙ্গে তাঁর বোন ফতেমাসাহেবা। অনেক চেষ্টা করেও হানিফ নিজের কথা বলতে পারল না। কারণ, জিন্নাসাহেবের পাশে যে তাঁর বোন রয়েছেন।

নতুন বুইক গাড়ি। আল্লার নাম করে হানিফ স্টার্ট দিল। খুব সাবধানে বাংলোর বাইরে গাড়ি বের করল। কিন্তু মালাবার হিল থেকে নামার সময় লাল বাতি দেখে হানিফ জোরে ব্রেক চাপল।

বিকট শব্দে বুইক ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। ঝাঁকুনিতে কায়েদে আজমের হাত থেকে চুরুট পড়ে গেল। ফতেমাসাহেবা সামনের সিটে ধাক্কা খেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—আনপঢ।

ভয়ে হানিফের হাত কাঁপছে। মাথাও মনে হল, ঘুরে উঠল।

কায়েদে আজম চুরুট তুলে নিয়ে বাংলো ফিরতে বললেন। —গাড়ি ঘোরাও।

হানিফ গ্যারাজে বুইক তুলে দিতে কায়েদে আজম আর একজন ড্রাইভারকে প্যাকার্ড গাড়িটা বের করতে বললেন। তারপর সেই গাড়ি চড়ে বেরিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার পর দেখতে দেখতে বর্ষা পেরিয়ে গেল। হানিফের আর গাজিয়াবাদ ফিরে যাওয়া হয়নি। আর সে ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানিতেও যায়নি। এই ক'মাসে সে আব তার কায়েদে আজমকে সেবা করাও সুযোগ পাযনি। জিন্নাসাহেবই তাকে আর গাড়ি চালাতে ডাকেননি। রাতেই সেক্রেটারি মতলুবসাহেব বলে দেন—পরদিন কোন গাড়ি—কোন ড্রাইভারকে দরকার হবে। এই ক' মাসে হানিফ আজাদের কখনও ডিউটি পড়েনি।

সে বুঝতেই পারে না—জিন্নাসাহেবের মনে কী আছে। কায়েদে আজম কাজের কথা ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলেন না। হানিফ এখন বুঝতে পারে—কায়েদে আজম তাগড়া শক্তপোক্ত লোক পছন্দ করেন। নিজের কাজের জন্য তিনি এরকম লোকই বাছাই করেন।

সেক্রেটারি মতলুবসাহেব দেখতে খুবই সুন্দর। ড্রাইভারদের সবাই বেশ তাগড়া। বাংলোর গেটে পাঠানটিও লম্বা চওড়া, কায়েদে আজম নিজেই শুধু হালকা পাতলা গড়নের মানুষ।

এ বাড়িতে হানিফকে রীতিমতো কেতামাফিক পোশাক পরে থাকতে হয়। সে এখন মনে করে—দিব্যি রুটি মাংস গিলে শরীর স্বাস্থ্য আরও ফিরে গেছে। কিন্তু কোনও কাজে আসতে পারছি না কায়েদে আজমের।

পাঠান দারোয়ানকে বলা আছে—সে যেন তার জাতীয় পোশাক পরে। কায়েদে আজমের ইচ্ছায় হানিফকেও মাঝে মাঝে পাগড়ি পরতে হয়—যদিও সে পাঞ্জাবি নয়। হানিফ লক্ষ করেছে—মাথা পাগড়ি বাঁধলে বেশ লম্বা চওড়া—স্মার্ট লাগে। পাগড়ি বেঁধে একদিন হানিফকে বেশ দেখাচ্ছে। কায়েদে আজম তার দিকে তাকিয়ে ডাকলেন।

হানিফ ভয়ে ভয়ে কাছে যেতেই জিন্নাসাহেব তার হাতে দুখানি একশো টাকার নোট উপহার দিলেন। হানিফ অবাক। সে দেখল, কায়েদে আজমের মুখে তারিফের হাসি।

হানিফ লক্ষ করেছে—কায়েদে আজম খাবার খান খুব কম। সে ভেবে পায় না—এত কম খেয়ে তিনি কী ভাবে বেঁচে আছেন। এ বাড়িতে রোজ চার পাঁচটা মুরগি জবাই হয়। জিন্না সাহেব এর ভেতর বড় জোর ছোট্ট এক পেয়ালা যতটুকু মাংস ধরে সেটুকুই মাত্র খান। নানা ফল আসে রোজ। তার ভেতর থেকে গোটা কয়েক পিচ ফল খান কায়েদে আজম। বেশিরভাগই চাকর, ড্রাইভার, দারোয়ানদের কাছে চলে আসে। নাসিকের আঙুর খেতে আজকাল হানিফের একঘেয়ে লাগে।

খাবার টেবিলে একটা খাবারের লিস্ট থাকে। রাতের খাবার খেয়ে জিন্নাসাহেব ওই লিস্টিতে পরের দিনের পছন্দের খাবারে দাগ দিয়ে দেন রোজ রাতে। তারপর হানিফের হাতে বাজারের জন্য একখানা একশো টাকার নোট দেন। দিয়ে বলেন, টাটকা জিনিস দেখে দেখে কিনবে কিন্তু বাজারে।

প্রথমদিন বাজার করে একাত্তর টাকা ফিরল। হানিফ হিসেব দিতে যাচ্ছিল। অন্য ড্রাইভাররা, দুজন বাবুর্চি তাকে আটকাল। করছে কী হানিফ ? সাহেব বাজারের হিসেব নেন না কখনও।

তাহলে এই টাকা ফতেমাসাহেবার হাতে দিয়ে আসি ?

সব্বোনাশ ! দেখি টাকাগুলো দাও তো। বলে বড় বাবুর্চি তার হাত থেকে টাকা নিয়ে সবার ভেতর সমান ভাগ করে দিল। দিয়ে বলল, ফতেমাসাহেবাকে টাকাগুলো দিলে তিনি তো তুমি কাজে বহাল হওয়ার আগের সব হিসেব চেয়ে বসতেন আমাদের কাছে।

হানিফ বুঝতে পারে—জিন্নাসাহেব নিশ্চয় জানেন—রোজ তাঁর টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে।

কিন্তু তিনি তো কখনও হিসেব চান না।

ফতেমা সাহেবার সবদিকে কড়া নজর। তিনি প্রায়ই বলেন, কাজের লোকগুলো সব চোর। এক আনার জিনিস এক টাকা বলে চালাচ্ছে।

এ বাড়িতে এসে হানিফ দেখছে—ড্রাইভার, বাবুর্চি, চাকর—সবাই সাহেবের টাকাকে নিজের টাকা মনে করে। তাই ফতেমাসাহেবা যতই গালাগাল করুন না কেন—সবাই চুপ করে তা সহ্য করে। সাহেবা গালাগালি করলে কায়েদে আজম একটা ইংরাজি কথা প্রায়ই বলেন। কথাটা মুখস্থ হয়ে গেছে হানিফের। ইট ইজ অল রাইট ! ইট ইজ অল রাইট !

কায়েদে আজম ও কথা বলে ফতেমাসাহেবার রাগারাগিতে যেন জল ঢেলে দেন।

মাসখানেক আগের কথা। কায়েদে আজমের 'ইট ইজ অল রাইট'-এ কোনও কাজ হল না একদিন। ফতেমাসাহেবা দুই বাবুর্চিকেই বরখাস্ত করে দিলেন। দেশি খাবারের বাবুর্চি তো বসেই থাকে। হয়তো তিন সপ্তাহে একবার তার রান্নার পালা পড়ে।

দুজন বাবুর্চি বরখাস্ত হওয়ার কায়েদ আজম কিছুই বললেন না। তিনি বোনের ব্যাপারে নাক গলান না। দোবেলাই হোটেলে খাওয়ার পাট সারছেন তিনি। ফতেমা-সাহেবার অর্ডারে রোজ দু খানা গাড়ি নিয়ে দুই ড্রাইভার বাবুর্চি খোঁজার নাম সারা শহর চক্কর মারে। শেষে পুরনো বাবুর্চিদের নিয়ে আসা হয়েছে।

হানিফ আজাদ এ বাড়িতে এসে একটা জিনিস জেনে বেশ অবাক হয়েছে। যারা কম খায়—তারা অন্যকে বেশি খেতে দেখলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। কায়েদে আজম কিন্তু অন্যকে খাইয়ে আনন্দ পান।

কদিন আগে ঈদের পর বিকেলবেলা হানিফ প্যাকার্ড গাড়ি চালাচ্ছে। সমুদ্রের তীরে। বেশ আস্তে আস্তে চলছে গাড়ি। জিন্নাসাহেব পেছনে বসে আছেন। মেজাজ শরিফ। তাই হানিফ গাড়ি চালাতে চালাতে ঈদের কথা পাড়ল।

সাহেব যেন হঠাৎ বিগড়ে গেলেন। মুখ থেকে চুরুট হাতে নিয়ে বললেন, ভাল কথা ! তুমি তো দেখছি—পুরোপুরি মুসলমান বনে গেছ।

ভারী সুন্দর দেখতে—লম্বা একটি মেয়ে—পরনে ছাই রঙের স্কার্ট আর ওপরে ফ্রিল দেওয়া সাদা। ব্লাউজ—ফর্সাই বলা যায়—মাথাটি বব ছাঁট—কদিন আগে মট মট করে এ বাড়ির গেট খুলে ভেতর ঢুকল। সকালবেলা। সে দিব্যি সদর দরজা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। হানিফ অবাকই হয়েছিল। গেটে পাঠান দারোয়ান তো আটকাল না মেয়েটিকে। দিশি বাবুর্চি মেয়েটির পথে পড়ে গিয়ে পলকে সরে দাঁড়াল।

এ দৃশ্য এ বাড়িতে কখনও দেখেনি সে। হতভম্ব হানিফকে দেখে দিশি বাবুর্চি বলল, সাহেবের মেয়ে—দীনা মেমসাহেব।

সাহেবের মেয়ে ?

হ্যাঁ। আমার হাতের তন্দুরি বড় ভালবাসত মেমসাহেব। বিয়ে করে চলে গেছেন।

চলে গেছেন ?

হানিফের এ কথার দিশি বাবুর্চি যেন কী বলল। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। কেননা—তখনই একতলার চেম্বারে থেকে সাহেবের চড়া গলা সব ছাপিয়ে বারান্দায় ভেসে এল।

কায়েদে আজম এমনিতে চাপা গলায় কথা বলেন। কিন্তু এখন তার উঁচু গলা বারান্দায় হানিফ, দিশি বাবুর্চি—দুজনেই পরিষ্কার শুনতে পেল।

কেন ? সারা দেশে তোমার পছন্দের একজন যোগ্য মুসলমান ছেলেকে বিয়ের জন্যে খুঁজে পেলে না ?

দীনা মেমসাহেবের গলা ভেসে এল। আপনিও তো আপনারা নিজের ইচ্ছেয় একজন পার্শি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন বাবা। আমি একজন পার্শি যুবককে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করায় আপনার আপত্তি ?

এর পরেই সব চুপচাপ। কোনও শব্দ নেই সারা বাড়িতে। দীনা মেমসাহেব যেমন গটগট করে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছিলেন—তেমনই গটগট করেই বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। হানিফ দেখল—কায়েদে আজম বেরিয়ে এসে তাঁর মেয়েকে আটকালেন না।

সেদিন রাতে খাবার টেবিলে বসেও কিছু না খেয়ে সাহেব উঠে গেলেন। তাঁর বোন তাঁকে কিছুই বললেন না। একটু পরে তিনিও প্রায় না খেয়ে উঠে গেলেন।

দেশসুদ্ধ লোকের সঙ্গে হানিফও জানে—সাহেবের বিবি ছিলেন পার্শি। অনেকদিন হল মারা গিয়েছেন। তাঁর নাম ছিল রতন। এসব কথা রবিবারের কাগজে কাগজে কতবার যে ছাপা হয়েছে। পাঠান দারোয়ান যা বলল হানিফকে তা হল: সাহেব পার্শি বিয়ে করায় পার্শিরা সাহেবের ওপর খুব চটে ছিল। তার শোধ তুলল ওরা—সাহেবের মেয়ের সঙ্গে পার্শি ছেলের বিয়ে দিয়ে। এটা একদম একটা ষড়যন্ত্র। পুরনো ড্রাইভার মকবুল পাঠান দারোয়ানের কথায় সায় দিল। হানিফের মনে হয়—এমন ষড়যন্ত্র সত্যিই হয়ে থাকতে পারে।

বিবি মারা যাওয়ার পর মেয়ের এমন বিয়ে। কায়েদে আজম ভীষণ গম্ভীর হয়ে পড়েছেন। সবসময় তাঁর মুখখানি চিন্তায় ছেয়ে আছে। এতবড় বাড়ি। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কায়েদের মুখে মাঝে মাঝে যে আনন্দের হাসি দেখা যেত—তা আর দেখা যায় না। কোনও কাজে একটু ভুল হলেই তিনি রেগে যাচ্ছেন। প্রায় দু সপ্তাহ হতে চলল কারও সঙ্গে কায়েদে আজম দেখা করেননি। সকালে একদিন হানিফ দেখল—বিরাট ছাইদানি পোড়া চুরুটে উপচে পড়েছে। তিনি বাড়ির ভেতর পায়চারি করে চলেছেন—করেই চলেছেন।

কিছু ঠিক করার আগে জিন্নাসাহেব পায়চারি করেন। আর ভাবেন। দেখে দেখে এটা বুঝতে পেরেছে হানিফ আজাদ। নিশুতি রাত। কায়েদে আজম ঘরের মেঝেতে পায়চারি করে চলেছেন। নিঝুম রাত। পায়ের সাদা কালো চপ্পলে আওয়াজ তুলে তিনি হাঁটছেন।

একসময় তাঁর অধীর ভাবটা কেটে গেল। চোখে মুখে শান্ত ভাবটা ফিরে এসেছে। যেন নুয়ে পড়েছিলেন। কায়েদে আজম সোজা হয়ে বসেছেন। হাঁটছেন।

এই রবিবারই সকালে—নিঝুম বাড়ির ভেতর কায়েদে আজম হানিফকে ডেকে পাঠালেন। বসার ঘর পেরিয়ে বাঁ হাতে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের ঘরে

কোনওদিন ঢোকেনি হানিফ। সে ঘরে বড় একটি কাঠের বাক্সের সামনে সাহেব দাঁড়িয়ে। চুপচাপ।

ঘরে কোনও সোফা কিংবা শোবার মতো বেড নেই। বেশ বড়সড় ঘর। জানলায় লেসের পর্দার কোথাও ধুলো নেই। রোজ সাফ করা হয় সব ঘর। তিনজন চাকর মিলে সারাটা বাড়ি গুছিয়ে সাজিয়ে রাখে।

কায়েদে বললেন, বাক্সটা খোলো তো হানিফ।

ঠিক বাক্স নয়। অনেকটা লম্বা সিন্দুকের মতো দেখতে। চওড়ায় প্রায় তিন ফুট। ডালা খুলে তুলেই হানিফ অবাক হয়ে দেখল—মেয়েদের নানা পোশাকে বোঝাই। খুব শৌখিন কাজ সব। লেস, ফ্রিল, জরি, গাউন রয়েছে সিল্কের থাক থাক। আবার তার সঙ্গে রয়েছে স্কুলে পড়া বাচ্চা মেয়ের অনেকগুলো ফ্রক। সেগুলোও খুব শৌখিন। পরিপাটি করে গোছানো।

একটি ফ্রক হাতে নিলেন কায়েদে আজম। চোখের কাছে নিয়ে খুব মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, ইট ইজ অল রাইট। ইট ইজ অল রাইট। বলতে বলতে চোখের মনোকল খুলে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দীনা মেমসাহেব যখন ছোট ছিলেন—তাঁর সেই সময়কার ফ্রক। গাউন—শাড়ি সবই মেমসাহেবের মায়ের।

হানিফ আজাদকে সাহেবের এখন খুব পছন্দ। মাঝে মাঝেই বাড়ির ভেতরে ডাক পড়ে। বিলিয়ার্ড খেলার ঘরেও সে যায়। অনেকগুলো ঘর। তবে একতলায় সামনের বড় ঘরে বসেই জিন্নাসাহেব তাঁর ব্যারিস্টারির মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলেন। বন্ধু যা দু-একজন আছেন—যেমন মামুদাবাদের রাজা, চুন্দ্রীগড় সাহেব—ওঁরা ভেতর যান। আর মুসলিম লিগের লোকজন এলে তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন আলাদা একটি ঘরে।

ফতেমা জিন্নাহও বিয়ে করেনি। তাঁর পরের দুই বোন রহমত আর মুনিরার বিয়ে হয়ে গেছে। সাহেবের ছোটবোন রহমত থাকেন মোটর ওয়ার্কসের কাছে চৌপট্টি কর্নারে। তাঁকে মুখ আঁটা খামে করে মাসের গোড়ায় টাকা পাঠিয়ে থাকেন কায়েদে আজম. সেই খাম এখন পৌঁছে দেয় হানিফ। একদিন কাযেদ আজম আর ফতেমাসাহেবাকে সেখানে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে হানিফ। সাহেব কাপড়জামা বোঝাই অনেকগুলো প্যাকেট রহমত বোনের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন।

সাহেবের সবচেয়ে ছোটবোন মুনিরা থাকেন তোনগরীতে। তার অবস্থা ভাল। তাকে বোধহয় সাহেবের টাকা পাঠাতে হয় না।

এর ভেতর হয়েছে কি একদিন হানিফ আজাদ পকেটে কয়েকখানা দশ টাকার নোট নিয়ে বিকেল বিকেল দাদাবের এক সস্তার বার টাইফুনে ঢুকেছে। বিশেষ কিছু নয়—একটা বিয়ার খাবে। এসব বারে ট্রামের ইন্সপেক্টর, মোটর ওয়ার্কসের মেকানিক, সরকারি দফতরের কেলার্কবাবুরা এসে থাকেন। সবে এক মগ ফিশার বিয়ার গলায় ঢেলেছে

হানিফ—ঠিক এই সময় বারের এক কোণে আবছা আলোয় একটা টেবিলে তাকিয়ে তার চোখ ছানাবড়া। একজন লোক গ্লাস হাতে—সামনে সোডার বোতল—যেন তাজমহল হোটেল বসে হুইস্কির গ্লাসে ঠোঁট ভেজাচ্ছেন। এমনই রইসি ভঙ্গি। অবিকল যেন কায়েদে আজম বসে আছেন। হানিফের হাত থেকে বিয়ারের মগ খসে পড়ে যাচ্ছিল। সে নিজেকে সামলে নিল। আবার ভাল করে দেখল। সে তো তাজ্জব বনে গেল। এমন কি লোকটির চোখে কায়েদে আজমের মতোই মনোকল।

রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে হানিফের আর বিয়ার খাওয়া হল না। বাড়ি ফিরে রাতে দিশি বাবুর্চিকে ব্যাপারটা খুলে বলল।

দিশি বাবুর্চি হেসে বলল, ঠিকই দেখেছ হানিফ। উনি সাহেবের ছোট ভাই। আহমেদ আলি। সাহেব ফি মাসে ওকে খামে ভরে টাকা পাঠান। আমি গিয়ে দিয়ে আসি আহমেদ আলিকে ওর আর্থার রোডের বাসায়। বড্ড মদ খান আহমদ আলি। মদ খেয়ে টাকা পয়সা সব উড়িয়ে দেন প্রায়ই।

তা আহমদ আলি এখানে আসেন না ?

না। এখানে আসতে সাহেব ওঁকে নিষেধ করেছেন। আহমদ আলিকে প্রথম দেখে আমিও তোমার মতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কোথায় মহম্মদ আলি জিন্না—আর কোথায় আহমদ আলি !

কোথায় দেখেছিলে আহমদ আলিকে ? কোনও বারে ?

না। তুমি তখনও আসো নি হানিফ। এই যে বছর দুই আগে গান্ধী-জিন্না মিটিং হয়ে গেল—

হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমি তখন ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানিতে কাজ করছি।

তার অল্পদিন আগে চৌপট্টিতে মুসলমানদের বিরাট এক পাবলিক মিটিং হয়েছিল। সেখানে সাহেব আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সাহেব দারুণ স্পিচ দিয়েছিলেন মিটিংয়ে। আর আমি হাজার হাজার লোকের একদম শেষে দেখি, ভিড়ের দাঁড়িয়ে একজন লোক—অবিকল সাহেবের মতো দেখতে—এমনকি চোখে সাহেবের মতোই মনোকল লাগিয়ে কায়েদে আজমের সব কথা গোগ্রাসে গিলছে। আমি তো ঘাবড়ে গেলাম তোমারই মতো। এ কী তাজ্জব ব্যাপার ! সাহেবের জুড়য়া ভাই না তো !

তারপর ?

ব্যাপারটা পুরনো ড্রাইভার মকবুলকে বললাম। সে তো অনেকদিন সাহেবের খিদমত করছে। সেই আমাকে সব বলল। লোকটা সাহেবের ছোটভাই। আহমদ আলি। ও তখন সাহেবের পাঠানো টাকা আর্থার রোডে গিয়ে আহমদ আলিকে পৌঁছে দিত। তারপর তো আমি দিয়ে আসি মাসের গোড়ায় গোড়ায়।

দিশি বাবুর্চির কথাগুলো শুনতে শুনতে হানিফ আজাদ চুপ করে গিয়েছে। এক ভাই সারা দেশের ভেতর এত মানী গুণী। আমাদের চোখের মণি। আর এক ভাই ? চেহারায়

এত মিল। অথচ নসিব তাকে কোথায় নিয়ে গেছে। মাস গেলে বড় ভাই তাকে টাকা পাঠান। ওই টাকা কটি নিশ্চয় আহমদ আলির কাছে খুব দরকারি।

আরব সাগরের তীরে এবার মালাবার হিল, ওয়ালকেশ্বর, কেম্পস কর্নার, কাম্বালা হিল, দাদার, আর্থার রোডে শীত আসবে। মকবুল ড্রাইভার বলেছে—মিঞা ! এ তোমার গাজিয়াবাদ নয় কিন্তু। এখানে শীতকালেও শীত পড়ে না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। বোম্বাই তো সমুদ্রের গায়ে। রাতে অল্প অল্প ঠাণ্ডা দিনগুলো প্রায় গরমকালের মতোই।

গাজিয়াবাদে কিন্তু ভাই এখনই একটু একটু ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে।

হানিফ আন্দাজ করতে পারে না—হিন্দুস্থানটা কত বড় দেশ। এখানে কত রকমের মৌসম। কত রকমের মানুষজন। কত ভাষা। কত ধর্ম। মন্দির মসজিদ, গির্জা, গুরুদোয়ারা। এর ভেতর এই হালকা পাতলা গড়নের আমার এই সাহেব কি পারবেন ? মঞ্জিলে পৌঁছতে পারবেন ? তাঁকে তো অনেক রাস্তা যেতে হবে। কিছুই প্রায় খান না। ছোট্ট এক কাপে যতটুকু মাংস ধরে বড় জোর শুধু সেইটুকুই খান। এত কম খেয়ে কি—

একেবারে গায়ের ওপর সমুদ্র বলে বোম্বাইয়ে শীতকাল কী জিনিস তা বোঝারই কোনও উপায় নেই। না-গরম না-ঠাণ্ডা। আর মালাবার হিলে মাউন্ট প্লেজান্ট রোডে কায়েদে আজমের বাংলোয় ডিসেম্বর শেষের এই সকালবেলা হানিফ আজাদের তো রীতিমতো গরমই লাগছে। সে দিল্লির কাছাকাছি গাজিয়াবাদের মানুষ। এখন সেখানে থাকলে তাকে শীতের দাপটে আগুন পোহাতে বসতে হত।

বাংলোর বাগানে সকালবেলায় অনেক পাখি আসে। বিশেষ করে কাম্বালা হিলের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলি এসে সফেদা গাছটার ডালপালা প্রায় ঢেকে ফেলে। এই গাছটা

নাকি কয়েক বছর আগে জিগরি দোস্ত বাহাদুর ইয়ার জং কায়েদে আজমকে উপহার দিয়েছিলেন। শুধু ইয়ার জং এলেই কাযেদ আজম এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করেন—হানিফ আজাদ লক্ষ করেছে—যেন দুজন দুজনের বালক বয়সের বন্ধু। নয়তো জিন্নাসাহেব কারও সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে একঘেযে গল্পগাছা করতে ভালবাসেন না। কাজের কথা ছাড়া একটি বেশি কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না। আর তাঁর খাসকামরায় সবাই ঢুকতেও পারে না। সে ঘরে শুধু একটিই সোফা। পাশে একটি ছোট টেবিল। টেবিলে ছাইদানি। কাগজপত্র পড়তে পডতে জিন্নাসাহেব সেই ছাইদানিতে চুরুটের ছাই ফেলেন। সোফার সামনে দুটি শোকেস। তাতে নানা সাইজের কোরানশরিফ সাজানো। কায়েদের ভক্তরা ওগুলো উপহার দিযেছেন। ওই ঘরেই বেশির ভাগ সময় পাঠিয়ে দেন কায়েদ আজম। খাসকামরায় তাঁর সামনে অন্য কেউ যে বসবেন—তেমন কোনও চেয়ার নেই।

আজ সকালে কায়েদে আজম বিলিয়ার্ড খেলার কামরাটি খুলতে বলেছেন হানিফকে। তাকে বলার একটা কারণ আছে। কারণ, দেখতে দেখতে হানিফ আজাদ বিলিয়ার্ড খেলাটা বেশ ভালভাবেই শিখে ফেলেছে। কায়েদে নিজে বিলিয়ার্ড খেলতে খুব ভালবাসেন।

ওপর নীচ মিলিয়ে বাড়ির সব কামরা রোজ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়। ধোয়া মোছা প্রায় শেষ হয়ে এল। এবার সাহেবকে নিয়ে আসা হবে বিলিয়ার্ড রুমে। ও ঘরে হানিফ ঢুকতে পারে। কায়েদের তাকে পছন্দ। হানিফ বারোটা বল নিয়ে রেডি হয়ে দাঁড়াল। বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপর ঝুলিয়ে রাখা আলোর বালব তার টেনে বোর্ডের কাছে নামিয়ে দিল হানিফ।

মুখে চুরুট --হতে ছড়ি নিয়ে জিন্নাসাহেব ঘরে ঢুকলেন। পায়ে লাল সাদা কম্বিনেশন সু। পাশে তাঁর বোন ফতেমা জিন্না। দাদার চেয়ে বছর ষোলো সতেরোর ছোট। ছায়ার মতো সবসময় পাশে থাকেন। দাদার দেখাশোনা করেন। পোশাকে সব সময় সাদা। গারারার ওপর জামা—তার ওপর দোপাট্টাও সাদা।

বলগুলো এগিয়ে দিল হানিফ। খেলা শুরু করলেন কায়েদে। বলে ঠোক্কর দিতেই ঠিক বলটি গড়িয়ে গিয়ে গর্তে পড়ল। আবার সিধে হয়ে চুরুটে টান দিয়ে তৈরি হতে থাকলেন জিন্নাসাহেব। এবারও ঠিক ঠিক বলটি গর্তে গিয়ে পড়ল। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিজয়ীর চোখে ফতেমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি মুচকি হাসলেন।

এই ছবি দেখে হানিফের মনে হল—কায়েদে আজম হিন্দুস্থানের ব্যাপারেও হঠাৎ কোনও কিছু ঠিক করে ফেলেন না। এই বিলিয়ার্ড খেলার মতোই তিনি আগাপাশতলা ভেবেই তবে ঘা মারেন। ঘায়েল করার ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হয়ে তবেই তিনি গুলি ছোড়েন।

বিলিয়ার্ড রুমের খোলা দরজার সামনে সেক্রেটারি মতলুবসাহেব এসে দাঁড়ালেন। হাতে একতাড়া খাম—ছোটবড়। তা ছাড়াও কাগজপত্র। ডাক এসেছে। তাঁকে দেখেই কায়েদে আজম ঘর থেকে বেগে বেরিয়ে গেলেন।

খাসকামরায় ঢুকে নিজের সোফাটিতে বসে চিঠিপত্র দেখতে লাগলেন কায়েদে

আজম। একটু দূরে মতলুব সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে। সাহেব যদি কোনও ডিক্টেশন দেন—তাই মতলুবের হাতে লেখার ছোট প্যাড আর শর্টহ্যান্ডে লেখার পেনসিল।

একটি চিঠি পড়তে পড়তে থমকে গেলেন কায়েদে আজম । কলকাতা থেকে ইস্পাহানি ভাইদের বড় ভাই আহমেদ ইস্পাহানি লিখেছে। সে মুসলিম লিগের ট্রেজারার। চিঠির কথাগুলো ইংরেজিতে লেখা।

By no means Fazlul Haque is spent force. He has influence and following. Hindus are almost daily with him.

চিঠিখানি পড়তে পড়তে সামনের খোলা জানলা দিয়ে জিন্নাসাহেব বাইরে তাকালেন। এখানে থেকে কলকাতা অনেক দূরে।

মতলুবসাহেব দেখলেন, কায়েদে আজমের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি চোখের মনোকল খুলে ছোট্ট টেবিলটায় রেখে বাইরে তাকিয়ে আছেন। বাগান থেকে পাখিদের কিচিরমিচির। মালাবার হিলের একেবারে শেষে বেশ উঁচুতে সমুদ্রের কিনারায় গভর্নর বাহাদুরের রোলস্ রয়েস পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে ঢালুতে নেমে আসছে। কায়েদে আজমের চোখে কলকাতার রাস্তাঘাট ভেসে উঠছে। সেখানে এখন হকসাহেবের সঙ্গে লিগের কোয়ালিশন সরকার। ওখানে ফতেমা পড়াশুনো করেছে। সতোরো আঠরো বছর আগে যখন সি আর দাশ বেঁচে—তখন কলকাতা কংগ্রেসে তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে তিনি প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করেছেন। দীনার মা রত্তি বেঁচে থাকতে তাকে নিয়ে কলকাতা কংগ্রেসে গিয়েছিলেন তিনি। রত্তি বোরখা না পরায়—মাথা ওড়না দিয়ে ঢাকা না দেওয়ায় সে কী কড়া কথা লিখেছিল কলকাতায় উর্দু কাগজগুলো। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিন পাল,আমি—আমরা সবাই—মানে সেকালের দাদাভাই নৌরজি, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, জয়াকর—আমরা সবাই আইনের ভেতর থেকে কাউনসিলের সভায় মুভমেন্ট করছিলাম।কোত্থেকে গান্ধী এসে পুরো মুভমেন্টটাকেই আইনসভার বাইরে নিয়ে গিয়ে মেঠো করে ফেললেন। একেবারে মেঠো মুভমেন্ট। যারা নাম ননকোঅপারেশন! চিত্তরঞ্জন দাশ গোড়ায় গোড়ায় আমাদের রাস্তাতেই ভাবতেন। কিন্তু গান্ধীর দিকে ঝোঁক দেখে তিনিও সে দিকে ঝুঁকলেন।

এই সুন্দর পাখি ডাকা সকালে অনেক কিছুই একসঙ্গে ছবির মতো পরপর ভেসে উঠছে তাঁর চোখের সামনে। আমি বারবার গান্ধীকে বলেছি—খিলাফতের মতো এমন ধর্ম জড়ানো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। কোথায় তুরস্কে খালিফার গদি গেল—তা নিয়ে মুসলমানদের আবেগের সঙ্গে আমাদের মুভমেন্টকে জড়িয়ে ফেলবেন না। ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানরা বড্ড সেনসিটিভ্। এর সঙ্গে হিন্দুস্থানের ন্যাশনাল আশা আকাঙ্ক্ষাকে মিশিয়ে ফেলে ভুল করছেন আপনি। তা শুনলেন আমার কথা! কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে ক্ষমতায় এসে খলিফাকেই তাড়িয়ে দিলেন! খিলাফৎ মুভমেন্টেরও সেই সঙ্গে দফারফা। আর অমনি মুসলমানরাও ন্যাশনাল মুভমেন্ট থেকে গুটি গুটি সরে এল সবাই। আমি আগেই

বলেছিলাম—আসুন, আইনসভায় আইনের পথ দিয়ে আমরা ন্যাশনাল মুভমেন্টকে এগিয়ে নিয়ে যাব। শুনলেন না গান্ধী। আইনসভার বাইরে মাঠে-ময়দানে সভা করে—পিকেটিং করে তিনি ননকোঅপারেশনের ডাক দিলেন। সে মুভমেন্টও মাঠেই মেঠোভাবে শেষ হয়ে গেল। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—আপনি আমাকে একটি চরকা দিয়ে বলেছিলেন—রত্তিকে দেবেন। চালাতে শিখে নিয়ে সে ঘরে বসেই সুতো কাটবে। প্রায় দশ বছর হল আমার স্ত্রী রত্তি আর নেই। কোন সুদূরে সে চলে গেছে।

ভাবতে ভাবতে কায়েদে আজমের চোখে জল এসে গেল।

তাই দেখে মতলুব কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়ালেন।

রুমাল বের করে কায়েদে আজম চোখ মুছে বললেন, ইটস অল রাইট। ইটস অল রাইট।

তারপর কায়েদে আজম জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এখানে দাঁড়িয়ে আগে তিন বাত্তির মোড় অব্দি দেখা যেত। এখন আর দেখা যায় না। নতুন বাড়ি উঠে গেছে। হঠাৎ তাঁর মনে হল—ননকোঅপারেশন মুভমেন্টের ঢেউয়ে আমরা সবাই ভেসে গিয়েছিলাম। আমরা কেউ সেই জনজোয়ারের মুখে পলিটিকালি দাঁড়াতে পারিনি সে দিন। সারা হিন্দুস্থানে তখন একটিই নাম। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সে জন্যেই কি আমি গান্ধীকে বরদাস্ত করতে পারিনি?

কিছুক্ষণের জন্যে মহম্মদ আলি জিন্না দ্বিধায় পড়লেন। এখন তাঁর বয়স বাষট্টি। সেই স্টুডেন্ট লাইফে ইংল্যান্ডে থাকতে তিনি হাউস অব কমন্সের ভোটে ক্যান্ডিডেট গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান দাদাভাই নৌরজির হয়ে খুব খেটেছিলেন। সে সব গত শতাব্দীর একেবারে শেষ দিককার কথা। বোম্বাইয়ে ফিরে এসে গোপালকৃষ্ণ গোখলের ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। আমি আইনসভায় আইনের পথে মুভমেন্টে বিশ্বাস করেছি চিরকাল। গোহত্যা বন্ধ, চরকার পলিটিক্স আমার চিরকালই অন্ধ গোঁড়ামি মনে হয়েছে। সে কথা আমি গান্ধীকে বলতে পিছপাও হইনি। বলেছি, শুনুন মিস্টার গান্ধী—আপনার এসব হল—জ্ঞান আর সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে বাধা দেওয়া। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনেও বলেছিলাম কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। তখন গান্ধী জ্বরে কংগ্রেস কাঁপছে—আছন্ন।

হানিফ আজাদ এসে খাসকামরার দরজায় দাঁড়াল। সেক্রেটারি মতলুবসাহেবের ঠিক পেছনে। তাই মতলুব তাকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু কায়েদে আজম জানলা থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই হানিফকে দেখতে পেলেন। দেখে ভাবলেন, এই তাগড়া জোয়ানটি বিলিয়ার্ড খেলার নেশায় একেবারে আমার খাসকামরার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ও থাকলে আমার খেলাটাও জমে ওঠে।

কী ব্যাপার ?

একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

মতলুব ঘুরে দাঁড়ালেন। রীতিমতো তটস্থ হয়ে। তিনি বললেন, এভাবে তো দেখা

হয় না। কোনও কার্ড দিয়েছেন ?

চেয়েছিলাম। বললেন, ওঁর কোনও কার্ড নেই।

মতলুব বললেন, বলে দাও—কায়েদে আজম এখন দেখা করবেন না।

বলছেন—তিনি কলকাতা থেকে এসেছেন।

যেখান থেকেই আসুন—এভাবে কায়েদে আজমের সঙ্গে হুটহাট দেখা করা যায় না।

লোকটা নাছোড়। বললেন—বল গিয়ে বর্ধমান থেকে মওলানা সাহেব এসেছেন—তা হলেই হবে।

এবার মতলুব কিছু বলার আগেই জিন্নাসাহেব বলে উঠলেন, নিয়ে এসো।

হানিফ আজাদ একটু পরেই লোকটিকে নিয়ে এল। মতলুব অবাক হয়ে দেখলেন, কোথায় মওলানা ! শরিয়তি মতে দাড়ি নেই। মাথায় কোনও ফেজ নেই। আরও আশ্চর্যের কথা—ওপরে ফুলশার্ট—কিন্তু নীচে স্রেফ ধুতি। মতলুব রীতিমত অবাক হলেন। ধুতি পরা মওলানা ?

কিন্তু জিন্নাসাহেব তাঁকে দেখে হেসে বললেন, এসো এসো। তুমি মওলানা বলে পরিচয় দিয়েছ—

বাঃ ! লখনউ কনফারেন্সে আমি হসরত মোহানির প্রোপোজাল কেন হাদিস কোরানের আদর্শমাফিক নয়—তাই বলাতে—আমাকে আপনিই তো মওলানাসাহেব বলেছিলেন।

সে কথা মনে রেখেছ ! তা বেশ। কিন্তু আবুল হাসিম তুমি এই ধুতি পরাটা কবে ছাড়বে বলতে পারো ?

কেন ? আমাদের বর্ধমান জেলায়—বিশেষ করে কাশিযাড়া গাঁয়ে—তার আশেপাশে সবাই তো আমরা ধুতিই পরে থাকি।

চলো হাসিম পেছনের বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

কায়েদে আজমের এ কথা শুনে হানিফ আজাদ ছুটে গেল। কায়েদে আজম গিয়ে পৌঁছবার আগেই বারান্দায় বসার জায়গাগুলো ঠিকঠাক করে ফেলতে হবে।

বাড়ির পেছনদিকে বেশ কেয়ারি করা ফুলের বাগান। খানিকটা জায়গায় মোয়ার চালানো সুন্দর করে ছাঁটা ঘাসের লন। সেখানে একটি দোলনা। আবুল হাসিম আরাম করে বসে দোলনাটার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন— এই দোলনায় যিনি অবরেসবরে দোল খান— তাঁর হাতেই হিন্দুস্থানের আট দশ কোটি মুসলমানের ভাগ্য। তাই বা কেন ? সারা হিন্দুস্থানের ভাগ্যের সঙ্গে ওই দোলনাটি জড়িয়ে আছে। আরেকটু দূরে তাঁর চোখ পড়ল মালাবার পাহাড় ছাড়িয়ে একখানি রুপোলি পাত হয়ে আরব সাগর পড়ে আছে। তার ওপর দিকটা ধোঁয়া ধোঁয়া। সেখানে সকালের রোদ পড়লেও কিছু বোঝা যায় না। নিজের পায়ের দিকে চোখ পড়ল আবুল হাসিমের। বর্ধমান শহরে বিজয় তোরণের কাছে জুতোর দোকান থেকে কেনা সাধারণ নিউকাট পাম্প সু। জুতোর হিলে কাদা লেগে আছে। দামি কার্পেটের

ওপর জুতো-সমেত চলে আসা ঠিক হয়নি।

তোমার অফিস সাজিয়ে বসেছ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তিন নম্বর ওয়েলেসলি ফার্স্ট লেনে এখন মুসলিম লিগের পার্টি হাউস। বাড়িটা বেশ বড়।

একতলায় অফিস হয়েছে। দোতলায় কমিটি মিটিংরুম। লাইব্রেরি। ডিস্ট্রিক্ট থেকে ওয়ার্কাররা এলে কলকাতায় থেকে যেতে হলে পার্টি হাউসে তাদের থাকার ব্যবস্থাও করেছি। সোহরাওযার্দিসাহেবদের বাড়ি তো। তিনি বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চল্লিশ নম্বর থিয়েটার রোডে উঠে গেছেন।

জানি।

আবুল হাসিম নিজের কথার তোড়ে আবেগে বলে যাচ্ছিলেন। তাঁর এখন সবে চল্লিশ। বললেন, একজন পার্টি সিমপ্যাথাইজার পাঁচটি ঝাড়বাতি উপহার দিয়েছিলেন। সেগুলো মেরামতির পর ঝাড়পোঁছ করে পার্টি হাউসের ঘরে ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছি কাযেদে আজম।

পার্টি হাউস তো সাজিয়েছে। কিন্তু পার্টি কেমন চলছে ?

এসেছিলাম ফ্যামিলির একটা বিয়েতে। থানের কাছে। পার্টির কথা আপনাকে জানাব বলে চলে এলাম আপনার কাছে।

বেশ করেছ।

গত বছর কলকাতার পার্টির ট্রেজারার ইস্পাহানিসাহেবদের বাড়িতে লিগ আর হকসাহেবের পার্টির লোকজনের কম্বাইন্ড মিটিংয়ে আপনি গিয়েছিলেন।আমায় দেখে বলেছিলেন—ইয়ংম্যান। আমার পতাকার নীচে তোমরা সবাই এসো।

বলেছিলাম বুঝি ?

হ্যাঁ। তাই আপনাকেই কিছু বলতে চাই। পার্টি হওয়া চাই সাধারণ মানুষের ডেমোক্র্যোটিক, প্রগ্রেসিভ পার্টি। লিগকে নবাব, নাইটদের কবল থেকে বের করে আনতে হবে।

এ কথা বলছ কেন ? পার্টির জন্মই তো ঢাকায় নবাব বাড়িতে। তাই তো ঢাকায় নবাব বাড়িতে আহসান মঞ্জিলে পার্টি এখনও আটকে আছে। মুসলিম লিগ আহসান মঞ্জিলের খাজা নাজিমুদ্দিনের পকেটে আজও। সেখান থেকে পার্টিকে বের করে এনে সর্বসাধারণের পার্টি করে তোলাই আমার লক্ষ। খাজাসাহেব নিজে—তাঁর ভাই--আত্মীয়স্বজন মিলিয়ে ওঁরাই নজন আইনসভার মেম্বার। বড় বড় টাকার চাঁদার চেয়ে আমরা সাধারণ মানুষের মাসে দু আনার মেম্বারশিপের ওপর জোর দিয়েছি। সেই টাকাতেই অফিস খরচ—মিটিং র‍্যালির খরচ চালাব। চালাবার চেষ্টা করছি।

সে তো খুবই ভাল। পার্টি মিটিং হচ্ছে ?

অবশ্যই। হকসাহেবদের সঙ্গে কোয়ালিশনের পর মুসলিম লিগ গাঁয়ে গঞ্জে মিটিং মিছিল করে চলেছে। এতদিন ট্রেজারার হাসান ইস্পাহানিসাহেব—তাঁর বড়ভাই আহমেদ ইস্পাহানিসাহেব বড় বড় দরকারে চেক কেটে দিতেন। দিতেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আদমজি।

এখন আমরা জেলায় জেলায় চাঁদার কোটা বেঁধে দিয়েছি। আমাদের মিটিং হলে এখন হক-সাহেবের কৃষকপ্রজা পার্টির লোকজনও শুনতে আসছেন।

ফজলুল হক কোয়ালিশন টিকিয়ে রাখবেন কি ?

দেখুন কায়েদে আজম—হকসাহেব নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি চমৎকার বক্তৃতা দেন। বহুদিন ধরে সবরকম লোকের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা। সাধারণ চাষি থেকে হাইকোর্টের জজ—সবার সঙ্গে তিনি সমানে মিশতে পারেন। নিজেই চাষিদের নিয়ে নাইনটিন ফিফটিন থেকে মুভমেন্ট করে আসছেন—

হিন্দুদের সঙ্গে তো খুব ঘনিষ্ঠ।

হিন্দু বলে নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে হকসাহেবের ক্লাসফ্রেন্ডরা অনেকেই আজ দেশের বিশিষ্ট মানুষ। তাঁরা জন্মসূত্রে হিন্দু বটে। কিন্তু হকসাহেবের চোখে তাঁরা ক্লাসফ্রেন্ড। হাইকোর্টে সেই কোনকালে তিনি নাম লিখিয়েছেন। একই প্রফেশনেব ব্যারিস্টাররা তাঁর বন্ধু। এমন মানুষ কোনও একটি পার্টির অনুগত হয়ে থাকতে পারেন না চিরকাল।

তাঁরাও তো হিন্দু।

হ্যাঁ। জন্মসূত্রে। কিন্তু ব্যারিস্টার বলেই হকসাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁদের। প্র্যাক্টিস করতে গিয়ে। কংগ্রেসের শরৎ বোস—বেঙ্গলের আইনসভায় অপোজিশন লিডার ?

হাইকোর্টে—আইনসভায় হকসাহেবের অনেকদিনেব সঙ্গী।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ?

প্রথম জীবনে হকসাহেব ওঁরা বাবা স্যার আশুতোযের কাছে আর্টিকেলড্ ছিলেন। সেই সুবাদে হকসাহেব শ্যামাপ্রসাদকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখেন। হকসাহেবের পার্সোনালিটিই আলাদা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। এক সময আবুল হাসিম বললেন,কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে যুবকদের কাছে পপুলার। একটা ফাইটিং ইমেজ গড়ে উঠেছে কংগ্রেসের।

বেশ তো।

হকসাহেবের কৃযক প্রজা পার্টি গত ইলেকশনে মুসলমান আর অ-মুসলমানে ঐক্যের স্লোগান দিয়েছিল: বলেছিল—ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেযে সবার জন্যে ওদের দবজা খোলা।

বেশ তো।

আমাদের এমন পার্টি প্রোগ্রাম হওয়া দরকার যাতে কিনা—

একটা ফাইটিং ইমেজ গড়ে ওঠে !

হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয জানেন—একবার বি সি রায মুসলিম লিগকে কী বলেছিলেন—

কী বলো তো !

আমি কথাটা আবুল মনসুর আহমেদের কাছ থেকে শুনেছি। বিধানবাবু নাকি বলেছিলেন, মুসলিম লিগ আইনসভায় বেশি বেশি সিট চায—চাকরিতে বেশি বেশি চাকরি

চায়—কিন্তু ফ্রিডম মুভমেন্ট থেকে দূরে সরে থাকে।

কায়েদে আজম এতক্ষণ আরামে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এবার তিনি সিধে বসে বললেন, বিধান রায়কে জবাবে বলা হয়েছিল—আপনারা একজন দুশমনের বিরুদ্ধে লড়ছেন। সে হল ইংরেজ। আমরা লড়ছি তিনজন দুশমনের বিরুদ্ধে। তারা হল—আমাদের ভেতরকার কাঠমোল্লা. কংগ্রেস আর ইংরেজ। কথাগুলো ছাপা হয়েছিল ইন্ডিয়ান মোসলেম কাগজের রিপোর্টে। তুমি নিশ্চয় তখন পলিটিক্সে আসনি।

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। আমি তখন ল কলেজে পড়ছি। অ্যাকটিভ পলিটিক্সে আসিনি।

দুজনে কথা হচ্ছিল ইংরেজিতে। বাড়ির পেছন দিকটা সমুদ্রের মুখোমুখি। দূরে বলে আরব সাগরের ঢেউ ভাঙার শব্দ এখানে পৌঁছতে পারছে না। কিন্তু আবুল হাসিম তাঁর নিজের বুকের ভেতর কী যেন ভেঙে পড়ার আওয়াজ পাচ্ছেন। কায়েদে আজমের চোখ স্থির। মুখে একটিও ভাঁজ পড়েনি। সুন্দর সকালবেলা। তিনি মাঝ রাতের আকাশি নীল রঙের পাটা ভাঙা সুট পরেছেন। কোথাও কোনও ভাঁজ নেই।

আমি বলতে চেয়েছি—আমাদের পার্টি হোক ডেমোক্র্যাটিক, প্রোগ্রেসিভ, ফাইটিং। তা হলে যে ইমেজ গড়ে উঠবে, তাতে যুবকরা দলে দলে আমাদের ফ্ল্যাগের নীচে এসে দাঁড়াবে।

তার আগে তোমার চোখের সামনে যে সব পোটেনশিয়াল মানুষজন দেখতে পাচ্ছো—তাদের দলে টানো হাসিম।

তা তো সব সময়েই করছি। নিজেদের কথা স্পষ্ট করে বলছি। যারা আমাদের দিকে ঝোঁকেনি—তাদের আহত না করে—মনে কোনও আঘাত না দিয়ে নরম করে বুঝিয়ে বলছি—ট্যাক্টিক্স হিসেবে শত্রুসংখ্যা বাড়তে দিচ্ছি না। বরং কমিয়ে আনছি রোজ।

ভোটের আগে কলকাতায় গিয়ে হকসাহেবের দলের আবুল মনসুর আহমেদ, হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে কয়েকবার বৈঠকে বসেছিলাম। ওরা কৃষক প্রজা পার্টির হয়ে ওদের ইলেকশন ম্যানিফেস্টোর জমিদারি উচ্ছেদের কথা বলতে এসেছিল। লিগের হয়ে আমি সেই প্রোগ্রামে রাজি হইনি হাসিম। কমপেনসেশন না দিয়ে ওই প্রোগ্রামে লিগ রাজি হতে পারে না। মনসুর আর কবির ক্ষতিপূরণ না দিয়েই জামিদারি উচ্ছেদ করতে চায়। তা কী করে হয় ? তাই হকসাহেবের সঙ্গে লিগের ইলেকশন অ্যাডজাস্টমেন্ট হল না।

জানি।

কিন্তু মনসুর আর হুমায়ুনের মতো ব্রাইট মানুষদের আমাদের পার্টিতে আনতে হবে। গত ইলেকশনে বেঙ্গলে দুটি মুসলিম পার্টি লিগ আর প্রজা পার্টির ভেতর কোনও সমঝোতা হল না বলেই আমরা মুসলমানরা অ্যাবসলিউট মেজরিটি পেলাম না। তাই পেতে হলে ওদের মতো মানুষকে আমাদের দিকে টেনে আনতেই হবে হাসিম। হিন্দুস্থানে মুসলমানদের পার্টি একটিই। সে হল মুসলিম লিগ। এ কথা আমাদের প্র[illegible] করতেই হবে। তা হলে জয়।

কথা বলতে বলতে কায়েদে আজমের চোখ [illegible] হয়ে উঠেছে। তিনি যেন একটু হাঁপাচ্ছেন। শীতের অলস রোদ গাছপালায় ভেতর দিয়ে ফিল্টার হয়ে নরম মতো,

বারান্দায় পড়ল। আবুল হাসিম বললেন, গত ভোটের রেজাল্ট দেখে কংগ্রেস আঁতকে উঠেছে। বুঝতে পেরেছে—মুসলমানরা আর ওদের পতাকার নীচে থাকছে না। তাই মাস কন্টাক্ট এর প্রোগ্রাম নিয়েছে।

কায়েদে আজম বললেন, হ্যাঁ। উত্তরপ্রদেশ থেকে খালিকুজ্জমান আমাকে সব জানিয়েছেন।

আবুল হাসিম বললেন, জওহরলাল চিঠি লিখে শরৎবাবুকে জানিয়েছেন—এবার মাস কন্টাক্টের প্রোগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং—মণ্ডল কংগ্রেসের মাতব্বররা বলছেন—এবার মুসলমানদের মন জয় করতে হবে

দ্যাখো হাসিম—উত্তরপ্রদেশে কৃষক মুভমেন্টে জওহরলাল আগাগোড়া রয়েছেন। নইলে গত ভোটে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস এত ভাল রেজাল্ট করতে পারত না। কিন্তু বেঙ্গলে ? বেঙ্গলে চাষিদের ভেতর কংগ্রেস কোথায় ! চাষিদের সঙ্গে বেঙ্গল আছি আমরা—আর আছে হকসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি।

আবার চুপচাপ। কায়েদে আজম ফের চুরুট ধরালেন। থেমে বললেন, বেঙ্গল কংগ্রেসের শরৎবাবু কিংবা তাঁর ভাই সুভাষবাবু আরবান লিডার। ওঁরা সাধারণ মুসলমান চাষিদের সঙ্গে কীসের মাস কন্টাক্ট করবেন ? কোনওদিন চাষিদের ভেতর ওঁরা কাজই করেননি।

আবুল হাসিম বললেন, আমরা হকসাহেবের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে যাবার পর বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে চাষিদের ভেতর সভার পর সভা করে চলেছি। যোগাযোগ রাখছি। এইভাবে আর একটা বছর কাজ করতে পারলে সাধারণ চাষিবাসী মানুষদের ভেতর হকসাহেবের পালের হাওয়া আমরা ঠিক কেড়ে নিতে পারব ! দেখবেন—

কায়েদে আজম যেন আগের কথাতেই রয়ে গেছেন। তাঁর দুই চোখ আরব সাগরের দিকে। আচ্ছন্ন। তিনি বললেন, উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের সঙ্গে গত ভোটে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। ব্রিটিশরা জমিদারদের পার্টি খাড়া করেছিল। কিন্তু কংগ্রেস আর লিগ খানিকটা বোঝাপড়া করে চলায় জমিদারদের পার্টি ভোটে উড়ে গেল। ব্রিটিশরা এটা ভাবতে পারেনি। এমন অ্যাবসলিউট মেজরিটি পেয়ে যাবে—কংগ্রেসও তা কল্পনা করতে পারেনি। কংগ্রেসের গোবিন্দবল্লভ পন্থ তাঁর মিনিস্ট্রিতে আমাদের দুজনকে নিতে আগ্রহী। কিন্তু জওহরলাল রাজি নন। তিনি বলেছেন—একজনকে, মানে খালিকুজ্জমানকে নেওয়া যেতে পারে—তবে তাঁকে মুসলিম লিগের পরিচয় মুছে ফেলে মিনিস্ট্রিতে যোগ দিতে হবে।

তা কখনও হয় নাকি ?

কায়েদে আজম সব ক'টি কথা জোর দিয়ে স্পষ্ট করে বললেন, দিস ইজ ইনসাল্টিং ! আমরা ঠিক করেছি—উত্তরপ্রদেশে লিগকে মজবুত করে গড়ে তুলব

আবুল হাসিম লক্ষ করলেন, কায়েদে আজম যেন সারা হিন্দুস্থান জুড়ে সাঁইত্রিশ সনের ভোটের রেজাল্টের হিসেবনিকেশ করে চলেছেন। ভোটের পর বছর দেড়েক কেটে গেছে।

সেই বেজাল্টের ছায়া পড়েছে তাঁর মনে। কোথায় কী সবই মানুষটির নখদর্পণে।

জিন্নাসাহেব বললেন, পাঞ্জাবে হিন্দু, শিখদের নিয়ে সিকান্দার হায়াৎ তাঁর ইউনিয়নিস্ট পার্টির সরকার কায়েম করেছেন পাঞ্জাবে আমরা পেয়েছি মোটে তিনটি সিট। ওখানেও লড়তে হচ্ছে। সিন্ধেও আমরা সুবিধে করতে পারিনি। ওখানে আল্লা বকসের সরকার ওখানেও মুসলিম লিগকে লড়তে হচ্ছে। সিকান্দার হায়াৎ, আল্লা বকস মুসলিম ইউনিটির শত্রু। একমাত্র কিছুটা আশা জেগেছে বাংলায়। সেখানে হাসিম তোমরা আছ।

আমরা এখন কোয়ালিশনের পার্টনার বাংলায়। একদিন নিশ্চয় আমরা একাই বাংলায় সরকার গড়ব। মুসলিম লিগ একাই সরকার করবে।

আবুল হাসিম মন দিয়ে মানুষটিকে দেখছেন। সারা হিন্দুস্থানে একটাই কথা কায়েদে আজমের। মুসলিম ইউনিটি। কথা বলতে বলতে জিন্নাসাহেব সিধে হয়ে বসেছেন। সারা গায়ে কোথাও একটু মেদ নেই। চটপটে চলাফেরা। আবুল হাসিমদের বাড়ি আগে ছিল কংগ্রেসি বাড়ি। বর্ধমানের কাশিয়াড়া গ্রাম থেকে তার বাবা কংগ্রেসের মিছিল নিয়ে গিয়েছেন বর্ধমান টাউনে—ননকোঅপারেশনের সময়। তার আগে তার বাবা স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির অনুরাগী ছিলেন। আস্তে আস্তে মুসলমানরা গত বিশ বছরে কংগ্রেস থেকে অনেকটা সরে এসেছে। মুসলিম ইউনিটির ডাকই আলাদা। এ কথা শুনলে মনটা আনচান করে উঠে। তবে হ্যাঁ—এখনও তার এক চাচা বর্ধমান টাউন কংগ্রেসের লিডার এদের যে করে জ্ঞান হবে তা বুঝতে পারেন না হাসিম। কিন্তু সারা হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে থাকা আট-দশ কোটি মুসলমানের ইউনিটি আসবে কোত্থেকে? কোথায় নোয়াখালি—আর কোথায় পেশোয়ার। বুঝে উঠতে পারেন না আবুল হাসিম। কাজটা যে ভয়ঙ্কর কঠিন। এত বড় দেশ। এত ভাষা। তার পর আছে গুচ্ছের নেটিভ প্রিন্স। তাদের শাসনে হায়দরাবাদ ভাওয়ালপুর, কাশ্মীর। কী দিয়ে এমন ছড়িয়ে থাকা মুসলমানদের জাগিয়ে তোলা যায়? ধর্মের বাঁধন? বুঝে উঠতে পারেন না আবুল হাসিম। তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন। আবার আলিগড়েও পড়াশুনো করেছেন। আইন পড়েছেন কলকাতায়। বর্ধমান টাউনে পাঁচটি বছর ওকালতিও করেছেন। তারপর চলে এসেছেন অ্যাকটিভ পলিটিক্সে এখন তাঁর সামনে বড় কাজ—বাংলায় মুসলিম লিগকে সাধারণ মুসলমানের পার্টি হিসেবে গড়ে তোলা সামান্য অক্ষরজ্ঞান নেই। আভাব। গোঁড়ামি। এ সব লোককে এক করে ফেলা কী যে কঠিন কাজ—তা কি মানেন বিলেত থেকে পাশ করে আসা এই ব্যারিস্টার। কিংবা একমাত্র তিনিই জানেন। জানেন বলেই কায়েদে আজম লেগে আছেন।

দ্যাখো হাসিম—মাদ্রাজ, বোম্বাই—কোথাও আমরা ক্ষমতার কাছাকাছিও নেই মাদ্রাজ আইনসভায়—বোম্বাইয়ের আইনসভায় কংগ্রেসের ওভারহোয়েলমিং মেজরিটি কংগ্রেসের বি জি খেরকে দিয়ে গান্ধীকে অনুরোধ করেছিলাম—মাদ্রাজ, বোম্বাইয়ে মন্ত্রিসভায় মুসলমানদের প্রতিনিধি নিন। গান্ধী কোনও আগ্রহই দেখালেন না। সাধে কি আমি দশ বছর আগে সেন্ট্রাল কাউন্সিলে মুসলমানদের জন্যে তিনি ভাগের এক ভাগ সিট

চেয়েছিলাম ! জানি হাসিম—মুসলিম পপুলেশন যা তাতে ওয়ান থার্ড সিট চাওয়া যায় না। তখন আমার দাবি মানা হল না। আমিও হিন্দুস্থানের মুসলমানদের জন্যে তাই আলাদা ইলেকশন চাইলাম। নইলে যে মেজরিটির চাপে মাইনরিটি মুসলমান ইলেকশনে হারিয়ে যাবে। তলিয়ে যাবে। কোনওদিন ক্ষমতার কাছাকাছি যেতে পারবে না। অনেক ভেবেচিন্তে হাসিম—আমি তাই জোর দিয়ে বলেছি—ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদ মেনে নিতে হবে। কোনও প্রোটেস্ট করাও চলবে না।

সেক্রেটারি মতলুবসাহেব কায়েদে আজমকে এমন জমে গিয়ে কথা বলতে খুব একটা দেখেননি। নবাব ইয়ার জং কিংবা মাহমুদাবাদের রাজা এলে জিন্নাসাহেব ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলে থাকেন। কিন্তু ধুতি পরা— তুলনায় বেশ অল্পবয়সী এই অতিথি কায়েদে আজমকে অনেকক্ষণ এক জায়গায় আটকে রেখেছেন। কে হতে পারেন এই লোকটি তা বুঝতে পারছেন না মতলুব। তিনি এটা বুঝতে পারছেন—ইনি নিশ্চয় বঙ্গাল থেকে এসেছেন। কিন্তু কোন কদরের মানুষ তা ধরতে পারছেন না। আবুল হাসিম উঠে দাঁড়ালেন।

যাবে ?

হ্যাঁ কায়েদে আজম ?

তোমার চোখের কী দশা এখন হাসিম ?

ডাক্তার তো দেখাচ্ছি। কিন্তু চোখে এখন কম দেখছি। একটু একটু করে যেন অন্ধ হয়ে যাচ্ছি।

ভুলে যেও না—তোমার চোখ দিয়েই বঙ্গালের তিনি কোটি মুসলমান মুসলিম লিগকে দেখে—দেখবে। তুমি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি।

আল্লা আছেন ওপরে। বলে একটু থামলেন আবুল হাসিম। তারপর বললেন, সারা হিন্দুস্থানে মুসলমানরা তো আপনার চোখ দিয়েই মুসলিম লিগকে দেখে—দেখবে।

কায়েদে আজম জিন্না এ কথায় সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না। খানিকক্ষণ দুজনই চুপচাপ সামনের লনে নেমে আসা পাখিদের দেখতে লাগলেন। তাদেব কিচিরমিচির শুনতে লাগলেন। শেষে জিন্নাসাহেব বললেন, আমার ওপর দায়িত্বটা খুব বেশি হাসিম। এত বড় রেসপনসিবিলিটি। আমার বুদ্ধি মতো আমি এগিয়ে চলেছি। গত ইলেকশনের পর উত্তরপ্রদেশে যদি কংগ্রেস তার কথা রাখত ! যদি জওহরলাল কথা রাখতেন ! গান্ধী যদি আমার রিকোয়েস্ট রেখে মাদ্রাজ—বোম্বাইয়ে মন্ত্রিসভায় মুললমানদের রিপ্রেজেন্টেটিভ নিতেন ! তা হলে—

আবুল হাসিম চলে যেতে জিন্নাসাহেব বারান্দায় আর্মচেয়ারে বসে রইলেন। কাছাকাছি কেউ নেই। মতলুব দূরের ঘরে বসে টাইপ করে চলেছে। তার খটাখট আওয়াজ। আমি তো একেবারে একা হয়ে যাচ্ছি।এই কথাটা মনে হতেই কায়েদে আজম দেখতে পেলেন-তাঁর প্রথম দিককার জীবন। কত আশা। কত বন্ধু। সন্ধে হলে সবার সঙ্গে ক্লাবে পার্টিতে দাঁড়িয়ে তিনি হাসছেন। তিরিশ বছর বয়স না হতেই হাইকোর্টে রীতিমতো জমাট পসারের ব্যারিস্টার। ওথেলো নাটকে ওথেলোর রোলে রিহার্সেল। প্রথমে লন্ডন—তারপর বোম্বাই—

বোম্বাই আমার নিজের শহর। এখানে দাদাভাই নৌরজি--গোপালকৃষ্ণ গোখলে--ফিরোজ শা মেটার কাছের মানুষ হয়ে গেলাম। কংগ্রেসে ডুবে আছি। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে তরুণ মেম্বার। সবই পেয়েছি আমি এই বোম্বাই শহরে। তারপর একদিন আমার জীবনে রত্তি এল। রত্তনবাই। তাকে বিয়ের অল্পদিন পরে আমরা দুজনে কলকাতা কংগ্রেসে গেছি এক সঙ্গে। কত আনন্দ। হোটেলের ঘরে ভোরে ঘুম ভেঙে যেতে আমি আর রত্তি এক সঙ্গে বসে জানলা দিয়ে কলকাতায় রাস্তা দেখছি।

আর এখন ?আমার পাশে কথা বলার মতো কেউ নেই। রোজ একা হয়ে যাচ্ছি। রোজ কাজ বেড়ে যাচ্ছে ! কাজ পাহাড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এখন আমি একা চলেছি। সঙ্গে কেউ নেই। পাঞ্জাবে সেকেন্দার হায়াৎ মুসলিম লিগকে জায়গা ছেড়ে দেবে না। সিন্ধে আল্লা বকস মুসলিম লিগের রাস্তা জুড়ে আছে। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস পাওয়ারে এসেছে। বেঙ্গলেই কংগ্রেস শুধু অপোজিশনে। আমরা সেখানে কোয়ালিশনে পার্টনার মাত্র। শুধু এইটুকু যা আশার আলো।

আমিও তো কংগ্রেসেই ছিলাম। আজ আমি কংগ্রেসের উল্টোদিকে। কংগ্রেস থেকে কতদূরে ! একেবারে উল্টোদিকে। কী বিশাল কংগ্রেস একদিকে। আরেকদিকে আমি একা। ভরসা আবুল হাসিমের মতো কিছু মানুষজন।

কায়েদে আজম বিড় বিড় করে বলে উঠলেন, গান্ধী ! গান্ধী ! গান্ধী ! নিজেকে শান্ত করার জন্যে তিনি উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর বইয়ের তাক থেকে শেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটকখানি নিয়ে এলেন। লাইনগুলো পড়তে গিয়ে দেখলেন-- তিনি নাটকের কোনও জায়গাতেই মন বসাতে পারছেন না। সব লাইন তাঁর চেনা। কিন্তু সব লাইনই তাঁর সমান লাগছে। কিছুক্ষণ পরে জিন্নাসাহেব বইটি বন্ধ করে পাশের চেয়ারের ওপর রেখে দিলেন। এখন বেলা এগারোটাও বাজেনি। তাঁর চোখ বুজে এল।

এখন ঘুম এলেও তিনি শান্তি পেতেন। কিন্তু ঘুম এল না। তিনি পরিষ্কার মনে করতে পারছেন--

তখন আমি অ্যানি বেসান্তের হোম রুল লিগের বোম্বাই ব্রাঞ্চের সভাপতি। অ্যানি বেসান্ত হোমরুল লিগ থেকে রিজাইন দিলেন। তখন উনিশশো উনিশ-কুড়ির সময়। অ্যানি বেসান্তের জায়গায় নতুন উঠতি নেতা গান্ধীর নাম আমি লিগের সভাপতির জন্য তুললাম। কিছুদিন পরেই--সেটা উনিশশো কুড়ি সনের এপ্রিল মাস--গান্ধী লিগের সভাপতি হয়ে স্টেটমেন্ট দিলেন, লিগ এখন থেকে তাঁর প্রোগ্রামের কাজকর্মকে সাহায্য করবে। উঃ ! সে যে কী মেঠো প্রোগ্রাম ! মেঠো মুভমেন্ট !--নিরক্ষর মানুষকে খেপিয়ে তোলাই শুধু। স্বাধীনতার জন্যে আইনের পথে কাউন্সিলে মুভমেন্ট না করে দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনা। সেখানেই গান্ধী থামলেন না। মতিলাল নেহরুর বক্তৃতার জোরে--ভোটের জোরে তিনি হোম রুল লিগের নাম বদলে 'স্বরাজ্যসভা' করে দিলেন। তখন অনেকের সঙ্গে কানহাইয়ালাল মুন্সী, আমি লিগ থেকে রিজাইন দিলাম। বললাম, মিস্টার গান্ধী--আপনি

এভাবে লিগের নাম---সংবিধান বদলাতে পারেন না।

কায়েদে আজম ফের বিড় বিড় করে বলে উঠলেন, উঃ ! গান্ধী ! তারপর একটু থেমে ফের বললেন, কতদিন হয়ে গেল। আঠারো বছর। অনেকটা পথ চলে এসেছি।

তখন গান্ধীকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তার খানিকটা খানিকটা তাঁর মনে অগোছালভাবে ভেসে উঠতে লাগল।

আপনার প্রোগ্রাম বা কার্জকর্মের যা আভাস দিয়েছেন---আমার ভয় হচ্ছে আমি তা মেনে নিতে পারব না। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও সব কাজকর্ম আমাদেব ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। যেখানেই আপনি যুক্ত হয়েছেন—আপনার কাজকর্ম সেই সব প্রতিষ্ঠানে দলাদলি ডেকে এনেছে।.....দেশের জনজীবনেও আপনার কাজেব পবিণাম একই। কেবল হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যেই নয—হিন্দু আর হিন্দু---মুসলমান আর মুসলমান—এমনকি বাবা ছেলের ভেতরেও ঝগড়া টেনে এনেছেন। দেশের সর্বত্র জনসাধারণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আপনার চবমপন্থী কাজকর্ম এখনকার মতো বিশেষ করে অনভিজ্ঞ যুবকের দল, অজ্ঞ, নিরক্ষরদের মনে সাড়া জাগিয়েছে। এর পরিণাম আগাগোড়া গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা। পবে যে কী হবে তা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। জাতীয়তাবাদীদের সামনে একমাত্র পথ হল—একত্র হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুরো দাযিত্বশীল সরকার গড়ার জন্যে সবাই মানেন এমন কোনও কর্মসূচি অনুসারে কাজে লেগে পড়া। এরকম কর্মসূচি কোনও ব্যক্তিবিশেষ চাপিয়ে দিতে পারেন না। এর পেছনে দেশের তাবৎ জাতীযতাবাদী নেতার সমর্থন চাই। এই লক্ষে পৌছনোর জন্যে আমি---আমার বন্ধুরা কাজ করে যাব।

হানিফ আজাদ দেখল, নবাবজাদা লিযাকত আলি খান গেট পেরিয়ে সদর দরজার দিকে এগিযে আসছেন।

হানিফ কোনও কাজ না পেয়ে বাড়ির সামনেব দিককার বসার ঘরের টেবিল চেয়ার ঠিক করছিল। সে জানে ---নবাবজাদা লিগের একজন মস্ত নেতা। প্রাযই কায়েদের কাছে আসেন। এসে কাযেদের চেয়ারের পাশে তটস্থ হযে দাঁড়িযে থাকেন। খুব মন দিযে কাযেদের সব কথা শোনেন।

হানিফকে দেখে নবাবজাদা জানতে চাইলেন, সাহেবের মেজাজ কেমন আজ ?

সাহেব তো ভেতর বারান্দায ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কেন ? শরীর খারাপ নাকি ?

না না। এমনি বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

নবাবজাদা লিযাকত আলি খান বললেন, তা হলে এ ঘরে একটু বসি। ঘুম ভাঙলে দেখা করব। কী বল ?

বসুন। বলে ঘর থেকে বেরিযে গেল হানিফ আজাদ। তাব মন বলল, লিগের মস্ত মস্ত নেতা কাযেদের কাছে এসে এমন কুঁকড়ে যান কেন ?

আলো নেই

খুলনা খুলনাতেই আছে। শিয়ালদা থেকে ট্রেন এসে খুলনায় রেলস্টেশনের লাগোয়া ভৈরবঘাটে বরিশালের স্টিমার ধরিয়ে দেয় প্যাসেঞ্জারদের। আবার বাগেরহাটের প্যাসেঞ্জাররা শহরের ভেতর দিয়ে রিকশা সাইকেলে রূপসার খেয়া গিয়ে ওপারের খেয়া ধরে। ওপারে উঠে বাগেরহাট যাওয়ার ছোট রেলগাড়ি। ভৈরব আর রূপসা—দু' দুটো নদী শহরের দু'দিক ছুঁয়ে গেছে। ভৈরব দিয়ে স্টিমার যায় বরিশাল। রূপসা চলে গেছে সমুদ্রের দিকে। রূপসা দিয়েই অনন্ত ঘোষাল বছরে এক বার মোরেলগঞ্জ যান, ভাগের ধানচাল আদায়ে। যতই নৌকো মোরেলগঞ্জের দিকে এগোয়-- ততই অনন্ত দেখতে পান নদী চওড়া হয়ে যাচ্ছে। নদীর নামও পালটে যাচ্ছে। দু'ধারের তীর ধোঁয়াটে। তার ভেতর নারকেল গাছের মাথা যেন অগুন্তি। আর আকাশ কেমন সাদাটে। বাতাসে বঙ্গোপসাগরের গন্ধ।

চৈত্রমাসের রোদ চড়া হয়ে উঠছে। সকালবেলা রাস্তায় দিকের বারান্দায় মাদুরে বসে খোকন ওয়ার্ডবুকের পাতা থেকে কয়েকটা শব্দ দেখে দেখে লিখছে। লিখতে লিখতে তার কী খেয়াল হল। সে ওয়ার্ডবুকের বালি কাগজের মলাটে ইংরেজিতে লেখা তার নিজের নাম মনে মনে পড়তে লাগল। সমর ঘোষাল। নামের নীচেই ইংরেজিতে লেখা—ক্লাস থ্রি। তার নীচে লেখা—খুলনা জেলা স্কুল।

খোকনের পাশে বসে তনু চৌবাচ্চার অঙ্ক কষছে। কোন চৌবাচ্চায় জল ভরলে তা কীভাবে বেরিয়ে যায়-- তাই নিয়ে পাটিগণিতের অঙ্ক। অনন্ত ঘোষালের বাড়িতে কোনও চৌব্বাচ্চা নেই। সবাই ধীরেন্দ্রনাথের পুকুরে চান করে। খাবার জল দিয়ে যায় মধু ভারী। সে জল থাকে কলসিতে। চৌবাচ্চার অঙ্ক গুলিয়ে যায় তনুর। তনুর মনে পড়ল, চৌবাচ্চা আছে ফেরদৌসদাদের বাড়িতে।

ঠিক এই সময় খোকন বলল, এই তনু। আমার নামটা কী লিখেছিস ? বানান ভুল আছে--

আলো নেই

তনু খোকনের বইয়ের মলাট দিয়ে তাতে নিজের হাতে নাম লিখে দিয়েছে। সে দুটো কারণে চটে গেল। ছোটভাই খোকন সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সে কিনা তার ভুল ধরে? তার ওপর আবার বড় ভাইয়ের নাম ধরে ডাকা!

তনু খাতার ওপর ঝুঁকে অঙ্ক কষছিল। সে উঠে বসে ভাল করে তার নিজের লেখা দেখল। তারপর বলল, ঠিকই তো লিখেছি। কতবার বলেছি—নাম ধরে ডাকবি না। দাদা বলবি—

দূরে তক্তপোশের ওপর বসে অনন্ত ঘোষাল খুব মন দিয়ে কোর্টের কাগজ দেখছিলেন। কলকাতায় ব্যবস্থাপক সভায় হকসাহেবের সরকার আগেকার প্রজাস্বত্ব আইন শুধরে কিছুদিন আগে বিল পাশ করিয়েছেন। বছর দশেক আগে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসি মেমবাররা এই আইনে জমিদারদের পাশ টেনে এমনই সব ধারা জুড়ে দেন—যাতে কিনা আইনে হবার পর দেখা যায়—সারা বাংলায় জমিজায়গার খাজনা নিয়ে লাঠালাঠি লেগে যাচ্ছে। জমিদাররা সেটেলমেন্ট কোর্টে গিয়ে খাজনা বাড়াবার আর্জি জানাতে পারতেন। প্রজারা তাতে আপত্তি করলে গোলমাল পাকাত। সবসময় অশান্তি লেগে থাকত। নতুন আইনেও সে সব দোষ একেবারে যায়নি। রায়তের সঙ্গে জমিদারের খিটিমিটি লেগেই থাকছে। এই নিয়ে মামলা। খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগেকার রায় পড়তে হচ্ছে অনন্তকে। তিনি দুই ছেলের কথা কাটাকাটিতে রেগে গেলেন। —কী হচ্ছে তনু?

কিছু না বাবা।

কী হচ্ছে খোকন?

কিছু না বাবা।

অনন্ত ঘোষাল আবার আগেকার মামলায় রায় দেখতে লাগলেন। এমন সময় তনু জানতে চাইল বাবা পেনসিলের গায়ে সেই লেখাগুলো নেই কেন?

কাগজ থেকে চোখ না তুলেই অনন্ত ঘোষাল জানতে চাইলেন, কোন লেখা?

তনু হাতের পেনসিল দেখিয়ে বলল, আগে পেনসিলে লেখা থাকত— মেড ইন ব্যাভেরিয়া। এখন লিখেছে—মেড ইন জার্মানি।

কাগজ থেকে চোখ না তুলেই ঘোষাল বললেন, এখন যে হিটলার সারা জার্মানির রাজা। তাই আর ব্যাভেরিয়ার নাম থাকে না। মেড ইন জার্মানি লেখে।

ব্যাভেরিয়া কোথায়? জার্মানিই বা কোথায়? ব্যাভেরিয়া যে জার্মানিরই একটা রাজ্য তা তনু জানে না। তবে সে হিটলারের নাম প্রায়ই শোনে।

রাজা?

তনুর এ কথায় অনন্ত ঘোষাল এবারও তাঁর হাতের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন, হ্যাঁ। হিটলারই এখন সারা জার্মানির রাজা। এই তো ক'মাস হল অস্ট্রিয়া দখল করে নিয়েছে।

অস্ট্রিয়া কোথায় বাবা?

জার্মানির পাশে। একথা বলে অনন্ত ঘোষাল জানতে চাইলেন, তিনটে মোটে অঙ্ক দিলাম। এখনও হয়নি তনু!

এই তো হয়ে এল। আগের পেনসিলগুলো বেশি ভাল ছিল বাবা। বার বার শিস ভেঙে যাচ্ছে নতুন পেনসিলের।

তনুর কথা অনন্ত ঘোষালের কানে গেল না। তিনি হাতের কাগজ সরিয়ে হাল খতিয়ানখানি দেখতে লাগলেন। মামলাটি খুলনা সদর থানার ভোগেরহাট মৌজার।

ভোগেরহাট রূপসা নদীর ওপারে। ওসব জায়গায় অনেকবার গেছেন অনন্ত। কোর্টের কাগজপত্তর দেখা ছাড়াও তিনি চেন নিয়ে জমি মেপে দিতে যান। নিজে ফৌজদারি আদালতের পেশকার হলেও অনন্ত ঘোষাল দেওয়ানি মামলার কাগজপত্তর বোঝেন। দেখে দিয়ে থাকেন। খুলনায় কোর্টের চাকরি নিয়ে আসেন বছর দুই পরে—সে আজ বছর দশেক আগের কথা—সারা দেশে প্রজাস্বত্ব আইন শোধরানো নিয়ে সে কী তোলপাড়। সে বোধহয় ১৯২৮ সনের কথা। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব বিল উঠল। কংগ্রেস আর স্বরাজ্য দলের মেমবারদের হাত দিয়ে প্রজাদের জন্যে একটুও জল গলতে চায় না। শেষে একটি ধারা কংগ্রেসি আর স্বরাজি মেমবাররা মেনে নিলেন। ভাগচাষি প্রজারা তাদের বাস্তুজমির ভেতরকার গাছ কাটতে পারবে। আজ যিনি দৈনিক আজাদের সম্পাদক—মৌলানা মহম্মদ আক্রম খাঁ, তখন ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসি আর স্বরাজিদের তুলোধোনা করেছিলেন। ভাগচাষি প্রজা তো বেশির ভাগই মুসলমান। ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসি আর স্বরাজি মেমবাররা অনেকে নিজেরাই ছিলেন জমিদার বাড়ি থেকে আসা লোক।

হাতের কাগজখানির ওপর কাচের চাপা দিয়ে অনন্ত ঘোষাল সামনের রাস্তায় তাকালেন। তিনি যে বিশেষ কিছু দেখছেন তা নয়। বরং তিনি দিনের আলোয় গত দশ পনেরো বছরকে দেখতে পাচ্ছেন। একবার তাঁর মনে হল—আমিও কি মোরেলগঞ্জে আমার ভাগচাষি প্রজাদের সঙ্গে স্বরাজি আর কংগ্রেসি মেমবারদের মতো কিপটেমি করে আসছি ? আমার জমি যারা চাষ করে তারাও তো সবাই মুসলমান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকেই মনে মনে বোঝালেন—না! না! আমি তো আর জমিদার নই। সামান্য কয়েক বিঘা জমি। বিয়ে করে বাবা যৌতুক পেয়েছিলেন। আমি ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের শ্রীশনগরে বাসাবাড়ি ভাড়া করে বাস করি। পঞ্চান্ন টাকা মাস মাইনেতে খুলনার সেসন জজ ডবসন সাহেবের ফার্স্ট পেশকার। আমার পাঁচটি ছেলে। মোরেলগঞ্জের ভাগের ধানচালে আমার সংসারের মাস তিনেকের খোরাকি হয়। মোরেলগঞ্জে প্রজাদের সঙ্গে আমার কোনওদিন খিটিমিটি হয়নি। আমি খাজনা বাড়াবার জন্যে কখনও সেটেলমেন্ট কোর্টে যাইনি। এই আইনটাই যত অশান্তি জিইয়ে রেখেছে।

প্রজাস্বত্ব আইনে মামলা মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখতে দেখতে এই আইনের প্রায় দেড়শো বছরের ইতিহাস অনন্ত ঘোষাল জানেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসনেরও আগের কোম্পানি আমলের আইন। দফায় দফায় শোধরাতে শোধরাতে এইবার শেষ শুধরে ফের নতুন আইন হয়েছে হকসাহেবের আমলে।

দেখতে দেখতে খুলনা তার চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে। মামলার কাগজখানির ভেতর দিয়ে অনন্ত ঘোষাল ভাগচাষি সোয়েদুল ইসলামের মুখখানি দেখতে পাচ্ছেন। সোয়েদুলকে চেনেন তিনি অনেকদিন। ভোগেরহাটে জমি মাপতে গিয়ে বছর চারেক আগে আলাপ হয়েছিল। গাঁয়ের লাগোয়া ধানখেতের ওপরেই মাটির ঘর। ওপরে গোলপাতা। সঙ্গে একটি ডোবা। ডোবার পাড় ধরে ফি বছর ওলকচু বসায় সোয়েদুল। একবার ওর কথায় অনন্ত ঘোষাল তার বাস্তুটুকু চেন ধরে মেপে দিয়েছিলেন। ডোবা সমেত সতেরশতক জায়গা। তা ওই ডোবার পাড়ে একটি বাবলা গাছ কাটা নিয়েই মামলা। সোযদুল বাবলা গাছটি কেটে তার সিধে গুঁড়ি দিয়ে ঘরের আড়া বানিয়েছে। জমির মালিক শরৎ মিত্তির মমলা ঠুকে দিয়েছেন। এই সামান্য জিনিস নিয়ে কেউ মামলা করে! আসলে শরৎ মিত্তির ভাগচাযের জমি থেকে সোয়েদুলকে তাড়িয়ে অন্য কাউকে চাষ করতে দেবেন। সে জন্যেই এই মামলা।

সেবারে বাস্তুটুকু মেপে দেবার জন্যে সোয়েদুল অনন্তকে একখানি ওল তুলে বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়েছিল। এসব কথা কয়েক পলকে অনন্ত ঘোষালের মনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। তিনি এখন সোয়েদুল, শরৎ মিত্তির, মওলানা মহম্মদ আক্রম খাঁ, মোরেলগঞ্জ, সুভাষচন্দ্র, শ্রীশনগরের জমিদার ধীরেন্দ্রনাথ, প্রজাস্বত্ব আইন, গান্ধীজি সবকিছু একই সঙ্গে তালগোল দশায় দেখতে পাচ্ছেন। চারটে ছেলের পড়াশুনো একসঙ্গে চালাতে হচ্ছে। তাও তো একেবারে ছোট গৌরের এখনও পড়শুনোই শুরু হয়নি। বছরের ন'মাস সবই কিনে খেতে হয়। সর্ষের তেল আছে। সাবান আছে। জ্বরজারি আছে। এ সব ভাবনার ভেতর অনন্ত ঘোষাল নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি পারব?

বাড়ির সামনের রাস্তাটা শ্রীশনগরের ভেতর দিয়ে উপেন পেশকার, শশী পেশকারের বাড়ি হয়ে যতীন সিংঘির মাঠে চলে গেছে। হঠাৎ অনন্ত দেখলেন, রাস্তা দিয়ে ছেলেদের মা রত্না আসছে। পেছনে পেছনে পানু। পানুর হাত ধরে গৌরও হেঁটে আসছে। অনন্ত অবাক হলেন। তিনি জানেন, রত্না এখন ভেতর বাড়িতে। কখন বেরোলো? সঙ্গে পানু আর গৌর।

রত্না এগিয়ে এলে দেখা গেল বাঁ হাত দিয়ে শাড়ির আঁচল কোঁচড় করে ধরা। পানুর হাতে হাত-কোদাল, ছোটমতো। বারান্দায় রত্না উঠে এলে অনন্ত দেখলেন, তার মুখময় ঘাম। পানু আর গৌরের পা মাটিতে মাখামাখি।

কোথায় গিয়েছিলে?

রত্না কোনও জবাব না দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। পেছন পেছন পানু আর গৌর।

অনন্ত ঘোষালও ঘরে ঢুকলেন। রত্না সিধে ভেতর বারান্দায় গিয়ে চেঁচিয়ে পানুকে বললেন, কোদালটা ধুয়ে রাখ। বলতে বলতে কোঁচড় খালি করে শুকনো আদার মতো দেখতে অনেকগুলো গাঠিকচু মার্কা—কচুই হবে হয়তো—বারান্দায় নামিয়ে দিলেন। গৌর উবু হয়ে বসে সেগুলো এক জায়গায় ঢিবি করতে লাগল। তার হাফপ্যান্টের ভেতর থেকে কচি কচি দু'খানা পা, নরম পায়ের পাতা—পায়ের নখে মাটি—সব দেখতে পাচ্ছেন অনন্ত ঘোষাল।

কখন বেরোলে?

অল্প একটু হেসে রত্না ওগুলো গোছাতে লাগলেন। গৌরকে একটু ধরোতো—

অনন্ত গৌরকে টেনে নিতে নিতে বললেন, এসব কী ?

সব ব্যাপারে খোঁজ করা অভ্যেস ! কোথায় গেছি ? কখন গেছি ?

অনন্ত দেখছিলেন রত্নাকে। তিনি বেশ অবাক হয়েছেন। রোদে রত্নার পিঠ ভিজে গিয়ে গায়ের জামা সপসপ করছে। শাড়ির পাড়ের কাছটায় চোরকাঁটা।

পানু হাত পা ধুয়ে এসে বলল, এগুলো ছাদে রোদে দিয়ে আসি মা ?

না। কাক এসে ঠোঁটে ঠোঁটে সব তুলে নিয়ে যাব। নীচেই চোখে চোখে সব শুকোবে। তারপর ধুয়ে নিয়ে গুঁড়ো করব।

এবার রত্না উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচলে মুখ ঘাড়-গলা মুছে নিয়ে হাসতে হাসতে অনন্তকে বললেন, কাল রাতেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। ভোরে উঠে দেখি তোমরা ঘুম থেকে ওঠোনি। টুনু বেরিয়ে গেল। আমিও পানুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এখন মাটি শক্ত—আমি তো কোপাতে পারব না। তাই পানুকে নেওয়া। ওমা গৌর দেখি ঘুম থেকে উঠে বসে আছে। তাই ওইটাকেও নিলাম। নযতো তুর তুর করে কোনদিকে হাঁটা ধরবে।

অনন্ত ঘোষালের আর সহ্য হল না। তিনি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, তুমি ফার্স্ট পেশকারের বউ। এই সাত সকালে খুলনার মতো শহর বন্দরে কোদাল হাতে কোথায় গিয়েছিলে বলবে তো—আমার তো জানতে হবে।

সব তোমাকে জানাতে হবে ? তুমি না গাঁয়ের ছেলে ! এগুলো কী চিনতে পারছো না ? শটি। শটি। যতীন সিংঘির মাঠে চালতা গাছতলায় শটির বন হয়ে আছে পানু বলেছিল। বললাম—চল তো দেখাবি। মাটি কুপিয়ে তুলে নিয়ে এলাম।

কেউ দেখেছে ?

দেখে থাকলে ভারী বয়ে গেল আমার। শুকিয়ে জ্বাল দিয়ে টুনু পানু তনুদের খাওয়াবো। সারাটা পৌষ মাঘের সকালে তো ওদের ফেনাভাত করে দিলাম। এবার কী দেব ওদের ? যাও তুমি তোমার কাগজ দ্যাখোগে।

অনন্ত ঘোষাল কোনও কথা বলতে পারলেন না। সারাটা শীতের সকাল টুনু পানুরা গরম গরম ফেনা ভাত খায়। এবার মোরেলগঞ্জ থেকে ফেনা ভাতের চালটা তত আসেনি।

রান্নার জন্যে বর্ষার আগেই কাঠ চেলা করে জমা করা থাকে। তার কয়েকখানা হাতে নিয়ে রত্না রান্নাঘরে ঢুকলেন। তার যেন কীসের একটা আহ্লাদ হচ্ছে। ভোর ভোর যতীন সিংঘির মাঠ অব্দি যাওয়া পায়ের নীচে ঘাসের শিশির। পানু ক'বার কোপাবার পর রত্না নিজেও হাত-কোদাল টেনে নিয়ে কুপিয়েছেন। ভোরবেলায় মাঠ ভিজে ভিজে থাকে। রোদ উঠে এলেও চালতা গাছতলায় ছায়া। একেবারে মাটির ভেতর থেকে একটা জিনিস তুলে আনা। আপনা আপনি গজিয়ে ওঠা শটিবন। কলাপাতার মতো ভাঁজ হয়ে ওঠা আকাশ মুখো শটিপাতা শুকোনোর মুখে। মাটির নীচে ছড়া দিয়ে শটি পুরুষ্টু হয়ে উঠলে

গাছ পাঁশুটে হয়ে আসে। চ্যালা কাঠে চড়া আগুন। হাঁড়ি ঠিক মতো বসালেন রত্না। গুড় দিয়ে গরম গরম শটি টুনু পানু খুব ভাল খায়।

পাশের বাড়িতে কুলসুম মুসুরির ডালে পেঁয়াজ সম্বর দিল। বাতাসে তার গন্ধ। নিঃশ্বাস টেনে সেই গন্ধ শুঁকলেন রত্না। তার স্বামী, বড় তিন ছেলে মুসুরির ডাল ভালবাসে। মোরেলগঞ্জ থেকে আকাঁড়া যেটুকু মুসুরির ডাল এসেছিল রেঁধেবেড়ে তা শেষ। খোসা ওঠা এই ডাল নিজেই রত্না ঘরের জাঁতা ঘুরিয়ে ভেঙেছেন। আসন করে বসে। অনন্ত, টুনু, পানুরা যে যাব মতো দুপুরে বেরিয়ে যাবার পর। ফাঁকা বাড়িতে। জাঁতাটি বসিয়ে নিয়েছেন ধানের বস্তায় ওপর। এ ডাল খেতে খুব ভাল। সুবাসই একদম আলাদা। এখন হরি মিত্তিরের মুদিখানা থেকে চার পয়সা ছ'পয়সা সেরে যে মুসুরি ডাল আসে তাতে না আছে স্বাদ—না আছে সুবাস।

কুলসুমদের ভাড়াবাড়িটা দোতলা। সামনে বারান্দা—ভেতরেও বারান্দা। ভাড়াও রত্নাদের চেয়ে দশটি টাকা বেশি। এক্রামুদ্দিন আহমেদ ইস্কুলে দেখে দেখে বেড়ান আর রিপোর্ট দেন। মাইনেও কিছুটা বেশি পান টুনুর বাবার চেয়ে। হরি মিত্তির তার মুদিখানা থেকে মাসকাবারি সব জিনিস মুটের মাথায় ডালায় চাপিয়ে এনে পৌঁছে দেয়। রত্নাদের বাড়ি চিনি, ডাল, তেল চার ছ'পয়সার করে যখন যেমন দরকার তখন তেমন আসে।

একটু পরেই কুলসুম দোতলার বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে ডাকবে, ও টুনুর মা কতদিন দেখি না মুখখানা!

রত্না রান্নাঘরের বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে এসে বলবেন, আহা! কালই সন্ধেবেলায় তো কথা হল।

রত্নাদিদি, তুমি আমার ডালিম সই। লোকে বকুল ফুল, টগর ফুল সই পাতায়। আমি তোমার সঙ্গে ডালিম সই পাতালাম।

তাহলে তুই কে আমার কুলসুম?

তুমিই বল ডালিম সই।

তুমি আমার বেদানা বোন!

এক একদিন এক এক রকম কথা হয়। খুলনার আকাশে চড় চড় করে রোদ উঠে এসে অনন্ত ঘোষালের উঠোনে—বাড়ির পেছনে ধীরেন্দ্রনাথের বাগানে নারকেল, আতা, সবেদা গাছের মাথায় গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রত্না দেখতে পাচ্ছেন—উঠোনের লাউ মাচায় ফনফনে লাউডগায় রোদ পড়ে সবুজ আভা ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ফস করে বঁটিখানা হাতে নিয়ে উঠোনে নামলেন। তারপর মাচার নীচে নিচু হয়ে দেখেশুনে একটি গোলমতো ভরন্ত লাউ কেটে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। ছেলেদের বাবার কোর্টে যাওয়া আছে। টুনুর আজ কলেজ আছে কি না জানেন না। ভোর ভোর বেরিয়ে কোথায় গেল? পানু, তনু, খোকন যাবে স্কুলে। ভাত তো চাপালাম। এবার?

রান্নাঘরের চালে গোলপাতা। দরমার দেওয়াল। মাটির মেঝের ওপর একখানি করে

ইট পেতে সামান্য আস্তর করা। গরম পড়লেও এ ঘরে তেমন গরম হয় না। রান্নাঘরে সঙ্গে ঢাকা বারান্দা। গুন গুন করে রত্না কাননবালার গাওয়া—যদি আপনারা মনের মাধুরি মিশায়ে এ এ—গানটি গলায় তুলে কাঠের তাকে টিনের কৌটোয় হাত ভরে দিলেন। মাধুরিতে একটু থেমে চাপ দিয়ে।

কৌটোয় হাত দিয়েই রত্না আনন্দে ফাঁকা রান্নাঘরে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। আছে। আছে—লাউ তো পেড়ে এনেছি। কিন্তু রাঁধব কী দিয়ে ? কী দিয়ে ? কৌটোর ভেতর তাঁর হাতের আঙুল ছুঁয়েই বুঝল—চারটি মুগডাল এখনও প'ড়ে আছে। ভয় ছিল—যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে।

লাউটা বড় করে কেটে মুগডাল চাপাতে হবে। গরম পড়তে শুরু করেছে। এখন লাউ ডাল দিয়ে ভাত খেতে ভালবাসবে ছেলেরা। ভাত ফুটে আসছে। রান্নাঘরটা কিছু অন্ধকার। তবে বড়। বেশ বড়। ভাগ করে দুটি ঘর করা হযেছে। পাশের ঘরটিতে কেউ এলে শুতে বসতে পারে। নয়তো পড়েই থাকে।

কাঠের টুলটিতে বসে ভাত ফোটা দেখতে দেখতে উনুনে আরেকখানি কাঠের চ্যালা গুঁজে দিলেন। তাতে আগুনটা উসকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রত্না নিজের মনের ভেতরে কী একটা পেয়ে যাওয়ার আনন্দ টের পেতে লাগলেন। আজ ভোর থেকেই দিনটার শুরু অন্য রকমের। তিনি শিশির ভেজা পায়ে মাঠের ভেতর শটি বনে গিয়ে যখন দাঁড়ালেন—তখনও সূর্য উঠে আসেনি। চালতা গাছতলায় শালিক নেমে এসে হলদে ঠোঁটে মাঠ থেকে পোকা খুঁজছে। গৌর লগবগ করে দুলে উঠল। পানু বলল, মা এ জায়গাটায় কোপাই ?

উনুনের আগুনের আভায় রত্নার দুই হাত লালচে দেখাচ্ছে। টুনু পানুদের জন্যে মাঠ থেকে একটা খাবার খুঁড়ে বের করতে যে কী আনন্দ। নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না রত্না। অথচ ভেতরে ভেতরে বলকা দেওয়া দুধের মতো ফুলে ফুলে উঠছেন তিনি।

সাদা খোলের শাড়িখানা পাড়ের জায়গায় সুতোর ঢেউ তোলা। সবুজ সুতোয়। গায়ের ব্লাউজটি কালো অরগান্ডি। ঘটি হাতা। ব্রোঞ্জের ওপর সোনার জল করা দুটি ফুল কানে। হাতে শাঁখা-নোয়া, গলায় কিছু নেই।

ভাতের হাঁড়ি খুব সাবধানে নামালেন রত্না। বিড় বিড় করে নিজেকে বললেন, দিব্যি হাঁড়িটা নামিয়ে ফেললাম। আমি বোধহয় এখন তেত্রিশ চৌত্রিশ। রত্না জানেন—তিনি জন্মেছিলেন বঙ্গভঙ্গর বছরে। ১৯০৫ সনে। টুনু জন্মেছিল আমার তেরো চোদ্দো বছর বয়সে। তখন টুনুর বাবা পঁচিশ ।

ডাল চড়িয়ে দিয়ে বঁটি নিয়ে লাউটা কাটতে বসলেন রত্না। এক এক সময় নিজেকে নাগাড়ে বর্ষা পড়তে থাকা ভরা মাঠ লাগে। সারা মাঠ জুড়ে সব ঘাস সবুজ হয়ে উঠেছে। নধর। ঢালে নাবি পেয়ে বর্ষার জল গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। নিজেকে রত্নার কেমন চারদিক থেকে ভরভরাট লাগে। টুনু, পানু, তনু, খোকন, গৌর। রান্নাঘরের তাকে পর পর সব কৌটো সাজানো। এক সময় অনন্ত এক এক কৌটোর গায়ে কাগজ মেরে দিয়েছিলেন আঠা

দিযে। তার কোনওটায় লেখা ছিল—মুসুরি। কোনটায বা লেখা ছিল—মুগ। আবার কোনও কৌটোর গাযে অনন্ত লিখে দিযেছিলেন—সাদা জিরা। সে সব কাগজ কবেই উঠে গেছে। ওই কৌটোগুলো, সর্ষের তেলের বোতলটা, কেরোসিনের কুপি, বোতল থেকে কেরোসিন ঢালার ফ্লানেল- উঠোনে দেওয়াল ঘেঁষে ঠেলে ওঠা মানকচু গাছটা, তার কালচে-সবুজ বড় বড় পাতা—এ সব কিছু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রত্না আলাদা কবতে পারেন না। টুনু পানুর মতো এরাও যেন তাঁর সংসার। বিয়ের পর এই সব নিয়েই তাঁর বিশ বাইশটা বছর কেটে গেল। দেখতে দেখতে এখন তিনি তেত্রিশ চৌত্রিশ। লাউযের খোসাগুলো আলাদা করে রাখলেন। পরে টুকরো করে ভাজবেন। পানু তনু ভাতের পাতে খেতে ভালবাসে। জীবন এইভাবেই চলে যায়। বয়স এইভাবে বাড়ে— তা যেন এইমাত্র টের পেলেন রত্না। তিনি বহুকাল নিজের কথা একটুও ভাবেননি।

রান্নাঘরের দরজার কার ছাযা পড়ল। চমকে উঠলেন রত্না। ওমা ! এ যে বসন্ত দিদি !

বসন্ত আসলে দিদি নয। শ্রীশনগরে সবাই বলে—বসন্ত বুড়ি। চব্বিশ ঘণ্টা হাতে মিশির কৌটো। ধীরেন্দ্রবাবুর মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। বোধহয় এক বয়সী। মাজা বেঁকে গেছে। সে শ্রীশনগরে যে - কোনও ভাড়াটের বাড়ি না বলে কয়ে হুট করে এমন ঢুকে পড়ে। ভাবখানা—এ সব বাড়িই তো আমাদের। সে যে জমিদারবাবু মায়ের সঙ্গে ঘোরে ফেরে। অনেককে স্রেফ—ও 'ভাড়াটে !'—বলেও ডাকে।

বসন্ত বুড়ি বলল, বউমা আজ দুপুরে রেডিওর গান শুনতে যেতে বলেছে।

ওমা ! তাই নাকি। কখন ?

আমি ঘড়ি পরি হাতে ? রেডিওর গান হয় যখন—তখন।

অলকা বলেছে ?

সে নযতো আবার কে বলবে ! আর কার রেডিও আছে শ্রীশনগরে ?

বসন্ত বুড়ি যেমন এসেছিল—তেমনই চলে গেল।

অলকা মেয়েটি বড় ভাল। বাসন্তী রঙের শাড়ি পরলে মনে হবে অলকার গা থেকে যেন রং ফুটে বেরুচ্ছে। এত ফর্সা। ঘিয়ে রঙের ফর্সা। বঁটি ভাজ করে উঠে দাঁড়ালেন রত্না। এবার সারাদিনেব মতো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল রত্নার। তেত্রিশ চৌত্রিশ বছরে। পাঁচ ছেলের মা। এক একসময নিজেই তিনি অবাক হযে যান—যখন মনে হয়, এতগুলো ছেলে তার কোত্থেকে এল ? বছর বছর ছেলেরা বড় হচ্ছে। পালটে যাচ্ছে। টুনুর টিকোলো নাকের নীচে গোঁফের রেখা ঘন হয়ে উঠছে। ভ্রূর নীচে বড় বড় দুই চোখ যেন এইমাত্র ঘুম ভেঙে উঠে সারা পৃথিবী দেখছে। পানু এখন আর হাফপ্যান্ট পরতে চায না। লম্বা লম্বা পা। পাজামা ভালবাসে। কিন্তু এ বাড়িতে পাজামা মোট দুটো। দুটোই যে টুনুল দখলে চলে গেছে। নিজেকে এক এক সময় তার বিড়ালদের মা মনে হয। যেমন কিনা বিকেলের দিকে ছাদের আলসেতে একটা বিড়াল চার-পাঁচটা ছানা নিযে চুপ করে বসে থাকে। বসে বসে খুব সম্ভব মাছের কথা ভাবে। মাছ কোথায় পাওযা যাবে ? কোথায কোথায থাকতে পারে ?

ফিক করে হেসে ফেললেন রত্না। একা একা। ফাঁকা রান্নাঘরে। তাঁর এই শরীরটা কিছুতেই ক্লান্ত হয় না। ডালের ভেতব লাউ ছেড়ে দিয়ে রত্না খরো পায়ে উঠোনে গিয়ে নামলেন। মানকচুতলায় দেওয়াল ঘেঁসে কিছু ব্রাহ্মী শাক হয়েছে। আপনাআপনি। কয়েকগুছি উপড়ে নিলেন রত্না। ডালের সঙ্গে ব্রাহ্মী শাকের বড়া ভেজে দেবেন। বারান্দায় উঠতে উঠতে দেখলেন, তার পায়ের নখে মাটি—গোড়ালি জুড়ে ময়লা।

বেদনা বোন পরশু বলেছিল, এসো আমার ডালিমসই —ডালিম ফল—ঝামা দিযে তোমার পা ঘষে দিই। এত সুন্দর পা এমন করে রাখতে আছে ?

ঝামরে উঠেছিলেন রত্না। চুপ কর বেহায়া ! ছেলেরা বড় হয়ে উঠেছে না ! সে খেয়াল আছে ?

খুনলায় —শ্রীশনগরে সাত দিন আগেরও কথাবার্তা স্পষ্ট মনে পড়ে যায় রত্নার। কে কাকে কী বলেছে—একদম পর পর সব মনে পড়ে যায়। যেন কোনও জলের নালায় অসাবধানে হাত থেকে গড়িয়ে একটা সিকি পড়ে গিয়েছিল সেই কবে কোন কালে। পরিষ্কার জলের ভেতর থেকে কথাগুলো যেন সিকিটার মতো রত্নার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কাল রাতে কী একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল টুনুর।

স্বপ্নের ভেতর গলা শুকিয়ে কাঠ। ঘুম ভেঙে যেতে স্বপ্নটাকে মনে করার অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না। এভাবে তার অনেক স্বপ্ন হারিয়ে গেছে। মশারির ভেতর থেকে জানলায় তাকিয়ে টুনু দেখতে পেল—জানলার ওপারে শ্রীশনগরের রাস্তায় ওপর পড়ে থাকা জ্যোস্না কেমন আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে। তার মানে ভোর হয়ে এল বলে।

তার পাশে পানু ঘুমোচ্ছে। ভাল নাম সত্যবান। সে নিজে ঋতবান। টুনুকে দৌলতপুর কলেজের ক্লাশফ্রেন্ডরা ডাকে ঋতু বলে। ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো বাড়ির সবেধন হাতআয়নাখানি নিয়ে জানলায় সামনে দাঁড়াল। আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকাল টুনু। কত বদলে গেছে সে। চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াল। তারপর মায়ের তৈরি কর্পূর মেশানো ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মেজে খুব টাটকা লাগতে লাগল তার।

মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরে গায়ে শার্ট গলাতে গলাতে টুনুর ফস করে মনে হল—কিছুদিন হল দৌলতপুর কলেজে ফোর্থ ইয়ারের কাউকে কাউকে ফুলপ্যান্ট পরতে দেখা যাচ্ছে। সবাই বলে দোনলা। অমন প্যান্ট পরলে তাকে কেমন দেখাবে ! সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই [illegible] উঠল বিড় বিড় করে—ধ্যুস্। পরি তো ধুতি নয়তো পাজামা। তাও একদিন অন্তর এ[illegible] গোলা সাবান দিয়ে কেচে ছাদে রোদ শুকিয়ে নিই।

স্যান্ডেলের নীচে বাঁ পায়ে একজায়গায় ঠেলে উঠেছে। হাঁটতে গেলে লাগে। তাই পায়ে দিয়ে বেরোতে যাবে—এমন সময় মায়ের মুখোমুখি।

কোথায় যাচ্ছিস ?

এই একটু ঘুরে আসি।

এত ভোরে ?

এমনি মা—

শ্রীশনগরের ঘুম ভাঙেনি তখনও। জলের ভারীরা কবরখানা রোডে ওড়িয়ার দোকানে লেড়ো বিস্কুট দিয়ে চা খাচ্ছে। সাহেবদের কবরখানার বেঁটে কম্পাউন্ড ওয়ালের ওপর দিয়ে পাতাবাহার গাছের নানা রঙের পাতা বেরিয়ে। কোথায় যাবে ? কোন দিকে যাবে ? কেন যাবে ? কিছু ঠিক করে উঠতে পারছে না ঋতবান ঘোষাল। তার কী এক অস্বস্তি হয়েছে— সে কোনও মেয়ের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই পারে না। চোখে চোখ পড়ে গেলে—কেমন ভয় করে ওঠে টুনুর—এই বুঝি আমাকে বুঝে ফেলল—আমার মনের ভেতরটা দেখে ফেলল। কী এক অসহ্য দশা। ভুলেও সে ভবানীদির মুখোমুখি হয় না। বিশেষ করে খালিশপুরের জঙ্গলে সেই দিনের পর থেকে। যেদিন সাধু হয়ে যাওয়া স্বামী দিলীপদার খোঁজ করতে বেরিয়ে ভবানীদি তাকে একটা গাছের সঙ্গে চেপে ধরেছিল।

খুলনায় গার্লস কলেজ শহরের ভেতর। দৌলতপুর কলেজ থেকে ফিরে খুলনা রেল স্টেশন থেকে বাড়ি আসার পথে ঋতবান দু একদিন কয়েকটি মেয়ের একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেছে। ওরা রেল কলোনির মেয়ে। এতদিন ওদের দেখতে বেশ লাগত ঋতবানের। বড় মেয়ে সবাই। শাড়ির আঁচল পিঠে। তার ওপর বেণী। হাতে বই। একটা মেয়ের চোখে চশমা। ওরা যে কলেজে পড়ে তা হাবেভাবে চলায় বলায় বুঝতে পারে ঋতবান। নিজে কলেজ থেকে ফেরার পথে ওদের মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে সে। এও বুঝতে পেরেছে—ওরাও তাকে দেখে—একদম প্রায় বুঝতে না দিয়ে। কিন্তু ঋতবান বুঝতে পারে। কারণ, সে কিছুকাল হল লক্ষ করছে—কলেজে, রাস্তায় শ্রীশনগরের পুকুরে চান করতে গেলে লোকে তাকে চুপ করে দেখে। এমনকি বাড়ির মা তাকে দেখে চুপ করে তাকিয়ে থাকে। দেখে হয়তো মা ফস করে বলে বসে—তুই টুনু খুব সুন্দর হয়ে উঠেছিস।

তাতে টুনু মনে মনে নিজেকে বলে, ধ্যাৎ ! এ সব কথা তো উঠতি মেয়েদের বলা হয়। মা অমন চুপ করে পানুকেও দেখে। পানুটা লম্বা হয়ে উঠেছে।

হাঁটতে হাঁটতে ধর্মসভার মোড়। বাঁয়ে বেঁকে সিধে গেলে ভৈরবনদীর ঘাট। সেখানে কালীবাড়ি পাড়া। টুনু বুঝতে পারে সে আগের চেয়ে লম্বা হয়ে গেছে। ছিপছিপে। মাথাভর্তি চুল। চোখ বুজে থাকলে অন্ধকার কোন বিন্দু থেকে একটা আলো যেন টের পায়। একেই কি আশার আলো বলে ? কে জানে ? চোখ খুলে তাকালে সব কিছু নতুন, সুন্দর তাজা মনে হয়। কেন যেন মনে হয়—সামনে ভাল কিছু একটা ঘটবে। যদিও আর কোনও লক্ষণ সে এখন দেখতে পাচ্ছে না।

ভৈরবঘাটে গিয়ে টুনু নদীর সামনে দাঁড়াল। নদী কখনও একা থাকে না। শঙ্খচিল পাক খাচ্ছে আকাশে। নীচে জেলেদের নৌকো, সারি সারি। জাল পেতে বসে আছে ওরা। মাগুরা যাবার লঞ্চ ভোঁ দিল। টুনু নিজের কাছে জানতে চাইল, আমি রেল কলোনির সেই কলেজের মেয়েদের দিকে আর চোখ তুলে তাকাতে পারি না কেন ? কেন লজ্জা করবে আমার তাকতে ?

সে নিজের মুখ দেখতে পায় না। পিঠ দেখতে পায় না। মাথা দেখতে পায় না। কিন্তু

সামনেটা দেখতে পায়। গলার স্বর তার আগের চেয়ে অনেক গাঢ় হয়ে উঠেছে। ভারী। মা কি এইজন্যে আমার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে ? একেই বলে বেড়ে ওঠা ? বড় হয়ে যাওয়া ? যাকে বলে যুবক—এখন কি আমি তাই ?

বেশ কয়েক বছর হল আমি আর পানু মায়ের সঙ্গে শুই না। শুলে খোকন, গৌরের জায়গা হয় না। বাবা প্রায়ই বলেন, গ্র্যাজুয়েট হলে ল পড়বি। উকিল হবি। একদিন তোর পসার হবে। নামডাক হবে। আমাদের সংসারের হাল ফিরে যাবে। তুই এখন বড় হয়ে গেছিস। দেখিস নি হাকিমসাহেবকে। আব্দুল হাকিম। রাত জেগে জেগে ল-এর বই পড়েন। খুব জ্ঞানী উকিল।

রোদ উঠে আসছে ধাঁ ধাঁ করে। কোথায় যাবে তা টুনু জানে না। পড়াশুনোও কেমন লাটে উঠেছে। পলিটিকাল সায়েন্সের থিয়োরিগুলো কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মনে হয় এত কচকচি কেন ? বিকেল পড়ে এলে কলেজ লাইব্রেরির করিডর যেন খাঁ খাঁ হয়ে যায়। যেন কোনও মানে নেই। এই পড়াশুনোর যেন কোনও মানে নেই। আমার জীবনে এ সবের দাম কী ? এই জীবন নিয়ে আমি কী করব ? এখনই অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা—

রবীন্দ্রনাথ চলে আসেন কেন ? কেন যেন এখন খুব কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে তার। একা একা। আমার এই শরীরটা নিয়ে কী করব জানি না। এই শরীর কি হাঁটার জন্যে ? না শুয়ে থাকার জন্যে ? অচ্ছোদ সরসী নীরে ?না, না, হবে—অচ্ছোদ সরসী তীরে— লাইনগুলো মনে রাখতে পারছি না। সাগরজলে সিনান করি ! খুলনার লোকে স্নান করাকে বলে চ্যান করে আসা।

ফেরার পথে ডাকবাংলোর মোড়। সারা শহর জেগে উঠেছে। পাঁই পাঁই করে সাইকেল রিকশা ছুটছে। এই ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে ঋতবান টের পেল—এই ব্যস্তসমস্ত জীবনের মাঝখানে আমি কোথাও জড়িয়ে নেই।

ডাকবাংলোর মোড় থেকে ডাইনে ঘুরলে স্টেশনে যাবার রাস্তা। ফেরিঘাট রোডের মোড়ে এসে বাঁয়ে ঘুরে গেলে শ্রীশনগর পড়ে ডান হাতে। স্টেশন যাবার রাস্তায় পড়ে সে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল।

ডান হাতে বাগান সমেত দোতলা বাড়ি। একতলায় বারান্দার লাগোয়া ঘর থেকে সুন্দর বাজনা ভেসে আসছে। পিয়ানো কি অর্গান তা আলাদা করতে পারল না টুনু। তবে হারমোনিয়ামের চেয়ে অনেক ভারী। খুব চেনা সুরে বাজনাটা রবীন্দ্রনাথের একটা গান গাইছে। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী—

আর কে ! আব্দুল হাকিমসাহেব বাজাচ্ছেন। খোলা জানলা দিয়ে তাঁর কাঁধ—মাথা দুইই দেখতে পেল টুনু। খোলা গেট দিয়ে এগিয়ে যেতে টুনুর চোখে আব্দুল হাকিম আরও স্পষ্ট হলেন। চোখ বুজে আছে তাঁর। গায়ে একটি ফতুয়া । মুখের একটি পাশ দেখা যায় মাথায় চুলের এগোনো ভাবটা—নাকের ডগা—চিবুক—সব কিছুর ওপর দিয়ে আলোর একটা আউটলাইন যেন মানুষটিকে ছুঁয়ে আছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপ করে ঋতবান বাজনায় রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে লাগল। কথাগুলো একদম ফুটে উঠছে। অথচ কথার চেয়ে যেন বেশি। এ নিশ্চয় পিয়ানো। নয়তো এত গম্ভীরের ভেতরেও এত আনন্দ থাকে।

কে ? কে ওখানে ?

হঠাৎ পিয়ানো থেমে গেল। আব্দুল হাকিম উঠে এলেন দোরগোড়ায়। কে তুমি ?

টুনু ঘাবড়ে গেল। সে কোনমতে বলতে পারল, আজ্ঞে আমি--

তোমাকে তো চিনতে পারছি না। কী চাই ?

আজ্ঞে আমি ঋতবান ঘোষাল।

তখনও বুঝতে পারছেন না আব্দুল হাকিম। তাঁর লম্বা চওড়া চেহারা। চোখে তখনও বাজনার সুর লেগে আছে। গলার স্বর বেশ গম্ভীর।

টুনু বলল, আমার বাবাকে আপনি চেনেন। শ্রীঅনন্তকুমার ঘোষাল—

ওঃ! তা বলবে তো। পেশকারবাবু ঘোষালমশায়ের ছেলে তুমি। তুমিই তো বড়।

হ্যাঁ।

তোমাকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম অনন্তবাবুকে। তুমি টুনু! তোমার নাম বলেছিলেন অনন্তবাবু। ভেতরে এসো। ভেতরে এসো।

টুনু খুলনার প্রায় কোনও বাড়িতেই ঘরে ঢোকার মুখে পাপোশ দেখেনি। এ বাড়িতে পাপোশটিও বেশ পরিষ্কার। সে স্যান্ডেল খুলে ভেতরে ঢুকল।

আব্দুল হাকিম টুনুকে ঘরের ভেতর এনে একখানি বড় চেয়ার এগিয়ে দিলেন। বোসো।

আপনি ?

তুমি বসবে তো আগে। তুমি আমার অতিথি। নবীন অতিথি।

এ কথায় সারা ঘরখানি যেন ঝলমল করে উঠল। আব্দুল হাকিম নিজে উল্টোদিকের দেওয়ালের কাছাকাছি বড় তক্তপোশের ওপর আসন করে বসলেন। সেই দেওয়ালের গা ধরে বই ভর্তি র‍্যাক। বাকি তিন দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় বই। অর্গান নয়—পিয়ানোই হবে—তাই মনে হল টুনুর। ঘরের মাঝামাঝি একটা বড় সেন্টার টেবিলে পর পর অনেকগুলো খবরের কাগজ। পাশেই মাসিক প্রবাসী পড়ে আছে।

মেঝেতে একখানি ইংরেজি পত্রিকা।

উঠে গিয়ে সেই পত্রিকাটি তুলে টেবিলে রাখল টুনু। মর্ডান রিভিউ।

তুমি পড় নাকি এ সব ম্যাগাজিন ?

উল্টেপাল্টে দেখেছি আমাদের কলেজ লাইব্রেরিতে।

দৌলতপুর কলেজে ? ওখানে আমিও পড়েছি। আমরা যশোরের কালিয়ার লোক। আমার আব্বাসাহেব পাটের ব্যবসা করতেন। তাঁর ইচ্ছেতেই আমার দৌলতপুর কলেজে ভর্তি হওয়া। তিনি চেয়েছিলেন আমি অনেকদূর পড়াশুনো করি। কলকাতায় এম.এ . ল' করে শেষে তো এই ওকালতিতেই জড়িয়ে পড়লাম। এখন আর পড়াশুনো করা হয় না।

বাবা বলেন, আপনি অনেক রাত জেগে পড়াশুনো করেন।

সে তো বেশিরভাগ আইনের কেস ঘাঁটি। পড়াশুনো আর কোথায় হয়! বি. এ-তে স্যান্সক্রিট ছিল। কালিদাস পড় তোমরা?

আমার তো সংস্কৃত নেই।

ক্ল্যাসিকাল ভাষা কেন যে পড়ায় না! কালিদাস আবৃত্তি করলে কেমন যেন একটা ঝঙ্কার টের পাই। উপনিষদ, কোরানশরিফ সঙ্গী পেলে পড়তাম। তুমি এলে পড়ে শোনাতাম। আসবে?

খুব ভাল লাগছে টুনুর। আব্দুল হাকিমসাহেব একেবারে অন্য মানুষ। কিন্তু সে সাহস করে বলতে পারল না—আসব।

মাঝে মাঝে কোরান অনুবাদ করে ঈদের মাঠে বিলি করি—বিশেষ করে যেখানে মানুষের কথা রয়েছে—সেই সব কথা। জানো টুনু, ফার্সি কবি রুমি পড়েছিলাম। একা পড়ে পুরো আনন্দ হয় না। সঙ্গে একজন লযদার লাগে। ভেবেছিলাম— প্রফেসরি করব। শেক্সপিয়র পড়ব। কালিদাস পড়ব।

করলেন না কেন?

ওকালতিতে ঢুকে পসার হয়ে গেল। কালিয়ায় আমার আর দুই ভাই থাকে। তাদের সবার সংসার নিয়ে আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। আমি তো বড় ভাই।

টুনু উঠে গিয়ে বইয়ের র‍্যাকের সামনে দাঁড়াল। আমি একটু দেখব?

দ্যাখো দ্যাখো। বই তো দেখে চাখার জিনিস।

পর পর বাঁধানো বঙ্গদর্শন দেখে টুনু জানতে চাইল, আপনি বঙ্গদর্শন রাখতেন?

হেসে ফেললেন হাকিমসাহেব। না না। বঙ্গদর্শন কি আজকের! আমার আব্বাসাহেব বঙ্গদর্শনের সাবস্ক্রাইবার ছিলেন। আমি কালিয়ার বাড়ি থেকে এনে বাঁধিয়ে নিয়েছি।

চেহারা দেখে টুনু বুঝল—ছ মাস ছ মাস করে প্রবাসী বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। পুটে সাল সব সোনার জলে লেখা। একখানি বাঁধানো বইয়ের পাতা খুলতেই প্রবাসীর ছবির নীচে লেখা—আবিসিনিয়ায় মুসোলিনির সৈন্যবাহিনী। খচ্চরের পিঠে বোঝা চাপিয়ে ইতালির সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে। ব্যাপারটা টুনুর জানা। বছর দুই তিনেক কথা। শোনা যাচ্ছে— ইতালিতে মুসোলিনি নাকি সব ট্রেন সময় মতো যাতে চলে তাই দেখতেন। হিটলারও নাকি জার্মান জাতির হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনবেন।

রোদ বেশ ভাল করে উঠেছে। বাড়ির সামনে পিচ রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি, সাইকেল রিকশা যায় আসে। মানুষজন। বাঁধানো প্রবাসী জায়গা মতো রেখে দিয়ে টুনু এ বার যে বইখানি হাতে পেল—তার ওপর লেখা—মোস্তাফা চরিত। লেখক—মৌলানা মহম্মদ আক্রম খাঁ।

ইনি কি সেই আক্রম খাঁ যিনি দৈনিক আজাদের—

সম্পাদক। হ্যাঁ, তাঁরই লেখা। সব বাঙালির এই বইখানি পড়া উচিত। কোনও অলৌকিকতার আশ্রয় না নিয়ে—ইতিহাসকে বিকৃত না করে হজরত মহম্মদের ওপর এত

সুন্দর বই লিখেছেন—এমন যুক্তিবাদী লেখা—

মোস্তাফা চরিত বইটি জায়গা মতো রেখে তার পাশেই টুনু দেখল--পর পর সাজানো রয়েছে--চার ইয়ারি কথা, বিষাদ সিন্ধু, চার অধ্যায়, পালামৌ আর বিষবৃক্ষ।

বই দেখতে --বই নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে না ?

হাকিমসাহেব যেন টুনুর মনের কথাটি বলে দিলেন। টুনু বলল, বই নাড়াচাড়া করতে করতে কিন্তু মন খারাপ হয়ে যায়।

কেন ? কেন ?

মনে হয় কিছুই পড়া হয়নি। এ জীবনে হয়তো আর হবে না।

ভেরি গুড সাইন। এই আকাঙ্ক্ষা থাকলেই তো পড়াশুনো হয়।

আমার বোধহয় পড়াশুনো হবে না।

এ কথা বলছ কেন টুনু ?

বাবাকে আমি দোষ দিই না। তিনি সংসার টানতে উদয়াস্ত খাটছেন। আমরা চারজন পড়ি। বাড়িভাড়া। স্কুল কলেজের মাইনে। আমার ট্রেনেব মান্থলি। বাবা বলেছিলেন, তুই কোর্টে বসবি। মুহুরি হবি। উপেন পেশকারের ছেলে লালু বসেছে।

পাজামার ওপর ফতুয়া। পায়ে হালকা চটি। আব্দুল হাকিমসাহেব উঠে দাঁড়ালেন। সে কী কথা ? অনন্তবাবু যেন বলেছিলেন—ছেলেদের হায়ার এডুকেশন দেবেন। প্লিডার করবেন--

হ্যাঁ। বাবার ইচ্ছে তাই। খুব ইচ্ছে। কিন্তু সংসারের চাপে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

না না। তা হয় নাকি ? আমি অনন্তবাবু সঙ্গে কথা বলব। তুমি পড়বে। যে বই ইচ্ছে আমার এখান থেকে নিয়ে গিয়ে পড়বে। পড়া হয়ে গেলে আবার জায়গা মতো এনে রেখে দেবে।

আমার ইচ্ছে কলকাতায় গিয়ে শেয়ালদার কাছে রিপন কলেজে ভর্তি হব।

কেন ? দৌলতপুরে কী অসুবিধে।

পড়াশুনো হয় না।

কেন ? প্রফেসাবরা পড়ান না ?

না না। তাঁরা পড়ান। কলেজে রোজ ঝগড়া লেগেই আছে। হকসাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির সাপোর্টারদের সঙ্গে মুসলিম লিগের সাপোর্টাদের মারামারি। আবার কংগ্রেসের ভেতর দু দল। একদিকে গান্ধীর সাপোর্টার অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের--

কিন্তু কলকাতায় পড়ার তো খরচ আছে। থাকবে কোথায় ?

খুলনাব শ্রীশনগরের আশুবাবুদের দাঁতের মাজনের হোলসেল কারবার। মির্জাপুর স্ট্রিটে অফিস, গোডাউন--দুইই আছে। সেখানে থাকার জায়গা হয়ে যাবে। ওদের মাজনের খুব কাটতি আসাম, বিহার, উড়িষ্যায়।

পড়া চালাবে কী করে ?

আশুবাবুকে ভাইপো জগদীশবাবু বলেছেন, নিচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের জন্যে প্রাইভেট টিউটার চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় কলকাতায় লোক। তার একটা নিশ্চয় জুটে যাবে। জানাশুনো হয়ে গেলে চাই কি তিন চারটে টিউশুনি পেয়ে যেতে পারি।

আব্দুল হাকিম অভিজ্ঞ উকিল। তিনি খুব মন দিয়ে টুনুর মুখখানি দেখছিলেন। অনেক স্বপ্ন ছেলেটির দু চোখে। কিন্তু এই পৃথিবী বড় কঠিন জায়গা। ঠিক এই সময় বড় রাস্তা থেকে গোলমালের আওয়াজ ভেসে এল। কারা যেন স্লোগান দিচ্ছে। আওয়াজটা এগিয়েই আসছে।

আব্দুল হাকিম আর টুনু গিয়ে রাস্তায় দিককার জানলায় দাঁড়াল। ওদের চোখের সামনে রাস্তা দিয়ে মিছিল যাচ্ছে। সামনে ফ্ল্যাগ। সে ফ্ল্যাগ দেখে হাকিম সাহেব বিড় বিড় করে বললেন, ওরা সব গাঁয়ের চাষি। নদীর ওপারের গাঁ থেকে এসেছ। লিগ ওদের খেপাচ্ছে।

টুনু লক্ষ করল, হাকিমসাহেব যেন অস্থির হয়ে পড়েছেন। জোরালো স্লোগানে রাস্তার দু পাশে মানুষজন, সাইকেল রিকশা সব দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তায় ওপারেই রেল কলোনির মাঠ। দিনের বেলায় কারা সেখানে ইঞ্জিনের কয়লা পোড়াচ্ছে। তার সাদাটে ধোঁয়া পাক খেয়ে আকাশমুখো।

আশ্চর্যের কথা টুনু—একমাত্র ফজলুল হকসাহেব গাঁয়ের চাষিদের কথা জোরালো গলায় বলেছেন। আইন করছেন। আর হকসাহেবের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার করার সুযোগে লিগ মুসলমান চাষিদের ধর্মের নামে তাতাচ্ছে। অথচ লিগের নিজের কোনও ল্যান্ড পলিসি নেই।

নেই ?

না। সেটাই তো মজার কথা। আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে দেখেছি হকসাহেব হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে গরিব চাষিদের নিয়ে মুভমেন্টে নেমেছেন। নাইনটিন টোয়েন্টিসিক্সে মানিকগঞ্জ মহকুমায় মহাজন আর জমিদাররা মিলে সব জমি নিয়ে নেয়। হকসাহেবের লিডারশিপে আন্দোলন হল। তখন মৌলানা আক্রম খাঁও এই মুভমেন্টে শামিল ছিলেন। চাষিরা চাষ বন্ধ করে দিল। ফলে মহাজনরা আপস করতে বাধ্য হল। এই সময় লিগের কোনও রোল ছিল না।

তাই ?

হ্যাঁ। বলছি কি টুনু, লিগ কোনও দিনই ল্যান্ড রিফর্ম করতে চায়নি। দুবছর আগে ভোটের ঠিক মুখে যখন লিগের সঙ্গে হকসাহেবের পার্টির সিট অ্যাডজাস্টমেন্টের কথা উঠল—তখন তো এই জমির প্রশ্নেই লিগ সে আলোচনা ভেঙে দিল। কলকাতায় ক্যামাক স্ট্রিটে লিগের ইস্পাহানিদের বাড়িতে সভা বসেছিল। উনিশশো উনত্রিশে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির পত্তন। তার প্রেসিডেন্ট কে হবেন তাই নিয়ে—দুঃখের কথা—আক্রম খাঁ-সাহেবের সঙ্গে হকসাহেবের বনিবনা হল না। মৌলানা আক্রম খাঁ বেরিয়ে গেলেন। গত ভোটের ঠিক আগে হকসাহেব ডাক দিয়েছেন—মুসলমান অ-মুসসলমান ঐক্য চাই। ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর দল সবার জন্যে খোলা। আর দ্যাখো ধর্মের নামে লিগ স্লোগান দিচ্ছে—

ল্যান্ড কোশ্চেনে নিশ্চুপ থেকে গরিব মুসলমানদের খেপাচ্ছে।

কংগ্রেস কী ররছে ? তার কি কিছুই করার নেই ?

সেটাই ট্র্যাজেডি টুনু। এত বড় পার্টি ! সেও ল্যান্ড কোশ্চেনে একেবারে বোবা। এই ট্র্যাজেডির শুরু দেশবন্ধু বেঁচে থাকতেই। তিনি কলকাতায বাংলায় গাঁয়ের লিডারশিপকে আনতে চেয়েছিলেন। চেষ্টাও করেছিলেন। পারেননি। কলকাতা কর্পোরেশনে জিতে তিনি আনতে চেয়েছিলেন মৌলবী আসরাফুদ্দিন চৌধুরী আর বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে। তুমি এদের নাম শুনেছো ?

টুনুর ঠিক মনে পড়ল না। সে লজ্জা পেয়ে বলল, একটু একটু শুনেছি।

আব্দুল হাকিম যেন অস্থির হয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁর নিজের কথার ঘোরেই রয়েছেন। বললেন, কলকাতা ঘেঁষা লিডারশিপের চাপে দেশবন্ধু কলকাতা কর্পোরেশনে আনতে বাধ্য হলেন সুভাযবাবু আর শহিদ সোহরাওয়ার্দিকে। আসরাফুদ্দিন চৌধুরি, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলেরা কোণঠাসা হলেন। সে জায়গায় এলেন শহরের নেতারা। এল শহরের পলিটিক্স। কংগ্রেস ল্যান্ড রির্ফম নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্যই করে না। তাই সাধারণ চাযি, ল্যান্ডলেস ফার্মারিদের ভেতর তার কোনও শেকড় নেই। সেখানে ধর্মের নামে ধুনো দিচ্ছে লিগ। এটাই তো আমাদের ট্র্যাজেডি।

হকসাহেবেব পার্টি ? ধর্মের নামে লোক তাতালে সেখানে যুক্তি, সুস্থবুদ্ধির জায়গা কোথায় ? এবাব হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষবাবু অবশ্য ল্যান্ড কোশ্চেন তুলেছেন। চাষিদের ঋণ মকুবের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি কি হালে পানি পাবেন ! দ্যাখো তিনিই কংগ্রেসে হারিয়ে যান কি না।

টুনু দেখল, মিছিল চলেছে তো চলেছই। রেল কলোনির মাঠে আগুন দেওযা ইঞ্জিনের কযলা থেকে ধোঁয়া উঠছে। সারা শহর যেন থমকে এক জাযগায় থেমে আছে। এই মিছিলের পাযের নীচে।

খানিকক্ষণ কোনও কথা নেই। সারা ঘর থমথম করছে। আকাশেও কি অকালে মেঘ করল ? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

আব্দুল হাকিম বললেন, এতদিনে কংগ্রেসের টনক নড়েছে। সাঁইত্রিশের ভোটের রেজাল্ট দেখে কংগ্রেসে রব উঠেছে, মাস কনট্যাক্ট করতে হবে। দূরে দূরে যাওযা মুসলমানদের সঙ্গে গণসংযোগ করতে হবে, দেরি হযে গেছে অনেক। সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট তাঁর মৃত্যুর পর কংগ্রেস বাতিল করল। তাতে মৌলানা আক্রম খাঁয়ের মতো মানুষ মনমরা হয়ে অন্য দল থেকে সরে এলেন। হকসাহেবের সঙ্গে বনিবনা হল না বলে সেখান থেকেও মৌলানা সরে গিযে লিগে জয়েন করেছেন। দ্যাখো না কালকের আজাদ কাগজখানা। এই মাস কনট্যাক্ট নিয়ে মৌলানাসাহেব কী লিখেছেন।

আব্দুল হাকিম সেন্টার টেবিলের ওপর থেকে গতকালের দৈনিক আজাদ খুঁজছেন। রাস্তায় মিছিল থেকে গলা ফাটানো স্লোগান। সে আওযাজে ঘর যেন ভেঙে পড়বে।

টুনু বলল, দেখুন। আমরা কখনও পলিটিক্সের কথা বলি না।

চমকে ফিরে তাকালেন আব্দুল হাকিম। তিনি কথাটার মানে বুঝতে পারেননি। টুনুর মুখে তাকিয়ে রইলেন।

বাবা একা চাকুরে। আমাদের অবস্থা তো অপনি বুঝতেই পারেন।

সে কী কথা ? তাই বলে দেশের পলিটিক্স নিয়ে ভাববে না ?

আমাদের তো কোনও ভোট নেই। আমাদের অতি সাধারণ অবস্থা। আমাদের নিয়ে কোনও পার্টিই মিছিল বের করবে না।

একটুখানি থমকে গেলেন হাকিম। তারপর গতকালের আজাদ কাগজখানি মেঝেতে দেখতে দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, পড়েই দ্যাখো না মৌলানাসাহেবের লেখাটা। মাস কনট্যাক্টের ওপর এডিটেরিয়াল—হিন্দু মুসলমান কী ভাবে ভাগ হয়ে যাচ্ছে—কত দুঃখের কথা—

টুনু আজাদ কাগজখানি হাতে নিয়ে পড়তে লাগল। আবছা মতো ছাপা। তবু সে পড়তে লাগল। পড়তে গিয়ে তার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল—

'কংগ্রেস যেদিন হইতে মোছলেম গণসংযোগ নামে পরিচিত নূতন নীতির বাণী ঘোষণা করিয়াছেন, তখন হইতেই ভারতের মোছলেম সমাজ স্পষ্টভাবে সে আন্দোলনের বিরোধিতা করিযাছেন। উক্ত আন্দোলনের অন্তরালে যে দুরভিসন্ধি রহিয়াছে তাহা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিযা দেওয়া হইয়াছে এবং নিখিলভারত মোছলেম লিগের সভাপতি মিঃ জিন্নাহ পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু কর্তৃক পাতা এই সাংঘাতিক ফাঁদ সম্বন্ধে মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।'

মুখ তুলল টুনু। দেখল আব্দুল হাকিম তার মুখে তাকিয়ে আছেন।

কী ? আর পড়া যাচ্ছে না তো ! হ্যাঁ। পড়তে গেলে কষ্ট হবেই। সবাই যেন আলাদা হয়ে গেছেন। প্রেম নেই। বিশ্বাস নেই। মৌলানার মতো মানুষ কত দূরে চলে গেছেন। আর জওহরলালই বা কী ! হারানো ভালবাসা, হারানো বিশ্বাস কি মাস কনট্যাক্টের মতো কোনও প্রোগ্রাম নিয়ে ফিরে পাওয়া যায় ! উদ্ধার করা যায় ? ভালবাসা কি কুয়োয পড়ে যাওয়া ডালের হাতা ?

টুনু দেখল—তক্তপোশে বসে পড়া মানুষটির মুখ মেঝের দিকে তাকিয়ে ঝুলে পড়েছে। দুই হাত বিছানার ওপর ভর দিয়ে হাকিম সাহেব শরীরের ভার রেখেছেন। অর্গান ? না, পিয়ানো ? ঠিক জানে না টুনু—ঘরের কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মিছিল চলে গেছে। আর কোনও আওয়াজ নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে এল টুনু। রাস্তায় উঠে দেখল—রেল ইঞ্জিনের কয়লার ঢিপিতে লাগানো আগুন থেকে ধোঁয়া উঠে উঠে আকাশের অনেকটা দখল করে ফেলেছে। সূর্য মাথায়।

এই সময়টায় যে যার মতো স্কুল, কলেজ, অফিস, কাছারিতে। সে নিজেও আজ কলেজে যায়নি। কিন্তু আব্দুল হাকিমসাহেব ? তিনি ? তিনি কেন কোর্টে যাননি তা বুঝতে পারল না টুনু।

ফেরার আগে ধর্মসভার মাঠ পড়ল। এই পাড়াটির নামই ধর্মসভা। এখানে একটি আটচালা আছে। একটি মন্দির আছে। তা ছাড়া মাঠও আছে অনেকটা। কখনও কথকতা হয়। কখনও বা খোলা মাঠে কংগ্রেস ছোটখাটো সভা করে।

পাশের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে টুনু দেখল—অনেকে মাঠে বসে। পা ভাঁজ করে। মাথায় ওপর আড়াল বলতে বিরাট আটচালার ছায়া। তা জনা তিরিশ চল্লিশ হবে। কেউ বা স্কুলের উঁচু ক্লাশের ছেলে। কেউ বা পান সিগারেটের দোকানে বিড়ি বাঁধে। তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভবানীদি কী সব বলছে। একেই বলা হয় কংগ্রেসের কর্মিসভা। মাঝে সাঝে এই কর্মিসভাব পোস্টার পড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে। খবরের কাগজের ওপর কালো কালি দিয়ে লেখা থাকে এই সব সভার জায়গা আর সময়ের কথা।

টুনু দূরে দাঁড়িয়ে। ভবানীদির কোনও কথাই সে শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার দাঁড়াবার ভঙ্গি—কথা বলতে বলতে হাত নাড়া--মাথা দোলানো--সবই সে দেখতে পাচ্ছে।

এরকম সভা প্রায়ই হয় । একে কংগ্রেসিরা বলে—কর্মসূচি। ওখানে আলোচনার পর যা ঠিক হয়—তার নাম সিদ্ধান্ত। এসব দেখে দেখে--শুনে শুনে সবার চোখ কান পচে গেছে।

আমার কী হল ? আমি তো ভবানীদির কোনও কথাই শুনতে পাচ্ছি না। টুনুর মনে হল—তার কান ভোঁ ভোঁ করছে। ভবানীদি কী কথা বলায় মাঠে বসে থাকা ছেলেরা সবাই হেসে উঠল একসঙ্গে। আবার কোনও কথায় সবাই গম্ভীর হয়ে গেল। ভবানীদির গলায় মাত্র দুটি শব্দ টুনু পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে বার বার। সে দুটি শব্দ হল--ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। কংগ্রেসের যে কোনও সভায় যা বার বার শোনা যায়। এই খুলনা শহরে ব্রিটিশ বলতে মাত্র একজনই আছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লসন সাহেব। তাঁকে বিশেষ দেখা যায় না। তিনি থাকেন জেলা স্কুলের কাছে। ভৈরব নদীর পাড়ে তাঁর বাংলোয়। যে বাংলো গাছপালা দিয়ে চারদিক থেকে ঢাকা থাকে। দূর থেকে টুনু দেখেছে—বাংলোর সামনে লসন সাহেবের লঞ্চ ভৈরবে ভাসছে। নদীনালার ভর্তি এই জেলায় লসন সাহেবকে লঞ্চে করে অনেক জায়গায় যেতে হয়।

টুনু রাস্তায় দাঁড়িয়ে নড়তে পারছে না। ভবানীদির কী একটা টান সে টের পায়। তার পাশ দিয়ে সাইকেল রিকশা সঙ্গে আসছে। অনবরত। একবার মনে হল—কথা বলতে বলতে ভবানীদি তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে নিল। সঙ্গে সঙ্গে টুনু মাথা নামিয়ে ফেলল।

বেশ দেখাচ্ছে ভবানীদিকে। কোমরে আঁটো করে শাড়ি পেঁচানো। খদ্দরের। পাড়ে গাঢ় সবুজ রং : বড় মোটা একটা বেণী পিঠ দিয়ে পেছনে না নেমে বাঁধের ওপর দিয়ে একেবারে সামনে এসে পড়েছে। পাড়ের সঙ্গে না মিলিয়েই খদ্দরের সাদা ব্লাউজ।

আবার ভবানীদি তার সামনে বসে থাকা ছেলেগুলোর মাথায় ওপর দিয়ে টুনুর দিকে তাকিয়ে হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে টুনু বুঝতে পারল সে কী এক টানে ফের ভবানীদিকে দেখছিল। নিজের অজান্তেই। একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে। ফের মাথা তুলে।

রাস্তা থেকে মাঠ প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ গজ দূরে। সাইকেল রিকশার প্যাঁক প্যাঁক—

চলতি লোকজনের কথাবার্তায় ভবানীদির কথাগুলো শোনা না গেলেও সবটা তো দেখা যায়। এবার আর মাথা নামাল না টুনু। তার চোখের সামনে কর্মিসভা শেষ হয়ে গেল। সবাই উঠে যাচ্ছে। টুনু এবার দেখতে পেল—ভবানীদির সব সময়ের সঙ্গী সাইকেলটি এতক্ষণ মাঠে শোয়ানো ছিল। সেটা তুলতে তুলতে ভবানী গলা তুলে ডাকল, আয়—

ডাক শুনেও টুনু গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

ভবানী সাইকেল হাতে—যেন বা কোনও ইটখোলার ম্যানেজার কামিনদের কাজ দেখতে বেরিয়েছে—এমনি ভঙ্গিতে আস্তে ধীরে সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রেখে এগিয়ে এল। টুনুর একেবারে সামনে এসে পেছনের চাকা শূন্যে তুলে ভবানী একবার প্যাডেল করল। নাঃ। চেন তো ঠিকই আছে—

নে! বোস আমার ক্যারিয়ারে। —বলতে বলতে ভবানী সাইকেলে চেপে বসে বাঁ পায়ের ডগা মাটিতে ঠেকিয়ে রাখল। যাতে ব্যালান্স থাকে।

আমি এখন বাড়ি ফিরব। তুমি যাও—

আমায় তো যেতেই হবে। একবার রূপসার খেয়াঘাটে যাওয়া দরকার। নে ওঠ—

বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার খুলনার রাস্তা। লোকজনের যাতাযাত। খোলামেলা জায়গায় দাঁড়িয়ে তক্কাতক্কি করতে কেমন লজ্জা লজ্জা করছে টুনুর।

সে শেষবারের মতো মরিয়া হয়ে বলল, তোমার দরকার তুমি যাও।

ভবানী সাইকেল থেকে নামল। কোনও কথা না বলে সাইকেলটি হেলিয়ে দিয়ে তাতে কোমরের লতানো মতো জায়গাটা—তাই তো মনে হচ্ছে টুনুর—সেখানটা খদ্দরের ব্লাউজে সবটা ঢাকা পড়েনি—শাড়ির সবুজ পাড় গ্রিন রিবন হয়ে এক প্যাঁচে পিঠে উঠে গেছে ভবানীর—ঠেকিয়ে ভবানী দুহাতে টুনুর শার্টের বোতামঘরে বোতাম ভরে দিল। দিয়ে বলল, শার্টটাও ঠিকমতো পরতে শেখেনি।

মফস্বলের এই শহরে ভবানী সবার চেনা। তার এরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে কোনও ছেলের শার্টের বোতাম লাগিয়ে দেওয়া কেউ ফিরেও দেখবে না। কিন্তু টুনুর পক্ষে ভবানীর চোরাটান আটকানো কঠিন হল।

তার খুব কাছাকাছি ভবানীর গা থেকে একটা না-জানা গন্ধ উঠে আসছে। নাকের নীচে কয়েকটা ঘামের বিন্দু। ঘেমে ওঠা কপালে মাথার দু'একটা চুল লেপটে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুক উঠছে সামান্য। পড়ছেও।

কোনও কথা না বলে সাইকেলে চেপে বসল ভবানী। পেছনের ক্যারিয়ারে টুনু। সারা শহরের কেউ এসব ফিরেও দেখে না। কেননা ভবানী তো স্টুডেন্ট কংগ্রেসের হয়ে প্রায়ই এমন ঘুরে বেড়ায়। একে ওকে পেছনে নিয়ে। কাউকে বা সামনে বসিয়ে।

খুলনায় এই সময়টায় উকিলরা ফার্স্ট মুনসেফের কোর্ট থেকে থার্ড মুনসেফের কোর্টে যাচ্ছেন। দৌলতপুর কলেজে বটতলায় নিশ্চয় কৃষক প্রজা পার্টির রফিকদা স্পিচ দিচ্ছে। কলেজের গায়ে ভৈরবের বুকে কচুরিপানা বয়ে চলেছে। জেলাস্কুলে পানু ক্লাসঘরের সামনে

পাকা বকুল পাড়তে গাছে উঠল। আর আমি সাইকেলের ক্যারিয়ারে চেপে টুটপাড়ার ভেতর দিয়ে রূপসার খেয়াঘাটে যাচ্ছি।

টুটপাড়া ছাড়াতেই রাস্তা একেবারে নির্জন। বাঁ ধারে যদিও বা ফাঁকায় ফাঁকায় ঘরবাড়ি। ডান হাতে ঢালা ধানখেত। ধানকাটার পর নেড়া নেড়া মাঠ। দূরে প্রায় ধোঁয়াটে ফাঁকার ভেতর কাদের মরাই। এখন বোধ হয় গাদা ভেঙে ধান ঝাড়া বাকি। রূপসার বুক থেকে উঠে আসা ভরা বাতাসের উল্টোমুখে সাইকেল চালাতে গিয়ে ভবানীর পা ধরে এসেছে। টানতে পারছে না। পেছনে অনেকদূরে কেউ নেই। সামনেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। খুব দূর থেকে একটা রিকশা আসছে।

তড়াক করে লাফ দিয়ে টুনু সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরল। —কী করছ ? এভাবে বাতাসের উল্টোদিকে কেউ ডবল বাইক করতে পারে !

টুনু নিজেই ব্রেক কষে দিতে ভবানী সাইকেল সমেত তার ওপর গিয়ে পড়ল।

ইস্ ! ঘেমে গ্যাছো তো। দম ফুরিয়ে এভাবে কেউ বাইক করে ?

টাল সামলে কোনওমতে ভবানীকে সাইকেল থেকে নামাতে নামাতে টুনু বুঝতে পারল—আর একটু এগোলে দু'জনকেই একসঙ্গে রাস্তায় পড়ে যেতে হত। একটা শিরীষ গাছের নীচে গরু চরানো রাখালদের ঝড়জলের সময়কার খড়ের কুঁজি। সাইকেলটা রাস্তায় থাকল। টুনু ভবানীকে পাঁজাকোলে তুলে কোনওমতে কুঁজির সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর খুব সাবধানে ভবানীকে পিচ রাস্তার পাশে কুঁজির ছড়ানো কয়েক তড়পা খড়ের ওপর শুইয়ে দিল। রাখালরা এই খড় বিছিয়ে ঘুম লাগায়।

এখন জল পাই কোথায় ?

ভবানী কোনওমতে বলতে পারল, সাইকেলে। ঝোলার ভেতর —বোতলে আছে—

ভেঙে যায়নি তো ? বলতে বলতে টুনু সাইকেলের কাছে ছুটে গেল। ভাঙেনি। সাইকেল পড়েছে। হ্যান্ডেলে ঝোলানো কাপড়েব ঝোলাটা পড়েছে তার ওপরে। টুকিটাকি জিনিসপত্তর। লবঙ্গ ভর্তি শিশি। অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট কংগ্রেসের একতাড়া বুলেটিন। ওগুলো ছিল বলেই জলের বোতলটা ভাঙেনি। ঝোলার একেবারে শেষে কংগ্রেসের একটি ছোট ফ্ল্যাগ। যা কিনা সভা সমিতির টেবিলের ওপর রাখা থাকে।

জল খেয়ে উঠে বসল ভবানী। —এরকম উল্টো বাতাসে কখনও ডবল বাইক করিনি।

টুনু কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। একদম খোলামেলা জায়গা। আশেপাশে আধ মাইলের ভেতর কেউ নেই। রূপসার ওপরকার আকাশে চিল। এই ফাঁকাটি যেন এখন এখানকার আড়াল। সে জানতে চাইল, দিলীপদার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল ?

ভবানী কোনও জবাব দিল না। সে স্থির হয়ে টুনুর মুখে তাকাল। তারপর দু' হাতে কল থেকে জল খাওয়ার মতো করে টুনুর বুজে থাকা দুই ঠোঁট খুলতে নিজের ঘেমে থাকা ঠোঁট দিয়ে হাঁ করে তার সারা মুখখানি তছনছ করে দিল। টুনু বুঝতেই পারেনি সে কখন দু হাতে ভবানীকে জড়িয়ে ধরেছে। তার মুখময় লবঙ্গের গন্ধ।

সাক্ষী বলতে দূরের কয়েকটা গাছ। জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে আর শেষ হয় না। আবার। আবার। দুজনই। দুজনকে। একবার উঠে বসতে গিয়ে কুঁজির নিচু আড়ার কঞ্চিতে কানের নীচে ঘষা খেল ভবানী।

কেটে গেল ?

না ! বলে গম্ভীর হয়ে উঠল ভবানী। খুব আস্তে স্পষ্ট করে বলল, শোনো। তুমি আর আমাকে দিদি দিদি করবে না।

তুমি যে আমার চেয়ে বড়।

তাতে কী ! আমি শুধু ভবানী।

ফাঁকা জায়গায় একটা চিৎকার থাকে। তা শোনা যায় না। দেখা তো যায়ই না। সেই আওয়াজটা যেন বাতাসের ভেতর থেকে —বাতাসের ওপরকার খোসা সরিয়ে একটানা উপরে উঠে আসছে।

অ্যাতো মিটিং মিছিল করে যে ভবানী সে এখন রাস্তায় পাশে খড় বিছানো জায়গায় পলকা একটা পাখির মতো বসে। তাই মনে হল টুনুর। সে ফের ভবানীর মুখে, চোখে, গলায় নিজের ঠোঁট ব্রাশের মতো ঝুলিয়ে নিয়ে এল। টের পেল টুনু—এই ইচ্ছের যেন কোনও শেষ নেই।

বহু দূরের বাতাস রূপসার বুক ঝাঁট দিয়ে এদিকটায় ছুটে আসে। তাদের থামার নাম নেই।যা কয়েকটা গাছ—তাদের মাথা এলোপাথাড়ি দুলেই চলেছে। কোনও না জানা গোলমালের একেবারে শেষে যেন ভবানী আর টুনু বসে আছে। টুনুর শার্টের কলার বাতাসে লতপত করছে। ভবানীর শাড়ির আঁচল তাকে পেঁচিয়ে নিয়ে ডানা হয়ে বাতাসে একদম টান টান হয়ে উড়ছে। চ্যাপটা ভারী বেণীটা এখনও খুলে যায়নি।

শহর খুলনা তার সব কোলাহল নিয়ে দূরে চুপ করে বসে আছে। অন্যসময় খুব তেজে চলাফেরা করে—কথা বলে যে ভবানী, সে এখন নরম করে রাস্তায় পাশের ঘাসে তাকিয়ে। যেন ওখানেও কিছু দেখার আছে।

যদি দিলীপদা ফিরে আসে ?

ভবানী কোনও কথা বলল না।

ফের যদি তোমাকে চায় ?

এবার ভবানী তার নিজের গলায় বলে উঠল, ইল্লি ! মাইরি—

এই কথায় ভঙ্গিতে টুনু ফিরে ভবানীকে ফিরে পেল। এইভাবেই তো তাল ঠুকে কথা বলে থাকে। টুনু যেন এবার সত্যি সত্যিই ভরসা পেল। সে বলল, এভাবে আর বাতাসের উল্টোদিকে বাইক কোরো না।

তোমাকে নিয়ে ডবল বাইক করলে একরকমের সুখ। তাকে ভবানী আবারও তুমি করে বলায় টুনুর ভেতরে শির্ শির্ করে উঠল। সে যেন এই ফাঁকা তল্লাটে কী একটা কুড়িয়ে পেয়েছে। যা দেখতে গেলে বাতাসে মিলিয়ে যাবে।